স্বেচ্ছাচারী

শ্রীবিভূতি ভূষণ ভট্ট

ভাদ্র—১৩২৪

মূল্য ১॥০ টাকা মাত্র

প্রকাশক—শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়,

"গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স,"

২০১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

প্রিণ্টার—শ্রীবিহারীলাল নাথ,

"এমারেল্ড্ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্"

৯, নন্দকুমার চৌধুরীর দ্বিতীয় লেন, কলিকাত

স্বেচ্ছাচারী

প্রথম খণ্ড

১

পিতা-মাতার একমাত্র সন্তান হওয়া অনেক রকমেই অপ্রার্থনীয়; বাপ-মা এবং ছেলে—উভয়ের পক্ষ হইতেই এ কথা বলা চলে। কার্ত্তিকচন্দ্রের জন্মের মাসছয়েক পরে অন্নপ্রাশনের সময় পিতা-মাতার মধ্যে তাহার নাম-করণ লইয়াই মস্ত একটা মতভেদ ঘটিয়া গেল। পিতা নাম রাখিলেন, হরিদাস; মাতা রাখিলেন, কার্ত্তিকচন্দ্র। এবং কালক্রমে তাহার মাতার জোরজবরদস্তি ও কান্নাকাটিতে পুত্রের কার্ত্তিকচন্দ্র নামই বাহাল রহিয়া গেল। পিতা যদিও আপনার পিতৃ-সত্ত্ব জাহির করিবার জন্য পুত্রকে মাঝে মাঝে হরিদাস বলিয়াই ডাকিতেন, তথাপি কোন দিক হইতে কোনরূপ সাড়া না পাইয়া তিনিও শেষে বিরক্ত হইয়া তাহাকে তাহার মাতৃদত্ত নামেই ডাকিতে আরম্ভ করিলেন।

বিরোধের মধ্যেই যাহার জন্ম, তাহার পুষ্টিও সেই বিরোধের মধ্যেই হইতে লাগিল। কার্ত্তিকের মাতার উক্ত নাম রাখিবার নানা প্রকার কারণের মধ্যে একটি কারণ এই যে কার্ত্তিকচন্দ্র দেখিতে ঠিক কার্ত্তিকেরই মত। অথচ এই পুত্রের নাম রাখা হইবে কি না, হরিদাস। হরে! ছি, ও যে চাকর-বাকরদের নাম! কার্ত্তিক কি বাবুদের বাড়ী তামাক

সাজিবে, না, ভাত রাঁধিবে যে তাহাকে হরি নামে ডাকিতে হইবে? ছি, কার্ত্তিকের বাপের কি কিছুমাত্র বিবেচনা নাই! যে ছেলে পরে হাকিম-সদরালা হইবে, তাহার নাম হইবে কি না, হরিদাস! বামুন যেন কি!

কার্ত্তিকের পিতা শিবচন্দ্র ন্যায়রত্ন একজন সংকুলীন অথচ দরিদ্র ব্রাহ্মণ। গ্রামের জমিদার মুখোপাধ্যায়-গোষ্ঠীর পৈতৃক টোলের বৃত্তি ও ব্রহ্মোত্তরের উপর নির্ভর করিয়া এবং দুই-এক ঘর শিষ্য-সেবকের বার্ষিকের আয়ে তাঁহার সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ হয়। অধ্যয়ন-অধ্যাপনা ও পূজা-পাঠেই তাঁহার অধিকাংশ সময় কাটিয়া থাকে। তথাপি তিনি তাঁহার একমাত্র পুত্রের ভবিষ্যৎ উন্নতির জন্য গ্রাম্য এণ্ট্রান্স্ স্কুলে তাহাকে ভর্ত্তি করিয়া না দিয়া স্বয়ংই তাহার অধ্যয়নাদির ভার লইলেন। ইহাও কার্ত্তিকচন্দ্রের মাতার সহিত তাঁহার মতদ্বৈধের আর একটি কারণ।

এইরূপ বিরোধের মধ্যে যাহার জন্ম ও বৃদ্ধি, বুদ্ধিও যে তাহার প্রথম হইতেই একটু 'বিরোধী' রকমের হইবে, ইহা অত্যন্ত স্বাভাবিক। সেইজন্য কার্ত্তিকচন্দ্রের প্রকৃতিতে প্রথম হইতেই কতকগুলি পরস্পর বিরোধী গুণের বিকাশ দেখা দিল। সে তাহার পিতার টোলের ছাত্র-দের সহিত সযত্নে ও তীক্ষ্ণ মেধার সহিত অধ্যয়নাদি করিত বটে, তথাপি সে তাহাদের দলে প্রথম হইতেই একটি মূর্ত্তিমান্ বিপ্লবের ন্যায় বিরাজিত ছিল। কিন্তু তাহার মুখের পরম গম্ভীর ভাব দেখিয়া কেহ তাহাকে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে শাসন করিতেও পারিত না। উপরন্তু অধ্যাপকের একমাত্র সন্তান বলিয়া সে অনেক গুরুতর অপরাধ করিয়াও মার্জ্জনা পাইত। বিশেষতঃ তাহার মাতাঠাকুরাণীর ভয়ে ছাত্রদিগকে কার্ত্তিকের বিষয়ে অনেক খানি সঙ্কুচিত থাকিতে হইত।

টোলের ছাত্র সর্ব্বানন্দের ব্যাকরণের আদ্য পরীক্ষার সময় অতি সন্নিকট। সে রাত্রি জাগিয়া ব্যাকরণের সূত্র কণ্ঠস্থ করিয়াছে এবং অনেক রাত্রে প্রদীপ নিবাইয়া শয়ন করিয়া প্রত্যূষে উঠিয়াই তাহার ব্যাকরণখানির জন্য হাতড়াইতেছে,—ইচ্ছা, প্রাতঃকৃত্য সারিয়া আসিয়াই পড়িতে বসিবে। কিন্তু দেখা গেল, তাহার মাথার শিয়রের পুস্তক-রাশি বিপর্য্যস্ত এবং ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত; সর্ব্বোপরি সেই অতি-যত্নের মুগ্ধবোধখানি যে কোথায় গিয়াছে, কেহই তাহা বলিতে পারে না।

কে করিল? কে করিল? আর কে?—কার্ত্তিকচন্দ্র। কিন্তু সে কোথায়, তাহারও কোন সন্ধান পাওয়া গেল না। পিতা বিরক্ত হইয়া শিশুর অনুসন্ধানে তাহাকে নিতাই ঘোষের দাওয়া হইতে ধরিয়া আনিয়া প্রশ্ন করিলেন, "কেন তুমি এ কাজ করলে?" কার্ত্তিকচন্দ্র পরম গম্ভীর-ভাবে বলিল, "সারা রাত্রি পড়ে সর্ব্ব দাদার মাথা খারাপ হয়ে যাবে, পরীক্ষায় ফেল হবে, তাই ওর বইখানা সরিয়ে রেখেছি।" পিতা ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, "শীঘ্র এনে দাও! আর যদি এ রকম কর, তা হলে তোমায় বিশেষ শাস্তি দেব।" কার্ত্তিকচন্দ্র নির্ব্বিকার চিত্তে সর্ব্বানন্দেরই একটা ভাঙ্গা বাক্স হইতে সেই প্রার্থিত পুস্তকখানি বাহির করিয়া দিয়া বলিল, "সর্ব্বদাদা, সারাদিন গ্যাজর গ্যাজর করো না, বল্‌ছি, আমার শুদ্ধ মাথা খারাপ হয়ে যাবে।" সর্ব্বানন্দ হাসিয়া বলিল, "তুমিও যখন পরীক্ষা দিতে যাবে, তখন এমনি করেই গ্যাজর গ্যাজর করবে।" কার্ত্তিকচন্দ্র অত্যন্ত অবজ্ঞা-ভরে একটা অদ্ভুত শব্দ করিয়া চলিয়া গেল।

ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত সত্য যে শীতকালেই গরম জামা-কাপড় গায়ে দিতে হয়, কিন্তু আমাদের কার্ত্তিকের নিকট সে সত্য একেবারে বন্ধ্যার পুত্রের ন্যায়ই মিথ্যা। বৈশাখের রৌদ্রে সকলে যখন ঘামিয়া অস্থির

হইতেছে, তখনই তাহার প্রাতর্ভ্রমণের সময়। সে মধ্যাহ্নে আহারাদি সারিয়া মাতুলালয় হইতে প্রাপ্ত লাল মোজা ও গরম কোটে শোভিত হইয়া ছত্রহীন মস্তকে ঐ সময় সমস্ত গ্রামটা প্রদক্ষিণ করিয়া আসে। কেহ আপত্তি করিলে সে বলে, "সবাই যা করবে, তাই যে করতে হবে, এর কি মানে? সব জিনিষেরই যখন দুটো দিক আছে, তখন সব কাজেরই বা দুটো দিক না থাকবে কেন?" সে যে একজন নৈয়ায়িকের পুত্র, এ কথা নানাপ্রকারে প্রমাণ করিয়া কার্ত্তিকচন্দ্র এই অল্পবয়সেই ন্যায়ের মূর্ত্তিমান্ ফক্কিকারস্বরূপ ঘুরিয়া বেড়াইত। এবং তাহার অকালপক্ক মুখের নিকট কাহারও কোনরূপ আপত্তি টিঁকিত না বলিয়া তাহার মাতা মনোরমা ঠাকুরাণী প্রতিবেশিনীদিগকে মাঝে মাঝে গর্ব্বিত হাস্যে বলিতেন, "বামুন আমার এমন ছেলেকে টোলে ভর্ত্তি করতে চায়!" তাঁহার কথায় কেহ যদি সমবেদনা প্রকাশ করিয়া কিছু বলিত, অমনি তিনি বলিতেন, "ছেলে যদি আমার বাঁচে তাহলে ও নিশ্চয় একটা হাকিম টাকিম হবেই। তবে যে ওর শরীর!" অবশ্য কার্ত্তিকচন্দ্রের ভগ্ন স্বাস্থ্য সম্বন্ধে প্রতিবেশিনীদিগের সহিত হয়ত তাহার মাতার আন্তরিক অমিল থাকিতে পারে,—কারণ কার্ত্তিকচন্দ্রের দিব্য নধর গৌর কান্তি,—তথাপি মনোরমা দেবীর মুখের সম্মুখে সকলেই তাঁহার কথায় সায় দিয়া যাইত।

কার্ত্তিকচন্দ্রের এইরূপ বহুবিধ গুণ থাকা সত্ত্বেও একটা বিশেষ দোষ ছিল এই যে সে পড়াশুনায় অতি দ্রুত অগ্রসর হইতেছিল। ইহারই মধ্যে সে ব্যাকরণ ও কাব্যে তাহার পিতার অনেক বর্ষীয়ান্ ছাত্রকেও পরাস্ত করিতেছিল; এবং ন্যায় শাস্ত্রেরও দুই-একটা বুকনি তাহার অবিদিত ছিল না।

অপরাহ্নে দেবায়তনের নাট মন্দিরে বসিয়া অধ্যাপক শিবচন্দ্র তাঁহার

কতকগুলি ছাত্রের সহিত ন্যায়ের "অভাব" বস্তু সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছিলেন। একজন বুদ্ধিমান্ ছাত্র, নাম ব্রহ্মপদ, অধ্যাপকের সহিত ঐ বিষয়ে মৃদুভাবে তর্ক করিতেছিল। নিকটে বসিয়া কার্ত্তিকচন্দ্র একটী পারাবতের পদদেশে ঘুঙুর ও গলদেশে বিচিত্র বর্ণের ফিতা জড়াইতে ব্যস্ত ছিল। অধ্যাপক যখন ছাত্রের তর্কে কিঞ্চিৎ উষ্ণভাবে উত্তর প্রত্যুত্তর করিতেছিলেন, ঠিক সেই সময় কার্ত্তিকচন্দ্র হঠাৎ পারাবতটীকে তুলিয়া লইয়া একেবারে অধ্যাপক ও ছাত্রগণের মধ্যস্থলে ফেলিয়া দিয়া সশব্দে হাসিয়া উঠিল। পিতা ক্রুদ্ধ হইয়া তাহার দিকে ফিরিবামাত্র সে গম্ভীর স্বরে বলিল, "আপনি অভাব বস্তু বোঝাতে পার্ছেন না, আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি। ব্রহ্মদাদা, তোমার বুদ্ধি নেই। এই অভাব বস্তুর দরুণই তুমি বুঝিতে পার্ছ না। অতএব অভাব বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার কর কি না? এই দেখ, এই রনু (পক্ষীটীর নাম) কেমন অভাব বস্তু বোঝে। ও বেশ বুঝেছিল যে ওর পায়ে ঘুঙুরের অভাব আছে, তাই এতক্ষণ চুপ করে তাই পর্ছিল, তোমার মত তর্ক করেনি। কিন্তু তুমি এমনি বোকা, তোমার বুদ্ধি নেই, এই অভাব বস্তুটা পর্য্যন্তও তুমি জান না।"

ছাত্রেরা অনেকে মুখ ফিরাইয়া হাস্য সম্বরণের চেষ্টা করিতে লাগিল, কিন্তু ব্রহ্মপদ ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, "ন্যায়রত্ন মহাশয়, চিরদিন কি আমাদের এইরকম অত্যাচার সইতে হবে?" অধ্যাপক স্বয়ংও বিরক্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু পুত্রের এই অদ্ভুত যুক্তি শুনিয়া তিনিও না হাসিয়া থাকিতে পারিলেন না। ব্রহ্মপদ ক্রুদ্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। কার্ত্তিকচন্দ্র তখন তাহার পৃষ্ঠদেশে মৃদু একটা চপেটাঘাত করিয়া বলিল, "এঃ, তোমায় অভাব বস্তুতেই পেয়ে বসেছে—বুদ্ধির অভাবের সঙ্গে হাসিরও অভাব হয়েছে—হাস্‌তে পর্য্যন্ত ভুলে গেছ! ছি!"

কার্ত্তিকচন্দ্র হাসিতে হাসিতে পারাবতটীকে লইয়া প্রস্থান করিল। অধ্যাপক তখন নানা কথায় ছাত্রকে শান্ত করিয়া পুনরায় অধ্যাপনায় মন দিলেন।

২

শিবরামপুরের কালিকামোহন মুখোপাধ্যায়ের বয়স যাহাই হউক, তাঁহার গুরু গম্ভীর চাল-চলনের জন্য কেহই তাঁহার বয়স অনুমান করিতে সাহস করিত না। বনিয়াদী জমিদারী চালের সমস্ত খুঁটিনাটিই সযত্নে তিনি পালন করিয়া চলিতেন। প্রাতঃকৃত্য-সমাপনের সময় সেই যেমন বহু বৎসর পূর্ব্বেও জলচৌকিতে বসিয়াই পাইকদের ডাকিয়া নিকটে আনিতেন, আজও তাঁহার সে চালের পরিবর্ত্তন ঘটে নাই। সেই বেলা দেড়টার পর কাছারি হইতে উঠিয়া দুইটা পঁয়ত্রিশ মিনিটের সময় আহারে উপবেশন আজিও অব্যাহত ভাবে চলিতেছে। নিদ্রার সময়, উদ্যান পরিদর্শনের সময়, পিতামহের আমলের সেই হল্‌দে রঙের মোটা লাঠিটি লইয়া ভ্রমণের সময়—এ সব কিছুরই একচুল নড়চড় হয় নাই। এমন কি কেহ কেহ বলে, বাবু তাঁহার পিতার মৃত্যুর পর প্রথম পুণ্যাহের দিনে যে বস্ত্রখানি যে-ভাবে পরিধান করিয়াছিলেন, আজও সেইরূপ বস্ত্র সেই ভাবে সেই তাঁতিদের নিকট হইতেই ক্রয় করিয়া পরিধান করিয়া থাকেন। অধিক কি, এই চাল বজায় রাখিবার জন্য তিনি সহরাদিতে গমনাগমনও একপ্রকার ছাড়িয়া দিয়াছিলেন।

তাঁহার ভয়ে ব্যাঘ্র ও ছাগশিশু একত্র জলপান করিত কি না, এ পর্য্যন্ত তাহার কোন সঠিক সংবাদ পাওয়া যায় নাই, তবে অনেক নর-ব্যাঘ্র অর্থাৎ ভোজপুরী পাহালবানকে তিনি পুষিতেন; এবং বহু দরিদ্র আত্মীয়-অনাত্মীয় শ্রেণীর লোক তাঁহার আশ্রয়ে পালিত হইত। তাঁহার প্রাসাদতুল্য প্রকাণ্ড অট্টালিকা বহু লোক-লস্কর ও জীব-জন্তুর কলরবে

মুখরিত থাকিত। অশ্বশালায় অশ্ব, গোশালায় গাভী, অতিথিশালায় অতিথি, স্তম্ভের শিখরে পারাবত, কড়ি বরগার ফুকরে ফুকরে চড়ুই তালচঞ্চু,—পাকশালায় পাচকের কলরব, দাস-দাসীগণের বচসা, অন্তঃপুরে বিধবার দল—তাঁহার সংসারে কিছুরই অভাব ছিল না। তথাপি কোন কোন বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি বলিতেন যে কালিকাবাবু পুত্র-সন্তান-অভাবে অন্তরে অন্তরে অত্যন্ত ম্রিয়মাণ ছিলেন। অবশ্য এ কথা বাহিরের কেহ বুঝিতে পারিত না। কারণ কালিকাবাবুর একমাত্র কন্যা শ্রীমতী শৈলজাসুন্দরী অন্ততঃ বাহ্যতঃ তাঁহার পুত্রের অভাব পূর্ণ করিয়া, বরং তাহার অধিক হইয়াই, বিরাজ করিতেছিলেন।

এই শৈলজাসুন্দরী যখন মাত্র দেড় বৎসরের, তখনি ইঁহার নামে একটী বড় মৌজা ক্রয় করা হয় এবং এতাবৎকাল পর্য্যন্ত বহু পত্তনি, দরপত্তনি, সেপত্তনি মাহাল পিতা ইঁহার নামে ক্রয় করিয়াছেন। এমন কি ইঁহার সমস্ত বিষয়াদি তত্ত্বাবধানের জন্য পৃথক সেরেস্তা গোমস্তা কারকুন পাইক নিযুক্ত করিয়া কালিকামোহন স্বয়ং "গার্জ্জেন" নাম স্বাক্ষর করতঃ ইঁহার বিষয়-কর্ম্ম চালাইতেছিলেন। কন্যার নামে পৃথক "বিষয়-আশয়" করা তাঁহার অপত্য স্নেহের যতখানি নিদর্শন, তদপেক্ষা শিশু কন্যাকে ইতিমধ্যেই জমিদারী করিয়া দেওয়ার একটা অহঙ্কারকেই বিশেষভাবে প্রকাশিত করিয়াছিল। শৈলজাসুন্দরী যদিও এখনও অষ্টম বর্ষ অতিক্রম করেন নাই, তথাপি ইহারই মধ্যে তাঁহার নাম বড় বড় মকদ্দমায় বাদী অথবা প্রতিবাদীরূপে জগৎ সমক্ষে প্রচারিত হইতেছিল। এমন কি ইঁহার নামীয় একটা মকদ্দমা প্রিভিকাউন্‌সিল্ পর্য্যন্ত গিয়া একটী "লিডিং" কেসের মূর্ত্তিতে বর্জ্জয়েস অক্ষরে I. L. R. এর অঙ্ক শোভিত করিয়াছে। যদিও উক্ত শৈলজাসুন্দরী উক্ত মকদ্দমায় পরাজিত হইয়াছিলেন, তথাপি, তিনি তাঁহার পিতার পিতৃপিতামহগণের প্রসিদ্ধ

নামকে সুদূর শ্বেতদ্বীপ পর্য্যন্ত বিস্তৃত করিয়া কালিকাবাবুর জমিদারীর প্রজাগণের হৃদয়ে জলাতঙ্কের ন্যায় বিরাজ করিতেছিলেন। এরূপ কন্যার পিতা হইয়া কালিকাবাবু আপনাকে ধন্যই মনে করিতেছিলেন।

এ হেন কন্যার বিবাহ দিতে হইলে অনেক চিন্তা, অনেকখানি সতর্কতার প্রয়োজন, শৈলজাসুন্দরীর পিতাও এ কথা বিশেষভাবে বুঝিতেন। অবশ্য এরূপ অবস্থায় সম্বন্ধ বা প্রস্তাবের অভাব কখনই হইতে পারে না, কারণ শৈলজা ধনী পিতার ধনী সন্তান। বহু দিক হইতে নানা প্রকার প্রার্থনীয়-অপ্রার্থনীয় সম্বন্ধ ইতিমধ্যেই ঝাঁকে ঝাঁকে আসিয়া উপস্থিত হইতেছিল। কিন্তু পিতা কালিকামোহনের এ পর্য্যন্ত কোনটিই মনঃপূত হয় নাই। কালিকামোহনের বৃদ্ধা মাতা এখনও জীবিতা আছেন; এবং তিনিই গৌরী-দানে পুণ্য সঞ্চয়ের লোভে এখনও ৺কাশীধামে যাইয়া বাস করিতে পারেন নাই। তবে ব্যাপার যেরূপ দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে গৌরী ত দূরের কথা, কন্যকা-দানও সন্দেহজনক হইয়া উঠিয়াছে।

শৈলজার বিবাহ-বিষয়ে ইনিও ইঁহার পুত্রের চিন্তার অংশ-ভাগিনী হইয়াছিলেন। কারণ বিবাহ দিয়া এই একমাত্র কন্যাকে একেবারে পর করিয়া দিতে কালিকামোহনও যেমন অনিচ্ছুক, তাঁহার মাতা জগদম্বা দেবীও তদ্রূপ। কিন্তু শৈলজাসুন্দরীর মাতা অর্থাৎ জমিদারী সেরেস্তায় যাঁহার নাম "বৌরাণী" লেখা হইয়া থাকে, তাঁহার ইচ্ছা কিঞ্চিৎ অন্যরূপ ছিল বলিয়াই প্রকাশ। শুনা যায়, তিনি না কি ঘরজামাই করার একান্ত বিরোধী। তিনি তাঁহার কোন কোন অন্তরঙ্গের নিকট মনের ভাব প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, যদি বিবাহই দিতে হয়, তাহা হইলে একেবারে দান করিয়া ফেলাই উচিত। কন্যার পরিবর্ত্তে একটী পুত্র লাভ করা কোনক্রমেই বাঞ্ছনীয় নহে, কারণ তাহাতে কন্যাই স্বামীর স্থান

অধিকার করিয়া দাম্পত্য জীবনের সমস্ত সুখ-শান্তি হারাইয়া ফেলে। স্ত্রীলোক যদি একেবারে স্বামীতে মিশিয়া যাইতে না পারে, তাহা হইলে বিবাহের প্রধান উদ্দেশ্যই নিষ্ফল হইয়া যায়। অবশ্য তাঁহার মত যে গৃহের বধূর মত বলিয়াই যথাবিধি উপেক্ষিত হইয়াছিল, এ কথা বলা বাহুল্য মাত্র।

একমাত্র কন্যার উপর যে মাতার এতখানি স্নেহ-হীনতা প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছিল, সেই মাতা যে তাঁহার শ্বশ্রূঠাকুরাণী ও স্বামী মহাশয়ের নিকট ইহার জন্য কিঞ্চিৎ লাঞ্ছিত হইবেন, ইহা স্থির সিদ্ধান্ত; তথাপি ইঁহার দুর্বুদ্ধি যে ইনি স্বীয় মতের একচুলও পরিবর্ত্তন করিতে পারেন নাই। স্ত্রী-বুদ্ধি (অর্থাৎ পত্নীর বুদ্ধি) চিরদিনই প্রলয়ঙ্করী! শাস্ত্র কি মিথ্যা হয়!

জমিদার মহারাজ ও তাঁহার মাতা এইভাবে চিন্তাযুক্ত হইয়া কালাতিপাত করিতেছেন, এমন সময় একদিন কালিকামোহনের দৃষ্টি অকস্মাৎ কার্ত্তিকচন্দ্রের উপর পতিত হইল।

কার্ত্তিকচন্দ্র তাহার মধ্যাহ্ন-ভ্রমণের সময় কখনও কখনও জমিদারী কাছারী, এমন কি জমিদারী প্রাসাদের অন্তঃপুর পর্য্যন্ত শুভাগমন করিত। তাহার অদ্ভুত চাল-চলন ও বেশভূষা সদর গোমস্তা হইতে পাইক দরোয়ান ঝাড়ুদার ফরাশ পর্য্যন্ত সকলের নিকটই পরিচিত ছিল; এমন কি অন্তঃপুরের দাস-দাসী, পাচিকা ও অন্যান্য "দীনাঃসমাশ্রিতা" বিধবাগণের নিকটও সে ন্যায়রত্ন মহাশয়ের পুত্র-রত্ন বলিয়া সমাদৃত, পরিচিত এবং সর্ব্বদোষে উপেক্ষিত হইত। তবে এতাবৎকাল পর্য্যন্ত সে বাবু মহারাজ অথবা তাঁহার মাতা "বুড়ী রাণীমার" মনোযোগ আকর্ষণ করিতে পারে নাই। কিন্তু জমিদারী কাছারীর দালানের পারাবত-দলের সহিত ইহার পরিচয় ঘনিষ্ঠতম ছিল। এবং সেই সামান্য কারণ হইতে সহসা কার্ত্তিকচন্দ্র একদিন "বাবু মহারাজের" রাজকীয় দৃষ্টি আকর্ষণ করিল।

স্থান জমিদারী কাছারীর সম্মুখস্থ প্রকাণ্ড নাটমন্দির—অর্থাৎ যেখানে নানা উপলক্ষে বৎসরের মধ্যে অন্ততঃ সার্দ্ধ দ্বাবিংশবার যাত্রা, নাচ, গান হইয়া থাকে। কাল মধ্যাহ্ন; এবং পাত্র আমাদের কার্ত্তিকচন্দ্র ও কতকগুলি বাগ্দি, চাঁড়াল প্রভৃতি নিম্ন শ্রেণীর লোক। উপলক্ষ দ্বিবিধ,—কার্ত্তিকচন্দ্রের পক্ষে "মুক্ষি" নামক এক প্রকার পারাবত-বংশের উপর অত্যাচার এবং তাহাদের বংশধরগণের দুই-একটীকে পিনাল কোডের এব্‌ডাক্‌সন ধারানুযায়ী কার্য্যের দ্বারা বে-আইনি স্থানান্তর-করণ, এবং বাগ্দিগণের পক্ষে জমিদার মহারাজের নিকট হইতে পথ-করের দায় হইতে মুক্তিলাভ করা।

কার্ত্তিকচন্দ্র একজন উক্ত শ্রেণীর লোককে আদেশ করিল, "রামু, এই মৈ খানা চেপে ধর ত, আমি উঠ্‌ব।"

রামু ওরফে রামা বাগ্দি ক্ষীণস্বরে প্রতিবাদ করিয়া বলিল, "দাদা-ঠাকুর, বাবু মহারাজের সামনে কেমন করে এ কাজ কর্‌ব?"

কার্ত্তিকচন্দ্র একবার অবজ্ঞার দৃষ্টিতে কাছারীর কক্ষের দিকে চাহিয়া বলিল, "কেউ কিছু বল্‌বে না, তুমি ধর।"

রামু তখন কাতর হইয়া বলিল, "দাদাঠাকুর, আমরা দরবার করতে এসেছি, এখন যদি দেওয়ানজী কোন কারণে বিরক্ত হন, তা হলেই সর্ব্বনাশ!"

কার্ত্তিকচন্দ্র বিস্মিত হইয়া বলিল, "দরবার! সে আবার কি? দরবার ত' নবাব-বাদশারা কর্‌তেন, তোমরা তা কি করে কর্‌বে?"

রামু কহিল, "আজ্ঞে মিছিমিছি আমাদের ওপর পথকর চাপানো হয়েছে, সেই কথা মহারাজের কাছে নিবেদন পেতে এসেছি।"

কার্ত্তিক কহিল, "তা কর্‌লে কি হবে?"

এই প্রশ্নে সেই বিষণ্ণ জোড়হস্ত ব্যক্তিগণের মুখেও একটা অস্ফুট

হাসির রেখা দেখা দিল। রামু ভাবিল, এই কার্ত্তিকচন্দ্রকে দিয়াই হয়ত তাহাদের এ বিষয়ে কিছু উপকার হইতে পারে। মজ্জমান ব্যক্তির তৃণাবলম্বনের ন্যায় রামচন্দ্র ইহাকেই অবলম্বন করিতে মনস্থ করিয়া বলিল, “দাদাঠাকুর, আপনি যদি আমাদের হয়ে দু'কথা বলে দাও, তাহলে আমি নিজেই কবিতোর ধরে দেব।”

কার্ত্তিক কহিল, “কাকে কি বল্‌তে হবে, বল, আমি এখনই বল্‌ছি।”

রামু কহিল, “দেওয়ানজীকে আর মহারাজকে বল্‌তে হবে—”

কার্ত্তিক কহিল, “মহারাজ! সে আবার কে?”

রামু কহিল, “আজ্ঞে, বাবু মহারাজ—”

কার্ত্তিক কহিল, “ওঃ, বুঝেছি। আচ্ছা, কি বল্‌তে হবে?”

রামু কহিল, “বল্‌বেন যে এরা গরীব, এদের উপর আবার পথকর বসানো কেন? আমাদের যে চাকরান জমি আছে, তার জন্য ত আমরা তাঁবেদার হামেহাল হাজির আছি। রাত-বিরেত মানিনে, যখনই ডাক পড়ে, হুজুরে হাজির হয়ে কাজ করে দি। এর ওপরও যদি আবার খাজনা দিতে হয়, তা হলে আমরা দাঁড়াই কোথা? এই সব কথা একটু গুছিয়ে কাকুতি মিনতি করে যদি বল্‌তে পার, তাহলে দাদাঠাকুর আমরা আপনার কেনা হয়ে থাক্‌ব।”

কার্ত্তিকচন্দ্র আর দ্বিরুক্তি না করিয়া যেখানে শিবরামপুরের জমিদার কালিকামোহন ও তাঁহার প্রবলপ্রতাপ দেওয়ান দুর্গাশঙ্কর বসিয়া কাগজ-পত্র দেখিতেছিলেন, একেবারে সেইখানে উপস্থিত হইয়া গম্ভীর মুখে বলিল, “আপনার কাগজপত্র রাখুন, দেওয়ানজী, আপনি রামু বাগ্দিদের খাজনা মাপ করে দিন। ওরা গরীব, ওরা খাজনা দেবে কোথা থেকে?”

হঠাৎ জমিদারী কাছারির মৃদু গুঞ্জনধ্বনি থামিয়া গেল। যুগপৎ সকলেরই দৃষ্টি কার্ত্তিকচন্দ্রের উপর পতিত হইল। দেওয়ান মহাশয়ের চক্ষু

তাঁহার চশমার উপর দিয়া তেজ উদ্‌গীরণ করিয়া এই নির্ভীক বালকের উপর স্থাপিত হইল। দেওয়ানজী গম্ভীর ভাবে বলিলেন, "কি বল্‌ছ, কার্ত্তিক ?"

কার্ত্তিক কহিল, "আমি বল্‌ছি, কেন আপনারা এই গরীব রামুদের ওপর অত্যাচার কর্‌ছেন ? আমি ওদের অবস্থা জানি, ওরা খাজনা দিতে পার্‌বে না।"

গোমস্তা, মুহুরী ও অন্যান্য কর্ম্মচারীরা ভয়ে বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া রহিল। কারণ এই দুর্দ্ধর্ষ দেওয়ানকে ভয় করে না, এরূপ ব্যক্তি দশ-বারো ক্রোশের মধ্যে একটিও ছিল না। এমন কি স্বয়ং জমিদার মহাশয়ও ইঁহার মান্য রক্ষা না করিয়া কথা বলিতে সাহস করিতেন না। ইঁহার হাঁক-ডাকে বড় বড় ভোজপুরী দরোয়ানদেরও কলেবর কম্পিত হইত। আর সামান্য প্রজারা ত ইঁহাকে দেখিলে বাত্যাতাড়িত শুষ্ক পত্রের ন্যায় সুদূরে পলায়ন করিত—কিম্বা যদি নিতান্তই দুর্ভাগ্যবশতঃ ইঁহার রোষ-দৃষ্টির সম্মুখে আসিয়া পড়িত, তাহা হইলে বাত্যাহত কদলীর ন্যায় ভূমি ভিন্ন তাহাদের অপর আশ্রয়-স্থান আর কোথাও থাকিত না।

এ-হেন দেওয়ানের চশমা ও পিঙ্গল চক্ষুর সম্মুখে দাঁড়াইয়া চতুর্দ্দশ বর্ষীয় বালক যখন প্রভুর ন্যায় আজ্ঞা প্রদান করিল, তখন সকলেরই হৃদয়ে একটা আশু বিপদ-পাতের আশঙ্কা দেখা দিল। কার্ত্তিকচন্দ্র কিন্তু কোন দিকে লক্ষ্য না করিয়া বলিল, "দেওয়ানজী, আপনি গোমস্তাদের বলে দিন, ওরা যেন আর এদের ওপর অত্যাচার না করে!"

দেওয়ান আপনার গাম্ভীর্য্যের শিখর হইতে না নামিয়া বলিলেন, "যাও কার্ত্তিক, এখন বিরক্ত করো না। অন্য সময় তোমার আর্জী শোনা যাবে।"

কার্ত্তিক কহিল, "অন্য সময় আবার কি ? এই ত সময়! এখনই

ত' কাছারি হচ্ছে। এখনই ওরা এসেছে, যা হয় এখনই হুকুম দিয়ে দিন। ওরা আবার কতবার হাঁটাহাঁটি কর্‌বে?"

দেওয়ান সিংহ-গর্জ্জনে বলিলেন, "কে আছিস্ রে, ঐ বাগ্‌দি হারাম-জাদাদের দূর করে দে ত! এত বড় আস্পর্দ্ধা! যা কার্ত্তিক, এখন গোল করিস্‌নে, বল্‌ছি, নইলে—"

কার্ত্তিকচন্দ্র গম্ভীরভাবে বলিল, "দেওয়ানজী, আপনি রাগই করুন আর যাই করুন, ওদের খাজনা মাপ না কর্‌লে আমি এখান থেকে উঠ্‌ছিনে। বাবু, আপনি ত রয়েছেন, আপনিই একটা হুকুম দিন না!"

দেওয়ানজীর আর সহ্য হইল না; তিনি জমিদারি-চালে হুকুম দিলেন, "ঘনবরণ সিং, এই ছোঁড়াটার কান ধরে ওর বাপের কাছে রেখে আয় তো।"

ঘনবরণ সিং নিকটে আসিয়া দাঁড়াইয়া হস্ত প্রসারিত করিয়া বলিল, "চলিয়ে ঠাকুরজী।"

কার্ত্তিকচন্দ্র সহসা কাছারির চৌকির উপর উঠিয়া তাহার গালে প্রচণ্ড এক চড় কসাইয়া বলিল, "ছাতুখোর, তুই আমার গায়ে হাত দিতে আসিস্!"

কালিকামোহন এতক্ষণ সকৌতুকে বালকের অদ্ভুত ভাব-ভঙ্গী লক্ষ্য করিতেছিলেন। সহসা তাঁহার প্রসিদ্ধ পাইককে এইভাবে অপমানিত হইতে দেখিয়া তিনি হাসিয়া বলিলেন, "ঘনবরণ, বাইরে যা। কি বাবা কার্ত্তিক, তুমি কি দরবার কর্‌ছ—আমার কাছে কর।"

কার্ত্তিক কহিল, "দরবার! কে দরবার কর্‌ছে? দরবার নবাব-বাদশা এরাই করে, আর কে কর্‌তে পারে! আমি এই কথা বল্‌তে এসেছি যে, যারা আপনারই কাজ করে, তারাই আপনার কাছ থেকে মাইনে দাবী কর্‌তে পারে। তা না হয়ে আপনি তাদের কাছ থেকে খাজনা নেবেন কি হিসেবে?"

কালিকামোহন বেগতিক দেখিয়া হাসিয়া বলিলেন, "আচ্ছা, আচ্ছা, আমি ওদের খাজনা মাপ করে দেব। যাতে কেউ ওদের খাজনা না নেয়, তা করে দেব। তুমি যাও, এই রোদ্দুরে ঐ গরম কোটটা খুলে ফেলো।"

কার্ত্তিকচন্দ্র বিজয়-গর্ব্বে গম্ভীর মুখে ফিরিয়া যাইতে যাইতে বলিল, "গরম জামা খোলা না খোলা, সে আমার ইচ্ছে।"

কার্ত্তিকচন্দ্র নাট-মন্দিরে নামিয়া দেখে, তাহার বাগ্দি বন্ধুরা বেগতিক দেখিয়া পূর্ব্বাহ্ণেই পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিয়াছে। তখন সেই বিজয়-সংবাদ স্বয়ং সে তাহাদিগকে দিবার জন্য উন্নত মস্তকে দেউড়ীর মধ্য দিয়া দরোয়ানদের জ্বলন্ত দৃষ্টি উপেক্ষা করিতে করিতে চলিয়া গেল।

৩

মধ্যাহ্নে দেবায়তনের কূপে স্নান করিতে করিতে ব্রহ্মপদ ও আর একটি ছাত্র, নাম শ্যামাপ্রসন্ন, এই দুইজনের মধ্যে গভীরভাবে তর্ক চলিতেছিল। শ্যামাপ্রসন্ন বলিল, "কাব্য পড়বার জন্য ব্যাকরণ বা অলঙ্কার শাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপত্তির প্রয়োজন নেই। কবিতার ভাব বোঝা সহজ বুদ্ধিতেই হয়।"

ব্রহ্মপদ ন্যায়ের ছাত্র, তথাপি সে ব্যাকরণের উপাধিও লাভ করিয়াছিল বলিয়া প্রতিবাদ করিয়া বলিল, "কখনই নয়; ব্যাকরণ আর অলঙ্কার শাস্ত্রকে অবলম্বন করেই কাব্য, নইলে সে কাব্য কাব্য নামেরই যোগ্য হতে পারে না।"

"অর্থাৎ, তোমার মতে আগে ব্যাকরণ তৈরি হয়েছিল, তার পর কাব্যসৃষ্টি! আগে রাস্তা তৈরি, তারপর লোক-চলাচল! কি বুদ্ধি!"

"ব্যাকরণের সৃষ্টি যে আগে হয়েছিল, এ কথা জোর করে বলা যায় না, তবে—"

মেসের দুই একজন সহৃদয় ব্যক্তির সাহায্যে এবং শিবচন্দ্র ও তৎপুত্রের সেবায় সর্ব্বানন্দ সে যাত্রা বাঁচিয়া গেল। পরে সর্ব্বানন্দ কতকটা সুস্থ হইলে কার্ত্তিকচন্দ্র একদিন তাহার পিতাকে বলিল, "বাবা, আমি বাড়ী যাব।"

শিবচন্দ্র বলিলেন, "আর চারপাঁচ দিন পরেই আমি সর্ব্বানন্দকে নিয়ে বাড়ী ফির্‌ব, তখন যেও।"

কিন্তু কার্ত্তিকচন্দ্র সে কথায় কান না দিয়া বলিল, "এই মেসের একজন আজই বাড়ী যাচ্ছেন, তাঁর সঙ্গেই আমি যাব। তিনি টিকিট করে দেবেন, তারপর ষ্টেশন থেকে আমি বাড়ী যেতে পার্‌ব। আমার মন কেমন কচ্চে।" শিবচন্দ্র পুত্রকে চিনিতেন। তিনি আর প্রতিবাদ না করিয়া তাহার যাওয়ার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন।

প্রভাতে কার্ত্তিকচন্দ্র যখন টোলে প্রবেশ করিতেছিল, তখন কয়েকজন ছাত্র তাহাকে দেখিতে পাইয়া ছুটিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "খপর কি, কার্ত্তিক?"

কার্ত্তিক বিষণ্ণ মুখে বলিল, "খপর আর কি! কাল সব শেষ হয়ে গেছে।"

সমবেত ছাত্রদের সকলের মুখ হইতে যুগপৎ একটা বিস্ময় ও ভয়সূচক শব্দ বাহির হইল। কার্ত্তিক তীব্র দৃষ্টিতে সকলের মুখের দিকে একবার চাহিয়া লইল। কিছুক্ষণ নীরবে থাকিয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ব্রহ্মপদ বলিল, "এই যে পরশু পত্র পেয়েছি, সর্ব্বানন্দের অবস্থা অনেক ভাল।"

কার্ত্তিকচন্দ্র আর কোন উত্তর না দিয়া মাতৃসন্নিধানে চলিয়া গেল। কিন্তু তাহার ওষ্ঠে সে সময় যে তীব্র ব্যঙ্গের ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছিল, সকলেই তাহা লক্ষ্য করিল। ব্রহ্মপদ গম্ভীর মুখে বলিল, "কার্ত্তিককে

আমার বিশ্বাস হয় না। ন্যায়রত্ন মশায় এলেন না কেন? নিশ্চয়ই এ-সব ওর দুষ্টামি।"

দুই একজন মাথা নাড়িয়া বলিল, "এত বড় মিথ্যা কথাটা কি ও বল্‌বে! আর এতে ওর লাভই বা কি হবে?"

ব্রহ্মপদ কহিল, "লাভ-অলাভ নিয়ে ওর দুষ্টুমির পরিমাপ হয় না। এত অল্প বয়সে এতখানি দুষ্ট বুদ্ধি আমি ত আর দেখিনি।"

কার্ত্তিক তাহার মাতার নিকট কোন কথা গোপন করিল না, সেই জন্য কিছুক্ষণের মধ্যেই সত্য সংবাদ প্রকাশ হইয়া পড়িল। ক্রুদ্ধ ব্রহ্মপদ মনোরমা ঠাকুরাণীর নিকট যাইয়া কার্ত্তিকচন্দ্রের দুষ্টামির কথা নিবেদন করিয়া প্রতিকার প্রার্থনা করিল। কিন্তু কার্ত্তিকচন্দ্র ততক্ষণে একটা চাদরে আপাদমস্তক আবৃত করিয়া শুইয়া বলিল, "সারা রাত্তির ঘুমুই নি, এখন আমায় বকিয়ো না।" মাতা তখন হাসিয়া ঘরের দ্বার-জানালা বন্ধ করিতে করিতে বলিলেন, "কি কর্‌ব বাবা, ওঁর আদরেই ও ক্রমশ এমন দুষ্টু হয়ে উঠ্‌ছে। যাক্‌, উনি আসুন, এলে ওর যা-হয় একটা বিশেষ শাস্তি কর্‌ব। এখন একটু ঘুমুক।"

তারপর কিছুদিন পরে সশরীরে সর্ব্বানন্দ ও শিবচন্দ্র গ্রামে ফিরিয়া আসিলেন, আসিয়া কার্ত্তিকচন্দ্রের বিরুদ্ধে নালিশও শুনিলেন; কিন্তু ইহাতে মৃদু হাস্য ব্যতীত কোনরূপ শাস্তির ব্যবস্থা হইল না দেখিয়া ব্রহ্মপদ হাড়ে হাড়ে জ্বলিয়া গেল।

৪

সর্ব্বানন্দ এখন সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়াছে, তথাপি এখনও পুস্তকে মনোনিবেশ করিবার অনুমতি পায় নাই। প্রত্যহ সকালে বৈকালে তাহাকে বেড়াইয়া আসিতে এবং যথাসময়ে আহারাদি করিয়া শয্যা গ্রহণ করিতে

হয়। এই ভ্রমণের সময় কার্ত্তিকচন্দ্রও কোন কোন দিন তাহার সঙ্গে থাকে।

আজ সে তাহার চাদরখানি কাঁধে ফেলিয়া বাহির হইবামাত্র কার্ত্তিক-চন্দ্র একখানা পিচের ডাল চাঁচিতে চাঁচিতে তাহার অনুসরণ করিল। সর্ব্বানন্দ হাসিয়া বলিল, "কার্ত্তিক, তুমি আজ দুপুরে বেড়াতে যাও নি কেন?"

"তুমি ত' আজ-কাল পড়্‌তে পাও না—তাই তোমার পড়া, আমার পড়া, দু'জনের কাজই আমি সেরে রাখ্‌ছিলাম।"

সর্ব্বানন্দ হাসিয়া বলিল, "ঐ রে, তাহলে আমার মাথাটি খেয়েছ, বোধ হয়,—সমস্ত বই, পুঁথিপত্র ঘেঁটে ঘুঁটে—"

"বেশ খিচুড়ি তৈরি করে রেখেছি, চমৎকার হজম হবে 'খন। এখন যে কাজে যাচ্ছ, চল। সব সময় বই, বই। কি যে হয় তার ঠিক নেই।"

উভয়ে কিছুদূর অগ্রসর হইয়াছে, এমন সময় দূরে একটা পরিচিত টমটমের ঘোড়ার গলার ঘুঙুরের ঝুন্‌ঝুন্ শব্দ শুনা গেল। জমিদার কালিকাবাবুর কন্যা শ্রীমতী শৈলজাসুন্দরী তাঁহার খাস দাসী ও দরোয়ানের সহিত সান্ধ্য-ভ্রমণে বাহির হইয়াছেন। ইহা তাহাদের প্রতিদিনের অভ্যাস, তাই কার্ত্তিক বা সর্ব্বানন্দ কাহারও তেমন লক্ষ্য করিবার বিষয় ছিল না। তাহারা পথের এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া গাড়ীটাকে পথ ছাড়িয়া দিল। কিন্তু গাড়ীটা সবেগে অগ্রসর হইতে না হইতে একটা দুর্ঘটনা ঘটিয়া গেল।

অপর দিক হইতে একখানা গরুর গাড়ী কার্ত্তিকদের দিকে অগ্রসর হইতেছিল। পল্লীগ্রামের গোজাতীয় জীবগণ যে কখন কি কারণে ভয় পায় তাহা বলা যায় না। সেই গাড়ীর বলদদ্বয় সহসা সেই গাড়ীসমেত সশব্দে পার্শ্বস্থ নালার মধ্যে নামিয়া পড়িল। গাড়ীতে দুই একজন

স্ত্রীলোক আরোহী থাকায় একটা ভয়ানক হৈ-চৈ ও আর্ত্ত শব্দ উত্থিত হইল। শুনিয়া সর্ব্বানন্দ ও কার্ত্তিকচন্দ্র ছুটিয়া ঘটনাস্থলে গেল।

দুর্ঘটনায় কাহারও তেমন আঘাত লাগে নাই বটে কিন্তু স্ত্রীলোকদের বাহিরে আনিতে ও গাড়োয়ানকে শকটের তলদেশ হইতে বাহির করিতে অনেকটা বেগ পাইতে হইল। ইতিমধ্যে মহামহিমান্বিতা শৈলজাসুন্দরী তাঁহার টমটম থামাইয়া গাড়ীর উপর দাঁড়াইয়া মজা দেখিতেছিলেন। গো-শকটের তলদেশ হইতে গাড়োয়ানকে যখন অদ্ভুতভাবে টানিয়া বাহিরে আনা হইল, তখন তিনি হাসিয়া তাঁহার টমটম হইতে প্রায় পড়িয়া যাইবার মত হইলেন। কার্ত্তিকচন্দ্র ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে গাড়ীটাকে টানিয়া তুলিতে সাহায্য করিয়া উঠিয়া যখন দেখিল, টমটমের উপর উন্নত পাগড়ি দরোয়ান ও কোচম্যান চুপ করিয়া বসিয়া আছে, তখন ক্রোধে তাহার সর্ব্বশরীর জ্বলিয়া গেল; তদুপরি ঐ হাস্যোচ্ছ্বসিতা বালিকার সহানুভূতিহীন হাস্যের শব্দে সে আর স্থির থাকিতে পারিল না। এক লম্ফে টমটমের উপর উঠিয়া বিরাশী শিক্কা ওজনের এক চড় উঁচাইয়া সে বলিল, "ফের যদি তুমি হাস্‌বে, তাহলে বুঝ্‌তে পার্‌বে। ওদের নালায় ফেলে দিয়ে বসে বসে হাসি! চড় খেয়ে হাস্‌তে পার ত' বুঝি।" দাসী দরোয়ান ও কোচম্যান তিনজনেই অবাক এবং ত্রিংশ সহস্র মুদ্রা আয়ের সম্পত্তিশালিনী শ্রীমতী শৈলজাসুন্দরী ভীত ত্রস্তভাবে বসিয়া পড়িয়া তাহার দাসীকে চাপিয়া ধরিলেন। অপূর্ব্বদৃশ্য!

সর্ব্বানন্দ তাড়াতাড়ি টমটমের নিকটে আসিয়া কার্ত্তিককে নামাইয়া আনিল। কার্ত্তিক গাড়ী হইতে নামিয়া কোচম্যানকে বলিল, "হারাম-জাদা, ফের যদি বসে বসে এই রকম করে মজা দেখিস্, তাহলে তোদের ছড়ি পেটা করব।" কোচম্যান আর দ্বিরুক্তি না করিয়া গাড়ী হাঁকাইয়া

দিল। কিন্তু শ্রীমতী শৈলজাসুন্দরীর সে দিন আর সান্ধ্য ভ্রমণ হইল না ; কাঁদিতে কাঁদিতে গাড়ীকে বাড়ী ফিরিতে আদেশ দিলেন।

এদিকে সর্ব্বানন্দ মহাভীতভাবে কার্ত্তিককে বলিল, "এ তুমি কি করে বস্‌লে! ছেলেমানুষের ওপর রাগ দেখিয়েই বা তোমার কি লাভ হ'ল? তা ছাড়া এই রকম করে একটা বিপদকে ডেকে এনেই বা কি লাভ হ'ল? ওরা ত এখনি গিয়ে বাবুকে বলে দেবে, তারপর কি হবে, কে বল্‌তে পারে?"

কার্ত্তিকচন্দ্রের রাগ পড়িয়া আসিয়াছিল, তাই সে উচ্চহাস্য করিয়া বলিল, "আমার ওপর কেউ রাগ করে না, তোমার ভয় নেই।"

সর্ব্বানন্দর ভয় কমিল না ; তাই সে বাড়ী ফিরিয়া যাইতে চাহিল। কিন্তু কার্ত্তিক সে প্রস্তাবে কিছুতেই রাজী নয়। সে বলিল, "না, এখনও বেড়ানো হয় নি। আমি কিছুতেই তোমায় ফির্‌তে দেব না।" সর্ব্বানন্দ অগত্যা আরও খানিক বেড়াইতে বাধ্য হইল। কিন্তু বিপদ সেই খানেই শেষ হইল না। কিছুদূর যাইতে না যাইতে জমিদার মহাশয়ের সহিত তাহাদের সাক্ষাৎ ঘটিয়া গেল। কালিকাবাবু নিকটে আসিয়া বলিলেন, "কিরে কার্ত্তিক, তুই শৈলকে মেরেছিস্‌ কেন ?"

কার্ত্তিক গম্ভীরভাবে বলিল, "ও তাহলে মিছে কথা বলেছে। আমি কেবল চড় উঁচিয়েছিলাম, কিন্তু এখন দেখ্‌ছি, মারাই উচিত ছিল।"

"কেন? মারা উচিত ছিল, কেন?"

কার্ত্তিক কহিল, "মানুষের এ রকম বিপদ ঘট্‌লে দাঁড়িয়ে যে হাস্‌তে পারে, তার উপযুক্ত ব্যবস্থা, আর কি আছে! তার ওপর আপনার কাছে মিথ্যে কথা বলেছে। আপনারই ওকে বিশেষ শাস্তি দেওয়া উচিত।"

কালিকাবাবু সমস্তই শুনিয়াছিলেন এবং কি কারণে যে তিনি কার্ত্তিকচন্দ্রের উপর কোনরূপ ক্রোধ প্রকাশ না করিয়া হাসিতে হাসিতে কথা

বলিতেছিলেন, তাঁহার অনুসরণকারী দরোয়ান ঘনবরণ সিং কিছুতেই তাহা বুঝিতে পারিতেছিল না। কিছুদিন পূর্ব্বে এই ধৃষ্ট বালকের নিকট যে চপেটাঘাত-লাভ তাহারও ভাগ্যে ঘটিয়াছিল, তাহার অনুভূতি এখনও তাহাকে পরিত্যাগ করে নাই। তাই অদ্যকার অপরাধের সংবাদ শুনিয়া প্রতিশোধের আশায় তাহার হস্তদ্বয় নিস্‌পিস্‌ করিতেছিল। কিন্তু ফলে যখন কিছুই হইল না, উপরন্তু বাবু মহারাজ যখন কার্ত্তিককে আদর করিয়া বলিলেন, "ছি বাবা, ছোট মেয়ের ওপর অত রাগ কর্‌তে নেই। ওর কতটুকু বুদ্ধি!" তখন সে তাহার গালপাট্টা চুমরাইতে চুমরাইতে ভাবিল, "মহারাজ বাওরা হো গয়ে হেঁ।"

কালিকাবাবু যখন চলিয়া গেলেন, তখন বিস্মিত সর্ব্বানন্দের দিকে চাহিয়া কার্ত্তিক বলিল, "দেখ্‌লে সর্ব্বদাদা, আমায় কেউ বক্‌তেই পারে না।"

কার্ত্তিকচন্দ্রের মাতা এই সংবাদ শুনিয়া বলিলেন, "ওর মামাও এক-দিন এক সাহেব মেরেছিল। কেমন লোকের ভাগ্নে!" কিন্তু তাহার পিতা গম্ভীরভাবে বলিলেন, "এ সব তোমার কি হচ্চে, কার্ত্তিক? পড়া শোনা করে কোথায় শান্ত প্রকৃতি হবে, তা না এ সব কি আবার? সেদিন ঘনবরণ সিংকে মেরেছ, আজ আবার একটি ছোট মেয়ের ওপর বীরত্ব ফলিয়েছ। এ সব ত ভাল নয়। এমন কর্‌লে আমায় এখানকার বাস উঠোতে হবে, দেখ্‌ছি।"

পরদিন হঠাৎ একজন পাইক আসিয়া যখন ন্যায়রত্ন মহাশয়কে সন্ধ্যার পর জমিদার মহাশয়ের নিকট যাইবার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়া গেল, তখন সকলেই বুঝিল, আজ একটা কিছু হইবে। কিন্তু বস্তুতঃ কিছুই ঘটিল না। কালিকাবাবু ন্যায়রত্ন মহাশয়কে পরম সমাদরে বসাইয়া নানাবিধ সদালাপ করিয়া সহসা একটা অদ্ভুত অনুরোধ করিলেন। বাবু

বলিলেন, "আপনার ছেলেটীর বিষয় যা দেখ্‌ছি শুন্‌ছি, তাতে সংস্কৃতর সঙ্গে সঙ্গে ওকে ইংরিজি শিখুলে ও পরে একজন মহাপণ্ডিত লোক হতে পারে। সে জন্য আমার অনুরোধ, আপনি ওকে আমাদের এণ্ট্রেন্‌স্ ইস্কুলে ভর্ত্তি করে দিন। আমি হেডমাষ্টার মশায়কে বিশেষ করে বলে দেব, যাতে ওর ওপর সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখা হয়।"

ন্যায়রত্ন মহাশয় আপ্যায়িত হইয়া বলিলেন, "কার্ত্তিকের গর্ভধারিণীরও অনেক দিন থেকে তাই ইচ্ছে, কিন্তু ইংরিজি শিখলে ছেলে ম্লেচ্ছ-ভাবাপন্ন হয়ে যাবে, হয়ত পিতৃপিতামহের সুনাম নষ্ট করে ফেল্‌বে! তা ছাড়া ভবিষ্যতে এই টোলের ভার ত ওকেই নিতে হবে, তা হলে আর ইংরিজি পড়ে ফল কি ?"

কিন্তু কালিকাবাবু ছাড়িলেন না। তিনি নানাপ্রকারে বুঝাইলেন যে ইংরাজী পড়িলেই কেহ ম্লেচ্ছভাবাপন্ন হয় না ; এবং বিদ্যা বা জ্ঞান জিনিষটার কোনরূপ জাতি-গোত্র নাই। যে কোন স্থান হইতেই বিদ্যা-লাভ করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

একে গ্রামের একচ্ছত্র সম্রাট, তাহাতে তাঁহার পুত্রের ভালর জন্যই যখন কালিকাবাবু এতখানি চেষ্টিত, তখন ন্যায়রত্ন মহাশয় আর বেশী আপত্তি করিতে পারিলেন না। কেবল এইটুকু বলিলেন, যে ছেলেটী তাঁহার কিঞ্চিৎ একগুঁয়ে ধরণের, উহাকে এ বিষয়ে মত করাইতে কিঞ্চিৎ সময় লাগিতে পারে। এ কথার উত্তরে কালিকাবাবু বলিলেন যে সে বিষয়ে তিনি স্বয়ংই ভার লইতে প্রস্তুত ; তিনি স্বয়ং কার্ত্তিকচন্দ্রকে বুঝাইয়া সম্মত করিবেন।

কার্ত্তিকচন্দ্র কিন্তু এই সংবাদ শুনিয়া মাথা নাড়িয়া বলিল, সে ইংরাজী শিখিতে ইচ্ছুক নয়। তাহার মাতা মনোরমা ঠাকুরাণী সগর্ব্বে বলিলেন, "তোকে সবাই এত ভালবাসে, আর তুই সে ভালবাসার এই রকম প্রতি-

দান দিবি ? আমি ওঁকে যে কাজে এতদিন ধরে রাজী করাতে পারি নি, আজ সেই তিনিও রাজী হয়েছেন, তবু তুই আমার কথা শুন্‌বি নে ?”

কার্ত্তিক কহিল, “বাবা রাজী হয়েছেন, তুমি কেমন করে জান্‌লে ? তুমি ছিনে জোঁকের মত লেগে তাঁর মত করিয়েছ, তার ওপর তিনি জমিদার মহাশয়ের ভয়ে রাজী হয়েছেন। আমি যে কারও ভয়ে কোন কাজ কর্‌ব, এ হতেই পারে না। বাবু যে ভয় দেখিয়ে, আমার বাবার অপমান করে আমাকে দিয়ে এই কাজ করিয়ে নেবেন, তা আমি কিছুতেই সইব না। তুমি বাবাকে এ কথা সাফ বলে দাও।”

মনোরমা দেবী চোখ কপালে তুলিয়া চীৎকার করিয়া বলিলেন, “তুই ওঁর মান অপমান দেখ্‌ছিস্, আর আমি যে তাদের বলে পাঠিয়েছি, তুই নিশ্চয়ই পড়্‌বি,—তার কি হবে ? এখন আমার কথাটা কোথায় দাঁড়াবে ? আমার মান-অপমান কি কিছুই নয় ?”

কার্ত্তিক কহিল, “তুমি নিজে বড় লোকের মেয়ে, টাকাকড়ি ধন-দৌলতের ওপর চিরদিনই তোমার লোভ। তোমার এ সব বিকারের রুগীর মত কাজ ; তাই এ বিষয়ে তোমার কথা না রাখ্‌লেই তোমার মান বাড়ানো হবে।”

মনোরমা দেবী কাঁপিতে কাঁপিতে তাঁহার ক্রোধের সমস্ত তেজটুকু নিরীহ শিবচন্দ্রের উপর ব্যয়িত করিয়া বলিলেন, “এমন ছেলেতে আমার কাজ নেই, তোমার ছেলের যা হয় কর, আমি ওর হাতের জলগণ্ডুষ যদি নি—”

শিবচন্দ্র ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, “থাম, থাম, মিছি মিছি একমাত্র বংশ-ধরের ওপর এত বড় অভিশাপ দিও না। আমিই ওকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ঠিক করে নিচ্ছি !”

কার্ত্তিকচন্দ্রকে অবশেষে বুঝিতে হইল বটে, কিন্তু সেও একটা সর্ত্তে।

সর্ত্ত এই যে সর্ব্বানন্দকেও ইংরাজী পড়াইতে হইবে। কিন্তু সর্ব্বানন্দ অতি দরিদ্র ব্রাহ্মণ-সন্তান। তাহার পড়াশুনার খরচের ভার কে লইবে? কার্ত্তিকচন্দ্র গম্ভীরভাবে বলিল, "জমিদার মহাশয় কি আর ইচ্ছা করিলে একজন দরিদ্র ব্রাহ্মণের ছেলের এইটুকু উপকার করিতে পারেন না?" শিবচন্দ্র বলিলেন, "এ বিষয়ে কে তাঁহাকে অনুরোধ করিবে?" তখন কার্ত্তিকচন্দ্র নিজেই সে ভার গ্রহণ করিয়া বলিল, "আমার বদলে না হয় সর্ব্বদাদা পড়্‌বে, তা হলেই হবে।"

শিবচন্দ্র ক্ষুণ্ণ হইয়া বলিলেন, "তোমার পড়াশুনার খরচ ত আর তিনি দিচ্ছেন না। তিনি কেবল ব্যবস্থা করে দেবেন মাত্র। খরচ-পত্র সবই আমার। সর্ব্বানন্দকে যদি পড়াতেই হয়, তাহলে সে খরচ আমাকেই বহন কর্‌তে হবে। তুমি সব বুঝ্‌ছ, আর এটুকু বুঝ্‌ছ না কেন? আর সর্ব্বানন্দই বা ইংরিজি পড়্‌তে স্বীকার কর্‌বে কেন? তুমি ছেলেমানুষী করো না, আমি যা বল্‌ছি, তাই কর।"

কার্ত্তিকচন্দ্র পিতার কথায় সম্মতি জ্ঞাপন করিল বটে কিন্তু মনে মনে একটা ফন্দি আঁটিয়া সে বাহির হইয়া গেল। ইহার দুই-একদিন পরে সকলেই সবিস্ময়ে শুনিল, বাবু সর্ব্বানন্দর পড়ার সমস্ত ব্যয়-ভার গ্রহণ করিয়াছেন।

৫

শিবরামপুরের দুর্দ্ধর্ষ দেওয়ান দুর্গাশঙ্কর চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বয়স যদিও পঞ্চাশের ঊর্দ্ধে উঠিয়াছে, তথাপি তাঁহার মতি-গতি এ পর্য্যন্ত বন-গমনের দিকে ঢলিয়া পড়িবার কোন লক্ষণ প্রকাশ করে নাই। ইহার মুখ্য গৌণ সমবায় প্রভৃতি নানাবিধ কারণের মধ্যে একটি বিশেষ কারণ এই ছিল যে তাঁহার পুত্র মণিশঙ্কর এখনও অবধি প্রবেশিকা পরীক্ষার দ্বার

উত্তীর্ণ হইয়া কলেজ নামক বৃহৎ বিচরণ-স্থানে কিছুতেই প্রবেশাধিকার পাইল না। জমিদার মহাশয়ের দেওয়ানের পুত্র বলিয়া অবশ্য কোনবারই সে নির্ব্বাচনপরীক্ষায় "বারিত" হয় নাই, কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের মূর্খ পরীক্ষকগণ কেহই তাহার জ্ঞানের গভীরতা ও বিদ্যার বিস্তৃতি বা অভি-ব্যাপ্তি উপলব্ধি করিতে পারিল না। এই সমস্ত সমবায় কারণে মণিশঙ্কর এক বার সংস্কৃত বিদ্যার গহন বনে প্রবেশের কল্পনাও করিয়াছিল। কিন্তু "সহর্দ্দ্বৈর্ঘঃ" প্রভৃতির রেফাদি-কণ্টকে প্রথমেই তাহার মনের রেশমী চাদর-খানি আটকাইয়া যাওয়ায় বিরক্ত হইয়া সে-কল্পনা সে ত্যাগ করিয়াছে। তাহার পিতার দুর্দ্ধর্ষ পাইকগণের অতন্দ্রিত চেষ্টাতেও যখন বিদ্যা-পথের কণ্টক দূর হইল না, তখন সে অগত্যা একটা কন্‌সার্ট ও থিয়েটার পার্টী খুলিবার সঙ্কল্প করিল।

দেওয়ান মহাশয়ের ইচ্ছা ছিল, তাঁহার পুত্র বিদ্যালয়ের সব-কয়টা ডিগ্রি আদায় করিয়া শেষে আইনের মুকুট মাথায় চড়াইয়া কালিকাবাবুর বিস্তীর্ণ এষ্টেটের পরামর্শ-দাতা বা অন্য কোন প্রকার দণ্ড-মুণ্ডের কর্ত্তা হইয়া তাঁহার সমস্ত শক্তি উত্তরাধিকার-সূত্রে লাভ করে। কিন্তু মণিশঙ্কর কোন প্রকারেই প্রবেশিকার সিংহ-দ্বার পার হইতে পারিল না; উপরন্তু দেওয়ানজী দেখিলেন, দুইটী অখ্যাত অজ্ঞাতনামা মনুষ্য-শিশু তাঁহার পুত্রের ভবিষ্যৎ উন্নতির পথে দিব্য অন্তরায় হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহার পুত্রের ভবিষ্যৎ ভাগ্যাকাশে যুগপৎ এই যুগল ধূমকেতুর উদয় দেখিয়া দুর্গা-শঙ্কর পূর্ব্বাহ্নেই সতর্ক হইতে আরম্ভ করিয়াছেন।

পরগণে কমবখ্‌ৎপুর ও তরফ পয়জারডেঙ্গার নিকাশ সারিয়া হিসা-বানা ও নজরানার কয়েক শত টাকা সঙ্গে করিয়া দুর্গাশঙ্কর রাত্রি আটটার সময় গৃহে ফিরিলেন। তাঁহার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী নিস্তারিণী দেবী ইতিমধ্যে মহা উৎকণ্ঠায় কাল-যাপন করিতেছিলেন; কারণ, পুত্র

মণিশঙ্কর বৈকালে মাতার নিকট তাহার কনসার্ট-পার্টির জন্ত দুইটা বাঁশীর আব্দার লইয়া বিস্তর কান্নাকাটি করিয়া গিয়াছে। এমন কি, দুই এক-বার তাহার মূর্চ্ছার উপক্রমও দেখা গিয়াছিল। মণিশঙ্কর না কি বাল্য-কাল হইতে বুদ্ধিশক্তির প্রাচুর্য্যের জন্য ঐ রোগে ভুগিতেছিল; তাই তাহার মাতা যখন-তখন দেওয়ান মহাশয়কে উক্ত বিষয়ে সতর্ক করিয়া মণিশঙ্কর যাহাতে সর্ব্বদা প্রফুল্ল থাকে, তাহাই করিতে উপদেশ দিতেন; — অবশ্য উপদেশের সঙ্গে তাঁহার অন্যান্য শক্তি প্রয়োগ করিতেন কি না, সে বিষয়ে সঠিক সংবাদ কেহ বলিতে পারে না। তবে দুর্দ্ধর্ষ দেওয়ান দুর্গাশঙ্করকে কেহ সেই উপদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন না করিয়া চুপ করিয়া থাকিতে দেখে নাই। এমন কি, দুষ্ট লোকে এ কথাও বলে যে দেওয়ানজীর "স্বকৃত" তালুকগুলির মুনাফার টাকাও কিস্তি কিস্তি ইঁহারই সিন্দুকজাত হইয়া থাকে। নিস্তারিণী দেবী অনেক সময়েই স্বামী মহাশয়কে কৃপা করিয়া "স্বকৃত" বিষয়চিন্তার ভার হইতে নিস্তার দিয়া থাকেন,—অন্ততঃ ইহাই বাজার-গুজব। কিন্তু বাজারে যাহা রটে, তাহাতে বিশ্বাস স্থাপন করা ঠিক নয়।

দুর্গাশঙ্কর অন্দরে প্রবেশ করিয়া বলিলেন, "ওগো, কোথায় আছ?" নিস্তারিণী দেবী অবশ্য অতি নিকটেই ছিলেন, কিন্তু অন্তরের উৎকণ্ঠা পাছে মুখে প্রকাশ হইয়া পড়ে, তাই কক্ষ হইতেই একজন দাসীর উপর হুকুম-জারী হইল, "ওরে রাজু, জলচৌকি আর গাড়ুটা এগিয়ে দে—বাবু এসেছেন।"

দুর্গাশঙ্কর সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া টাকার তোড়াটা ধপাস্ করিয়া ফেলিয়া দিয়া বলিলেন, "উঃ বেটারা কম হায়রাণ করেছে। কোন বেটার যদি বুদ্ধি শুদ্ধি থাকে। শোন, ওগুলো লোহার সিন্দুকে তুলো না, আলমারিতেই রেখে দাও। কাল আমার টাকার বিশেষ দরকার।"

নিস্তারিণী দেবী আলমারি খুলিতে খুলিতে বলিলেন, "আমারও একশ' টাকার বিশেষ দরকার। কত টাকা আছে এ তোড়ায় ?"

"সাত শ' বাইশ।"

"তুমি কাল কত নেবে ?"

"দরকার ত প্রায় এগার শ' টাকা। ঐ সাত শ' আর চার শ' কাল জোগাড় করে আমায় সলিমপুরের খাজনা শোধ করে দিতে হবে, তারা তাগাদা লাগিয়েছে।"

"এক শ' টাকা আমায় কাল দিতেই হবে। বাদ-বাকি তুমি নিও।"

"হঠাৎ এত টাকা কি হবে ?"

"মণির জন্যে দুটো বাঁশি কিনে দিতে হবে।"

"বাঁশি ! বাঁশি কি হবে ?"

"কি হবে, তা জানি নে। না পেলে আবার হয় ত সে মূর্চ্ছো যাবে। আজ অনেক কষ্টে তাকে সাম্‌লেছি।"

পুত্রের বিষয় কোন কথা বলিতে গেলে এখনই একটা বিপদ ঘটিতে পারে, সেই ভয়ে দুর্গাশঙ্কর তাড়াতাড়ি মুখাদি প্রক্ষালন করিতে বাহিরে গেলেন। এবং পরে জলযোগ সারিয়া গড়গড়ার নল মুখে দিয়া বাহিরে বৈঠকখানায় গিয়া বসিলেন। বাহিরে গ্রামস্থ দুই একজন উমেদার তলপিদার মোসাহেব তাঁহারই অপেক্ষায় বসিয়াছিল।

দেওয়ানজী আসন গ্রহণ করিতেই বৃদ্ধ পার্ব্বতীনাথ সরকার বলিলেন, "দেওয়ানজী, আপনি মণিশঙ্করের হারমোনিয়া বাজানো শুনেছেন ? কি সুন্দরই সে বাজাচ্ছে ! আমি আসতে আসতে পথে পোড়া বাঙ্‌লায় ওর বাজনা শুনে এলাম।"

রাজীব জোয়াদ্দার বাঁধানো হুঁকাটা আর একজনের হাতে চালান করিয়া ধোঁয়া ছাড়িতে ছাড়িতে বলিলেন, "এই ত' মোটে

মাসখানেক হ'ল হারমোনিয়াটা ও কিনেছে, এরই মধ্যে এত শিখ্‌লে কবে ?"

পার্ব্বতীনাথ কহিলেন, "পূর্ব্বজন্মের সংস্কার, ভায়া ! পূর্ব্বজন্মের সাধনা !"

পার্ব্বতীনাথের উপর সরকারি দুইটা ডিক্রি এখনও ঝুলিতেছিল। এবারে সেটার পরিশোধের কোন আশা ছিল না, তাই তিনি স্বীয় নাতিটীকে মণিশঙ্করের থিয়েটারে জুটাইয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু স্কুলের থার্ড মাষ্টারটী এ বিষয়ে তাহাকে নিবৃত্ত করিবার জন্য অনেক অনুরোধ করিয়া বিফল-মনোরথ হইয়া দেওয়ানজীকে ঐ বিষয়ে অনুরোধ করিতে বলিয়াছিলেন। দেওয়ানজী তাই গম্ভীর মুখে বলিলেন, "সরকার মশায়, আপনার নাতিটীকে এরই মধ্যে পড়াশুনা ছাড়িয়ে দিলেন ? থার্ড মাষ্টার ত খুব দুঃখ কর্‌ছিল। সে বল্‌ছিল, আপনার গিরিজানাথের বেশ ধার আছে, সে এন্‌ট্রন্‌শ্‌ পাশ কর্‌বেই। এরই মধ্যে ওকে পড়াশুনা ছাড়ানো ভাল হ'ল না।"

পার্ব্বতীনাথ মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বলিলেন, "আজ্ঞে দেওয়ানজী, মণিই যখন পাশ কর্‌তে পার্‌লে না, তখন গিরিজার আর কতটুকু ধার ! তাই মনে কর্‌ছি, আমার যা কিছু আছে, তাই দেখ্‌বে-শুন্‌বে আর মণির সঙ্গে থেকে যদি—"

রাজীব জোয়াদ্দারের উচ্চ হাস্যে সরকার মহাশয়ের বাকি কথাটুকু শুনিতে পাওয়া গেল না। দেওয়ান মহাশয়ও সেই হাস্যে যোগ দিয়া বলিলেন, "না, না, সরকার মশায়, এরই মধ্যে তা কর্‌বেন না। মণির সঙ্গে জুট্‌লে ওর ইহকালও যাবে, পরকালও যাবে। মণিটাকে নিয়ে যে কি কর্‌ব, তা আমিই ঠিক কর্‌তে পার্‌ছি না। তার ওপর আপনারা পাঁচজনে লাগ্‌লে ওকে আর সামলানো যাবে না। দেখুন দেখি, ন্যায়রত্ন

মশায়ের ছেলেটীকে আর সর্ব্বানন্দকে! এরই মধ্যে ওরা কেমন এগিয়ে যাচ্ছে। আহা, ছেলে দুটীকে বুকে ধর্‌তে ইচ্ছা করে!"

উপস্থিত বন্ধুগণের মধ্যে, রাজীব জোয়াদ্দার ব্যতীত, সকলেই দেওয়ানজীর এই দেবোপম করুণায় গলিয়া গিয়া "আহা তা বটে!" "তাতে আর সন্দেহ কি?" ইত্যাদি বাক্যে তাঁহার কথার পোষকতা করিল। কিন্তু জোয়াদ্দার মহাশয়ের কোটরগত ভ্রূ-সমাচ্ছন্ন দুই চক্ষু হইতে একটা অদ্ভুত দৃষ্টি বাহির হইয়া দেওয়ানের অর্দ্ধ নিমীলিত চক্ষুর সহিত সঙ্গত হইল। এবং মুহূর্ত্তেই এই দুই বন্ধুর চোখে-চোখে একটা নীরব কথাবার্ত্তা হইয়া গেল। তাহার পর, দুই এক 'দান' দাবা খেলা ও তাম্রকূট ধ্বংসের পর সকলেই যখন উঠিয়া বাড়ী গেল, তখন জোয়াদ্দার মহাশয়কে একা পাইয়া দেওয়ানজী বলিলেন, "কি করি বল ত, রাজীব? মণির যে কি কর্‌ব, কিছু বুঝ্‌তে পার্‌ছি না।"

রাজীবলোচন তাঁহার শ্বেত-কৃষ্ণ মস্তকটী আন্দোলিত করিতে করিতে বলিলেন, "আমি তখনই বলেছিলাম তোমায় যে, এ ভাল হচ্ছে না, তুমি ন্যায়রত্নটাকে টোলশুদ্ধ গঙ্গাপার করে দিয়ে এস,—তুমি ত তা শুন্‌লে না। যেদিন কার্ত্তিক ছোঁড়াটা কাছারিতে বাবুর নাকের ওপর তোমায় অপমান কর্‌লে সেই দিনই বুঝেছিলাম, তোমার মণির ভাগ্যে কাঁচকলা!"

দেওয়ানজী কহিলেন, "এখন আর তা হয় না! বাবু ঐ দুটো চ্যাঙড়াকে কি নজরে যে দেখেছেন, তা বল্‌তে পারিনে। স্বয়ং হেডমাষ্টার ওদের মাষ্টার হয়ে শেখাচ্ছে। ন্যায়রত্ন এখন পরামর্শ-দাতা, হর্ত্তা-কর্ত্তা-বিধেতা। কি করি!"

দেওয়ানজী মুখের নলটা ছুড়িয়া ফেলিয়া বলিলেন, "হরে, তামাক দিয়ে যা না! বেটা এরই মধ্যে ঘুমুচ্ছে!"

ভৃত্য হরিদাস কলিকায় ফুঁ দিতে দিতে প্রবেশ করিয়া বলিল, "খাবার হয়েছে। মা ঠাকরুণ—"

"যা, যা, এখন গোল করিস্ নে।"

হরিদাস গড়গড়ায় কলিকা বসাইয়া দিল, বলিল, "ঠাকরুণ বল্লে খেতে এস।"

"যাচ্ছি, তুই যা না, কথাটা সেরে যাচ্ছি, বল্‌গে।"

হরিদাস নাছোড়বান্দা; আপন-মনে বকিতে লাগিল, "রামে মার্‌লেও মারে, রাবণে মার্‌লেও মারে! এখন যাই কোথা? রাজীব বাবু, বাড়ী যান না, রাত হয়েছে। মা রেগেছে,—বাবু ওঠো—আমার যেমন কপাল খাট্‌তে খাট্‌তে প্রাণটা গেল—ওঠো বাবু—"

দেওয়ানজী বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "রাজীব, কাল দুপুর বেলা এস।"

রাজীবলোচন অগ্রেই উঠিয়া পড়িয়াছিলেন! কারণ মা-ঠাকুরাণীর রাগের অর্থ তিনি ভাল রকমই বুঝিতেন। তাই পরদিন আসিতে স্বীকৃত হইয়া তিনি প্রস্থান করিলে দেওয়ানজীও হরিদাসকে বকিতে বকিতে অন্তঃপুরে চলিলেন।

৬

মণিশঙ্কর লোকটী চিরদিনই কবি। সতেরো বৎসর বয়সের মধ্যেই তিনি বন্ধু ও গ্রামস্থ বহু বৃদ্ধের মহলে তাঁহার অপূর্ব্ব কবিত্বশক্তির জন্য বিখ্যাত হইয়াছিলেন; এবং উনবিংশ বর্ষ গত হইতে না হইতেই তিনি "মকরাক্ষের মোক্ষ" নামক নাটক ও "গঙ্গার গোষ্পদ লাভ" নামক মহাকাব্যের তিন সর্গ লিখিয়া যশ-গৌরবে মণ্ডিত হইয়াছিলেন।

আজ কোন এক অপূর্ব্ব খণ্ড-কাব্যের 'উদ্দীপনা' তাঁহার মস্তিষ্কে জাগিয়া উঠায় তিনি দ্বিপ্রহরে তাঁহাদের বাগানের একটা আমগাছের তলায়

বসিয়া উন্মুক্ত প্রান্তরের দিকে চাহিয়াছিলেন। পার্শ্বে হেরল্ডের বাড়ীর ফ্লুটটি অনাদরে পড়িয়াছিল! কবিবর মণিশঙ্কর এক-মনে এক রাখালের গোচারণ-কালীন গীতি শুনিতেছিলেন এবং তাঁহার মস্তিষ্কে সেই সঙ্গে কাহার কমল চরণের রিণিকি ঝিনির মধুর রাগিণী ফিরিয়া ফিরিয়া বাজিয়া উঠিতেছিল, কে জানে!

রাখালের গানটিও অতি চমৎকার, অতি করুণ। বিশেষতঃ তাহার গলায় অশিক্ষিত পটুত্বের অপূর্ব্ব নিদর্শন দেখিয়া আমাদের কবিবর তাহাকে তাঁহার থিয়েটারে কোনও একটা পার্ট দিতে পারেন কি না, ঐ সঙ্গে তাহাও ভাবিতেছিলেন। রাখালের গানটিতে বেশ মধুর করুণ রসের সমাবেশ ছিল। রাখাল গাহিতেছিল,—

“ছোট মামু গো। ভেব্যা মনু গো!
তুনিয়া পোড়ালে আল্লা!
ম্যাঘ কইরে সদা পানী নাহি হয়,
মাটী ‘ফাইটা’ হল চ্যাল্লা চ্যাল্লা।
ঠাকুর বামুন যত হয়্যা হ্যাতজ্ঞ্যান
‘শিবির’ মাথায় তাঁরা পানি ঢেইল্যা ছান,
কাঁইদা ভ্যাকুল হইল য্যাত মোছলমান,
কোরাণ পইড়্যা মল চ্যারানে মোল্লা।”

কবি মণিশঙ্কর রাখাল-বালকটীকে নিকটে ডাকিয়া তাহার নিকট হইতে গানটী লিখিয়া লইলেন এবং তৎক্ষণাৎ একটী নবতর সুরের গুঞ্জন ধ্বনি তাঁহার মগজে জাগিয়া উঠায় তিনি রাখাল-বালকের সঙ্গে বাঁশীতে তান ধরিয়া দিলেন। সেই দিনই সন্ধ্যার সময় সুরটি তাঁহার বন্ধুর মহলে “শঙ্কর-সাহি” নাম ধারণপূর্ব্বক প্রচারিত হইয়া গেল।

কিন্তু এইরূপে আমাদের মণিশঙ্কর নব সুর, নবতর গান এবং নবতর

কাব্যের জন্ম দিয়াও মনে স্বস্তি পাইতেছিলেন না। কারণ তাঁহার মানস-প্রতিমার মূর্ত্তি তাঁহাকে শয়নে স্বপনে আকুল করিয়া তুলিয়াছিল। এই মানস-প্রতিমাটী হঠাৎ এক শীতের সন্ধ্যায় দশম বর্ষীয়া এক বালিকার রূপ ধরিয়া বহু জামা-জোড়া শ্রী-অঙ্গে ধারণ পূর্ব্বক সবুট পদক্ষেপে কবিবরের মানস-আম-দরবারে প্রবেশ করিয়া একেবারে রাণীর মহিমায় চিত্ত-সিংহাসনে উঠিয়া বসিয়াছিলেন। ইনি আর কেহই নন, আমাদের পরিচিতা শ্রীযুক্তা শৈলজাসুন্দরী। যদিও কবিবর ইঁহাকে বহুবার দেখিয়াছিলেন, তবুও কে জানে কেন, কোন্-এক অপূর্ব্ব সন্ধ্যালোকে অপরূপ লগ্নে টম্‌টমোপরি উপবিষ্টা ত্রিংশ সহস্র মুদ্রা আয়ের সম্পত্তি-শালিনী এই মহিমময়ী কুমারী এক-লম্ফে তাঁহার সান্ধ্য-ভ্রমণের টমটম হইতে একেবারে কবির চিত্ত-শতদলের উপর চড়িয়া বসিয়াছিলেন, তাই কবি মণিশঙ্কর উদ্‌ভ্রান্ত-চিত্ত, উৎক্ষিপ্তহস্ত হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে-ছিলেন। তাঁহার মাতা নিস্তারিণী দেবী বলেন যে তাহার পরিপাকের গোলমাল হইতেছে; বন্ধুরা বলেন, কবিতা দেবী ফুটিয়া বাহির হইবার চেষ্টা করিতেছেন এবং শক্ররা বলে—না, সে কথায় আর কাজ নাই! শক্রর কথায় কান দিতে গেলে জগতের কোন শক্তিমান্ পুরুষের সম্বন্ধেই কোন কথা বিশ্বাস করা অসম্ভব হইয়া পড়ে—গঞ্জিকা-সেবনে বা ধান্যেশ্বরীর সেবায় কবিতার উৎস খুলিয়াই যায়, হজমের গোল করে না, শক্ররা যাহাই বলুক, মণিশঙ্করের "শঙ্কর-সাহি" সঙ্গীত গঞ্জিকার ধূমে অথবা সময়ান্তরে ধান্যেশ্বরীর চক্রে অধিকতর জমিয়া উঠে। শক্রর কথায় কর্ণপাত নিষ্প্রয়োজন।

কিন্তু প্রকৃত কবির মনোভাব কখনই গোপন থাকিতে পারে না, তা সে কথা যত গোপনীয়ই হোক। যে কথা শুনিলে লোকে কর্ণে অঙ্গুলি দান করিবে, তাহাও যদি প্রকৃত কবির জীবনে ঘটিয়া থাকে, তবে

কবিতা দেবীর কৃপায় তাহাও জগৎ-সমক্ষে প্রচারিত হইবেই; এবং 'নিরঙ্কুশা হি কবয়ঃ' মন্ত্রানুসারে তাহা প্রকৃত কবিত্ব-শক্তির অভিব্যক্তি বলিয়া লোকে হজম করিবেই। চিরদিনের এই নিয়মানুসারে কবি মণি-শঙ্করের গোপন কথাটি স্থান-কাল-পাত্র-বিশেষে প্রচারিত হইয়া পড়িল; এবং ক্রমশঃ সেই কথা কবির "শঙ্কর-সাহি" যোগে কোন্ এক বিশেষ মুহূর্ত্তে মাতা নিস্তারিণী দেবীরও শ্রুতিগোচর হইল; পরে সে স্থান হইতে যথারীতি পিতা দুর্গাশঙ্করের কর্ণেও সে কথা উঠিতে বাকী রহিল না। দুর্গাশঙ্কর তখন চোখ কপালে তুলিয়া বলিলেন, "এঁ্যা! হারামজাদা কোন্ দিন আমারও সর্ব্বনাশ কর্‌বে, দেখ্‌ছি! আরে চুপ, চুপ, কি বল, তার ঠিক নেই! আমার ছেলে শৈলর জন্য পাগল! মা দুর্গে, এ আমায় কি বিপদে ফেল্লে! তোমাদের জ্বালায় কি দেশ ছেড়ে পালাব না কি!"

নিস্তারিণী কহিল, "তা তুমি রাগই কর, আর যাই কর, এর একটা বিহিত কর্‌তে হবে। মণি আমার খায় দায় না—শৈলর নামে কি একটা গান বেঁধেছে, তাই গেয়ে বেড়ায়।"

দুর্গাশঙ্কর কহিলেন, "আরে, থাম, থাম, চাকর-বাকরে শুন্‌তে পেলে সর্ব্বনাশ ঘট্‌বে। হতভাগাটার মাথা তুমি এমনি করে খাচ্চ? আপন ছেলের ইষ্ট বুঝ্‌ছ না? এ সব কি হচ্চে তোমার?"

নিস্তারিণী দেবী চটিয়া লাল হইয়া উঠিলেন, বলিলেন, "হবে আবার কি! তোমারই মাথা খারাপ হয়েছে, তাই নিজের ছেলের ভাল দেখ্‌তে পাচ্ছ না। বাবু ত ঘরজামাই নেবার চেষ্টায় আছেন। আমার মণি কি তাঁর ঐ রূপের ধোচন মেয়ের অযুগ্যি? কেন, তুমি চেষ্টা কর না! চেষ্টা করে দেখ্‌লে এত দিন কোন্ কালে দেখ্‌তে, আমার মণি তোমার মনিব হয়ে তোমার ওপর হুকুম চালাচ্ছে।"

পত্নীর পতিভক্তির এই সুমধুর পরিচয় পাইয়াও দুর্গাশঙ্করের ক্রোধ কমিল না। তিনি ক্রুদ্ধ স্বরে বলিলেন, "বাবু ঘরজামাই নেবেন বলে কি হাত-পা বেঁধে মেয়েটাকে জলে ফেলে দেবেন! কে তোমার ঐ মাতাল গেঁজেল ছেলেকে মেয়ে দেবে?"

নিস্তারিণী দেবীর আর সহ্য হইল না, তিনি মাটীতে পড়িয়া "ওগো, এমন স্বামীর হাতেও পড়েছিলুম গো, ওগো—" ইত্যাদি নানাবিধ সকরুণ উক্তির সহিত বহুবিধ রাগ-রাগিণী-সংযোগে আপনার মর্ম্মবেদনা জগৎ-সমক্ষে প্রচারিত করিতে লাগিলেন। দুর্গাশঙ্কর তখন বে-গতিক দেখিয়া বহু অনুনয়-বিনয়ে এবং নিস্তারিণী দেবীর কথামত কার্য্য করিতে প্রতিশ্রুত হইয়া সে যাত্রা নিস্তার লাভ করিলেন।

৭

দুই-তিন বৎসর ধরিয়া হেডমাষ্টার মহাশয়ের গৃহে যাতায়াত করিয়া সর্ব্বানন্দ ও কার্ত্তিকচন্দ্র যখন এন্‌ট্রান্‌স্ স্কুলের তৃতীয় শ্রেণীতে প্রবেশের অনুমতি পাইল, তখন শিক্ষক পূর্ণচন্দ্র দাস একেবারে অপমানে প্রজ্বলিত হুতাশনবৎ প্রধান শিক্ষকের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "দুই এক বৎসরের মধ্যে কেহই তৃতীয় শ্রেণীর যোগ্য ইংরাজী ও অঙ্কে ব্যুৎপত্তি লাভ করিতে পারে না; ছাত্র দুইটীকে আরও নিম্ন শ্রেণীতে ভর্ত্তি করা হউক।" প্রধান শিক্ষক রামরতন হাজরা হাসিয়া বলিলেন, "আপনি পরীক্ষা করে দেখুন, যদি অনুপযুক্ত বোধ করেন, নামিয়ে দেবেন।"

তৃতীয় শিক্ষক মহাশয়ের স্পষ্ট-বক্তৃত্ব নামক একটী সর্ব্বজন-বিদিত গুণ ছিল। তিনি যখন তখন সেই গুণানুযায়ী কার্য্য করিয়া যশ অর্জ্জন করিতে ছাড়িতেন না। সেই কারণেই এমন উপযুক্ত অবসরকে তিনি ছাড়িয়া দিলেন না,—তাঁহার টেরা চক্ষুর একটী অন্য একজন শিক্ষকের

উপর এবং অপরটী গবাক্ষের গরাদের উপর ন্যস্ত করিয়া তিনি বলিলেন, "আপনি নিজে পড়িয়েছেন বলেই যে ওরা উপযুক্ত হবে, তার কোন অর্থ নেই। আমি নিজে পরীক্ষা করে নেব, আর অখিলবাবুও (অঙ্ক-শিক্ষক) পরীক্ষা কর্‌বেন।" অখিলবাবু সেই স্থানেই উপস্থিত ছিলেন। তিনি তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলেন, "আজ্ঞে, আমার পরীক্ষার প্রয়োজন নেই। আপনিই পরীক্ষা করুন।"

তৃতীয় শিক্ষক মহাশয় তাহার দিকে তাঁহার টেরা চক্ষুর এমন একটা দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন, যাহার অর্থ বিচক্ষণ চক্ষুতত্ত্ববিদ্ ডাক্তার সাহেব তিন হাজার বৎসরের সুগভীর আণুবীক্ষণিক পরীক্ষা দ্বারাও উদ্ধার করিতে পারিতেন না। তবে উক্ত শিক্ষক মহাশয় সেই দৃষ্টি যে অতি ঘৃণার দৃষ্টি অর্থেই গ্রহণ করিয়াছিলেন, ইহা সুনিশ্চিত; কারণ তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁর হ্রস্ব ও ঋজু পদের উপর ভর দিয়া স্বাভাবিক পদটা কিঞ্চিৎ দূরে ফেলিয়া ঘুরিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

উক্ত মহানুভব শিক্ষক তাঁহার রাজাসনে আসীন হইয়া যখন সর্ব্বানন্দকে বলিলেন, "ওহে ছোকরা, কি নাম তোমার? এ দিকে এস" তখন ঐ শ্রেণীর সমস্ত তরুণ হৃদয়গুলি আতঙ্কে কাঁপিয়া উঠিল। কারণ, শিক্ষক মহাশয়ের স্বরের বহুবিধ ভঙ্গীর অর্থ তাহারা অস্থি-মজ্জায় অনুভব করিতে শিখিয়াছিল। সর্ব্বানন্দ যখন সলজ্জভাবে তাঁহার সিংহাসনের নিকটে গিয়া দাঁড়াইল, তখন তিনি গুরু-গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "ওহে, এত ধেড়ে বয়সে এতটুকু-টুকু ছেলের সঙ্গে পড়্‌তে তোমার লজ্জা কর্‌বে না?" সর্ব্বানন্দ অধিকতর লজ্জিত হইয়া অবনত মস্তকে চটী জুতা দিয়া প্লাট-ফর্ম্মের পায়ায় আঘাত করিতে লাগিল। শিক্ষক মহাশয় উক্ত কার্য্যকে "ধেড়ে ছেলের" ধৃষ্টতা মনে করিয়া গর্জ্জন করিয়া বলিলেন, "চুপ করে রইলে কেন? বল না!" সর্ব্বানন্দ তখন অতি মৃদুস্বরে বলিল, "লজ্জা করিবে।"

শিক্ষক বলিলেন, "কিন্তু সাবধান, যা জিজ্ঞাসা করি, যদি তার ঠিক জবাব দিতে না পার, তা'হলে তোমায় এদের চাইতেও ছোট ছেলেদের সঙ্গে পড়্‌তে হবে।"

সর্ব্বানন্দর হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। শিক্ষক তাহাকে রয়েল রিডার নম্বর ফাইভ নামক অতি অপূর্ব্ব ও গুরুগম্ভীর পুস্তক হইতে একটী গুরুতম স্থান বাহির করিয়া বলিলেন, "পড়।" সর্ব্বানন্দ কম্পিত হৃদয়ে উহা পাঠ করিল, কিন্তু ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের সন্তান বলিয়াই হউক বা অন্য যে কোন কারণেই হউক, তাহার উচ্চারণ তেমন সুবিধাজনক হইল না, তবে কোন স্থানে আটকাইল না। পূর্ণবাবু তাঁহার চক্ষু দুইটিতে একটা অবজ্ঞার হাসি ফুটাইয়া তুলিতে চেষ্টা করিলেন, ফুটিল কি না সে সংবাদ কেহ রাখে না, তবে তাঁহার দন্তপংক্তি সহসা বিকশিত কুন্দবৎ সমস্ত মৌন ও ভীত হৃদয়গুলির ভয়ের অন্ধকার কথঞ্চিৎ দূরীভূত করিল। তিনি তাঁহার দংষ্ট্রময়ূখ প্রীতির পাত্র কোন এক বালকের উপর পুঞ্জীভূত করিয়া বলিলেন, "কেমন রে নিধে, পড়া ঠিক হয়েছে?" নিধে ওরফে নিধিরাম এক লম্ফে দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল, "ও কিছু হয় নি।" শিক্ষক তাহাকে আদেশ করিলেন, "একবার শুনিয়ে দে ত, হেড মাষ্টারের ছাত্র হ'লেই রিডিং পড়া শেখা যায় না।" নিধিরাম পরম পুলকিত চিত্তে অপূর্ব্ব ভঙ্গিমায় উক্ত শিক্ষক মহাশয় যে ভাবে যে স্থানে মাথা নাড়িতেন, থামিতেন, বা সুর টানিয়া ছোট-বড় করিতেন, অবিকল তাহার অনুকরণ করিয়া ঠিক সেই ভাবে পাঠ করিল।

তাহার পাঠ-ক্রিয়া শেষ হইলে শিক্ষক মহাশয় বলিলেন, "That's all right. শুন্‌লে হে ছোকরা, দু'বছরে এ রকম রিডিং পড়া শেখা যায় না।"

পরে তিনি সর্ব্বানন্দকে ঐ স্থানের অর্থ করিতে আদেশ দিলেন।

সর্ব্বানন্দ ভয়ে ও লজ্জায় দুই-এক স্থানের অর্থ বলিতে ভুল করায় আবার তাহার উপর শ্রেণীস্থ সমস্ত বালকবৃন্দের বিদ্রূপাত্মক কলরব ও সর্ব্বোপরি তৃতীয় শিক্ষক মহাশয়ের বিরাট হাস্যের তীব্র বিষ বর্ষিত হইল।

এদিকে কার্ত্তিকচন্দ্র সর্ব্বানন্দর অবস্থা দেখিয়া ক্রোধে গুমরাইতেছিল। হঠাৎ শিক্ষক মহাশয়ের দৃষ্টি তাহার উপর পড়িবামাত্র তিনি হাসিয়া বলিলেন, "কি হে, অমন করে তাকাচ্ছ কেন? এদিকে এস ত দেখি, তোমারই বা কতদূর দৌড়!"

কার্ত্তিকচন্দ্র ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে একবার সমবেত বালকমণ্ডলীকে দেখিয়া লইয়া একলম্ফে সম্মুখস্থ একটা ডেস্ক ডিঙ্গাইয়া একেবারে শিক্ষক মহাশয়ের নিকটে গিয়া দাঁড়াইল। শিক্ষক মহাশয় তাহার প্রচণ্ড মুখভঙ্গীতে কিঞ্চিৎ থতমত খাইয়া বলিলেন, "ও কি! অমনভাবে লাফিয়ে এলে যে? কেবল লাফালাফি শিখেছ, বুঝি?"

কার্ত্তিকচন্দ্র গম্ভীরভাবে বলিল, "যেখানে যেমন রীতি, সেখানে তেমনি কর্‌তে হয়।"

শিক্ষক মহাশয় অবাক্ হইয়া তাহার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "ইস্কুলে কি বাঁদরলাফ শিখ্‌তে আসে না কি?"

কার্ত্তিক কহিল, "এখানে ত তাই শেখানো হয় দেখ্‌ছি। থাক, কি জিজ্ঞাসা কর্‌বেন, করুন।"

শিক্ষক কহিলেন, "কি! হুকুম চালাচ্ছ যে! আমি ভোজপুরী ছাতুখোর দরোয়ান নই যে আমায় ভয় দেখিয়ে সার্‌বে! যা জিজ্ঞাসা কর্‌ব, তা বল্‌তে না পার্‌লে বিতিয়ে লাল করে দেব।"

কার্ত্তিক কৃত্রিম বিনয়ে হাত জোড় করিয়া বলিল, "যে আজ্ঞে! এখন জিজ্ঞাসা করুন।"

শিক্ষক মহাশয় বজ্র-নিনাদে বলিলেন, "Rascal! bloody fool!"

কার্ত্তিকচন্দ্র টেবিল চাপড়াইয়া বলিল, "এদের অর্থ চান? এদের অর্থ —a squint-eyed lame man. বাঙলা মানে, টেরা-চোখো, দেড়-ঠেঙ্গো মানুষ।"

স্যর রবার্ট বল বলেন যে ক্রাকাটোভা নামক আগ্নেয়-গিরির বিকট গর্জ্জন না কি বহুশত ক্রোশ দূরস্থিত মালয় উপদ্বীপেও শুনা গিয়াছিল এবং তাহা হইতে উৎক্ষিপ্ত ভস্মরাশি সুদূর ইংলণ্ডের সান্ধ্য আকাশকেও রঞ্জিত করিয়াছিল। কার্ত্তিকচন্দ্রের ভীষণ বিদ্রূপে তৃতীয় শিক্ষক মহাশয় যে প্রচণ্ড শব্দে আপনাকে উর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত করিয়াছিলেন, তাহা সুদূর লাইব্রেরী ও দরোয়ানের টীনের ছাদেও প্রতিধ্বনিত হইয়াছিল। সেই ভীষণ শব্দের নানা কারণের মধ্যে মাধ্যাকর্ষণ নামক দুর্বিনীত শক্তির যোগ থাকায় ব্যাপারটা আরও গুরুতর হইয়াছিল বলিয়া অন্যান্য শিক্ষক-গণের অনুমান। প্রত্যক্ষ যাহারা দেখিয়াছিল, তাহারাও বলে যে, তৃতীয় শিক্ষক মহাশয় তাড়াতাড়ি উঠিতে গিয়া তাঁহার চেয়ারখানি চৌকি হইতে তাঁহাকে লইয়াই পতিত হইয়াছিল। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা তীব্রতর বেদনার কারণ হইয়াছিল, কার্ত্তিকচন্দ্রের বিদ্রূপাত্মক হাস্যপরিপূর্ণ বাক্য!—উক্ত শিক্ষক মহাশয় যখন ধূলি ঝাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া শুনি-লেন, কার্ত্তিকচন্দ্র পরিষ্কার কণ্ঠে উক্ত বচনটী উদ্ধৃত করিতেছে, তখন তিনি ক্রোধে দুঃখে অপমানে কাঁদিয়া ফেলিলেন; এবং ব্ল্যাক বোর্ডের বেঞ্চের উপর আহত পাখানি তুলিয়া সতৃষ্ণ দৃষ্টিতে দেখিতে লাগিলেন।

ইত্যবসরে অন্যান্য শিক্ষকগণ সেই কক্ষে সমবেত হইলেন এবং প্রধান শিক্ষক সমস্ত ব্যাপার অবগত হইয়া কার্ত্তিকচন্দ্রকে নিকটে ডাকিয়া বলি-লেন, "কার্ত্তিক, তুমি এঁর অপমান করেছ?"

কার্ত্তিকচন্দ্রের ক্রোধ অনুশোচনায় পরিণত হইয়াছিল। সে বিনীত স্বরে বলিল, "উনি মিছামিছি সর্ব্ব-দাদাকে সকলের সামনে অপদস্থ করে-

ছিলেন, তাই আমি সে অপমানের শোধ নিয়েছি। তবে আমি ক্ষমা চাচ্ছি।” কার্ত্তিকচন্দ্র জোড়-করে তৃতীয় শিক্ষক মহাশয়ের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিল। কিন্তু শিক্ষক মহাশয়ের আঘাতের জ্বালা তখনও কমে নাই; তাই তিনি মুখ বিকৃত করিয়া বলিলেন, “আগে ও কান মলুক, নাক-খৎ দিক, তবে ক্ষমা করব।” কার্ত্তিকচন্দ্র বিনা বাক্যব্যয়ে উক্ত কার্য্য সম্পাদন করিল। তথাপি উক্ত শিক্ষক মহাশয় মুখ বক্র করিয়া রহিলেন দেখিয়া হেডমাষ্টার মহাশয় বলিলেন, “ওর আর কি শাস্তির ব্যবস্থা করবেন করুন। ও প্রস্তুত আছে।” পূর্ণবাবু আজ্ঞা দিলেন, উহাকে সাতদিন বেঞ্চের উপর দাঁড়াইতে হইবে। হেডমাষ্টার মহাশয় বুঝিলেন যে, ইহা অত্যন্ত বাড়াবাড়ি হইতেছে; তথাপি তিনি কার্ত্তিক-চন্দ্রের উপর সেই আজ্ঞা প্রচার করিলেন। কার্ত্তিকও বিনা বাক্যব্যয়ে তাহার নিজস্থানে গিয়া বেঞ্চের উপর দণ্ডায়মান হইল। কিন্তু কোন বালকই সাহস করিয়া তাহার দিকে চাহিতে পারিল না।

হেডমাষ্টার মহাশয় তখন তৃতীয় মাষ্টার মহাশয়কে ডাকিয়া বাহিরে লইয়া গিয়া বলিলেন, “আপনি কার্ত্তিকের পিছনে বেশী লাগ্‌বেন না। কারণ এর মধ্যেই ও আমার ফাষ্ট ক্লাশের সেরা ছাত্রের চাইতেও অনেক শিখে ফেলেছে। এত বড় মেধাবী ছাত্র আমার হাতে কখনও পড়ে নি, ওকে ফাষ্ট ক্লাশেই একেবারে নিতে চেয়েছিলাম, কিন্তু ও কিছুতেই সর্ব্বা-নন্দর সঙ্গ ছাড়্‌তে রাজী নয়, তাই ওকেও আপনার ক্লাশে দিয়েছি। আর মনে থাকে যেন, কালিকা বাবুর দৃষ্টি ঐ ছেলেটীর উপর সর্ব্বদা পড়ে আছে। ওকে বেশী ঘাঁটালে কারও রক্ষা থাক্‌বে না। আর, এই বয়সে এত মাইনের এমন চাকরী যে আপনার অন্য কোথাও জুটবে, তারও বড় ভরসা দেখি না। সাবধান!”

৮

একাদশ বর্ষ অতিক্রম করিয়া শৈলজা যখন দেখিল, তাহার বয়োকনিষ্ঠা বা সমবয়স্কা সরলা, কমলা প্রভৃতি বহু আত্মীয়া অনাত্মীয়া বালিকার বিবাহ হইয়া গেল, তাহার হইল না, তখন সে আশ্চর্য্য হইয়া তাহার ঠাকুরমার উপর আবদার আরম্ভ করিয়া দিল। ঠাকুরমা হাসিয়া বলিলেন, "তুই কি রকম বর নিবি?" শৈলজা সগর্ব্বে বলিল, "কেন, মণিদার মত।" মণিশঙ্কর ইতিমধ্যে মাতৃ-উপদেশে জমিদার-গৃহে যাতায়াত আরম্ভ করিয়াছিল এবং তাহার "মানস-প্রতিমাকে" ভুলাইবার জন্য বহুবিধ জাল বিস্তার করিতেও সে কোন ত্রুটি রাখে নাই।

ঠাকুরমা চমকিত হইয়া বলিলেন, "সে কি রে, ঐ হতভাগাটার মত?"

শৈলজা ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, "গাল দিচ্ছ? আমি ওকে বলে দেব।"

"তা দিস্, কিন্তু ওকে তোর পছন্দ হ'ল কেন?"

"ও কেমন থিয়েটারে রাজা সাজে, গান করে, আবার আমায় সেদিন কেমন খরগোস দিয়েছে, তুমি দেখনি?"

"দেখেছি, কিন্তু রাজা সাজলে, খরগোস দিলেই কি বিয়ে হয়!"

"ও আমায় কত আদর করে! বাঃ, আমার জন্যে সেদিন কেমন মস্ত একটা ফুলের তোড়া এনেছিল, আমি মণিদাকেই বিয়ে কর্‌ব, ঠাকুমা, তুমি বিয়ে দাও।"

ঠাকুরমা হাসিয়া বলিলেন, "আচ্ছা, দাঁড়া, তোর বাবাকে বলে বিয়ের বন্দোবস্ত কর্‌ছি। কিন্তু মণির সঙ্গে নয়।"

"তবে কার সঙ্গে ?"

"কার্ত্তিকের সঙ্গে।"

"হ্যাঁ, আমি ওকে বিয়ে কর্‌লে ত। ও যে দুষ্টু !"

"দুষ্টু ! সে কি রে, কি দুষ্টুমি কর্‌লে ?"

"ও সব্বাইকে মারে। আমায় ত একবার মার্‌তে গিয়েছিল, মনে নেই ?"

"সে কিরে ! সে কথা এখনও তোর মনে আছে ?"

"মনে নেই আবার ! তা ছাড়া মণিদা তার কত নিন্দে করে, বলে, ইস্কুলে ছেলেদের সঙ্গে ও ভারী মারামারি করে, মাষ্টারদের সঙ্গে ঝগড়া করে। না ঠাকুমা, তার চেয়ে সর্ব্ব-দা ভাল, না হয়, ওরই সঙ্গে বিয়ে দাও। কার্ত্তিকদাকে বিয়ে কর্‌ব না,—ও তাহলে কোন্‌দিন আমায় মেরে ফেল্‌বে।"

ঠাকুরমা উচ্চ হাস্য করিয়া তাঁহার বধূমাতাকে ডাকিয়া বলিলেন, "ও বৌমা, তোমার মেয়ের কথা শোনো।"

শৈলজার মাতা নিকটে আসিয়া বলিলেন, "কি বল্‌ছিস্, শৈল ?"

শৈল কহিল, "ঠাকুমা আমায় কার্ত্তিকদাকে বিয়ে কর্‌তে বলছে। আমি বল্‌ছি, অত দুষ্টুকে আমি বিয়ে কর্‌ব না।"

মাতা হাসিয়া বলিলেন, "তা না করিস্, না করবি ! এখন যা, তোকে সরলা ডাক্‌ছে, তার শ্বশুরবাড়ী থেকে কত খেলনা এসেছে, দেখ্‌ গিয়ে।" শৈলজা ছুটিয়া চলিয়া গেল।

শৈলজার মাতা তখন শ্বশ্রূঠাকুরাণীকে বলিলেন, "মা, ও সব কথা শৈলকে না বলাই ভাল। উনি ওতে রাগ করেন, বারণ করেন।"

শ্বশ্রূঠাকুরাণী হাসিয়া বলিলেন, "তা জানি, মা। কিন্তু তোমার মেয়েই

যে এদিকে পাকা বুড়ী হয়ে উঠেছে, তার খবর ত' রাখ না। ওই বল্লে সরলার বিয়ে হ'ল, কমলার বিয়ে হ'ল, আর আমার বিয়ে হবে কবে? আমি তাই জিজ্ঞেস কর্‌ছিলুম, কেমন বর নিবি? তাতে কি বল্লে, জান? বল্লে, মণিদাকে বিয়ে কর্‌ব। এমনি তোমার মেয়ের পছন্দ!"

শৈলজার মাতাও চমকিত হইয়া বলিলেন, "সে কি মা, মণিশঙ্কর! দেওয়ানজীর ছেলে!"

"হ্যাঁ, ওই বাউণ্ডুলে ছোঁড়াটা। ছোঁড়াটা না কি ওকে কি কি দিয়েছে।"

"আর ওকে এখানে আস্‌তে দেওয়া নয়। ও ভারি বদ ছেলে।"

"তা কি আর আমি জানিনে?"

শৈলজার মাতা চিন্তিত মনে প্রস্থান করিলেন এবং সময়মত সমস্ত কথা কালিকা বাবুর নিকট খুলিয়া বলিলেন। কালিকা বাবু হাসিয়া বলিলেন, "এতেই এত ভাবনা! আমি বলি, মেয়ের বুঝি সর্দ্দি লেগেছে! তা নয়, সে মণিটাকে বিয়ে কর্‌তে চেয়েছে! তাই বল। ডাক ত' শৈলকে।" শৈলজাকে ডাকিতে আদেশ দিয়া গৃহিণী বলিলেন, "তুমি হেসে উড়িয়ে দিয়ো না। ও বয়সে মেয়েমানুষের যখন বিয়ে হয়ে যায়, তখন শৈলর কথা হেসে ওড়ানো চলে না।"

কালিকা বাবু কহিলেন, "যাদের চলে না, তারা অমন করে বল্‌তে পারে না যে, 'আমার বিয়ে দাও'। তা আবার কার সঙ্গে, না, যে দুটো খরগোস দিয়েছে, কি দুখানা ছবি দিয়েছে, তারই সঙ্গে! আমার শৈল চিরদিন খুকীই থাক্‌বে, তোমার ভয় নেই, ইন্দিরা। তবে তোমাদের একটা অনুরোধ, ডেঁপো মেয়েদের সঙ্গে ওকে মিশ্‌তে দিয়ো না, এইটুকু করো, তা হলেই দেখ্‌বে, সব ঠিক থাক্‌বে।"

গৃহিণী কহিলেন, "কিন্তু মা যে ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন, আর

কতদিন অপেক্ষা করবে? কাৰ্ত্তিককেই যদি তোমার এত পছন্দ হয়ে থাকে, তা হলে আর দেরী করছ কেন? ওর বাপকে বলে সব ঠিক করে ফেল না। কিন্তু আমার মত যদি নাও, তা হলে সমান ঘরে বিয়ে দাও, অমন গরীবের ছেলে এনে শেষে ও বেচারার এ কুল ও কূল দুই মজাবে!"

কালিকা বাবু কহিলেন, "তুমি কার্ত্তিককে এখনও চিনতে পার নি, তাই ঐ ভয় করছ। ঘর-জামাই হলেই যা হবার সম্ভাবনা, আমি তাই দূর করবার জন্য কার্ত্তিককে যথাসাধ্য শিক্ষিত করে নিতে চাই। ও যাতে মনে করতে পারে যে, ইচ্ছা করলেই ও স্বাধীন, এই রকম বিদ্যা-সাধ্য ওর করিয়ে দিয়ে তবে ওকে মেয়ে দেব। তাই এত যত্ন করে পড়াচ্ছি!"

গৃহিণী ইন্দিরা দেবী কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন, "কিন্তু মেয়ের যদি ওকে পছন্দ না হয়?"

"তা হলে আজীবন কষ্ট পাবে। আমি কিন্তু আর কারও হাতে আমার মেয়ে তুলে দিতে পারব না। কাৰ্ত্তিককে দেব, তারপর মেয়ে যদি নিজের বুদ্ধির দোষে সব নষ্ট করে, বুঝব, মেয়ের কপালে সুখ নেই। নইলে কার্ত্তিককে যে জানে, সে ওকে ভাল না বেসে থাকতে পারে, তা ত আমি কিছুতেই ভাবতে পারি না।"

"তুমি যে কার্ত্তিককে কি চোখে দেখেছ, তা তুমিই জান। কিন্তু আমি ত ওর খুব বুদ্ধি-শুদ্ধি ছাড়া আর কোন গুণ দেখতে পাইনে।"

"পাও না! আশ্চর্য্য। ওর ঐ গম্ভীর মুখখানায় কি একটা প্রচণ্ড শক্তি! আপনাকে বিপদে ফেলেও পরকে ভালবাসবার ক্ষমতাও রাখে! তা ছাড়া আরও যা আছে, তা তোমায় কি বোঝাব? তার সুমুখে দাঁড়ালে হয় ত রাজা-মহারাজের মাথা নীচু হয়ে যায়।

সেটা হচ্চে, নির্ভীক তেজস্বিতা! দেখেছ কোন দিন, ওর তেজ? ওকে দেখ্‌লেই আমার মনে পড়ে, সেই পূর্ব্বকালের তপোবনের ঋষি-বালকদের কথা। ইন্দিরা, আমি যে কেন ওকে ভালবাসি একদিন ওকে তোমার কাছে বসিয়ে কথা কয়ে দেখো, তাহলেই সব বুঝ্‌তে পারবে।"

তাঁহাদের কথাবার্ত্তা চলিতেছে, এমন সময় শৈলজা সেখানে আসিয়া বলিল, "কি বাবা, ডাক্‌ছ কেন?"

পিতা তাহাকে খাটের নিকটে ডাকিয়া বলিলেন, "কি করছিলি?"

"কিছু না। একটা মজা দেখ্‌ছিলুম।"

"মজা দেখ্‌ছিলি? কোথায়, কি মজা?"

"কার্ত্তিকদা এসে তোমার আলমারি খুলে বই ঘাঁট্‌ছিল। যে বইখানা ও রোজ কেবলই-কেবলই ঘাঁটে, আমি সেখানা লুকিয়ে রেখেছি, ও তাই খুঁজ্‌ছে আর রামচরণকে বক্‌ছে। আমি লুকিয়ে তাই দেখ্‌ছিলুম, আর সরলাকে দেখাচ্ছিলুম।"

"তুই ত ভারি দুষ্টু! যা, গিয়ে বের করে দিয়ে আয়।"

"না, দেব না। কেন দেব? ও কেন রোজ রোজ আমাদের বই ঘাঁট্‌বে! ওর নিজের বই ঘাঁটুক না গিয়ে।"

"পাগলি, ও যে আমার বই নিয়ে পড়ে। ও বই না পেলে ওর পড়া হবে না, শেষে স্কুলে মার খাবে।"

"ও যেমন দুষ্টু ওর মার খাওয়াই উচিত। বাবা, তুমি ইস্কুলের মাষ্টারদের বলে দিয়ো যে, ওর নিজের বই নেই, পরের বই নিয়ে পড়ে, তাই ও পড়া বল্‌তে পারে।"

ইন্দিরা কহিলেন, "তুই যেমন ওকে দেখ্‌তে পারিস্ নে, আমরা যে তেমনি ওকে খুব ভালবাসি।"

শৈল কহিল, "তাইতেই ত ওর আস্কারা আরও বেড়ে গিয়েছে, নইলে যখন-তখন সবাইকে ও বকে কেন? আমি কিছু করলে ধম্‌কায় কেন?"

ইন্দিরা কহিলেন, "তুই ওর পেছনে লাগ্‌তে যাস্ কেন?"

শৈল কহিল, "বেশ কর্‌ব, লাগ্‌ব। যে আমায় মার্‌তে আসে, বকে, তাকে আদর কর্‌বে! বাবা, তুমি ওকে কেন এখানে আস্‌তে দাও? রোজ রোজ কেন ও তোমার লাইব্রেরী ঘাঁট্‌বে?"

কালিকাবাবু কহিলেন, "আচ্ছা, কাল থেকে ওকে এখানে আস্‌তে মানা করে দেব। তা হলেই ত হবে? ও বেচারার তাহলে কিন্তু খুব কষ্ট হবে।"

শৈলজা কিছুক্ষণ বিছানার উপর মাথা রাখিয়া চিন্তা করিয়া বলিল, "খুব কষ্ট হয় ত এক-একদিন আস্‌তে দিয়ো, কিন্তু রোজ নয়। তার চাইতে মণিদাকে বলে দেব, ও এসে রোজ রোজ তোমার বই পড়ে যাবে।"

ইন্দিরা দেবী গম্ভীর মুখে বলিলেন, "খবদ্দার শৈল, মণির সঙ্গে কথা বলিস্‌নে। ও ভারী পাজী। ফের যদি কোন দিন ওর কাছ থেকে কিছু তুমি নাও—"

গৃহিণীর কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই কালিকাবাবু বাধা দিয়া বলিলেন, "কি মিছি-মিছি যা-তা বক্‌ছ! না রে শৈল, মণির সঙ্গে কথা বলিস্। তবে তাকে সবাই মন্দ বলে, সেজন্য সে কিছু দিলে নিয়ো না। নিলে সবাই আমায় বক্‌বে, তোমাকেও বক্‌বে।"

শৈলজাসুন্দরী এইবার চটিয়া গেলেন। তিনি মহারাণী-অধিরাণীর মত তাঁর ক্ষুদ্র মস্তকটি উন্নত করিয়া বলিলেন, "আমি তোমাদের কারও কথা শুন্‌ব না। কেন, তোমরা মণিদাকে বক্‌বে? কি করেছে সে?"

কালিকাবাবু কন্যার মুখের ভাব দেখিয়া হাসিয়া বলিলেন, "ওরে না,

া, সে আমাদের কিছু করে নি। কিন্তু তুই যদি তার কাছ থেকে কিছু নস্, তাহলে সবাই আমাদের বক্‌বে।" শৈলজার সে কথা বিশ্বাস হইল া, কারণ তাহার পিতাকে তিরস্কার করিতে পারে, এমন লোক সে চাখে দেখেই নাই, কল্পনাও করিতে পারে না! সেই কারণে সে াথা নাড়িয়া বলিল, "তোমাকে কেউ বক্‌বে না। তোমরা তাকে দখ্‌তে পার না বলে এই কথা বল্‌ছ।"

কালিকাবাবু কহিলেন, "যে জন্যই বলি, তুমি তার কাছ থেকে কিছু নয়ো না। নিলে আমার খুব দুঃখ হবে, তোমার মার কষ্ট হবে।"

শৈলজা এইবার নরম হইয়া বলিল, "আচ্ছা, তোমরা কষ্ট পাও ত' নব না। কিন্তু মিছিমিছি তোমরা মণিদার উপর রাগ্‌তে পাবে না। মামি কিন্তু মণিদার খরগোস ফিরিয়ে দেব না।"

কালিকাবাবু অগত্যা সেই সর্ত্তে সম্মত হইয়া কন্যাকে বলিলেন, "যাও এখন খেলা কর্‌গে!" কন্যা অমনি বলিয়া উঠিল, "খেলা কর্‌ব কি? কার্ত্তিকদা কি কর্‌ছে, দেখে আসি। বই না পেয়ে নিশ্চয়ই সে এতক্ষণ াইব্রেরী মাথায় করেছে।"

কার্ত্তিকচন্দ্র ওদিকে তাহার ওয়েব্‌ষ্টার্ ডিক্স্‌নারীখানা খুঁজিয়া না াইয়া যৎপরোনাস্তি বিরক্ত হইয়াছিল এবং শেষে অগত্যা আর একখানা ুরাতন অভিধান খুঁজিয়া পাতিয়া বাহির করিয়া কাজ চালাইয়া লইতে- ছল। তাহার সম্মুখে বসিয়া সর্ব্বানন্দ একখানা খাতায় কতকগুলা ংরাজী idiom-এর বাংলা তর্জ্জমার চেষ্টায় বারবার মাথা চুলকাইয়া পন্‌সিল্ কামড়াইয়া ক্ষণে ক্ষণে কার্ত্তিকচন্দ্রের দিকে চাহিতেছিল— চ্ছা, সে একটু সাহায্য করে। কিন্তু কার্ত্তিকচন্দ্র ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া াপন মনে কাজ করিতেছিল, অন্যদিকে চাহিবার তাহার অবসরমাত্র ছল না!

এমন সময় দ্বারের নিকট একটা সুমধুর হাস্যধ্বনি শুনিয়া সর্ব্বানন্দ চমকিয়া ফিরিয়া দেখে, শৈলজা দুই হাতে সেই অভিধানের দুই অংশ লইয়া দ্বারে দাঁড়াইয়া হাসিতেছে। সর্ব্বানন্দ হাসিয়া বলিল, "কার্ত্তিক ঐ দেখ তোমার ওয়েবষ্টার্।"

কার্ত্তিকচন্দ্র তাহার পুস্তক হইতে মুখ তুলিয়া শৈলজার দিকে তীব্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবামাত্র, শৈলজা হাসিতে হাসিতে মাথা নাড়িয়া বলিল, "দেব না, কথ্খনো দেব না ত।" তখন কার্ত্তিকচন্দ্র গম্ভীর স্বরে বলিল, "দিয়ে যাও বল্ছি, শৈল, নইলে—"

শৈলজা কিন্তু কিছুমাত্র ভীত না হইয়া মাথা নাড়িয়া কেবলই বলিতে লাগিল, "দেব না—কথ্খনো দেব না।" তখন কার্ত্তিকচন্দ্র চেয়ার ছাড়িয়া তাহার দিকে সবেগে ছুটিতে গিয়া আর-একখানা চেয়ারে কাপড় আটকাইয়া পড়িয়া গেল ; এবং একটা আলমারির কোণে লাগিয়া তাহার কপাল কাটিয়া রক্ত পড়িতে লাগিল। তবুও কার্ত্তিকের সে দিকে ভ্রূক্ষেপও নাই, সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া বাহিরে বারান্দায় শৈলজাকে ধরিতে গেল। শৈলজা কিন্তু কিছু দূরে ছুটিয়া গিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল, ইচ্ছা কার্ত্তিক যদি বাহিরে না আসে, তাহা হইলে আবার গিয়া তাহাকে ঐ বইদুখানা দেখাইবে। কার্ত্তিকচন্দ্র বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইতেই তাহার মুখের দিকে চাহিয়া শৈলজার সমস্ত দুষ্টামি মুহূর্ত্তে উড়িয়া গেল। সে তাড়াতাড়ি বই দুইখানা ফেলিয়া দিল এবং কার্ত্তিকের নিকট ছুটিয়া আসিয়া বলিল, "ও কার্ত্তিক-দা, রক্ত যে! তোমার কপাল কেটে গেছে। ও রামচরণ, জল আন্। ও সর্ব্ব-দা, শীগ্গির এস।"

কার্ত্তিকচন্দ্র প্রথমটা ঝোঁকের মাথায় বাহিরে আসিয়াছিল বটে, কিন্তু বাহিরে আসিয়াই আঘাতের গুরুত্ব অনুভব করিল। কারণ কপাল কাটিয়া রক্তের ধারায় তাহার মুখ ও বুক ভাসিয়া যাইতেছিল। সর্ব্বানন্দ

তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া দেখিল, শৈলজা কাঁদিতে কাঁদিতে লাইব্রেরীর বাহিরে যে এক-কলসী জল ছিল, তাহাই একটা প্রকাণ্ড মগে ঢালিবার চেষ্টা করিতেছে, আর কার্ত্তিক এক হাতে ক্ষত স্থান চাপিয়া ধরিয়া রেলিংয়ে ভর দিয়া দাঁড়াইয়া আছে।

লাইব্রেরীর খানসামা রামচরণ দ্বিপ্রাহরিক নিদ্রা দিতেছিল। শৈলজার চীৎকারে সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া আসিয়া তৎক্ষণাৎ জল ঢালিয়া কার্ত্তিকের কপালে জলপটী বাঁধিয়া ডাক্তারকে সংবাদ দিতে গেল। কার্ত্তিক ধীরে ধীরে উঠিয়া যখন লাইব্রেরীর একখানা চেয়ারে বসিল, তখন শৈল চোখ মুছিয়া ম্লান মুখে তাহার কাছে গিয়া বলিল, "কার্ত্তিক-দা, বাবাকে বলো না, আর আমি দুষ্টুমি কর্‌ব না!"

কার্ত্তিক হাসিয়া বলিল, "তোমার দোষ কি! আমি ত আপনি পড়ে গিয়েছি।"

"না কার্ত্তিক-দা, আমারই দোষ। আমি মাপ চাচ্ছি। সর্ব্ব-দা, ঐ দেখ আরও রক্ত পড়্‌ছে! কি হবে?"

সর্ব্বানন্দ বলিল, "ভয় কি! ডাক্তারবাবু আস্‌ছেন। এখনই সেরে যাবে।"

"যদি রক্ত বন্ধ না হয়, আমার বড় ভয় কর্‌ছে, আমি বাবাকে ডেকে আনি।"

শৈলজা চলিয়া গেল। তারপর ডাক্তার বাবু আসিয়া বাঁধা-ছাঁদা করিয়া বলিলেন, "এখন নড়ো না, বিকেলে বাড়ী যেয়ো, এখন খবর্‌দার নড়ো-চড়ো না।"

৯

কবিবর মণিশঙ্করের হৃদয়ে দারুণ আঘাত লাগিয়াছে। তাঁহার 'মানস-প্রতিমা' হঠাৎ সান্ধ্যভ্রমণ ত্যাগ করিয়াছেন, এবং সেদিন তিনি স্পষ্ট

তাঁহাকে বলিয়াছেন যে আর তিনি তাঁহার সম্মুখে বাহির হইবেন না। মণিশঙ্করের কাতর দৃষ্টি, অভিমানভরা মধুর বচন, সমস্ত উপেক্ষা করিয়া তিনি বলিয়াছেন, "বাবা বলেন, তুমি মদ খাও, খারাপ লোকের সঙ্গে থাক, তোমার সঙ্গে কথা বল্‌তে নেই।" হায় নিষ্ঠুরে! তুমি ত' জান না, কেন সে মদ খায়! তোমার নিষ্ঠুরতা, তোমার উপেক্ষাই যে তাহার কারণ। তুমি যদি দয়া করিয়া তাহার পানে একবার চাহিয়া দেখ, তাহা হইলে যে সে রাজার রাজা হইতে পারে, যুধিষ্ঠিরের মত ধাৰ্ম্মিক হইতে পারে, ভীষ্মের মত শরশয্যায় শয়ন করিতেও তাহার বাধে না! তুমি যদি বল, তাহা হইলে সে পিতা ত্যাগ করিতে পারে, এমন কি এমন যে হিতৈষিণী মাতা, তাঁহাকেও ত্যাগ করিয়া তোমার চরণে সে আপনাকে বলি দিতে পারে। হায়! তুমি তোমার ত্রিংশ সহস্র মুদ্রা আয়ের সম্পত্তির উপর উন্নত হইয়া বসিয়া রহিলে, আর সে রহিল কোথায়?

কবিবরের দুঃখ-সাগর মথিত হইয়া আজ-কাল যে সমস্ত উচ্ছ্বাস বাহির হইতেছিল, তাহাদের অমানুষিক বা আনুনাসিক রসাত্মকতায় অনেক নিশাচর সাহসী ব্যক্তিও আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিতেছিল। এমন কি তাঁহার "শঙ্করসাহি" কবিতাগুলি "পল্লী-সাহিত্যানুসন্ধান-সমিতির" সভাগণের কৃপায়, মণিশঙ্কর নামটিকে খৃষ্টীয় বিংশ শতাব্দী হইতে একেবারে ত্রয়োদশ কি চতুৰ্দ্দশ শতাব্দীতে উপনীত করাইয়া পল্লী সাহিত্যের গতাসু মহাপুরুষ-গণের সঙ্গে তাঁহাকে একাসনে বসাইয়া দিতেছিল।

গৃহে তাঁহার সঘন মূর্চ্ছা, বন্ধু-মহলে তাঁহার উদ্‌ভ্রান্ত প্রাণোন্মাদকর শঙ্করসাহি গীত এবং পথে ঘাটে তাঁহার চপল মন্থর গতি গ্রামের চিত্তটিকে একেবারে দখল করিয়া বসিয়াছিল। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া তাঁহার মাতা ডাক্তার ডাকিলেন। ডাক্তার আসিয়া ব্যবস্থা করিলেন, দুই বেলা ক্ষুদ্র মৎস্যের ঝোল আর ভাত এবং দিবারাত্রি গৃহে আবদ্ধ থাকা। বন্ধুরা

ব্যবস্থা করিলেন, "পোড়া বাঙ্গলা" ছাড়িয়া তাঁহারই বৈঠকখানায় আসিয়া তাঁহাকে প্রফুল্ল রাখা। মণিশঙ্কর স্বয়ং ব্যবস্থা করিলেন, প্রতিদিন চারি বোতল করিয়া ধান্যেশ্বরীর সেবা। কিন্তু মূর্খ পিতা দুর্গাশঙ্কর ব্যবস্থা করিলেন, তাঁহার নিজ সলিমপুর মহালের নায়েবী—না হয়, জমিদার-মহাশয়কে বলিয়া-কহিয়া নিকটস্থ কোন এক তালুকের ম্যানেজারী।

পিতার এই ব্যবস্থা শুনিয়া পুত্রের উদ্ভাবনশীল মস্তিষ্কে এক অপূর্ব্ব ভাব গজাইয়া উঠিল। তিনি তাঁহার পিতাকে ধরিয়া বসিলেন যে শ্রীমতী শৈলজাসুন্দরীর নামে যে সুবর্ণ-গোলা নামক তালুক আছে, তাহার ম্যানেজারিটা তাঁহাকে দেওয়া হউক। উহার ম্যানেজার না কি এই সময় হিসাব দিবার জন্য সদর কাছারিতে আসিয়াছে ; উহাকে এই সময় বরখাস্ত করিয়া পিতা তাঁহাকে ঐ পদটী প্রদান করুন, তাহা হইলেই কবিবরের সমস্ত রোগ সারিয়া যাইবে। পিতা সেই কথা শুনিয়া মনে মনে হাসিলেন, কিন্তু তাঁহার মস্তকেও ঐ সময়ে তড়িৎগতিতে একটা অভিসন্ধি জাগিয়া উঠিল ; এবং দৈবের কোন্ অলঙ্ঘ্য নিয়মে তাঁহার মুখ দিয়া বাহির হইল, "ম্যানেজার বেটাকে হিসেব নিকেশে ফেল্‌তে হবে !"

দুর্গাশঙ্কর চলিয়া গেলে মণিশঙ্কর বন্ধুগণের নিকট উপস্থিত হইয়া এক অদ্ভুত প্রস্তাব করিলেন। শুনিয়া বন্ধুগণ একেবারে ভয়ে-বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়িল। কিন্তু কবিবরের তখন বাক্যের উৎস খুলিয়া গিয়াছে ; তিনি জ্বলন্ত গদ্য-পদ্য বর্ষণ পূর্ব্বক বন্ধুগণকে উত্তেজিত করিতে লাগিলেন ; দুই ঘণ্টার উদ্যোগে স্থির হইল, যেমন করিয়াই হউক সুবর্ণ গোলার ম্যানেজারের কাগজ-পত্র সরাইয়া ফেলিতে হইবে। ম্যানেজার রাত্রে ঠাকুরবাড়ী-সংলগ্ন একটা কুঠরীতে নিদ্রা যায়। রাত্রি বারোটা-একটার সময় কার্য্য সম্পন্ন করিতে হইবে! মহাশক্তির প্রভাবে সকলেই উৎসাহিত হইয়া উক্ত কার্য্যে যোগদান করিতে স্বীকৃত হইল।

কিন্তু কার্য্যকালে সমুৎপন্নে দেখা গেল, তিন-চারিজন ছাড়া আর কেহই মণিশঙ্করের সঙ্গে নাই। তথাপি কি ভয়, কি ভয়! তাহারা এক-একজনেই এক একশত। Forward ! March ! No fear !

সেনাপতি মণিশঙ্কর বলিলেন, "সাবধান! কোন শব্দ করো না। চুপি চুপি ওখানে ঢুকে যদি দেখি দরজা বন্ধ, তাহলে কাঠের জানলাটা এক টানে খুলে ফেলে ঘরে ঢুকে তার পর দেশলাই জ্বালা যাবে। পাপিষ্ঠ ম্যানেজার যদি বাধা দেয়, তাহলে—" মণিশঙ্কর কলোসিয়ম্-স্থিত রোমান সম্রাটের ন্যায় বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের দ্বারা দেখাইয়া দিলেন, কি করিতে হইবে।

মণিশঙ্কর নিঃশব্দতার আদেশ দিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার একজন প্রিয়তম শিষ্য যিনি শঙ্করসাহি সঙ্গীতে এবং ধান্যেশ্বরীর সেবায় গুরুকেও অতিক্রম করিয়াছিলেন, তিনি কিছুতেই তাঁহার হৃদয়স্থ শঙ্করসাহির সুরকে চাপিয়া রাখিতে পারিলেন না। তাই অন্যান্য সকলে যখন ম্যানেজারের কক্ষের নিকট উপস্থিত হইয়া জানলা-দরজা বন্ধ দেখিয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ের ন্যায় কর্ত্তব্যসম্বন্ধে পরামর্শ করিতেছিল, তখন তাঁহার শঙ্করসাহি হঠাৎ সংযমের বাঁধ ভাঙ্গিয়া বাহির হইল, "একবার বেরোও হে নরেশ!"

"আরে, চুপ চুপ।"

"আমরা তোমায় দেখে নেবো ;
বেরোও হে নরেশ! একবার বেরোও হে—এ।—"

"সর্ব্বনাশ করলে! আরে চুপ!"

কিন্তু কে শোনে? পুনরায় দ্বিগুণ জোরে বাহির হইল, "বেরোও হে—এ—এ—একবার।"

এমন সময় দ্বার খুলিয়া ম্যানেজার নরেশচন্দ্র মহালনবীশ বাহিরে আসিয়া বলিলেন, "কে হে তোমরা?"

আর পিছানো চলে না! মণিশঙ্করের সেই গায়ক শিষ্য গিয়া তাহাকে জাপটাইয়া ধরিয়া গাহিল, "আমরা তোমায় দেখে নেবো—হে!" নরেশবাবু ভীত হইয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "ডাকাত—ডাকাত—" এবং কোনরূপে আপনাকে মুক্ত করিয়া ঘরে প্রবেশ করিয়া দ্বার বন্ধ করিয়া দিলেন। তাঁহার চীৎকারে কিছুক্ষণের মধ্যেই টোলের কয়েকটী ছাত্র-সমেত সর্ব্বানন্দ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া দেখিল, মুখে কাপড়-বাঁধা কয়জন লোক দরজা ঠেলিয়া নরেশ বাবুর কক্ষে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিতেছে এবং তিনি কক্ষমধ্য হইতে প্রাণপণে চীৎকার করিতেছেন। তাহারা আসিয়া মণিশঙ্করকে সবলে ঘিরিয়া ফেলিল। মণিশঙ্কর বেগতিক দেখিয়া হুকুম দিলেন, "চালাও লাঠি।"

সর্ব্বানন্দ বলিল, "আর লাঠি চালিয়ে দরকার নেই। পালাও বলছি, নইলে সব-কটী মাতালকে ঐ কূয়োয় চোবাব।"

মণিশঙ্কর হুকুম দিলেন, "মারো শালা সর্ব্বাকে।" কিন্তু সর্ব্বানন্দ ও অন্যান্য ছাত্রগণ কিল, চড় ও দুই-চারি লাথিতে সকলকে ভূতলশায়ী করিল। পরে ঠাকুরবাড়ীর দরোয়ানগণ পৌঁছিলে বলিয়া দিল, "বাঁধো এদের।" দরোয়ানেরা সঙ্গে আনিয়াছিল। তাহারা আলোর সাহায্যে যখন চিনিল, কাহাকে বাঁধিতে হইবে, তখনই সকলে পিছাইয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "আরে ইনি মণিবাবু! ই কেয়া হুয়া? আপ্ কাহে ডাকু বন্ গিয়া?" মণিশঙ্কর তখন সাহস পাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "বাঁধো ঐ শালাকো।" কে কাহাকে বাঁধে?

ইত্যবসরে কার্ত্তিকচন্দ্র সংবাদ পাইয়া ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইল এবং সমস্ত ঘটনা শুনিয়া বলিল, "বটে! আরে সর্ব্ব-দা, করেছ কি! মণিবাবু এসেছেন, ওঁর অভ্যর্থনা করনি? ছি ছি, কি করছ, শীগ্‌গির কূয়ো থেকে একঘড়া জল তুলে এনে ওঁর মাথায় দাও।" সর্ব্বানন্দ ব্যস্ত হইয়া

বলিল, "এই সারলে! ওহে মণি, পালাও, কার্ত্তিক ক্ষেপেছে। আমার হাতে তবু রক্ষা আছে, ওর হাতে নেই।"

মণিশঙ্কর কার্ত্তিকচন্দ্রের মূর্ত্তি দেখিয়াই সসম্মানে পলায়নের পথ খোলসা কি না তাহাই দেখিতেছিল। ইত্যবসরে কার্ত্তিকচন্দ্র কূপ হইতে একবড়া জল তুলিয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইল। মণিশঙ্করের অন্যান্য বন্ধুগণ পূর্ব্বেই পলাইয়াছিল, কিন্তু সে তখনও সাহসে ভর করিয়া দাঁড়াইয়াছিল। কার্ত্তিক আসিয়া যেমন তাহার গলায় হাত দিয়া এক ধাক্কায় তাহাকে মাটীতে ফেলিল, অমনি সে সর্ব্বানন্দকে ডাকিয়া কাতর কণ্ঠে বলিল, "সর্ব্ব ভাই, রক্ষে কর।" সর্ব্বানন্দ তখন কার্ত্তিককে টানিয়া বলিল, "আঃ, কি কর, কার্ত্তিক? দেখ্‌ছ না, বেচারা মদের ঝোঁকে এ কাজ করে ফেলেছে। যাও মণি, পালাও।"

মণিশঙ্কর তখন একেবারে তাঁহার "আড্ডা" পোড়া বাঙ্গলায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেইস্থানে তাঁহার যে কয়টী সঙ্গী সুরাভিযানে যাইতে সাহস করে নাই, তাহারা উপস্থিত ছিল। মণিশঙ্কর ফরাশের উপর গিয়া আছাড় খাইয়া বলিলেন, "ভাই দেবেন, ভাইরে, আমার বড় অপমান হয়েছে!"

"কি, কি, কি হ'ল?"

"উঃ, বড় অপমান! জ্বলে গেল, বুক জ্বলে গেল!"

একজন বন্ধু তাড়াতাড়ি এক গ্লাস ষ্টিমুলাণ্ট আনিয়া তাহার মুখের কাছে ধরিতেই, তৎক্ষণাৎ সে তাহা উদরসাৎ করিয়া বলিল, "উঃ, ভাইরে কি অপমান! আমার মূর্চ্ছা যাবার ইচ্ছে হচ্ছে!" তাহার অবস্থা দেখিয়া একজন তাড়াতাড়ি তাঁহার মাতার নিকট সংবাদ দিতে ছুটিয়া গেল, এবং অন্যান্য সঙ্গিগণ পাখা লইয়া তাহাকে বাতাস করিতে লাগিল।

দেবেন জিজ্ঞাসা করিল, "কি হয়েছে, একটু ঠাণ্ডা হয়ে বল দেখি?"

মণিশঙ্কর কহিল, "প্রিয়নাথ, বাপ! আর এক গ্লাস দাও, ভাই!"

প্রিয়নাথ তাহার আজ্ঞা পালন করিলে মণিশঙ্কর উঠিয়া বসিয়া বলিতে আরম্ভ করিল, "কি হয়েছে? বরং বল কি হয়নি? সেই পাপিষ্ঠ পরান্ন-ভোজী কুকুরগুলোর ভয়ে আমায় পালিয়ে আসতে হ'ল! সেই পাতচাটা হারামজাদা সর্ব্বা আর কার্ত্তিকে! সেই দুটো চ্যাংড়া আমায় লাথি মারলে! এ প্রাণ আমি আর রাখ্‌ব না।"

দেবেন কহিল, "থাম, থাম, ও কি করছ? গলা টিপ্‌ছ কেন?"

মণি কহিল, "আমি মরব। সত্যি আমি মরব।"

দেবেন কহিল, "প্রিয়নাথ, তুই আরও মাটি করলি। এসময়ে আবার মদ দিতে গেলি কেন? এখন একটু তেঁতুল-গোলার জোগাড় দেখ্।"

দেবেন তাড়াতাড়ি এক গ্লাস জল লইয়া মণির মাথায় দিতে লাগিল। মণিশঙ্কর গর্জ্জন করিয়া বলিল, "কি ঠাণ্ডা করছিস, দেবেন? এ প্রাণ আর ঠাণ্ডা হবে না। যেদিন সর্ব্বার মুণ্ডু এই হাতে, আর কার্ত্তিকের মুণ্ডু এই হাতে ঝোলাতে পারব, সেদিন ঠাণ্ডা হব। নইলে বন্ধু, তোমরা বন্ধুহারা হবে!"

প্রিয়নাথ তেঁতুল-গোলা আনিবামাত্র দেবেন বলিল, "এই তেঁতুল-গোলাটুকু খাও।"

মণি কহিল, "কি এনেছ? তেঁতুল-গোলা! যদি এই বাটিতে করে ঐ পাপিষ্ঠদের গরম রক্ত আনতে পারতে, তাহলে তাই খেয়ে আমি ঠাণ্ডা হতুম! কি মিছে তেঁতুল-গোলা খাওয়াচ্ছ? রক্ত চাই—রক্ত চাই—রক্ত—রক্ত!"

দেবেন কহিল, "আমি এখনি তাদের রক্ত এনে দিচ্ছি। তুমি ততক্ষণ এইটে খাও—"

"তাদের মুণ্ডু—দু-দুটো মুণ্ডু—"

বলিল, "এই সার্‌লে! ওহে মণি, পালাও, কার্ত্তিক ক্ষেপেছে। আমার হাতে তবু রক্ষা আছে, ওর হাতে নেই।"

মণিশঙ্কর কার্ত্তিকচন্দ্রের মূর্ত্তি দেখিয়াই সসম্মানে পলায়নের পথ খোলসা কি না তাহাই দেখিতেছিল। ইত্যবসরে কার্ত্তিকচন্দ্র কূপ হইতে একঘড়া জল তুলিয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইল। মণিশঙ্করের অন্যান্য বন্ধুগণ পূর্ব্বেই পলাইয়াছিল, কিন্তু সে তখনও সাহসে ভর করিয়া দাঁড়াইয়াছিল। কার্ত্তিক আসিয়া যেমন তাহার গলায় হাত দিয়া এক ধাক্কায় তাহাকে মাটীতে ফেলিল, অমনি সে সর্ব্বানন্দকে ডাকিয়া কাতর কণ্ঠে বলিল, "সর্ব্ব ভাই, রক্ষে কর।" সর্ব্বানন্দ তখন কার্ত্তিককে টানিয়া বলিল, "আঃ, কি কর, কার্ত্তিক? দেখ্‌ছ না, বেচারা মদের ঝোঁকে এ কাজ করে ফেলেছে। যাও মণি, পালাও।"

মণিশঙ্কর তখন একেবারে তাঁহার "আড্ডা" পোড়া বাঙ্গলায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেইস্থানে তাঁহার যে কয়টী সঙ্গী যুদ্ধাভিযানে যাইতে সাহস করে নাই, তাহারা উপস্থিত ছিল। মণিশঙ্কর ফরাশের উপর গিয়া আছাড় খাইয়া বলিলেন, "ভাই দেবেন, ভাইরে, আমার বড় অপমান হয়েছে!"

"কি, কি, কি হ'ল?"

"উঃ, বড় অপমান! জ্বলে গেল, বুক জ্বলে গেল!"

একজন বন্ধু তাড়াতাড়ি এক গ্লাস ষ্টিমুলাণ্ট্‌ আনিয়া তাহার মুখের কাছে ধরিতেই, তৎক্ষণাৎ সে তাহা উদরসাৎ করিয়া বলিল, "উঃ, ভাইরে কি অপমান! আমার মূর্চ্ছা যাবার ইচ্ছে হচ্চে!" তাহার অবস্থা দেখিয়া একজন তাড়াতাড়ি তাঁহার মাতার নিকট সংবাদ দিতে ছুটিয়া গেল, এবং অন্যান্য সঙ্গিগণ পাখা লইয়া তাহাকে বাতাস করিতে লাগিল।

দেবেন জিজ্ঞাসা করিল, "কি হয়েছে, একটু ঠাণ্ডা হয়ে বল দেখি?"

মণিশঙ্কর কহিল, "প্রিয়নাথ, বাপ! আর এক গ্লাস দাও, ভাই!"

প্রিয়নাথ তাহার আজ্ঞা পালন করিলে মণিশঙ্কর উঠিয়া বসিয়া বলিতে আরম্ভ করিল, "কি হয়েছে? বরং বল কি হয়নি? সেই পাপিষ্ঠ পরান্ন-ভোজী কুকুরগুলোর ভয়ে আমায় পালিয়ে আস্‌তে হ'ল! সেই পাতচাটা হারামজাদা সর্ব্বা আর কার্ত্তিকে! সেই দুটো চ্যাংড়া আমায় লাথি মার্‌লে! এ প্রাণ আমি আর রাখ্‌ব না।"

দেবেন কহিল, "থাম, থাম, ও কি কর্‌ছ? গলা টিপ্‌ছ কেন?"

মণি কহিল, "আমি মর্‌ব। সত্যি আমি মর্‌ব।"

দেবেন কহিল, "প্রিয়নাথ, তুই আরও মাটি কর্‌লি। এসময়ে আবার মদ দিতে গেলি কেন? এখন একটু তেঁতুল-গোলার জোগাড় দেখ্‌।"

দেবেন তাড়াতাড়ি এক গ্লাস জল লইয়া মণির মাথায় দিতে লাগিল। মণিশঙ্কর গর্জ্জন করিয়া বলিল, "কি ঠাণ্ডা কর্‌ছিস, দেবেন? এ প্রাণ আর ঠাণ্ডা হবে না। যেদিন সর্ব্বার মুণ্ডু এই হাতে, আর কার্ত্তিকের মুণ্ডু এই হাতে ঝোলাতে পার্‌ব, সেদিন ঠাণ্ডা হব। নইলে বন্ধু, তোমরা বন্ধুহারা হবে।"

প্রিয়নাথ তেঁতুল-গোলা আনিবামাত্র দেবেন বলিল, "এই তেঁতুল-গোলাটুকু খাও।"

মণি কহিল, "কি এনেছ? তেঁতুল-গোলা! যদি এই বাটিতে করে ঐ পাপিষ্ঠদের গরম রক্ত আন্‌তে পার্‌তে, তাহলে তাই খেয়ে আমি ঠাণ্ডা হতুম! কি মিছে তেঁতুল-গোলা খাওয়াচ্ছ? রক্ত চাই—রক্ত চাই—রক্ত—রক্ত!"

দেবেন কহিল, "আমি এখনি তাদের রক্ত এনে দিচ্ছি। তুমি ততক্ষণ এইটে খাও—"

"তাদের মুণ্ডু—দু-দুটো মুণ্ডু—"

দেবেন কহিল, "আমি এখনি কেটে এনে দিচ্ছি। তুমি এটুকু খেয়ে ফেল দেখি।"

তাহাদের এইরূপ কথাবার্ত্তা চলিতেছে, এমন সময় নিস্তারিণী দেবী "ওরে মণিরে, বাপ্‌রে" বলিয়া সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন। তখন মাতৃ-ভক্ত সন্তান টলিতে টলিতে উঠিয়া মাতাকে ধরিয়া বলিল, "মা—গর্ভ-ধারিণী—জগৎজননী—"

বাকীটুকু আর শুনা গেল না। কারণ পুত্রের নিবিড় আলিঙ্গনে মাতা সপুত্র ভূমিসাৎ হইলেন।

১০

দেওয়ান দুর্গাশঙ্করের গর্ব্বোচ্চ শির নত হইয়া যাওয়ায় তিনি একেবারে মরমে মরিয়া গেলেন। এমন কি যাহারা তাঁহার কৃপাদৃষ্টির জন্য সতত সতৃষ্ণ নয়নে জোড়করে তাঁহার মুখপানে চাহিয়া থাকিত, তাহারাও আজ কাল তাঁহাকে কৃপাদৃষ্টিতে দেখিতে আরম্ভ করিয়াছে। কাছারির আমলা ফয়লা হইতে আরম্ভ করিয়া উমেদার পাইক এমন কি ঝাড়ুদার পর্য্যন্ত তাঁহাকে দেখিয়া লুকাইয়া হাসে। দেখিয়া শুনিয়া তিনি অবরুদ্ধ কণ্ঠে একদিন জমিদার মহাশয়কে বলিলেন, "আমার বয়স হয়েছে, এখন আর আমি পারি না, আমার কাছ থেকে সব বুঝে সুঝে নিয়ে আমায় ছুটী দাও।"

কালিকাবাবু গম্ভীরভাবে বলিলেন, "ছেলের দোষে নিজেকে দোষী করা নিজের উপর অন্যায় অত্যাচার! আপনি কেন ব্যস্ত হচ্চেন? মণিশঙ্করের জন্য আপনি কেন শাস্তি ভোগ করতে যাবেন? আপনি আমার পৈতৃক দেওয়ান, আপনাকে আমি এত সহজে ত্যাগ করতে পারি না।"

দুর্গাশঙ্কর কহিলেন, "না বাপু, এ আমারই পাপের শাস্তি। যেখানে আমি মাথা উঁচু করে সবার ওপর হুকুম চালিয়েছি, সেখানে মাথা নীচু করে কাজ কর্‌তে পার্‌ব না। তোমার এষ্টেট্ হ'তে আমি যা কিছু করেছি, তাতেই আমার বাকি কটা দিন বেশ চলে যাবে। আর কেন আমায় ধ'রে রাখ্‌ছ ?"

কালিকাবাবু বহু অনুনয়-বিনয় করিয়া কিছুতেই দেওয়ানজীকে রাখিতে পারিলেন না ; তবে দুর্গাশঙ্কর আরও কয়েক মাস থাকিয়া সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া দিতে স্বীকৃত হইলেন।

দেওয়ান মহাশয়ের কর্ম্মত্যাগের সংবাদ চতুর্দ্দিকে রাষ্ট্র হইয়া গেল। কেহ দুঃখিত হইল, কেহ মনে মনে খুবই সন্তুষ্ট হইল। কিন্তু ন্যায়রত্ন মহাশয় এই সংবাদে যৎপরোনাস্তি দুঃখবোধ করিলেন। পুত্রের পাপে পিতার শাস্তি-ভোগ তাঁহার নিকট বড়ই দুঃসহ বোধ হইল, তাই তিনি কার্ত্তিককে ডাকিয়া বলিলেন, "তোমাদের জন্যই দেওয়ানজী এরকম ক্ষতিগ্রস্ত হলেন। তোমরা যদি মণিশঙ্করের সেদিনকার ব্যাপার চতুর্দ্দিকে রাষ্ট্র করে না দিতে, তাহলে কখনই এ ব্যাপার ঘট্‌ত না। সেদিন থেকে মণি কোথায় নিরুদ্দেশ হয়েছে, দেওয়ান মহাশয়ের স্ত্রীও শুন্‌লাম, সেদিন থেকে শরীরে আঘাত পেয়ে অসুস্থ হয়েছেন, তার ওপর উনি আবার কাজ ছেড়ে দিচ্চেন। তোমাদের উচিত, ওঁর পায়ে ধ'রে যাতে উনি আবার কাজ নেন, তাই করা।"

কার্ত্তিকচন্দ্র আর দ্বিরুক্তি না করিয়া সময়-মত দেওয়ানজীর সঙ্গে দেখা করিল। দেওয়ানজী বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "কেন তোমরা বাপু আবার আমার পিছনে লাগ্‌লে ? কাজ করা না করা আমার ইচ্ছে। এতে পরের এত মাথা-ব্যথা কেন ?"

কার্ত্তিক কহিল, "আমাদের জন্য যদি আপনার ক্ষতি হয়ে থাকে,

বলুন, যেমন করে হোক, সে ক্ষতি পূরণ কর্‌বার চেষ্টা কর্‌ব। রামকে তীর মার্‌লে সে তীর যদি শ্যামকে লাগে, তাহলে যে তীর ছুড়েছিল, সকলে তাকেই দোষ দেবে। কি হ'লে আপনি সন্তুষ্ট হবেন, বলুন, আমার সাধ্যাতীত না হ'লে আমি তাই কর্‌ব।"

দুর্গাশঙ্কর গড়গড়ায় ভীষণভাবে দুইটা টান দিয়া বলিলেন, "বিপদে কোথায় সহানুভূতি পাব, না, এই রকম একটা চ্যাংড়ার কাছে অপমান হ'তে হচ্চে! যারা আমার সামনে মুখ তুলে কথা বল্‌তে সাহস করত না, তারা এখন বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে বল্‌ছে, সাহায্য কর্‌ব। ওঃ, এর চাইতে মরণ ছিল ভাল!"

কার্ত্তিক কহিল, "আপনার পা ছুঁয়ে বল্‌ছি, আমার কোন রকম অসদভিপ্রায় নেই। যে শপথ করতে বলেন, তাই ক'রে বল্‌ছি, যদি আমার দ্বারা কোন উপকার হয়, আমি তা করতে রাজী আছি।"

দুর্গাশঙ্কর কহিল, "কি, এতদূর স্পর্দ্ধা! আচ্ছা, দেখি টোলের ভাত খেয়ে তোমার মনটা কতখানি বড় হয়েছে! বাবুকে ব'লে ক'য়ে মণিশঙ্করের সঙ্গে শৈলজার বিয়ে দিয়ে দিতে পার?"

কার্ত্তিকচন্দ্র বিস্মিত হইয়া বলিল, "সে কি! তা আমি কেমন ক'রে পারব? শৈলজার বিয়ের ওপর আমার কি হাত? বাবু আমার কথা শুনবেন কেন? তবে আমায় যদি এ প্রস্তাব করতে বলেন, আমি আজই করব।"

"না, না, অতখানি দয়া তোমার করতে হবে না। তবে তুমি যদি ইচ্ছে কর, তা হ'লে তা হ'তে পারে।"

"কি ক'রে, বলুন। আমি তাই কর্‌ব।"

"তোমাদের এখানকার বাস তুল্‌তে হবে।"

কার্ত্তিক কিছুক্ষণ নীরবে চিন্তা করিয়া হাসিয়া বলিল, "আমরাই তা

হলে আপনার শত্রু ! বেশ, তাহ'লে বাবাকে একথা বলছি যে, আমরাই আপনার পথের কাঁটা ; কিন্তু বাবা এখান থেকে যাবেন কি না, সে কথা বলতে পারিনে। যদি একা আমি গেলে হয়, বলুন, আমি এখনই সরে পড়ছি। আর যখন ইংরিজিই পড়ছি, তখন এ বিদ্যার শেষ না দেখে আমি ছাড়ছি না। চার মাস পরেই আমাদের এন্ট্রান্স্ একজামিন, তারপর হয় কলকাতায়, নয় অন্য কোন জায়গায় আমায় যেতেই হবে। তখন অনায়াসেই আমি আপনার পথ থেকে দূর হব। এই চার মাস অপেক্ষা করতে পারবেন না ? এখন যেতে হ'লে, হয়ত বাবু আমায় যে-রকম ভালবাসেন, তাতে আপনার সুবিধে না হয়ে অসুবিধেই হ'তে পারে।"

দুর্গাশঙ্করের ক্রোধ ক্রমশঃ বিস্ময়ে পরিণত হইল। এই অষ্টাদশ বর্ষীয় বালকের এতখানি বুদ্ধি ! দুর্গাশঙ্করের মনে আবার আশা দেখা দিল। তিনি ভাবিলেন, ইহার বুদ্ধি যথেষ্ট বটে, কিন্তু বিষয়-বুদ্ধি কম, নহিলে নিজের ভবিষ্যৎকে কি কেহ এতখানি উপেক্ষা করিতে পারে ?

তাঁহাকে চিন্তা করিতে দেখিয়া কার্ত্তিকচন্দ্র হাসিয়া বলিল, "আপনার ভয় হচ্ছে যে, এত বড় লোভ আমি কি করে সংবরণ করব ? হয়ত পারব না ? কিন্তু ঠিক জানবেন যে আপনার কাছে যেটা খুব বড়, আমার কাছে হয়ত সেটা খুবই ছোট ! আপনি টাকা-কড়ি, ধন-দৌলতকে বড় ক'রে দেখতে শিখেছেন, আর আমি গরীব ব্রাহ্মণের ছেলে, নিজের মানটাকেই বড় ক'রে দেখতে শিখেছি। বাবু হয়ত আমাকে শিখিয়ে-পড়িয়ে তাঁর বিষয়-সম্পত্তির সঙ্গে শৈলজাকে আমার হাতেই সঁপে দেবেন, মনস্থ করেছেন। কিন্তু আমি জানি, ভিখিরীর ছেলে রাজপদ পেলেও সেই ভিখিরীই থাকে। আপনার মণি এই এত বড় লাখ-দেড় লাখের সম্পত্তি পেলেও সেই মণিই থাকবে। আমি দূর থেকে তাই দেখে

হাস্‌ব। কিন্তু বাবু আমায় ভালবাসেন, ঠিক জান্‌বেন, সে ভালবাসার অপমান আমি কখনও কর্‌ব না। আমি বড়ই হব, ছোট হব না। বাবা যদি এতদিন পর্য্যন্ত আমার ভার বহন কর্‌তে পেরে থাকেন, আরও কিছুদিন তিনি তা পার্‌বেন বোধ হয়।"

দুর্গাশঙ্কর তাড়াতাড়ি নিকটে আসিয়া বলিলেন, "বাবা, তোমায় আশীর্ব্বাদ করি, চিরদিন তুমি ব্রাহ্মণের ছেলেই থেকো। তোমায় কিছু কর্‌তে হবে না। কপালে থাকে, মণি বড় হবে, ভাল হবে, কিন্তু আমি তোমার কাছ থেকে এ বিষয়ে কোন সাহায্য নেব না। তুমি নিশ্চিন্ত মনে পড়াশুনা করগে। আমি অধম, তাই তোমায় সন্দেহ করেছিলাম।"

কার্ত্তিক কহিল, "কিন্তু আমি যখন বলেছি যে আপনার পথে দাঁড়াব না, তখন নিশ্চয়ই সরে যাব, কেউ আমায় নিবারণ কর্‌তে পার্‌বে না। তবু এও ব'লে রাখ্‌ছি, আপনার মণিকে বাবু যদি মেয়ে না দেন, তাহলে আমি আবার আস্‌ব। তখন যদি তিনি আমাকেই সমস্ত দেন, ত আমায় নিতেই হবে, কারণ তিনি আমায় ভালবাসেন। তবে ভয় নেই, এখন যদি তিনি প্রস্তাব করেন যে তোমায় শৈলজাকে বিয়ে কর্‌তে হবে, তাহলে আমি কিছুতেই তা কর্‌ব না। আপনি আপনার মণির জন্য যথেচ্ছা চেষ্টা করুন।"

কার্ত্তিকচন্দ্র আর দাঁড়াইল না, দেওয়ানজীকে প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল। দুর্গাশঙ্কর নীরবে গড়গড়া টানিতে লাগিলেন; কিছুক্ষণ পরে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "আমি যে বাপ, কি করি!"

১১

প্রবেশিকা পরীক্ষার ফল বাহির হওয়ার কিছুদিন পরে দেখা গেল, কার্ত্তিকচন্দ্র কুড়ি টাকার বৃত্তি পাইয়াছে। সর্ব্বানন্দ পাশ হইয়াছে মাত্র।

এই দুই সংবাদে সকলেই সন্তুষ্ট হইল বটে, কিন্তু কার্ত্তিকচন্দ্র অত্যন্ত দুঃখিত হইল। তাহার পিতা যখন প্রস্তাব করিলেন, সে ঐ স্কলারশিপের টাকায় কলিকাতা বা অন্য কোন স্থলে পড়িতে যাইতে পারে, তখন সে বলিল, "সর্ব্ব-দার কি হবে ?"

পিতা বলিলেন, "যিনি এতকাল ওর খরচ বহন করে আস্‌ছেন, তিনি যদি এখন অস্বীকৃত হন, তাহলে নিরুপায় !"

"তাঁর কাছে এখন এ প্রস্তাব করে কে ?"

"ইতিপূর্ব্বে যে করেছিল, সেই কর্‌বে।"

"কোন কারণবশতঃ আমি আর সে প্রস্তাব কর্‌তে পার্‌ব না।"

"কি কারণ ?"

কার্ত্তিকচন্দ্র কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিল, "আপনার কাছে গোপন করা উচিত নয়। দেওয়ানজীর সঙ্গে আমার পূর্ব্বে যে কথাবার্ত্তা হয়েছিল তা থেকে এখন স্পষ্ট বুঝ্‌তে পেরেছি, কেন বাবু আমায় এত স্নেহের চক্ষে দেখেন। বাবু তাঁর মেয়ের সঙ্গে আমার বিয়ে দেবার ইচ্ছা করেছেন। এখন সেকথা জেনে-শুনে তাঁর উপর জোর-জুলুম আর আমি কর্‌তে পারিনে। যদিও আপনিই এতদিন আমাদের খরচ-পত্র চালিয়েছেন, কিন্তু অন্য জায়গায় পড়্‌বার খরচ চালানো আপনার পক্ষে অসম্ভব। অতএব এ অবস্থায় আমি ত কোন উপায় দেখ্‌তে পাচ্ছি না। এখন জেনে-শুনেও যদি অজ্ঞের ভাব দেখিয়ে আমি তাঁকে গিয়ে বলি যে সর্ব্ব-দার খরচ আপনাকে দিতে হবে, তাহলে সেটা মিথ্যে কথা বলার মতই হবে। এক উপায়, যদি সর্ব্ব-দা গিয়ে বলে। কিন্তু—"

শিবচন্দ্র কহিলেন, "কালিকা বাবু কত লোকের ছেলে-পুলের খরচ-পত্র দিচ্ছেন, সর্ব্বানন্দর মত গরীব ব্রাহ্মণের ছেলের খরচ দিতেও কুণ্ঠিত হবেন না। কিন্তু তোমার সঙ্গে যে তিনি মেয়ের বিয়ে দেবেন, এ সংবাদ

ত আমিও জান্‌তাম না। আমি মনে কর্‌তাম, তিনি যেমন সকলকেই দয়া করেন, তোমাকেও তেমনি। তবে তোমায় যে অত্যন্ত স্নেহ করেন, এটা আমি খুবই জানি! কিন্তু এর মধ্যে যে ঐ রকম ভাব লুকানো ছিল, তা ত কৈ ঘুণাক্ষরেও টের পাইনি। ছি ছি, কি লজ্জা! এখন ত সকলেই মনে কর্‌বে যে, আমি টাকার লোভে ছেলে বিক্রী করেছি। কার্ত্তিক, আর তোমার ইংরিজি লেখাপড়ার প্রয়োজন নেই।"

"আমার লেখা-পড়ায় ত এতদিন কোনরকম আর্থিক সাহায্য বাবু করেন নি, আজও কর্‌তে হবে না, কারণ আমি যা স্কলার্‌শিপ্‌ পেয়েছি, তাতেই আমার চল্‌বে।"

"আর্থিক সাহায্য পাও নি, তাই বা কেমন ক'রে বল্‌ব! হেড মাষ্টার মশায় নিজে তোমায় পড়াতেন। তোমাদের যখন যে বইয়ের দরকার, বাবুর লাইব্রেরী থেকে তখনই তা পেয়েছ। স্কুল-পাঠ্য পুস্তক কিছু লাইব্রেরীতে থাকে না, তবু তোমরা দুজনেই তা পেয়েছ। এখন ত সবাই বুঝ্‌তে পার্‌বে যে, কেন ওখানে তোমার এত প্রতিপত্তি! না, না, কার্ত্তিক তুমি ইংরিজি পড়ার আশা ছেড়ে দাও।"

"আমি না হয় ছেড়ে দিলুম, কিন্তু সর্ব্ব দাদাকে তাহলে গাছে চড়িয়ে মৈ কেড়ে নেওয়া হবে!"

"তার উপায় আমি কি কর্‌ব? সর্ব্বানন্দকে বল, সে নিজে গিয়ে বাবুকে ব'লে-ক'য়ে যা হয় করুক। আমরা আর তার কোন সাহায্য কর্‌তে পার্‌ব না!"

"বাবা, আপনি ব্যস্ত হচ্চেন, কেন? আমাদের কার্য্যোদ্ধার নিয়ে কথা! আমি নিজে বিবাহ না কর্‌লে ত আর তাঁরা জোর ক'রে আমার বিয়ে দিতে পার্‌বেন না।"

"কি! তুমি আমায় এত নীচ মনে কর যে এতদিন এত উপকার

নিয়ে আজ ঐ রকম মিথ্যাচারের দ্বারা তাঁর প্রত্যুপকার কর্ব? এতদিন অজ্ঞানে যা করেছি,—করেছি; আর তা কিছুতেই পার্ব না। তুমি আর পড়্তে পাবে না, আমার পৈতৃক যা আছে, তাই নিয়ে তোমায় সন্তুষ্ট থাক্তে হবে।"

"বাবা, আপনি এ রকম ব্যস্ত হ'লে আপনার পৈতৃক সম্পত্তিই বা রাখ্বেন কি ক'রে?"

"না পারি, ব্রাহ্মণের ছেলে, ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন কর্লে কেউ দোষ দিতে পার্বে না। তবু এ কথা ত কেউ বল্তে পার্বে না যে, হরচন্দ্র সার্ব্বভৌমের সন্তান পুত্র বিক্রয় করেছে।"

"আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, বাবা, আপনার যাতে কোনরকম অসম্মান হয়, তা কর্তে দেব না। কিন্তু বিপদকে আগে থেকে ডেকে আনা কোনরকমেই উচিত হবে না। একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, সর্ব্ব-দাদার যদি কোন উপকার কর্তে পারি, কর্ব কি?"

"আমাদের উঁচু মাথা নীচু না ক'রে যদি পার, তাহলে কর। কিন্তু সাবধান, কালিকা বাবুর মত উদার-হৃদয় ব্যক্তির সঙ্গে কোনরকম চালাকি কর্তে পাবে না। সব কথা স্পষ্ট বলার পরও তিনি যদি তোমার আর সর্ব্বানন্দর উপকার কর্তে রাজি হন, তাহলে তা তুমি কর্তে পার।"

"বেশ, সেই কথাই স্থির।"

কার্ত্তিকচন্দ্র পিতার নিকট হইতে চলিয়া গিয়া সর্ব্বানন্দকে সকল কথা খুলিয়া বলিল। সর্ব্বানন্দ ম্লান মুখে বলিল, "কাজ কি ভাই, আমার ইংরিজি পড়ায়? ইংরিজি পড়ে বড় জোর কেরাণী হব। গরিব ব্রাহ্মণের ছেলের ভাগ্যে সেই দাস্য বৃত্তি ছাড়া যখন আর কিছুই জুট্বে না, তখন যা দু'দশ বিঘে জমি শিষ্যসেবক আছে, তাই নিয়ে দুঃখে-কষ্টে জীবন কাটানো মন্দ কি!"

কার্ত্তিক কহিল, "তুমি যদি এম্, এ, পাশ কর্‌তে পার, তাহলে প্রোফেসর হতে পার্‌বে, অন্য কোনরকম বড় কাজও মিল্‌তে পারে। সেই জন্যেই বল্‌ছি, তুমি এ সুবিধা ছেড়ো না। চল, গিয়ে বাবুকে সব কথা বলি।"

সর্ব্বানন্দ কহিল, "এতদিন তোমার স্কন্ধে ভর ক'রে চালিয়েছি, আর আমার তা ইচ্ছে নয়।"

কার্ত্তিক কহিল, "কেন?"

সর্ব্বানন্দ কহিল, "আমি তোমায় সে কথা আর বল্‌তে পার্‌ব না, কার্ত্তিক! আমায় ক্ষমা কর ভাই, আমায় ছেড়ে দাও। আমার ভাগ্যে যা আছে, তাই হোক।"

কার্ত্তিক কিছুক্ষণ সর্ব্বানন্দর মুখের পানে চাহিয়া রহিল। সর্ব্বানন্দ সহসা অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া বলিল, "কার্ত্তিক, মানুষকে বেশী ভালবাস্‌তে নেই, বেশী বিশ্বাসও কর্‌তে নেই। আমি তোমার কাছে একটা কথা এতদিন গোপন করেছি ব'লে লজ্জায় আমার মরে যেতে ইচ্ছে হচ্ছে। তুমি তোমার অকৃতজ্ঞ বন্ধুকে ত্যাগ কর।"

কার্ত্তিক কহিল, "তোমায় সব কথা খুলে বল্‌তেই হবে। কি হয়েছে বল,—হয়তো আমা হ'তে তোমার উপকার হ'তে পারে।"

"তা জানি, তুমি তা পার ব'লেই তোমায় তা বল্‌ব না। তোমার দ্বারা এ উপকার আমি নেব না।"

"নিতেই হবে, বল, নইলে জান আমাকে?"

সর্ব্বানন্দ কাতর হইয়া বলিল, "কার্ত্তিক, ভাই, তোর পায়ে পড়ি, তুই আমায় এত ভালবাসিস্ নে, আমি তোর এতখানি ভালবাসার মোটেই উপযুক্ত নই।"

কার্ত্তিক কহিল, "তুমি ভালবাসার উপযুক্ত কি না, সে বিচার আমি

কর্‌ব। এখন তুমি যে আমায় ভালবাস, তার পরিচয় দাও। বল, কি হয়েছে ?"

সর্ব্বানন্দ ছল ছল নেত্রে বলিল, "আমায় যদি মেরে ফেল্‌তে পারিস্, তা হ'লে বল্‌তে পারি।"

কার্ত্তিক কহিল, "তাহলে বল্‌বে না ?"

"কিছুতেই না।"

কার্ত্তিক কহিল, "সর্ব্ব-দা, তাহ'লে ব'লে রাখ্‌ছি, আর তুমি আমায় দেখ্‌তে পাবে না। এ জন্মে এই পর্য্যন্ত।"

কার্ত্তিকচন্দ্র চলিয়া যায় দেখিয়া সর্ব্বানন্দ তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল, "কার্ত্তিক, আমায় দয়া কর। তুমি মুখ ফিরিও না। তুমি যদি মুখ ফেরাও, তা হ'লে ভগবান্ মুখ ফিরুবেন। দয়া কর, ভাই !"

কার্ত্তিক কহিল, "তুমি কৈ আমায় দয়া কর্‌লে ? তুমি যে দয়া আমায় কর্‌তে পার না, আমিও তোমায় সে দয়া কর্‌তে পারি না।"

সর্ব্বানন্দ সত্যসত্যই কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিল, "কার্ত্তিক, শোন, যদি তোমায় এ কথা বলি, তা হ'লে এই মুহূর্ত্তে তুমি সে কাজ কর্‌তে যাবে। অথচ তাতে ফল হবে এই যে তোমাদেরও ক্ষতি হবে—আর আমার ? ন্যাংটার আবার গাঁটকাটার ভয় ? আমি যে সর্ব্ব সেই সর্ব্বই থাক্‌ব।"

কার্ত্তিক কহিল, "তোমার কোন কথা শুন্‌তে চাইনে। হয় সব কথা খুলে আমায় বল, নয় আমার আশা ত্যাগ কর।"

সর্ব্বানন্দ তখন নিতান্তই নিরুপায় হইয়া কার্ত্তিককে বলিল, "ঐ দরজাটা তাহ'লে বন্ধ ক'রে দাও।" দরজা বন্ধ করিয়া দুই বন্ধুতে যে কথা হইল, তাহাতে কার্ত্তিকচন্দ্র অত্যন্ত বিষণ্ন হইয়া গেল। কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া সে বলিল, "যাই হোক, আমিও যা তুমিও তাই। আমি গরীবের

ছেলে, তুমিও গরীবের ছেলে। কালিকাবাবু আমাকে যদি মেয়ে দিতে উদ্যত হ'য়ে থাকেন, তোমাকেই বা তিনি না দিতে পার্‌বেন কেন ?"

"তোমাকে যে বাবু কতখানি ভালবাসেন, তা তুমি জান না, তাই এ কথা বল্‌ছ। তার উপর শৈল ?"

"শৈল ছেলেমানুষ, ওর কথা ছেড়ে দাও। যার সঙ্গে বিয়ে হবে, তাকেই ওর ভালবাস্‌তে হবে। ওর কথা ধর্ত্তব্যই নয়।"

"কি ভয়ঙ্কর! যার বিয়ে হবে, তার কথাই ধর্ত্তব্য নয়! শৈল আর ছেলে মানুষটি নেই। এখন ওর মুখ-চোখ দিয়ে ওর মনের কথা প্রকাশ হ'য়ে পড়্‌ছে। তুমি অন্ধ, তাই কিছু দেখ্‌তে পাওনি। আমি আজ কতদিন লক্ষ্য ক'রে আসছি, তোমাকে দেখ্‌লে ওর সমস্ত মুখখানির ওপর দিয়ে—"

কার্ত্তিক বাধা দিয়া কহিল, 'থাম, থাম, তুমিও কি মণিশঙ্কর হ'য়ে উঠ্‌লে না কি ? কি বল তার ঠিক নেই! আমার মত হোঁৎকারামকে যদি তুমি সাম্‌নে থাক্‌তেও শৈল পছন্দ ক'রে থাকে, তাহ'লে ওর ভাগ্যে অশেষ দুর্গতি আছে। যাক্‌, তোমার আমার মধ্যে মেঘ কেটে গেল! এই সামান্য কথা তুমি যখন আমায় বল্‌ছিলে না, তখন বুঝ্‌ছি তোমার যথেষ্ট পাপ সঞ্চয় হয়েছে। সেই পাপের শাস্তির জন্য তোমাকে আমার সঙ্গে কলকাতায়, কিম্বা যেখানেই যাই পড়্‌তে যেতে হবে। আর তোমার সঙ্গে যেমন ক'রে পারি, শৈলজার বিয়ে আমি দেওয়াব। এতে যত চালাকি খাটাতে হয়, খাটাব।"

সর্ব্বানন্দ ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, "কি! তুমি নিজের নাম ক'রে টাকা নিয়ে আমার পড়ার সাহায্য কর্‌বে ? আর মনে করেছ, সেই টাকা আমি নেব ?"

কার্ত্তিক কহিল, "আরে থাম না, তুমি বাবুকে একটুও চেন নি।

আমি না চাইলেও তিনি তোমায় সাহায্য কর্‌বেন। এখনও ত কোন কথা হয়নি। সবই যখন উড়ো-ভাসার ওপর চল্‌ছে, তখন তাই চলুক্‌ না!”

“না, আর তা হ’তে পারে না। তুমি না চাইলেও তোমারই জন্য তিনি আমায় সাহায্য কর্‌বেন।”

কার্ত্তিক কহিল, “দেখ সর্ব্ব-দা, বাবুর এতখানি অপমান করো না, বল্‌ছি, তাহলে তোমার পাপ হবে। বাবু এতদিন আমার জন্য তোমায় সাহায্য করেন নি, এ তোমায় ব’লে রাখ্‌ছি। তার প্রমাণ চাও, আজ আমার সঙ্গে যেয়ো, দেখ্‌তে পাবে।”

সর্ব্বানন্দ কহিল, “তা যদি প্রমাণ কর্‌তে পার, তা হ’লে তোমার সঙ্গে যেখানে যেতে বল, রাজি আছি।”

কার্ত্তিক কহিল, “যেতে রাজি না হ’লেই বা তোমায় ছাড়্‌ত কে? আমি যা মতলব করেছি, তার জন্য তোমায় সরিয়ে দিতুম্‌ই। আমি আজ পাঁচ মাস আগে দেওয়ানজীর কাছে প্রতিজ্ঞা ক’রে এসেছি, তাঁর মণির জন্য পথ খোলসা ক’রে দেব, সে কথা ত তোমার মনে আছে?”

সর্ব্বানন্দ কহিল, “ছি ছি, কার্ত্তিক, শৈলর সঙ্গে ঐ জানোয়ারটার নাম এক সঙ্গে কর্‌তে তোমার বাধে না?”

কার্ত্তিক কহিল, “আচ্ছা সর্ব্ব-দা, জিজ্ঞাসা করি, মানুষ ত মানুষই! আত্মায় ত সবাই এক! তাহ’লে একজনের নাম কর্‌লেই বা তোমাদের মুখে জল আসে কেন, আর একজনের নামেই বা খড়্গহস্ত হ’য়ে ওঠ কেন? মানুষ মানুষই, অবস্থা শিক্ষা ইত্যাদির গুণে নানা রকম হয়। কে জানে? কে জোর ক’রে বল্‌তে পারে যে আমরাই খুব উচু জীব, আর মণিশঙ্কর খুব নীচু। শ্রীমতী শৈলজাসুন্দরী তাঁর নিজের ত্রিশ হাজার আর তাঁর বাপের দেড় লাখ টাকার সম্পত্তির দরুণই বা এত প্রার্থনীয় বস্তু হ’য়ে

উঠ্লেন কেন? আর সর্ব্বানন্দ শর্ম্মার চল্লিশ বিঘে ব্রহ্মোত্তর মাত্র সম্বল হওয়াতে তিনিই বা এত হেয় হলেন কেন? সমস্ত জগতের উপর যদি কারও আধিপত্য থাকে ত সেই রাজরাজেশ্বরের অফুরন্ত ধন-দৌলতের কাছে তোমার মাসিক পাঁচ টাকাই বা কি, আর মহারাজাধিরাজের লাখ লাখ টাকাই বা কি! One divided by infinity'ও যা, আর one million divided by infinity'ও তাই।"

সর্ব্বানন্দ কার্ত্তিকের যুক্তি শুনিয়া হাস্য সংবরণ করিতে পারিল না। তাহাকে হাসিতে দেখিয়া কার্ত্তিক বলিল, "ঐ হাসিটেই হচ্ছে একমাত্র দামী জিনিষ। সংসারের দু'এক টুকরো মাটি, কাঠ, জল-বাতাসের জন্য কামড়া-কামড়ি দেখে যে হাস্‌তে পারে, সেই ঠিক বস্তু লাভ করেছে। অন্য সবাই গড্ডলিকা-প্রবাহের দলে প'ড়ে ভেসে যাক্, আর আমরা দুজনে কেবল হাসি এস।"

১২

সন্ধ্যার সময় লাইব্রেরীর সম্মুখস্থ উদ্যানে একটা বেদীর উপর বসিয়া কালিকাবাবু তাম্রকূট সেবন করিতেছিলেন। এমন সময় কার্ত্তিক ও সর্ব্বানন্দ আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইল। কালিকাবাবু হাসিয়া বলিলেন, "আমি আগেই সংবাদ পেয়েছি। কিন্তু দুপুর বেলায় তোমরা আসনি কেন?"

কার্ত্তিক কহিল, "বাবার সঙ্গে একটা পরামর্শে আমরা ব্যস্ত ছিলুম, তাই আস্‌তে পারি নি।"

কালিকাবাবু কহিলেন, "তাঁর সঙ্গে আমারও যে একটা কথা আছে— তিনি এখনও আস্‌ছেন না কেন? ওরে রামচরণ, বিষণকে ডাক্ ত।"

কার্ত্তিক কহিল, "বাবা আস্‌বার আগে আমাদের দুটো কথা আছে—"

কালিকাবাবু কহিলেন, "তাই না কি? বসো, বসো, ঐ বেঞ্চে বসো।"

কার্ত্তিক আসন গ্রহণ করিয়া বলিল, "আমার কথা এই যে আমার কলেজে পড়্‌তে যাওয়ায় একটু গোলমাল উপস্থিত হয়েছে। কি গোলমাল, বাবা তা নিজে বল্‌বেন। সেই গোলমালের দরুণ হয়তো আমার ইংরিজি পড়া আর নাও হ'তে পারে। কিন্তু—সর্ব্বদা তাহ'লে কি কর্‌বে?"

কালিকাবাবু বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "তুমি কুড়ি টাকা স্কলারশিপ্ পেয়েছ, তবু তোমার পড়ার গোলমাল হবে? আশ্চর্য্য! তোমার বাবাকে আবার নতুন ক'রে সেই সব পুরোনো কথা বোঝাতে হবে না কি?"

কার্ত্তিক কহিল, "কোন একটা নতুন কারণ ঘটায় তিনি আমাকে আর ইংরিজি পড়াতে অনিচ্ছুক। কি কারণ তিনিই তা বল্‌বেন। এখন সর্ব্ব-দা'র কি হবে, তাই জান্‌তে চাচ্ছি।"

কালিকাবাবু কহিলেন, "ওর যদি সে রকম কোন কারণ না ঘ'টে থাকে, তাহ'লে ওর পড়াশোনার কোন রকম বাধা ত দেখ্‌তে পাচ্ছি না। এতদিন ওর খরচ দিতে যদি এ এষ্টেটের না আট্‌কে থাকে, তাহ'লে এখনও আট্‌কাবে না। তোমার বাপ যদি তোমার মঙ্গল না চান, তা ব'লে সর্ব্বানন্দ কেন নিজের ভবিষ্যৎ নষ্ট কর্‌বে? সর্ব্বানন্দ, তুমি কি বল্‌তে চাও?"

সর্ব্বানন্দ কহিল, "আজ্ঞে, আমার আর কিছুই বক্তব্য নেই, তবে কার্ত্তিক জোর ক'রে আমায় ইংরিজি পড়া ধরিয়েছে। এখন ওই যদি ছেড়ে দেয়, তাহ'লে আমারই বা এত প্রয়োজন কি! আমি যে বরাবর সমস্ত একজামিনই পাশ কর্‌তে পার্‌ব, তারও কিছু ঠিক নেই।"

কালিকাবাবু কহিলেন, "তাই ব'লে কেউ চুপ ক'রে থাক্‌তে পারে না। যখন তোমার এতখানি সুবিধে ক'রে দিতে আমরা সম্মত হচ্ছি, তখন তুমিই বা সে সুবিধে ছেড়ে দেবে কেন? হয় ত যদি ভাল ক'রে বরাবর পাশ ক'রে যেতে পার, তা হ'লে পরে গভর্ণমেণ্ট সার্ভিসে কোন ভাল পোষ্ট পাওয়াও তোমার পক্ষে কঠিন না হ'তে পারে।"

সর্ব্বানন্দ কহিল, "কিন্তু কার্ত্তিক যদি যেতে না চায়—"

কালিকাবাবু কহিলেন, "বাপু, অতখানি সেন্টিমেণ্টাল্ হ'লে সংসার চলে না। আমি মান্‌লাম, তোমাদের দুটিতে খুব ভাব। তাই ব'লে একজন যদি নিজের ভাল-মন্দ না বোঝে, তাই ব'লে যে অপরকেও বিবেচনা-শক্তি ত্যাগ কর্‌তে হবে, এর কোন অর্থ নেই। তোমার যদি আর কোন আপত্তি না থাকে, তা হ'লে প্রস্তুত হওগে। তোমার যা কিছু খরচ-পত্র হবে, আমি তা বহন কর্‌ব। কার্ত্তিক, তোমার আর কিছু বল্‌বার আছে?"

কার্ত্তিক কহিল, "আর যা আছে, তা বাবাই বল্‌বেন। তবে আমার কিন্তু সর্ব্ব-দা'র সঙ্গ ছাড়্‌তে ইচ্ছে হচ্ছে না। আপনি বাবাকে বুঝিয়ে যদি রাজি করাতে পারেন, তা হ'লে আমিও যাব।"

কালিকাবাবু কহিলেন, "বাবা কার্ত্তিক, তোমার কিসে ভাল হবে, সে কি আমি বুঝিনে? তুমি জান না—"

কার্ত্তিক কহিল, "আপনার পায়ে পড়ি, আপনি আমার ওপর রাগ কর্ব্বেন না। আপনার দয়া যদি আমি এ জীবনে ভুলি, তাহ'লে আমার সমস্ত জীবনই একটা অভিশাপ ব'লে জ্ঞান কর্‌ব। যেন চিরদিন আপনার আশীর্ব্বাদের উপযুক্ত থাক্‌তে পারি, আমায় এই আশীর্ব্বাদ কর্‌বেন।"

কালিকাবাবু কহিলেন, "আমার ভালবাসাটা সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ নয়, পরে জান্‌তে পার্‌বে। এখন যাও, তোমার বাবাকে পাঠিয়ে দাওগে।"

কার্ত্তিক কহিল, "আমরা গিয়ে তাঁকে পাঠিয়ে দিচ্ছি।"

কার্ত্তিক ও সর্ব্বানন্দ তাঁহাকে প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল এবং কিছুক্ষণ পরে শিবচন্দ্র ন্যায়রত্ন আসিয়া তাহাদের স্থান অধিকার করিলেন। কালিকাবাবু জ্যোৎস্নাবিধৌত একটী কামিনী বৃক্ষের দিকে চাহিয়াছিলেন। তাঁহাকে অন্যমনস্ক দেখিয়া ন্যায়রত্ন মহাশয় বলিলেন, "আপনি আমায় ডেকেছিলেন ?"

কালিকাবাবু চমকিত হইয়া বলিলেন, "এই যে আপনি এসেছেন। আজ এত দেরী হ'ল যে ?"

শিবচন্দ্র কহিলেন, "কার্ত্তিক আমাকে বলেছিল, আজ একটু পরে যাবেন, আমার একটা কথা আছে, বাবুর সঙ্গে ; তাই সে চ'লে গেলে, আস্‌ছি।"

কালিকাবাবু কহিলেন, "আপনি না কি কার্ত্তিককে আর পড়াশুনা কর্‌তে দেবেন না ?"

শিবচন্দ্র কহিলেন, "পড়াশুনা কর্‌তে দেব না, এ কথা বলিনি ; তবে অন্য কোথাও গিয়ে ওর পড়াশুনার আর প্রয়োজন নেই।"

কালিকাবাবু কহিলেন, "কেন এ-রকম ইচ্ছা হ'ল ?"

শিবচন্দ্র কিছুক্ষণ নীরবে চিন্তা করিলেন ; তারপর পদতলস্থ চটী জুতার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া বলিলেন, "আজ এমন একটা কথা শুনেছি, যাতে আপনার দয়ার ওপর নির্ভর ক'রে তাকে বিদেশে বিদ্যার্জ্জনের জন্য পাঠাতে আমার ইচ্ছা চ'লে গিয়েছে।"

কালিকাবাবু কহিলেন, "কি কথা আর কার কাছেই বা তা শুন্‌লেন, শুনি।"

শিবচন্দ্র কহিলেন, "কথাটা শুনেছি, কার্ত্তিকের কাছে, তবে সে কার কাছে শুনেছে, সে কথা বল্‌তে পার্‌ব না। কারণ তাতে সে ব্যক্তির

হয়ত অনিষ্ট হ'তে পারে। তবে কি কথা, তা যদি শুনতে চান ত বলতে পারি। কিন্তু পরের মুখে শোনা কথা, আপনাকে বলতে সঙ্কোচ বোধ হচ্ছে।"

কালিকাবাবু কহিলেন, "সঙ্কোচ বোধ হয় ত' ব'লে কাজ নেই, কিন্তু আমার বক্তব্য যা আছে, তা ব'লে নি। কার্ত্তিকের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আপনি যতখানি চিন্তিত, আমাকেও ততখানি জানবেন।"

শিবচন্দ্র কহিলেন, "আজ্ঞে, সে কথা অবিশ্বাস করবার তাহ'লে আর কিছুমাত্র কারণ নেই। আপনি যে কার্ত্তিককে নিজের সন্তানের মত দেখেন এ কথা আপনার অতি-বড় শত্রুতেও বলবে। কিন্তু যদি বুঝতে পারি যে একমাত্র স্নেহ হ'তেই আমি যে কথা শুনেছি, সেই কথা উঠেছে, তাহ'লে সমস্ত দ্বিধা ত্যাগ ক'রে কালই আমি কার্ত্তিককে কলেজে পড়তে পাঠিয়ে দেব।"

কালিকাবাবু ক্ষুব্ধভাবে বলিলেন, "আর যদি এই অতিস্নেহের অন্য কোন গূঢ় কারণ থাকে, তাহ'লে আপনি ওকে আমার কাছ থেকে কেড়ে নেবেন? আপনার ছেলেকে যদি কেউ একটু বেশী ভালবাসে, —তা সে ভালবাসা যে কারণেই হোক—সেটা আপনার কাছে মস্ত অপরাধ ব'লে গণ্য হবে?"

শিবচন্দ্র ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, "আপনি যদি এতখানি ক্ষুণ্ণ হন, তা হ'লে এ বিষয়ে আলোচনা ত্যাগ করতে বাধ্য হব, কারণ আপনার দয়ার উপর, স্নেহের উপর, নির্ভর ক'রেই আমাদের এখানে বাস করা। আপনি দুঃখিত হ'লে আমাদের—"

কালিকাবাবু কহিলেন, "আপনি ব্যস্ত হবেন না। ক্ষুণ্ণই হই, আর রাগই করি, আমাদের পূর্ব্বপুরুষের কীর্ত্তি লোপ ক'রে আপনার মত ব্যক্তিকে পরিত্যাগ করব, এতখানি নীচ আমি নই। তবে কার্ত্তিককে

আমার বিশেষ প্রয়োজন আছে, ন্যায়রত্ন মশায়। বহুদিনের একটা আশা তিলে তিলে সঞ্চিত হ'য়ে এখন পর্ব্বতাকার ধারণ করেছে। এখন যদি আপনি নিষ্ঠুরের মত সে আশাকে ধূলিসাৎ করেন তাহ'লে সে দুঃখ রাখ্‌বার আমার আর স্থান থাক্‌বে না। ন্যায়রত্ন মশায়, এত দিন একথা প্রকাশ ক'রে বলিনি, তার কারণ, কি জানি, যদি এ সংবাদ শুনে কার্ত্তিকের কোন অনিষ্ট হয় বা আপনি প্রথমেই তাতে বাধা দেন। আপনার মধ্যে যে একটা ব্রাহ্মণোচিত গর্ব্বিত ভাব আছে, তার প্রমাণ আমি বহুদিন পূর্ব্বেই পেয়েছিলাম, সেইজন্যই সাহস ক'রে এ বিষয়ে কোন কথা বল্‌তে পারিনি। আমার চিরকালের ইচ্ছা যে যদি কার্ত্তিককে নাও পাই, তবুও তাকে বড় হ'তে মহৎ হ'তে আমি সাহায্য করব। কিন্তু সেই সঙ্গে আমার যে আশা ছিল, সেটাও তত বড় হ'য়ে উঠে এখন আমার সমস্ত কায়মনোবাক্যের একমাত্র চেষ্টা হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। আপনি যদি আমার সে বাসনা পূর্ণ না করেন, তাহ'লে—"

শিবচন্দ্র কহিলেন, "কি বাসনা, স্পষ্ট খুলে বলুন! কার্ত্তিককে আপনার কি প্রয়োজন!"

কালিকাবাবু কহিলেন, "এ জীবনের শেষ বাসনা পূর্ণ কর্‌ব, আমার শৈলজাকে তার হাতে সমর্পণ ক'রে নিশ্চিন্ত হব। ন্যায়রত্ন মশায়, আমায় আপনি দয়া করুন, এ ইচ্ছায় বাধা দেবেন না। তবে আপনাকে প্রতিজ্ঞা ক'রে বল্‌ছি যে কার্ত্তিককে সর্ব্ব বিষয়ে স্বাধীন ক'রে দিয়ে, শৈলজা আর তার মধ্যে যেন কোন রকম অসাম্য না থাকে, তাই ক'রে দিয়ে তবে আমার কাজ শেষ হবে।"

শিবচন্দ্র কহিলেন, "বুঝ্‌তে পার্‌লাম না, শৈলজার যাই করুন, তবু সে আপনার কন্যাই থাক্‌বে, আর কার্ত্তিকের যাই করুন, তবু সে দরিদ্র ব্রাহ্মণের ছেলেই থাক্‌বে। তাকে যদি আপনার সমস্ত সম্পত্তির উপর

বসিয়ে দেন, তবু সে জান্‌বে যে সে সমস্তই তার পাওয়া জিনিষ, এবং সে পরের গচ্ছিত সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়ক মাত্র। যেমনই করুন, আপনার শৈলজার সঙ্গে আমার পুত্রের যে আন্তরিক প্রভেদ, চিরদিন তা থেকেই যাবে। এমন স্থলে বিবাহ দিলে বিবাহের যা ফল তা মিল্‌বে কি না সন্দেহ। সেই জন্যই জিজ্ঞাসা কর্‌ছি, আপনি কি সাহসে এক ভিখারীর সন্তানের সঙ্গে আপনার কন্যার বিবাহ দিতে সাহস কর্‌ছেন? আমার কি সাধ্য যে আপনার মত ধনী ব্যক্তির সঙ্গে সমানভাবে কুটুম্বিতা রক্ষা ক'রে চলি!"

কালিকাবাবু কহিলেন, "একমাত্র টাকাতেই যে মানুষ বড় হয়, এ কথা আপনার মুখে শুনে আশ্চর্য্য হচ্চি। আপনাকে যদি আমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ না মনে কর্‌ব, তাহ'লে আপনার সঙ্গে কুটুম্বিতা স্থাপনের জন্য এত ব্যস্ত হব কেন? আমার শৈলজার ত' সম্বন্ধের অভাব ছিল না, বড় বড় লোকের বাড়ী থেকেও সম্বন্ধ এসেছে, আর আমি ইচ্ছা কর্‌লে যে কোন দরিদ্র সৎকুলীনের সন্তানকে এনে ঘরজামাই ক'রে রাখ্‌তে পারি। ও দুটোর একটা ইচ্ছেও আমার নেই। আমি চাই ব্রাহ্মণের সন্তান, আমি চাই যার আত্মসম্মান-জ্ঞান আছে, সেইরকম মানুষ, পুরোপুরি মানুষ। কলের পুতুল বা খেঁকী কুকুরের যদি দরকার হ'ত তাহ'লে তা এত দুর্লভ হ'ত না। আপনার পুত্র ব'লেই কার্ত্তিক দুর্লভ, আপনার পুত্র ব'লেই কার্ত্তিকের মানুষ হবার আশা আছে, তাই ওকে এমন ক'রে আপনার কাছ থেকে চেয়ে নিতে হচ্চে।"

শিবচন্দ্র কহিলেন, "কিন্তু সকলেই ত' বল্‌বে যে আমি পুত্র বিক্রয় করেছি। যতই কেন আপনি করুন না, লোক-নিন্দার মুখ থেকে আমার নিস্তার নেই। এমন অবস্থায় কি ক'রে আমি সম্মতি দেব?"

কালিকাবাবু কহিলেন, "সামান্য একটু লোক-নিন্দার ভয়ে আপনি এক নিরীহ ব্রাহ্মণ-কন্যার সৎপাত্রলাভে বাধা দেবেন? ভুলে যান যে সে ধনীর সন্তান; মনে করুন, সে কেবল এক নির্দ্দোষ ব্রাহ্মণ-কন্যা। মনে করুন, তার বাপ আপনার হাত চেপে ধ'রে বল্ছে, "মশায়, আমার কুল রক্ষা করুন, আমার কন্যার বিনিময়ে আপনার পুত্রটীকে দান করুন।" তারপর বলুন, আপনি কি কর্বেন? এর পরও যদি আপনি চান যে আমি সকলের সম্মুখে দাঁড়িয়ে বলি, আপনার কাছ থেকে জোড়হাতে এই কার্ত্তিককে আমি ভিক্ষা ক'রে নিয়েছি, তাতেও আমি প্রস্তুত!"

শিবচন্দ্র ন্যায়রত্ন স্তব্ধ হইয়া গেলেন। এতখানি বিনয়ের সম্মুখে তাঁহার সমস্ত গর্ব্ব ধূলিসাৎ হইয়া গেল। তিনি অন্য কিছু করিতে না পারিয়া নত নেত্রে হস্তের তলদেশ খুঁটিতে লাগিলেন। কালিকাবাবু সহসা নিকটে আসিয়া তাঁহার হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন, "বন্ধু, আপনি আমার বয়োজ্যেষ্ঠ, বলুন, আমায় কি কর্তে হবে, কি কর্লে আপনার মন পাব?"

শিবচন্দ্রের মস্তক হইতে তর্ক-যুক্তি, ন্যায়, সাংখ্য, পাতঞ্জল, বেদান্তাদি সমস্তই এক নিমেষে উড়িয়া গেল। তাঁহার যত গর্ব্ব যত অহঙ্কার যত ব্রাহ্মণত্ব ছিল, সমস্তই 'বাসাংসি জীর্ণানি'র ন্যায় খসিয়া পড়িয়া গেল। তিনি দেখিলেন, কালিকাবাবুও মানুষ, তিনিও মানুষ—উভয়ের মধ্যে কোন ভেদ নাই। তিনি উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, "কালিকাবাবু, আপনারই জয়! আমি আর তর্ক কর্ব না। আপনাকে আর কিছু কর্তে হবে না। কিন্তু এ সংবাদ উভয়ের মধ্যেই আবদ্ধ থাক্। এখন কর্ণান্তর করার প্রয়োজন নেই।"

কালিকাবাবু কহিলেন, "বৈবাহিক, আপনাকে নমস্কার! এই সন্ধ্যার আকাশের নীচে বসে ঐ চন্দ্র আর তারাদের সাক্ষী রেখে আমাদের

কথাবার্ত্তা স্থির ক'রে নিলাম। আপনার কার্ত্তিককে যখন উপযুক্ত বিবেচনা করবেন, তখনই অনুমতি দেবেন, আমি বিবাহের উদ্যোগ করব। কিন্তু মনে থাকে যেন আমার কন্যা বাগ্‌দত্তা হ'য়ে রৈল, এর এখন অন্য পাত্রে সম্প্রদান অসম্ভব।"

শিবচন্দ্র কহিলেন, "ভয় নেই, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।"

শিবচন্দ্র গৃহে ফিরিয়া কার্ত্তিকচন্দ্রকে বলিলেন, "তোমার কলেজে পড়্‌তে যাওয়াই সাব্যস্ত হ'ল।"

কার্ত্তিকচন্দ্র মনে মনে হাসিল ; প্রকাশ্যে বলিল, "তাহ'লে একটা ভাল দিন দেখে দিন্, আমি গিয়ে মাকে খবর দি।"

যাত্রার দিন সর্ব্বানন্দকে কিন্তু অত্যন্ত বিষণ্ন মুখে লুকাইয়া বেড়াইতে দেখিয়া কার্ত্তিকচন্দ্র হাসিয়া বলিল, "সে হচ্চে না, সর্ব্ব-দা, সিন্নি খেতে এগিয়ে এখন কোঁৎকা দেখে পেছুলে চল্‌বে না। আমি যা মনে করেছি, তা করবই।"

সর্ব্বানন্দ কহিল, "নিজের বুদ্ধিকে বা ইচ্ছাকে বাড়িয়ে দেখা তোমার ক্রমশঃ একটা রোগ হ'য়ে দাঁড়াচ্ছে। সাবধান, হয়ত এই কারণেই তোমার সমস্ত মহত্ত্ব ধূলিসাৎ হ'য়ে যাবে।"

কার্ত্তিক কহিল, "সে ভয় নেই, কারণ শেষ পর্য্যন্ত তুমি আছ। নিতান্তই যদি পড়ি, তুমি আমায় টেনে তুল্‌বে। কিন্তু তুমি যে মনে করেছ, আমার plan of operationএ বাধা দেবে, তা হচ্ছে না। আমি সমস্ত কাজের ভার নিজের উপর নিয়েছি, কারও মুখাপেক্ষী হ'য়ে কাজ করব, তেমন লোক আমি নই। এ বিয়ে আমি দেওয়াবই, তাতে যা হয় হবে। তুমি আমার ওপর নির্ভর কর।"

সর্ব্বানন্দ কহিল, "তোমার কাছেও যেমন "সর্ব্বমাত্মবশং সুখং", আর কারও কাছে যে তা নয়, তা তুমি কেন মনে করছ? আমিও প্রতিজ্ঞা

কর্ছি যে যদি বুঝি, শৈলজা আমায় চায় না, তাহলে স্বয়ং ভগবান্ এলেও এ বিয়েতে কেউ আমায় সম্মত করাতে পার্বে না।"

কার্ত্তিক কহিল, "আমি পার্ব।"

সর্ব্বানন্দ কহিল, "কেন ?"

"কারণ! কারণ, আমি তোমায় ভালবাসি।"

সর্ব্বানন্দ কহিল, "মিথ্যে কথা! এর কারণ আমি বল্‌ব,—শুন্‌বে ? এর কারণ, তুমি নিজেকে সব-চাইতে ভালবাস। তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কথার বিরুদ্ধে কিছু হবে, এ তোমার সহ্য হয় না! আমার সঙ্গে শৈলর বিয়ে দিতে যখন তোমার ইচ্ছে হয়েছে, তখন সে ইচ্ছের সুমুখে তুমি আর কারও ইচ্ছেকে দাঁড়াতে দিতে চাও না! তোমার সূক্ষ্ম অথচ প্রচণ্ড গর্ব্বই তোমার সব। সাবধান, কার্ত্তিক, পতনের এই হ'ল প্রথম সোপান।"

কার্ত্তিক কহিল, "এঃ, সমস্ত সৎকার্য্যই দেখ্‌ছি বিরোধের মধ্য দিয়েই ঘ'টে থাকে। আমার জীবনের প্রথম সৎকাজের দেখ্‌ছি প্রথম থেকে তুমিই বিরোধী হ'য়ে দাঁড়ালে। তা হওগে, কিন্তু এতদিন পর্য্যন্ত যখন আমায় কোন কাজেই হারাতে পারনি, তখন এ কাজেও পার্বে না—এ'ও ব'লে রাখ্‌লুম, দেখে নিয়ো।"

বৈকালে দুইখানি গো-শকট সজ্জিত হইয়া আসিল এবং সর্ব্বানন্দ ও কার্ত্তিক টোলের সকলের নিকট হইতে বিদায় লইয়া জমিদার-গৃহাভিমুখে চলিয়া গেল। সেখানে সকলের নিকট হইতে বিদায় লইয়া দুইজনে যেমন বাহিরে আসিবে, অমনি দেখিল, লাইব্রেরীর দ্বিতল কক্ষের গবাক্ষে শৈলজা দাঁড়াইয়া আছে। যুগপৎ উভয় বন্ধুর দৃষ্টিই শৈলজার উপর পতিত হওয়াতেই হউক বা যে কারণেই হউক শৈলজা গবাক্ষ হইতে সরিয়া গেল। কার্ত্তিকচন্দ্র তাড়াতাড়ি সর্ব্বানন্দর হাত ধরিয়া টানিয়া

বলিল, "সকলেরই সঙ্গে দেখা কর্‌লুম, শৈল কেন বাকি থাকে। ওর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আসি, চল।"

সর্ব্বানন্দ ক্রুদ্ধ স্বরে বলিল, "তুমি অতি পাষণ্ড!"

কার্ত্তিক বলিল, "যে আজ্ঞে, আপনি না যান্, আমার ত যেতে বাধা নেই! আমি চল্‌লুম।"

সর্ব্বানন্দ কোন কথা না বলিয়া গো-শকটে গিয়া উঠিল। কার্ত্তিক-চন্দ্র লম্ফে লম্ফে সোপান অতিক্রম করিয়া এক নিমেষে শৈলজার নিকটে গিয়া বলিল, "শৈল, আমরা যাচ্ছি। বোধ হয় দু'এক বছর আস্‌তে পার্‌ব না। সবাই কত উপদেশ দিলে, তুমি কিছু বল্‌বে না?"

শৈল ধীরে ধীরে তাহার পায়ের গোড়ায় একটা প্রণাম করিয়া একটু যেন ম্লান মুখে বলিল, "আমি আর কি বল্‌ব?"

কার্ত্তিক কহিল, "কিছু না? একটা কথাও বল্‌বার নেই? সর্ব্ব-দাও আস্‌তে পার্‌বে কি না, ঠিক নেই, ওকেও কিছু বল্‌বার নেই?"

শৈলজা লজ্জিত হইয়া বলিল, "ওঁকে আমার প্রণাম দিয়ো!"

কার্ত্তিক কহিল, "তুমি এই ক'বছরের মধ্যে বড্ড বুড়ো হ'য়ে পড়েছ, দেখ্‌ছি। এত দিনের জন্য আমরা যাচ্ছি, আর একটা কথাও আমাদের জন্য জুগিয়ে রাখনি? ছিঃ! যদি তোমার আপন ভাই এমনি ক'রে দূরদেশে চ'লে যেত, তাহ'লে কি তুমি তাকে একটা কথাও বল্‌তে না, শৈল?"

শৈল সহসা কাঁদিয়া ফেলিল এবং একবার ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে কার্ত্তিকের পানে চাহিয়া ছুটিয়া সে স্থান হইতে পলাইয়া গেল। কার্ত্তিকচন্দ্র সে দৃষ্টির কোনরূপ ব্যাখ্যা করিতে না পারিয়া অগত্যা হাসিতে হাসিতে আসিয়া সর্ব্বানন্দর অনুসরণ করিল।

দ্বিতীয় খণ্ড

১

"বৈরাগ্যমেবাভয়ং"—সনাতন ভারতবর্ষের এই সনাতন উক্তির সনাতন সার্থকতা দেখাইবার জন্য মণিশঙ্কর পশ্চিমে নানা স্থানে ঘুরিয়া অবশেষে যখন আবার তাহার জন্মভূমিতে ফিরিয়া আসিল, তখন সে একজন প্রবল প্রাণায়ামী পরিব্রাজক পরমহংস। যদিও পরিব্রাজক ধর্ম্মের প্রচলিত রীতি-অনুসারে দ্বাদশ বর্ষের শেষভাগে একবার জন্মভূমিতে দেখা দিতে হয়, তথাপি 'তেজীয়সাং ন দোষায়' শাস্ত্রের এই বচনানুসারে পরিব্রাজকাচার্য্য শঙ্করানন্দ স্বামীজি ওরফে মণিশঙ্কর তাঁহার অজ্ঞাত-বাসের দুই বৎসর অতীত হইতে না হইতেই শিবরামপুরে আপনার পূর্ব্ব পীঠস্থান পোড়া বাঙ্গলায় আসিয়া অধিষ্ঠিত হইলেন। তিনি সংসারাশ্রম ত্যাগ করিয়াছিলেন বলিয়া গৃহে প্রবেশ করিলেন না এবং সেই কারণেই তাঁহার পুণ্যনাম অচিরে দিকে দিকে প্রচারিত হইয়া পড়িল। গ্রামের বৃদ্ধগণ বলিলেন, "মানুষ কি আর চিরদিন এক-রকমই থাকে? সুবাতাস বহিলে সকলেরই পরিবর্ত্তন হয়। আহা, মণির আমাদের কি সুন্দর পরিবর্ত্তনই হইয়াছে! হইবে না কেন? সনাতন ধর্ম্ম!"

সনাতন ধর্ম্মের এই অপূর্ব্ব সন্তানটির কীর্ত্তি-কলাপের কথা ইতিমধ্যে সুপ্রচারিত হওয়ায় সে সংবাদ যথারীতি জমিদারী অন্তঃপুরেও প্রবেশ লাভ করিয়াছিল। গ্রামস্থ অন্যান্য ভদ্র পুরাঙ্গনাগণ যেমন সাধু দর্শনার্থ মাঝে মাঝে পোড়া বাঙ্গলায় যাতায়াত আরম্ভ করিয়াছিলেন, কালিকাবাবুর পুরমহিলাগণের মধ্যেও সেইরূপ করিবার একটা কথাবার্ত্তা জল্পনা-কল্পনা

চলিতেছিল। নবীন স্বামীজিটির যশের অন্যান্য নানাবিধ কারণের মধ্যে একটি কারণ ইহাই ছিল যে, তিনি নাকি শান্তি-স্বস্ত্যয়নাদিতে সিদ্ধহস্ত এবং নাস্তিপুরের রাজকন্যার দুই চারি বৎসরের মূর্চ্ছারোগ তিনি নাকি তিন দিনের স্বস্ত্যয়নে আরাম করিয়াছেন! সর্ব্বোপরি তিনি সামুদ্রিক বিদ্যায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া আসিয়াছেন।

যদি কোন হতভাগ্য ব্যক্তি সন্দেহ প্রকাশ করিয়া বলিত, দুই-এক বৎসরের মধ্যে মণিশঙ্কর এত শিখিল কি করিয়া? তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ সে স্বামীজির নবীন ভক্তগণের দ্বারা তিরস্কৃত হইত। কেহ বলিত, "দৈবশক্তির দ্বারা কি না হয়?" যাঁহারা অধিকতর বুদ্ধিমান্, তাঁহারা বলিতেন, "কেমন করিয়া হইল, সে প্রশ্নের কি প্রয়োজন? গণনার ফলই স্বামী শঙ্করানন্দের অমানুষিক ক্ষমতার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। স্বামীজির এমনি অদ্ভুত ক্ষমতা যে তিনি হাত দেখিয়া বলিয়া দিতে পারেন, কোন্ ব্যক্তির গৃহ কোন্ দুয়ারী এবং সেই গৃহের ঈশান কিম্বা নৈঋৎ কোণে কোনও বৃক্ষাদি আছে কি না। এমন কি সদর রাস্তা সেই গৃহের কোন্ দিকে, তাহাও অধিকাংশ সময় মিলিয়া যায়। তবে যদি কখনও তাঁহার ভুল হয়, সে ভুল ব্যস্ততা-প্রযুক্তই ঘটিয়া থাকে, কারণ স্বামীজির নিকট লোক-সমাগমের বিরাম নাই।"

স্বামীজির গণনা-শক্তির একটা উদাহরণ দেওয়া যাক্। নিকটস্থ গ্রাম হইতে এক বৃদ্ধ গোপজাতীয় ব্যক্তি স্বামীজির নিকট আপনার ভাগ্য-গণনার জন্য উপস্থিত হইল, এবং সাড়ম্বরে একটি রজত মুদ্রা পরমহংসের পদতলে রাখিয়া প্রণাম করিল। পরিব্রাজকাচার্য্য তৎক্ষণাৎ বৃশ্চিক-দষ্ট ব্যক্তির ন্যায় উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, "কি ভয়ঙ্কর! এ লোকটি, দেখছি, ঘোর বিষয়ী! সন্ন্যাসী যোগীর কাছে এসেও টাকার কথা ভুল্‌তে পারেনি! টাকা-কড়ির চেষ্টায় আমার কাছে কেন, বাপু?" বৃদ্ধ

গোয়ালাটি বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "এ কি মানুষ! আমার মনের কথা আস্‌তে মাত্র ধরেছে! বাবাঠাকুর, আমি বড় গরীব, আমায় দয়া কর—হাতটি দেখ।"

মণিশঙ্কর কহিল, "হাত দেখাতে এসেছিস্ ত টাকা এনেছিস্ কেন?"

ভক্তগণের মধ্যে একজন তখন ব্যস্ত হইয়া বলিল, "ওহে বাপু, উনি কামিনী-কাঞ্চনত্যাগী; ওঁকে কি টাকার লোভ দেখাতে আছে? টাকাটা তুলে নাও, দেখ্‌ছ না, উনি টাকার জন্য বস্‌তে পাচ্ছেন না!"

বৃদ্ধ তাড়াতাড়ি টাকাটা উঠাইয়া লইয়া বলিল, "বাবাঠাকুর, আমি গরীব, আমার কপালে কি যে লিখেছে বিধেতা, তা জানিনে! আমার চার-চারটে গরু মরে গেল। দেখ দেখি বাবাঠাকুর, আর কতদিন এমনি চল্‌বে?"

শঙ্করানন্দ স্বামী আসন পরিগ্রহ করিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিলেন, তারপর হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন, "ওরে, তোদের গ্রামে চামার আছে?"

বৃদ্ধ সবিস্ময়ে বলিল, "আজ্ঞে, আছে বই কি!" স্বামীজি পুনরায় চক্ষু মুদ্রিত করিয়া বলিলেন, "তাদের মধ্যে বেঁটে মোটা কালো রংয়ের যে, সে-ই তোর শত্রু, সে-ই তোর গরুদের বিষ দিয়ে মার্‌ছে। তাকে বিশ্বাস করিস্‌নে।"

বৃদ্ধ চমকিত হইয়া বলিল, "এঁ্যা, হারাণে! হারাণে বেটার এই কাজ! ভাগ্যে বাবাঠাকুর তোমার কাছে এয়েছিলুম! দাঁড়া বেটা, তোর চামারগিরি বা'র কর্‌ছি!"

বৃদ্ধ আরও দুই-চারিটী প্রশ্নের সঠিক উত্তর গ্রহণ করিয়া প্রস্থান করিল। তৎপরে এই সংবাদ নানা শাখা-প্রশাখায় বিস্তার লাভ করিয়া সারা গ্রামময় রাষ্ট হইতে বাকী রহিল না।

তবে যেমন সকল মহৎ ব্যক্তিরই শত্রু থাকে, তেমনি স্বামীজিরও

দুই-একজন শত্রু জুটিয়াছিল। গ্রাম্য বিদ্যালয়ের দুই-একটী ত্রিপণ্ড্ ছাত্র স্বামীজির বৈরাগ্যমেবাভয়ং এই সূত্রের অদ্ভুত ব্যাখ্যাও বাহির করিয়াছিল। তাহারা বলিত, শঙ্করানন্দ পরমহংস নন, পরম বক; এবং বৈরাগীর বেশ তাঁহার ভণ্ডামির আশ্রয়, তাই বৈরাগ্যই তাঁহার পক্ষে অভয়। অবশ্য এ ব্যাখ্যার জন্য তাহারা গুরুজনের নিকট যথারীতি শাস্তি পাইত বটে, তবুও তাহারা এ কথা বলিতে ছাড়িত না।

তাঁহার সম্বন্ধে এইরকম একটু-আধটু সন্দেহজনক জনরব প্রচারিত হইবার কারণও ছিল। স্বামীজি প্রতিরাত্রে পূজায় বসিয়া বীরাচার-মতে দুই-এক বোতল কারণ-সলিল বা সুধাপান করিতেন এবং ভক্তির আবেগে মধ্যরাত্রের স্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া রাসভনিন্দিত স্বরে যখন গান ধরিতেন,

"সুরাপান করিনে আমি সুধা খাই
জয় কালী ব'লে,
আমার মন-মাতালে মেতেছে আজ
যত মদ-মাতালে মাতাল বলে।"

তখন পথিকের চিত্তে ভক্তি-মোহের পরিবর্ত্তে ত্রাসেরই সঞ্চার হইত। কিন্তু অন্তরে অন্তরে "মহাকৌল" হইয়াও বাহ্যতঃ তিনি কখনও সে ভাব প্রকাশ করিতেন না; যদি কোন সংশয়ী শিষ্য তাঁহার এই অসমঞ্জস ভাবদ্বয়ের বিষয়ে কোন প্রশ্ন তুলিত, তাহা হইলে তিনি মৃদু হাসিয়া বলিতেন,

"অন্তঃ শাক্তঃ বহিঃ শৈবঃ সভায়াং বৈষ্ণবো মতঃ।"

অন্তরে শাক্ত রহিয়া বাহিরে শৈবের ন্যায় আচরণ করিবে এবং সভায় বৈষ্ণবের ন্যায় কথা কহিবে। ইহাই হইতেছে কুলধর্ম্ম, ইহাই শিববাক্য।

২

এ-হেন মহাপুরুষ যে তাঁহার লৌকিক পিতামাতার সহিত আপনার জ্ঞানগরিষ্ঠ চরিত্রোচিত ব্যবহার করিবেন, সে বিষয়ে সন্দেহ করাই অন্যায়। ন মাতা ন পিতা ন বন্ধু র্ন ভ্রাতা,—কেহই কিছু নয়, সকলেই মায়ার বিজৃম্ভণ মাত্র। অতএব এই "শিব-স্বরূপ" পুত্রের, এই চলন্ত শঙ্করের মাতা হইয়া নিস্তারিণী দেবী স্বভাবতই আপনাকে ধন্যা মনে করিতে-ছিলেন। কিন্তু পিতার সহিত এই মহাপুরুষ-সন্তানের প্রথম দর্শনেই চোখে চোখে যে কথা হইয়া গিয়াছিল, স্থূল শরীরে যে যে ভাবের আদান-প্রদান হইয়াছিল, সে কথা প্রাকৃত লোকের বুদ্ধির অগম্যই রহিয়া গিয়াছে।

সে যাহা হউক, প্রভুপাদ শঙ্করানন্দের পিতা-মাতা উভয়েই উপযুক্ত পুত্রের যশঃসৌরভ চতুর্দ্দিকে নানাভাবে বিস্তারিত করিতে ত্রুটি রাখেন নাই; এবং তাঁহাদের, বিশেষতঃ নিস্তারিণী দেবীর সহিত শিবচন্দ্র ন্যায়রত্নের পত্নী মনোরমা দেবীর বিশেষ সখিত্ব থাকায় শিবচন্দ্র ন্যায়রত্ন কোন-এক প্রভাতে শঙ্করানন্দের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন ও স্বামীজির সদালাপে মুগ্ধ হইয়া গৃহে গিয়া কেবলমাত্র এই কথাটী উচ্চারণ করিলেন, "কাকঃ কাকঃ।"

ন্যায়রত্ন মহাশয় উঠিয়া গেলে সহসা স্বামীজির চিত্তে ভাবান্তর উপস্থিত হইল। তিনি যেন সহসা একটা প্রকাণ্ড বিষাদের দ্বারা আক্রান্ত হইয়া বলিলেন, "অহো, এমন জ্ঞানী পিতার এমন কুসন্তান!" শিষ্যগণ প্রভুর মুখ হইতে এবম্বিধ বাক্য উচ্চারিত হইতে শুনিয়া বিস্মিত হইল। কিন্তু কেহই প্রভুর উক্ত প্রকার অদ্ভুত উক্তির কারণ জানিতে পারিল না। প্রভু কেবল গম্ভীরভাবে মাথা নাড়িয়া চক্ষু মুদ্রিত করিলেন।

ক্রমশঃ এই কথাটী অজ্ঞাত উপায়ে জমিদারী অন্তঃপুরেও প্রচারিত হইয়া গেল। কালিকাবাবুর মাতা পুত্রকে ধরিয়া বসিলেন যে অন্ত কালিকাবাবু স্বয়ং গিয়া এ-বিষয়ে সঠিক সংবাদ জানিয়া আসুন। কালিকাবাবু মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "মণিশঙ্করের কথায় যদি বিশ্বাস কর্‌তে হয়, তাহ'লে যে কোন মাতালের মাতলামিতেও বিশ্বাস কর্‌তে হবে।"

মাতা বলিলেন, "কিন্তু মণি আর যাই হোক্, ওর কথা যে শুন্‌ছি অনেক সময়ে ফ'লে যায়। ওর একটা-কিছু ক্ষমতা হয়েছে নিশ্চয়, নইলে এত লোক ওকে মান্‌বে কেন?"

কালিকাবাবু কহিলেন, "মা, সহজে বিশ্বাস করা সাধারণ লোকের একটা রোগ। বিশেষ যদি তার সঙ্গে দৈব শক্তি-টক্তির ভণ্ডামি থাকে, তাহ'লে ত আর কথাই নেই। আমায় যদি স্বয়ং ভগবান্ এসে বলেন যে মণিশঙ্কর সাধু হয়েছে, তাহ'লেও আমি সে কথা বিশ্বাস কর্‌ব না।"

মাতা কহিলেন, "এ তোমার অন্যায়! সাধু-সঙ্গে কি না হয়?"

"হ্যাঁ, সাধু-সঙ্গ হ'লে! কিন্তু ওর যে সাধু-সঙ্গ হয়েছিল, তা কে বল্লে? তা ছাড়া আমার বিশ্বাস, কয়লাকে হাজার ধুলেও তার কালো রং যায় না।"

"কিন্তু আগুনে লাগ্‌লে সে কালি যেতে পারে ত।"

"মা, তুমি কি দেখ্‌তে পাচ্ছ না যে, দেশের যত ওঁছা ত্রিপণ্ড্র, মায়ে-তাড়ান বাপে-খ্যাদান ছোঁড়া ওর সঙ্গে গিয়ে জুটেছে? সাধুর প্রথম লক্ষণ এই যে তার কাছে গিয়ে বস্‌লেই মনটা ঠাণ্ডা হবে। সাধু-চরিত্র ঠিক চিনির গুদোমের মত, ঘরে ঢুক্‌লেই মুখটা মিষ্টি মিষ্টি হ'য়ে যাবে। যার একটুও ভাল-মন্দ বিচার কর্‌বার ক্ষমতা আছে, সে-ই ওর কাছ থেকে ফিরে এসে বল্‌ছে, ওর মধ্যে আঠারো আনাই ভণ্ডামি। বাস্তবিক, শান্ত প্রকৃতির সাধু-চরিত্রের লোক কি একটিও এ-পর্য্যন্ত ওর সঙ্গী হয়েছে?

ইংরিজিতে একটা চলিত কথা আছে, যার মানে হচ্চে, মানুষের সঙ্গী দেখেই তার চরিত্র ধরা যায়।"

মাতা কহিলেন, "তোমাদের ইংরিজি-পড়া লোকেদের ঐ কেমন এক ধরণ! কিছুই বিশ্বাস কর্‌তে চাও না! কিন্তু ডাকিনী যোগিনী সিদ্ধি এ সবও যে শুনি আজকাল বড় বড় ইংরিজি জানা লোকও মান্‌ছে। বিলেতে সাহেবেরাও না কি মান্‌ছে।"

"তা মানুক্‌গে, মা, আমি মান্‌তে পার্‌ব না।"

"যাই হোক্, তুমি কার্ত্তিকের বিষয় তাহ'লে খোঁজ নাও।"

"তার খোঁজ আমি রোজই পাই, মা, এই ত কালও মনোহর তার বিষয় লিখেছে। মনোহরের ছেলে শশীর সঙ্গে কার্ত্তিক আর সর্ব্বানন্দর খুব ভাব হয়েছে। তার কাছ থেকে মনোহর রোজই কার্ত্তিকের খবর পায়।"

"তোমার টৌর্ণি বাবুকেও চিঠি লেখে দাও। কি জানি, সহর বাজার স্থান—কার্ত্তিক হয়ত—"

"তুমি ভয় করো না। আমি কার্ত্তিকের উপর সর্ব্বদা দৃষ্টি রেখেছি, নইলে কি এতদিন ধ'রে আমার মেয়ের বিয়ে না হ'য়ে থাকে? কার্ত্তিক যদি সহজে নষ্ট হবার মত ছেলে হ'ত, তাহ'লে এমন ক'রে ওকে পাবার জন্য চেষ্টা কর্‌তুম না।"

তথাপি কালিকাবাবুর মাতা জগদম্বা দেবীর সন্দেহ দূর হইল না। তিনি নানা কৌশলে মণিশঙ্করের নিকট হইতে কার্ত্তিকের সম্বন্ধে সঠিক সংবাদ জানিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু স্বামীজির সেই এক কথা,—"আমি কখন্ কি যে বলি, সব কি আমার মনে থাকে? যখন যে ভাব যে কথা গুরুর কৃপায় আমার মনশ্চক্ষুর সম্মুখে ভেসে ওঠে, তখন তাই প্রকাশ করি। তবে যদি কারও কিছু জান্‌বার দরকার থাকে,

সে যেন একটা হরীতকী হাতে ক'রে জিজ্ঞাসুভাবে আমার কাছে আসে, তাহ'লে তার প্রশ্নের সদুত্তর আপনিই আমার মনে উদয় হবে এবং সেও জান্‌তে পার্‌বে।"

কালিকাবাবুর মাতা জগদম্বা দেবী ব্যস্ত হইয়া একদিন মণিশঙ্করের মাতা নিস্তারিণী দেবীকে ধরিয়া বসিলেন যে তাঁহাকে সঠিক সংবাদ আনিয়া দিতে হইবে। আর যদি নিস্তারিণী দেবী অক্ষম হন, তাহা হইলে জগদম্বা দেবী স্বয়ং একদিন তাহার কাছে যাইবেন। শৈলজার মাতা ইন্দিরা দেবী এ সংবাদে মনঃক্ষুণ্ণ হইয়া শ্বশ্রূ ঠাকুরাণীকে মৃদু অনুযোগ করিয়া বলিলেন, "মা, আপনি কেন এত ব্যস্ত হচ্চেন? উনি যখন নিশ্চিন্ত হ'য়ে আছেন, তখন আমাদের ভয় কি? আর আপনি এই রকম কাণ্ড কর্‌ছেন শুন্‌লে উনি দুঃখিত হবেন। সে দিন তিনু ঠাকুরঝি, ক্ষান্ত পিসি মণির সঙ্গে দেখা কর্‌তে গিয়েছিলেন ব'লে উনি কত রাগ কর্‌লেন! তার ওপর যদি আপনি যান, তাহ'লে উনি বড্ড দুঃখিত হবেন।"

জগদম্বা কহিলেন, "বৌমা, শৈল ত তোমাদের একার নয়! ওর কিসে ভাল মন্দ হবে, তা আমিও বুঝি। তুমি নিশ্চিন্ত থাক, আমি যা কর্‌ছি, তাতে কেউ দোষ দিতে পার্‌বে না।"

ইন্দিরা দেবী ক্ষুণ্ণ মনে প্রস্থান করিলেন। জগদম্বা দেবী শৈলজাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। শৈলজা আসিলে তিনি তাহাকে বলিলেন, "ওরে তোর মণি-দার সঙ্গে একদিন দেখা কর্‌তে যাবি? সে এখন মস্ত সাধু হ'য়ে এসেছে! চল্ না, একবার দেখে আসি।"

শৈল কহিল, "মণি-দা'র সঙ্গে দেখা কর্‌তে যাব? কেন?"

জগদম্বা কহিলেন, "শুনিস্‌নে, সে না কি ভারি গুণ্‌তে পারে! চল্, তোর হাতটা দেখিয়ে আনি।"

শৈল কহিল, "কেন, আমার হাত দেখিয়ে আবার কি হবে?"

জগদম্বা কহিলেন, "তোর কেমন বর হবে, সেটা জান্‌বি নে ?"

শৈলজা হাসিয়া বলিল, "সে তখন যেমন হয় হবে, তার জন্য আমি এখন থেকে ভাব্‌তে যাব কেন ?"

জগদম্বা কহিলেন, "তুই ভাব্‌বি না ত কে ভাব্‌বে ?"

শৈলজা কহিল, "যার দরকার হয়, সে ভাবুক্‌গে, আমি ভাব্‌ব না।"

জগদম্বা কহিলেন, "অর্থাৎ তোর ভাবা-টাবা সব ফুরিয়ে গিয়েছে, এখন কেবল হাতে পেলেই হয়, কেমন ?"

শৈল কহিল, "যাও, তুমি বড় দুষ্টু! আমি চল্লুম।"

জগদম্বা কহিলেন, "আহা, চল্‌ না! তোকে যে বিয়ে কর্‌বে, সে কেমন লোক হবে, এ কথা কি জান্‌তে ইচ্ছে করে না ?"

শৈল কহিল, "কে কেমন হবে, তা কি কেউ হাত দেখে ব'লে দিতে পারে না কি ?"

জগদম্বা কহিলেন, "যারা গুণ্‌তে জানে, তারা পারে।"

শৈল কহিল, "তা পারুক্‌, আমি সে সব গুণে-টুনে দেখ্‌তে চাইনে।"

জগদম্বা কহিলেন, "কেন, শুনি ?"

শৈল কহিল, "কেন আবার কি! আমি বারে বারে তোমার 'কেন'র উত্তর দিতে পার্‌ব না,—আমি কোথাও যাব না।"

জগদম্বা এইবার গম্ভীর হইয়া বলিলেন, "আমার কথা তবে রাখ্‌বিনে ? তোর বাবার ভয় কর্‌ছিস্‌? আমি নিয়ে গেলে সে কিচ্ছু বল্‌বে না।"

শৈল কহিল, "আর যদি আমিই না যাই ?"

জগদম্বা কহিলেন, "তাহ'লে আর আমি কি কর্‌ব!"

শৈল কহিল, "তবে সেই বেশ কথা! আমিই যাব না। কোথাকার একটা কে, মদো-মাতাল গাঁজাখোর লোক, তার কাছে হাত দেখাতে যেতে হবে! তোমার দিন দিন বুদ্ধি-শুদ্ধি যেন কি হ'য়ে যাচ্ছে!"

জগদম্বা কহিলেন, "কোথাকার কে কেন হ'তে যাবে? ও যে আমাদের মণি।"

শৈল কহিল, "হ'লই বা মণি! কে ওর মনের ভিতর ঢুকে দেখ্‌তে গিয়েছে, যে ওর মনে কি আছে? এই ত' বছর-দুই আগে ও একটা মস্ত মাতাল বওয়াটে ছিল। এরই মধ্যে দুবছর যেতে না যেতে একখানা গেরুয়া কাপড় প'রে এল, আর অমনি তোমরা দেশশুদ্ধ লোক ওর পেছনে ছুট্‌তে আরম্ভ করেছ! তোমার যেখানে ইচ্ছে যাও, মা যেখানে যেতে বারণ করেন, সেখানে আমি কিছুতেই যাব না।"

শৈলজা রাগ করিয়া চলিয়া গেল। জগদম্বা দেবী নানা প্রকারে বুঝাইয়াও কিছুতেই তাহাকে মণিশঙ্করের নিকট হাত দেখাইতে লইয়া যাইতে পারিলেন না। শেষে তিনি বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "হায় হায়, দেবতা-বামুনে ভক্তি আজকাল কোথায় চ'লে গেল? হায় রে সে কাল!"

৩

কলিকাতার কোন এক প্রসিদ্ধ কলেজের সেকেণ্ড-ইয়ার ক্লাশে সংস্কৃত অধ্যাপক প্রবেশ করিবামাত্র ছাত্রগণ নানারূপ গল্প-গুজবে প্রবৃত্ত হইল। অধ্যাপক মহাশয় 'রোল্' 'কল্' করিয়া রঘুবংশের কোন এক সর্গের শ্লোকের ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইবামাত্র কয়েকজন ছাত্র সর্ব্বানন্দকে ধরিয়া বলিল, "সর্ব্ব-দা, আজ পণ্ডিত মশায়ের সঙ্গে ব্যাকরণ-ঘটিত একটা তর্ক জুড়ে দাও, আমরা একটু মজা করি।"

সর্ব্বানন্দ হাসিয়া বলিল, "রোজ রোজ তোমাদের জন্য পণ্ডিত মশায়ের সঙ্গে ঝগড়া কর্‌তে পারিনে।"

যোগীন্দ্র নাছোড়-বন্দা। সে বলিল, "সে হবে না সর্ব্ব-দা, তোমায় তর্ক কর্‌তেই হবে। ঐ দেখ, পণ্ডিত মশায় কেবল বাঁকা চোখে তোমার

দিকে চাচ্ছেন। তোমাকেই সব-চেয়ে সমজদার ছাত্র ব'লে জানেন। তুমি চুপ ক'রে থাক্‌লে আজকের ঘণ্টাটাই উনি ব্যর্থ মনে কর্‌বেন।"

সর্ব্বানন্দ কহিল, "তা করুন! আজ আমার নিশ্চুপের পালা। আজ কার্ত্তিককে গিয়ে ধর্‌ না।"

পিছন হইতে কালো কোলো মোটা-সোটা দেবনাথ তাহার অসম্পূর্ণোদ্গত গুম্ফে তা' দিতে দিতে বলিল, "ওখানে দাঁত ফুট্‌বে না, তার চেয়ে বাইরে চলুন, সর্ব্ববাবু, আপনার উদ্ভট শোনা যাক্‌ গিয়ে।"

গীতবাতিকগ্রস্ত কাব্য-কূপ সত্যজীবন তাহার স্বাভাবিক ব্যস্ততা দেখাইয়া অতি দ্রুতবেগে বলিল, "উদ্ভট কবিতা, উদ্ভট কবিতা! আমি —আমি—আমি সেদিন যে একটা চমৎকার কবিতা পেয়েছি, তার কাছে, তার কাছে, সব, বুঝেছ কি না, সব কবিতা meaningless trash ব'লে মনে হবে! কবিতাটা ঠিক যেন ইয়ের মত,—মন-প্রাণ একেবারে উঃ সে কি বল্‌ব, ভাই!"

দেবনাথ তাহার উচ্ছ্বাসে বাধা দিয়া বলিল, "তা আর ব'লে কাজ নেই।"

সত্যজীবন কহিল, "ওহে, না, না, সেদিন আমি যাঁর কাছ থেকে শুন্‌লুম—"

যোগীন্দ্র কহিল, "ওঃ বোঝা গেছে! যাঁর কাছ থেকে শুনেছ, তাঁরই কমনীয় কণ্ঠের যোগ থাকাতে সেটা এত সুমিষ্ট হ'য়ে উঠেছিল।"

বন্ধুদের দলে একটা চাপা হাসির স্রোত বহিয়া গেল। সত্যজীবনের মনের "চর্ম্ম"টা কিঞ্চিৎ স্থূল, তাই যোগীন্দ্রর বিদ্রূপে সে-ই বেশী হাসিল; কিন্তু পরক্ষণেই অতি প্রবলবেগে হাত-মুখ নাড়িয়া সে বলিল, "তোমরা যদি তাঁর গলা শুন্‌তে, তাহ'লে আর সে বিষয় নিয়ে ঠাট্টা কর্‌তে না! আঃ, সে কি সুন্দর! গলা ত নয়, যেন—"

দেবনাথ বাধা দিয়া কহিল, "মিছরির ছুরি! চোরের নাক কাটা চলে! খেতেও মিষ্টি!"

আবার চাপা হাস্যধ্বনি উত্থিত হইতেই সর্ব্বানন্দ বলিল, "ওহে, পণ্ডিত মশায় চশমার ওপর দিয়ে ঘন-ঘন এ ধারে তাকাচ্ছেন। তোমরা বাইরে যাও।"

সত্যজীবন তাহার "তিনি"র গল্প করিবার জন্য ছট্‌ফট্‌ করিতেছিল। সে তাড়াতাড়ি বলিল, "তাই চল, তাই চল।"

যোগীন্দ্র তাহার পার্শ্বস্থিত 'ঠাকুরদা' নামধারী প্রকাণ্ড-কালো-দাড়ী-সমন্বিত নিদ্রিত বন্ধুটীকে একটা খোঁচা মারিয়া জাগাইয়া দিল। এই ঠাকুরদা দশ-বারো বৎসর ধরিয়া এফ, এ, পরীক্ষায় ফেল্‌ হইয়া উক্ত উপাধিটী অর্জ্জন করিয়াছিল, এবং আপনার বহু দিনের অধিকারের ফলে যে-কোন ঘণ্টায় নিদ্রা যাইবার একটা অবাধ ও চিরস্থায়ী স্বত্ব প্রফেসর ও ছাত্রগণের নিকট হইতে আদায় করিয়া লইয়াছিল। খোঁচা খাইয়া 'ঠাকুরদা' তাহার রক্তবর্ণ চক্ষু দুইটী উন্মীলিত করিয়া একবার কক্ষের চতুর্দ্দিক দেখিয়া লইল, তারপর মৃদু স্বরে বলিল, "ওঃ, পণ্ডিত এসেছে! চল্‌ রে, তামাক খেয়ে আসি।"

যোগীন্দ্র ও সত্যজীবন সর্ব্বানন্দকে টানাটানি আরম্ভ করিতেই কিঞ্চিৎ দূরস্থিত কার্ত্তিকের দৃষ্টি তাহাদের উপর পড়িল। কার্ত্তিক তৎক্ষণাৎ চোখ ফিরাইয়া লইল বটে, কিন্তু সর্ব্বানন্দ আর উঠিতে পারিল না। যোগীন্দ্র তখন ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, "কার্ত্তিক কি তোমার অভিভাবক না কি যে, ওর মত না নিয়ে তুমি নড়্‌বে না?"

'ঠাকুরদা' হাই তুলিয়া বলিল, "কার্ত্তিকটাকেও ডেকে নাও না। ও'ই বা কি কর্‌ছে ব'সে?" যোগীন্দ্র কার্ত্তিকের নিকট গিয়া বলিল, "কার্ত্তিক, 'ঠাকুরদা' তোমায় ডাক্‌ছে, এস।"

কার্ত্তিক তাহাদের সঙ্গে বাহিরে আসিয়া বলিল, "সর্ব্ব-দা, দিন-দিন তোমার এ কি হচ্ছে? পণ্ডিতমশায় নিরীহ গোবেচারা ব'লে তাঁকে কেন তোমরা এমনভাবে রোজ রোজ অপমান্ কর? তোমাকে উনি সব-চাইতে বেশী ভালবাসেন, আর তুমিই ওঁকে সব-চাইতে বেশী অবহেলা দেখাচ্ছ!"

সর্ব্বানন্দ লজ্জিত হইয়া কি বলিতে যাইতেছিল, এমন সময় যোগীন্দ্র রাগিয়া বলিল, "এদিকে ত' দাদা বলা হয়, কিন্তু কথা শুনে মনে হয়, যেন তুমিই ওর দাদা!"

কার্ত্তিক কহিল, "অন্যায় দেখ্‌লে সকলকেই সাবধান করা যেতে পারে তাতে বড়-ছোট ব'লে কোন কথা মনে রাখ্‌বার দরকার নেই।"

সত্যজীবন বেগতিক দেখিয়া তাড়াতাড়ি যোগীন্দ্র আর কার্ত্তিকের মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "আরে যেতে দাও, যোগীন। কার্ত্তিকবাবু, রাগ কর্‌বেন না। আমিই একটা কথার জন্য সর্ব্ববাবুকে ডেকে এনেছি।"

কার্ত্তিক কহিল, "কি কথা?"

ঠাকুরদার নিদ্রার ঘোর সিগারেটের ধোঁয়ায় ক্রমশঃ কাটিয়া আসিতে-ছিল, তাই সে দাড়ীতে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল, "আরে, সে কথা কি তোর সঙ্গে হ'তে পারে রে বেরসিক? সতুর কথার মর্ম্ম যারা বুঝ্‌বে, তাদের কাছেই ও বল্‌বে। তুই আমার কাছে আয়, একটা কথা আছে। ও চ্যাংড়াদের ছেড়ে দে।"

বয়সে চৌদ্দ-পনেরো বৎসরের তফাৎ হইলেও এই ঠাকুর্দ্দা ওরফে শশিভূষণের সঙ্গে কার্ত্তিকচন্দ্রের এই কয় মাসের মধ্যে যথেষ্ট হৃদ্যতা জন্মিয়াছিল। শশিভূষণ মনোহর বসু মহাশয়ের একমাত্র পুত্র। মনোহরবাবু সীতাপুরের জমিদার এবং কালিকাবাবুর বিশিষ্ট বন্ধু। পুত্র শশিভূষণ যখন বারংবার চেষ্টা করিয়াও এফ, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ

হইতে পারিল না, তখন তিনি পুত্রকে লেখাপড়া ছাড়িয়া গ্রামে ফিরিয়া কাজকর্ম্ম দেখিবার জন্য লিখিয়া পাঠাইলেন। কিন্তু পুত্র শশিভূষণ পত্রোত্তরে লিখিল, সেকেণ্ড ইয়ারের বেঞ্চখানার মায়া সে কিছুতেই ত্যাগ করিতে পারিতেছে না। দ্বিপ্রহরে একবার কলেজে গিয়া ঐ বেঞ্চখানায় বসিয়া ঐ ডেস্কের উপর মাথা রাখিয়া না ঘুমাইলে তাহার সারারাত্রি নিদ্রা হইবে না। এমন কি রবিবার প্রভৃতি ছুটির দিনে অন্ততঃ এক মিনিটের জন্যও সে দরোয়ানদের দ্বারা দ্বার খোলাইয়া সেই বেঞ্চখানায় বসিয়া আসে। অতএব যতদিন না ঐ বেঞ্চখানা ভাঙ্গিবে, ততদিন আর শশীর নিস্তার নাই, তাহাকে কলেজে যাইতেই হইবে!

স্নেহ-দুর্ব্বল পিতা আর কোন উপায় নাই দেখিয়া মাসে মাসে যথারীতি টাকা পাঠাইতে লাগিলেন। পুত্রও এক পুরাতন পুস্তকের দোকান হইতে সের বা মণ-দরে কতকগুলি অতি পুরাতন পুস্তক কিনিয়া আনিয়া একটা আলমারি সাজাইয়া রাখিল এবং কলেজের নিয়মিত নিদ্রায় ও প্রতি সন্ধ্যার উদ্দেশ্যহীন ভ্রমণে পরম সুখে জীবন যাপন করিতে লাগিল।

কার্ত্তিক ঘাসের উপর বসিয়া পড়িয়া নিকটস্থ পুষ্পবৃক্ষ হইতে একটা ডাল ভাঙ্গিয়া লইল এবং সপত্র সেই ডালটাকে মাটির উপর আছাড় মারিতে মারিতে বলিল, "কি কথা?"

শশিভূষণ দাঁত খুঁটিতে খুঁটিতে বলিল, "আমি এক মুস্কিলে পড়েছি। বুড়োবয়সে বাবা বল্‌ছেন, আবার বিয়ে কর। এখন এর উপায় কি?"

কার্ত্তিক কহিল, "বিশ-পঁচিশ বছরে কেউ বুড়ো হয় না। তুমি যদি বুড়ো হও, আমরা তাহ'লে কি প্রৌঢ় না কি!"

শশিভূষণ কহিল, "তুমি আমার চেয়েও বুড়ো। বয়স নিয়ে কি হবে? যাক্ ও কথা। এখন উপায় কি?"

কার্ত্তিক কহিল, "উপায় আবার কি! তোমার বাবা যখন ধরেছেন, তখন হয় বিয়ে কর, নয় সাফ লিখে দাও, কর্‌ব না।"

"লিখে না হয় দিলুম, কিন্তু কারণ কি দেখাব?"

"কারণ আবার কি। বিয়ে করা না করা তোমার ইচ্ছে।"

"উঁহুঃ আমার ইচ্ছে অনিচ্ছে ত নয়,—"

"তবে কার?"

"সেই কথাই তোকে বল্‌ব। আজ আমার ওখানে সন্ধ্যার সময় যাস্‌, সর্ব্বাকেও নিয়ে যাস্‌। ওকেই আমার বিশেষ দরকার।"

ইতিমধ্যে দেবনাথ নিকটে আসিয়া বলিল, "ওহে ঠাকুরদা, সতুর কথা শোনো, ও বলে কি যে ওর সে ইতিমধ্যে ওকে এমন সব পত্র লিখে ফেলেছে, যা বঙ্গসাহিত্যে কাউপারের letterএর স্থান অধিকার কর্‌বে!"

সত্যজীবন উত্তেজিত হইয়া বলিল, "তোমরা আমার কথা বিশ্বাস কর্‌ছ না?"

শশিভূষণ কহিল, "ওরা বিশ্বাস না করুক, আমি করি। প্রেম-পত্রের ঠেলায় এই যে এত-বড় দাড়ী দেখ্‌ছ, এর প্রত্যেক গাছিতে পাক ধ'রে গেছে। সতু ভাই, মাভৈঃ, আমি তোকে বিশ্বাস করি।"

সত্যজীবন কহিল, "ঠাকুরদা, ঠাট্টা কর্‌ছ? কিন্তু সেগুলো যদি তোমায় দেখাতে পার্‌তুম, তা'লে—

শশিভূষণ কহিল, "অমন কাজটি করো না, ভাই। প্রেমপত্র আর সব সইতে পারে, পকেটের বাইরে আসা শুধু সইতে পারে না। প্রেমেরও যেমন আঁধারে স্বভাব, প্রেমপত্রেরও তেমনি সর্দ্দির ধাত,—ঠাণ্ডা লাগিয়েছ, কি সর্ব্বনাশ!"

ইতিমধ্যে সে ঘণ্টা শেষ হইয়া যাওয়ায় বন্ধুগণের সভাভঙ্গ হইল এবং তাহারা তাড়াতাড়ি ক্লাসে ফিরিয়া আসন গ্রহণ করিল।

কলেজের ছুটী হইলে সর্ব্বানন্দ ও কার্ত্তিক তাহাদের বেনেটোলা লেনের মেশের একটা কক্ষে যাইয়া বস্ত্রাদি পরিবর্ত্তন ও কিঞ্চিৎ জলযোগ সারিয়া চাঁপাতলায় শশিভূষণের বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইল। শশিভূষণ একটা ষ্টোভে চায়ের জল চড়াইয়া ভৃত্য রঘুনাথ উড়েকে তামাক কিনিয়া না রাখার জন্য বকিতেছিল; এবং মাঝে মাঝে তাহার সযত্ন-বর্দ্ধিত দাড়ীর উপর সিগারেটের ছাই পড়াতে তাহাই ঝাড়িতে ঝাড়িতে রেলিংয়ের উপর দিয়া মুখ বাড়াইয়া দেখিতেছিল, সর্ব্বানন্দ ও কার্ত্তিক আসিতেছে কি না।

কার্ত্তিক ও সর্ব্বানন্দ আসিয়া পৌছিলে সে বলিল, "তোরা চা-ও খাবিনে, তামাকও খাবিনে, কি দিয়ে তোদের অভ্যর্থনা করি?"

সর্ব্বানন্দ বলিল, "মৃদু মধুর হাস্য দিয়ে।"

শশিভূষণ কহিল, "তাও ত ঐ দাড়ীর ফাঁকে মিলিয়ে যাবে।"

শশিভূষণ চা প্রস্তুত করিয়া পান করিতে লাগিল। ইত্যবসরে চাকর আসিয়া গড়গড়ায় তামাক সাজিয়া দিয়া গেল। একচুমুক করিয়া চা ও একটান করিয়া তামাক সেবন করিতে করিতে শশিভূষণ বলিল, "আজ তোদের কেন ডেকেছি, জানিস্?"

সর্ব্বানন্দ বলিল, "জানি বৈ কি! খুব বড়রকম একটা ভোজের আয়োজন কর্তে।"

শশিভূষণ কহিল, "হ্যাঁ, সে কথা ঠিক বটে! তবে কে যে তার খরচ জোগাবে, সেটা এখনও ঠিক হয় নি। যাক্, আজ আমার সঙ্গে এক জায়গায় তোদের যেতে হবে।"

কার্ত্তিক কহিল, "ভোজের জোগাড় কর্তে ত? খুব রাজি আছি।"

শশিভূষণ কহিল, "এখন ত বল্‌ছিস্, খুব রাজি, কিন্তু কোঁৎকা দেখে তখন যেন পেছুস্ নে।"

সর্ব্বানন্দ কহিল, "সে আবার কি, ঠাকুরদা? কোঁৎকা-টোৎকার ভয় থাকে ত' আমি ভাই তাতে নেই। গরীব পুঁটী মাছের প্রাণ, আমায় তুটো-একটা সন্দেশ টন্দেশ দাও ত কষ্টে-স্মৃষ্টে খেতে পারি।"

শশিভূষণ কহিল, "আগে থাক্‌তে ভয় পেলে কোন শক্ত কাজই করা যায় না। যাক, ভণিতা ছেড়ে, চল্, একটা কাজ করি আগে।"

শশিভূষণ উঠিয়া পাশের ঘরের দরজা খুলিল। এই ঘরটা সর্ব্বদাই বন্ধ থাকিত, কেহ কখনও শশীকে ও ঘর খুলিতে দেখে নাই এবং এ বিষয়ে প্রশ্ন করিলেও সে কখনও কোন উত্তর দিত না। আর হঠাৎ ঐ কক্ষ উন্মুক্ত হইলে সর্ব্বানন্দ উঁকি মারিয়া দেখিয়া বলিল, "ব্যাপার কি, ঠাকুরদা, আজ কি তোমার যক্ষের ধনাগার আমাদের দেখাবে না কি? এত অনুগ্রহ কেন আজ!"

শশী কোন উত্তর দিল না, গম্ভীর ভাবে উক্ত কক্ষের জানালা দরজা-গুলি খুলিয়া দিয়া মৃদু স্বরে বলিল, "এস তোমরা!"

তাহারা কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিল, কক্ষটী বেশ প্রশস্ত। পূর্ব্ব ও দক্ষিণ দিকের উন্মুক্ত গবাক্ষ হইতে আলো ও বাতাস আসিবার দিব্য বন্দোবস্ত রহিয়াছে। বাসার অন্যান্য কক্ষ হইতে এটি সর্ব্বপ্রকারেই শ্রেষ্ঠ। কক্ষের চারিদিকেই আলমারি। একটা জানালার সম্মুখে একটা বড়-রকমের টেবিল, এবং তাহার পার্শ্বস্থিত একটা র‍্যাকে নানা প্রকারের কেমিকেলের শিশি ও নানাবিধ যন্ত্র-পাঁতি। আলমারি গুলির ভিতরে বিপুলকায় পুস্তকাবলী; এবং সর্ব্বাপেক্ষা অদ্ভুত ব্যাপার, উত্তরের দেওয়ালের গায়ে একটা প্রকাণ্ড তৈল-চিত্র। চিত্রে একটী রমণী বিস্ফারিত নেত্রে কোন এক গবাক্ষের পর্দ্দা সরাইয়া আলোকের অবাধ প্রবেশের পথ উন্মুক্ত করিয়া দিতেছে। চিত্র তেমন কোন অসাধারণ সুন্দরীর নয়, তথাপি ঐ বিস্ফারিত-নেত্রা রমণীর মুখের উপর এমন একটা ভাব চিত্রকরের অসামান্য নৈপুণ্যে

ফুটিয়া উঠিয়াছে, যাহা দেখিবামাত্র বুঝা যায়, রমণীটী অন্ধ। তথাপি আলোকের জন্য তাহার একটা আন্তরিক ব্যাকুলতা চিত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিবামাত্র ধরিতে পারা যায়! চিত্রাঙ্কিতা রমণীর প্রত্যেক অঙ্গ-ভঙ্গী, এমন কি তাহার গাত্র-বস্ত্রের প্রত্যেক ভাঁজটী অবধি যেন চীৎকার করিয়া বলিতেছে, "আলো, আলো, আলো দাও, আমি একবার দেখি।"

সর্ব্বানন্দ ও কার্ত্তিকের মুখ হইতে হাস্যোপহাসের রেখা মুহূর্ত্তে কোথায় মিলাইয়া গেল। তৎপরিবর্ত্তে একটা গূঢ় বেদনায় ব্যথিত হইয়া উভয়েই যুগপৎ শশিভূষণের দিকে ফিরিয়া চাহিল। চাহিয়া দেখিল, শশিভূষণ একটা গবাক্ষের কাছে দাঁড়াইয়া বাহিরের দিকে নির্ব্বাক্ নিস্পন্দভাবে চাহিয়া আছে। কার্ত্তিক অতি সন্তর্পণে তাহার নিকটে গিয়া মৃদু কণ্ঠে বলিল, "ছবিখানা কার?"

শশিভূষণ না ফিরিয়া উদাসভাবে মৃদু স্বরে বলিল, "মানুষের আত্মার।"

সর্ব্বানন্দ শুনিতে না পাইয়া পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, "কার?"

শশিভূষণ মুদিত নেত্রে আর্দ্র কণ্ঠে বলিল, "আমার স্বর্গগতা স্ত্রী আশাময়ীর।"

বহুক্ষণ তিনজনে আর কোন কথাবার্ত্তা হইল না। পরে শশিভূষণ নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া বলিল, "আমি এ ছবি আজ পর্য্যন্ত বাবা ছাড়া আর কাকেও দেখাইনি। আমার এ ঘরের যা-কিছু দেখ্‌ছ, সবই ঐ ওঁরই জন্য। বিবাহের চার-পাঁচ বছরের পর ওঁর বাতশ্লেষ্মা বিকার হয়, তারপর বছর-দুই ভুগে উনি মারা যান। ঐ রোগেই ওঁর প্রথমে দুই চোখ যায়, শেষে সেই অবস্থাতেই উনি প্রাণ পর্য্যন্ত হারান। কিন্তু সেই ব্যারামের সময় আলোর জন্য তাঁর যে ব্যাকুলতা দেখেছিলুম, তা এ জীবনে কখনো ভুল্‌ব না। সেই ভাবটি তাঁর একটা সুস্থ সময়ের ছবির উপর আঁকিয়ে

নিয়েছি। আর সেই সময়ে একটা প্রতিজ্ঞা করেছি যে সারা জীবনে আমার আর কোন কাজ রইল না। কেবল সংসারে যারা অন্ধ, তাদের দৃষ্টি দেবার চেষ্টা কর্‌ব। ভগবানের আলো থেকে যারা বঞ্চিত, তাদের চোখে আলো ফোটাবার চেষ্টা করব। যদি তা না পারি ত এমন কোন উপায় কর্‌ব, যাতে চোখের অভাবের কষ্ট যৎকিঞ্চিৎও দূর হয়। এই যে সব বই এই আলমারিতে দেখ্‌ছ, এ সমস্তই চক্ষুরোগ সম্বন্ধে। এ সব ওষুধ-পত্রও তারই জন্য। ঐ তিনটে আলমারি হ'লে অনেক খরচ করে বিলেত থেকে বাঙ্গলা আর ইংরিজি বই raised অক্ষরে আমি transcribe করিয়ে আনিয়েছি। আমি নিজেও অনেক কষ্টে ঐ রকম transcription শিখেছি। তোমাদের কেন এ সব বল্‌ছি, তা' বলি। আমি একা আর এ কাজ পার্‌ছি না। তোমরা যদি আমায় এ কাজে সাহায্য কর, তাহলে অবশ্য তোমাদের তাতে কোন লাভ হবে না, কিন্তু ভগবানের শ্রেষ্ঠ আশীর্ব্বাদ থেকে বঞ্চিত যে-সব হতভাগারা আছে, তাদের অন্তরের আশীর্ব্বাদের যদি কোন মূল্য থাকে, তা তোমরা পাবে।"

শশিভূষণ নীরব হইলে সর্ব্বানন্দ দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "ঠাকুরদা, আমায় সঙ্গে নাও, আমি তোমায় সাহায্য কর্‌ব। আমার আর কেউ নেই যে আমায় বাধা দেবে!"

শশিভূষণ কহিল, "কিন্তু তোমায় মিছিমিছি খাটাতে চাইনে, তোমার এমন অবস্থা নয় যে একটা wild goose chaseএ বাজে কাজে সারাজীবন কাটাবে। তাই যাতে তোমার দিনপাত হয়, অথচ আমার কাজটাও সফল হয়, তা কর্‌ব। সেজন্য চিন্তা করো না।"

কার্ত্তিক হঠাৎ বলিয়া উঠিল, "আর আমি! আমায় কেন এ সব কথা জানালে, যদি কোন কাজ না দেবে?"

শশিভূষণ কহিল, "তোমার জীবনের লক্ষ্য আর পরিণতি ঠিক হয়ে

গিয়েছে। আমি তোমাকে অন্য পথে নিয়ে যেতে পার্‌ব না। তা যদি করি, তাহলে কালিকা কাকার ক্ষতি করা হবে।"

কার্ত্তিক কহিল, "কালিকাবাবুর ক্ষতি হবে বলে আমার নিজের কোন স্বাধীনতা থাক্‌বে না? আমি নিজের ইচ্ছে অনুসারে নিজের জীবন গড়ে তুল্‌তে পাব না? আমি কি তাঁর ক্রীতদাস যে তিনি আমাকে দিয়ে যা-ইচ্ছে তাই করিয়ে নেবেন।"

শশিভূষণ কহিল, "তোমার মত তেজী একগুঁয়ে লোককে নিয়ে আমার চল্‌বে না। তোমার সঙ্গে আলাপ করে বুঝেছি, তোমাকে আমি ঠিক আমার হাতের তেলোর মধ্যে ধরে রাখ্‌তে পারি, এমন শক্তি আমার নেই। তুমি যে কাজে আছ, তাতেই লেগে থাক, তাতেই তুমি যথেষ্ট উন্নতি কর্‌তে পার্‌বে,—তাতেই তুমি সংসারের অনেক উপকার কর্‌বে।"

কার্ত্তিক কহিল, "তা হবে না, ঠাকুরদা আমায় এই অন্যায় পরাধীনতা থেকে মুক্তি পেতে দাও, আমায় তোমার সঙ্গী করে নাও। আমি কলের পুতুল নই, আমাকে কেউ আট্‌কে রাখ্‌তে পার্‌বে না। আমি স্বাধীন।"

শশিভূষণ কহিল, "কার্ত্তিক, তোর হাত ধরে বলছি, তুই স্বাধীনতার অহঙ্কার করিস্‌ নে। জগতে কেউ স্বাধীন নয়—স্বাধীনতা মানে স্বেচ্ছাচারিতা নয়। যে স্বেচ্ছাচারী, সে কখনই পরার্থপর হতে পারে না। আজ কতদিন হল যে চলে গিয়েছে, সেও যদি পর-জগৎ থেকে আমাদের ইচ্ছেকে, আমাদের কাজকে তার ইচ্ছে দিয়ে চালাতে পারে, তাহলে যারা বেঁচে আছে, তাদের ইচ্ছে অনুসারে কেন আমরা চল্‌ব না? নিজেকে বড় করে দেখ্‌তে শিখ্‌লে, নিজের ইচ্ছেটা নীতির বাঁধ্‌কে ডিঙ্গিয়ে গেলে, তখন নিজেকে ছাড়া জগতের আর কাউকে দেখ্‌তে পাওয়া যায় না। এই দেখ, বাবা আমার সব জানেন, সব জেনেশুনেও

তিনি আমায় আবার তাঁর সংসারের মধ্যে টেনে নেবার চেষ্টা করছেন। তাঁর কষ্ট হচ্ছে বলে আমাকেও ফিরতে হবে। জানি না, হয়ত তাঁকে সুখী করবার জন্য বিয়েও বুঝি করতে হয়। বাবাকে বোঝাব, কিন্তু তিনি যদি না বোঝেন, আমার তখন আর কোন উপায় থাকবে না। সেইজন্যই সর্ব্বাকে তাড়াতাড়ি এই কাজে ঢোকাতে চাচ্ছি।"

কার্ত্তিক কহিল, "কিন্তু সর্ব্বদাদাও ত স্বাধীন নয়।"

শশিভূষণ কহিল, "ও সম্পূর্ণ স্বাধীন নয় বটে, তবু কতকটা স্বাধীন। কারণ প্রথমতঃ ওর নিজের বলতে কেউ তেমন নেই, যার মুখ চেয়ে ওকে থাকতে হবে। আর কালিকা কাকা? তিনি ওর ভালবাসা আর সম্মান ছাড়া ওর উপর অন্য কিছুরই দাবী রাখেন না। এ সংবাদ আমি জানি, তাই ওকে আমার কাজে ডেকে নেবার চেষ্টা করছি।"

কার্ত্তিক কহিল, "কালিকাবাবুরই অর্থ-সাহায্যে ওর সমস্ত হচ্চে, অথচ ও মুক্ত! আর আমার ওপর তাঁর লুব্ধ দৃষ্টি আছে বলে আমি বদ্ধ!"

শশিভূষণ কহিল, "লোভ! কালিকা কাকার এত বড় অপমান তুই করলি? তোর মুখ না দেখাই উচিত। যিনি তোকে এত ভালবাসেন যে তোর হাতে তাঁর সর্ব্বস্ব অর্পণ করতে এক মুহূর্ত্ত দ্বিধা করবেন না, তাঁকে বলছিস্, লোভী! এতখানি ভালবাসার এত-বড় অপমান করতে তোর সাহস হল! না কার্ত্তিক, আমি তোমায় চাই না।"

কার্ত্তিক মৌন হইয়া রহিল, কিন্তু তাহার সমস্ত দেহের মধ্যে একটা প্রচণ্ড অভিমান ও ক্রোধের উষ্ণ রক্তস্রোত বহিতে লাগিল। তাহার মুখের ভাব দেখিয়া সর্ব্বানন্দ তাহার হাত ধরিয়া বলিল, "কার্ত্তিক, ভাই, আমায় ক্ষমা কর!"

কার্ত্তিক কহিল, "ক্ষমা! ক্ষমা আমি আমাকেই করতে পারছি না

তা তোমাকে! আমি কাউকে ক্ষমা কর্‌ব না। আমি তোমায় ছাড়্‌ব না, তোমাকে দিয়েই আমার স্বাধীনতা কিনে নেব।"

শশিভূষণ সহসা উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "কথায় কথায় বেলা গেল। চল, আজ যেখানে তোমাদের নিয়ে যাব বলেছিলুম, সেইখানে নিয়ে যাই। কার্ত্তিক, ভাই, সেখানে গিয়ে সব অবস্থা দেখেও যদি না তুমি আমাদের ক্ষমা কর্‌তে পার, যদি না কেমন করে নিজের ইচ্ছেকে দমন করে পরের জন্য নিজেকে উৎসর্গ কর্‌তে হয় শিখ্‌তে পার, তাহলে বুঝ্‌ব, তোমার আর কোন আশা নেই।"

৪

বাগবাজারে এক গলির মোড়ে এক দ্বিতল অট্টালিকার সম্মুখে শশিভূষণ ও তাহার বন্ধুদ্বয় আসিয়া দাঁড়াইল। তখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। বড় রাস্তা ও গলির সব আলোগুলাই জ্বলিয়া উঠিয়াছে এবং অনতিদূরস্থিতা গঙ্গার যে অংশ দেখা যাইতেছিল, তাহাতেও অসংখ্য সচল আলোক-বিন্দু ভাসিয়া বেড়াইতেছে।

শশিভূষণ কড়া ধরিয়া কোন এক কৌশলে টানিবামাত্র ভিতর হইতে দরজা খুলিয়া গেল। শশিভূষণ বন্ধুদের লইয়া ভিতরে ঢুকিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিল।

বন্ধুদ্বয় প্রবেশ করিয়া দেখিল, গৃহটি বাহির হইতে যেরূপ মনে হইয়াছিল, সেরূপ নয়। উঠানটি বেশ প্রশস্ত। উঠানের চারিদিকেই বারান্দা এবং সেই বারান্দা নানাজাতীয় পুষ্পিত ও অপুষ্পিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লতায় শোভিত। সমস্ত বাড়ীটি বৈদ্যুতিক আলোকে আলোকিত। দেখিলেই বুঝা যায়, যেন সমস্ত বাড়ী হইতে চেষ্টা করিয়া অন্ধকারকে দূর করা হইয়াছে। যেখানে আলোর কোন প্রয়োজন নাই, সেখানেও

হয়ত একটা বড় টবে বড় একঝাড় জুঁই ও তাহার উপর একটা আলোকাধার হইতে আলোক বিকীর্ণ হইয়া স্তবকে স্তবকে প্রস্ফুটিত শ্বেতপুষ্পের অমল শুভ্রতা আরও বাড়াইয়া তুলিয়াছে। উঠানটির মাঝখানে গোলাকার বেদী ; তাহার উপরও একটা প্রকাণ্ড চিনামাটির টবে একরাশ গন্ধরাজ ফুটিয়া রহিয়াছে!

বন্ধুদ্বয় অধিকক্ষণ ধরিয়া এই সমস্ত পর্য্যবেক্ষণ করিবার সময় পাইল না, কারণ দুইটী বালক ও একটী বালিকার সঙ্গে এক সুবেশা রমণী আসিয়া অপর দিকের বারান্দায় দাঁড়াইয়া বলিল, "শশিদা, মার জ্বর আজ বেড়েছে, তোমায় ডাক্‌ছেন।"

শশিভূষণ কহিল, "সরোজ, এদের নিয়ে গিয়ে আমার ঘরে বসাও। আমি যাচ্ছি।"

শশী তাড়াতাড়ি একটী সোপান অবলম্বনে উপরে চলিয়া গেল। রমণী, বন্ধুদ্বয়ের নিকটে আসিয়া বলিল, "আসুন আপনারা।"

কার্ত্তিক ও সর্ব্বানন্দ দেখিল, রমণী সুন্দরী, বয়স অনুমান সতেরো আঠারো বৎসর হইবে। সে যে-ভাবে তাহাদের নিকট আসিয়া দাঁড়াইল, তাহাতে যথেষ্ট লজ্জাহীনতা প্রকাশ পাইল বটে, কিন্তু তাহার মুখের দিকে চাহিয়া উভয় বন্ধুই নিমেষে বুঝিল, রমণী দৃষ্টি-শক্তি-হীনা। যদিও সুন্দর মুখখানির উপর দুইটী আয়ত নয়ন লজ্জা-সঙ্কোচহীন সৌন্দর্য্যে ফুটিয়া রহিয়াছে, তথাপি তাহাতে অন্ধজন-সুলভ উদ্দেশ্যহীনতা প্রকাশ পাওয়ায় উভয় বন্ধুরই সমস্ত সঙ্কোচ মুহূর্ত্তে কাটিয়া গেল। এক দুর্ভেদ্য অন্তরালে অবস্থিত নরনারীর মধ্যে যেমন কোন সঙ্কোচের প্রয়োজন থাকে না, তেমনই কার্ত্তিক ও সর্ব্বানন্দ তাহাদের সমস্ত দ্বিধা ত্যাগ করিয়া বলিল, "চলুন।"

রমণী, বালক-বালিকাদের নিকটস্থ হইয়া বালকদ্বয়কে বলিল,

"তোমরা সুকুকে নিয়ে রঘুকাকার কাছে গিয়ে গল্প শোনোগে—আমি এঁদের নিয়ে ওপরে যাচ্ছি। সুকু এদের সঙ্গে যাও।

বালকদ্বয়ের মধ্যে একটী বালক নিকটে আসিয়া কার্ত্তিককে স্পর্শ করিয়া বলিল, "আপনি কি সর্ব্বদাদা?"

কার্ত্তিক বলিল, "না, আমি কার্ত্তিকদাদা?"

তার পর উহার হাতখানি সর্ব্বানন্দর গায়ে ছোঁয়াইয়া বলিল, "উনিই তোমার সর্ব্বদাদা।"

সর্ব্বানন্দ বালকটিকে হস্ত দ্বারা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "চল, তোমরা আজ আমার কাছেই থাক্‌বে। তোমার নাম কি ভাই?"

বালক বলিল, "আমার নাম শ্রীমণীশচন্দ্র ঘোষ, ওর নাম শ্রীজ্যোতিপ্রসাদ রায়। আর সুকুর নাম, শ্রীমতী সুকুমারী দেবী।"

কিশোরীটি হাসিয়া বলিল, "আর আমার নাম বল্‌লিনে?"

মণীশ বলিল, "তোমার নাম কি তুমি এতক্ষণও বল নি? আপনারা সরোদিদির নাম জানেন না?"

সর্ব্বানন্দ কহিল, "এই ত জান্‌লুম। চল ওপরে যাই।"

কার্ত্তিক দেখিল, রমণী অন্ধ বটে কিন্তু অভ্যাসের জন্য এমনভাবে চলিতেছে যেন সে সমস্তই দেখিতে পাইতেছে। সোপান অতিক্রম করিয়া সে উপরে উঠিল, এবং পথে যে সমস্ত বস্তু ছিল, অনায়াসে তাহাদের পাশ কাটাইয়া একটী কক্ষের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "ভিতরে চলুন।"

কার্ত্তিক ও সর্ব্বানন্দ কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিল, উহার সাজসজ্জা একটু অন্য ধরণের, এটি যেন পাঠ-কক্ষ। সমস্ত বাড়ীর প্রত্যেক গলি-ঘুঁজিও যেমন নানারূপ চিত্রাদিতে পরিশোভিত, এই কক্ষে তেমন কিছুই নাই। ইহাতে কেবল আলমারি, টেবিল ও পুস্তকের রাশি।

কক্ষের মধ্যস্থলে একটা বড়-রকমের ফুলের তোড়ার মত বৈদ্যুতিক আলোকের তোড়া কড়িকাঠ হইতে ঝুলানো রহিয়াছে।

কক্ষের মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া কার্ত্তিক সর্ব্বানন্দকে বলিল, "সর্ব্ব-দা, আজ যেন আমার প্রথম চোখ ফুটল। আগে জানতুম না, আলো এত সুন্দর!"

সর্ব্বানন্দর উত্তর দিবার পূর্ব্বেই মণীশ বলিয়া উঠিল, "আমি ছেলেবেলায় আলো দেখেছি; কিন্তু জ্যোতি বলে, আলো কেমন, জানিনে। ও বলে, আলো নেই, ও-সব মিছে কথা।"

সর্ব্বানন্দ কহিল, "সুকু কি বলে?"

সুকুমারী আর জ্যোতিপ্রসাদ বাহিরেই দাঁড়াইয়াছিল। তাহাদের দিদি ঘরে প্রবেশ না করিলে তাহারা প্রবেশ করিবে না। এইভাবে তাহাদিগকে রমণীর অঞ্চল ধরিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া কার্ত্তিক বলিল, "আপনারা ভিতরে আসুন, আর আমাদের কাছে সঙ্কোচ করবার প্রয়োজন নেই, আমরা আপনাদের আত্মীয়।"

রমণী প্রবেশ করিয়া বলিল, "সঙ্কোচ করবার আর আমাদের উপায় কৈ? যার জন্য সঙ্কোচ, তাই আমাদের নেই।" সর্ব্বানন্দ সসঙ্কোচে বলিল, "আপনি জন্মাবধিই কি এই রকম?"

সরোজ কহিল, "কি রকম সে কথা বলতে সঙ্কোচ বোধ করছেন কেন? আপনাদের চোখ আছে, তাই এ বিষয়ে আপনাদের হার! আমাদের চোখ যেদিন থেকে গিয়েছে, সেইদিন থেকে ও বাধাটুকুও দূর হয়েছে। এখন আমাদের পক্ষে সবই সমান। আমি জন্মান্ধ নই, এখনও আমার চোখে সম্পূর্ণ অন্ধকার নেমে আসেনি—ঐ আলোর একটা অস্পষ্ট আভাস আমি পাচ্ছি—যেন একটা পুরু কাপড়ের মধ্য দিয়ে আলো আসছে। আমার যখন আট-ন' বছর বয়স, তখন থেকে আমার চোখের দোষ দেখা দেয়, তার পর ক্রমশঃ আমার এই অবস্থা দাঁড়িয়েছে।"

কার্ত্তিক কহিল, "আপনার আবার সেই পূর্ব্বাবস্থা পেতে ইচ্ছা করে না ?"

কথাটা শুনিবামাত্র সর্ব্বানন্দ লজ্জিত হইয়া ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে কার্ত্তিকের পানে চাহিল। কিন্তু নির্লজ্জ কার্ত্তিক নির্ব্বিকার চিত্তে সরোজিনীর দিকে উত্তরের প্রতীক্ষায় চাহিয়া রহিল। সরোজিনী তাহার দৃষ্টি-শক্তি-হীন বিশাল চক্ষু কার্ত্তিকের মুখের উপর স্থাপিত করিয়া বলিল, "হারানো জিনিস কে না ফিরে চায় ?"

কার্ত্তিক কহিল, "আর যার কিছু হারায়নি ? যে জন্মান্ধ ?"

সরোজ কহিল, "তার কি হয়, তা এই সুকুকে জিজ্ঞাসা করুন। কেমন সুকু, তুই আলো দেখ্‌তে চাস্‌ ?"

সুকুমারী মাথা নাড়িল। সরোজ তাহার পিঠে হাত দিয়া বলিল, "তা লজ্জা কি, বল্‌ না ?"

সুকুমারী মৃদু স্বরে বলিল, "আলো যে কি, তাই আমি বুঝিনে।"

সর্ব্বানন্দ বলিল, "আমি তোমায় বুঝিয়ে দেব সুকু, তুমি আমার কাছে এস।"

সরোজিনী তখন হাসিয়া বলিল, "আপনারা তাহলে এদের সঙ্গে আলাপ করুন, আমি আপনাদের জলখাবারের জোগাড় করে আনি।"

সে বাহির হইয়া গেলে সর্ব্বানন্দ কার্ত্তিককে বলিল, "কার্ত্তিক, তোর একটুও বুদ্ধিশুদ্ধি নেই ! কি করে ও কথা ওঁকে জিজ্ঞাসা কর্‌লি ?"

কার্ত্তিক কহিল, "অন্ধের কাছে লজ্জা বা সঙ্কোচ দেখানো আর একটা অন্ধতা।"

সর্ব্বানন্দ কহিল, "উনি অন্ধ হলেও স্ত্রীলোক ত !"

কার্ত্তিক কহিল, "ওটাও একটা অন্ধতা ! তুমি দেখ্‌তে পাচ্ছ বলে ওঁকে বল্‌ছ, স্ত্রীলোক ! যদি না দেখ্‌তে পেতে, তাহলে উনি স্ত্রীলোক

কি পুরুষ, তা-নিয়ে কোন প্রশ্নই উঠ্‌ত না। এ স্ত্রীলোক, ও পুরুষ, এ সমস্তই চক্ষুষ্মানের অন্ধতার ফল। আমি তোমার মত অন্ধ নই, তাই ওঁকে কেবল মানুষ বলেই দেখ্‌ছি।"

সর্ব্বানন্দ আর কোন উত্তর না দিয়া বালক-বালিকাদের সহিত আলাপ আরম্ভ করিয়া দিল। কিছুক্ষণ পরে শশিভূষণ সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া বলিল, "দেরী হয়ে গেল—কি কর্‌ব? আমার শাশুড়ীর জ্বর বেড়েছে। আজ বোধ হয় তোমাদের সঙ্গে ফির্‌তে পার্‌ব না। সরোজ কৈ? তোমাদের জল-টল দেয় নি যে এখনও!"

কার্ত্তিক কহিল, "তিনি তোমার চেয়ে কম বুদ্ধিমতী নন। আমরা যে দুর্ভিক্ষপীড়িত অতিথি, সে কথা তিনি আগেই বুঝ্‌তে পেরেছেন, আর তারই জোগাড়ে গেছেন।"

শশিভূষণ কহিল, "এই অন্ধের বাথানে পড়ে তোমাদের কষ্ট হয়নি ত?"

কার্ত্তিক কহিল, "এত কষ্ট হয়েছে যে ইচ্ছে কর্‌ছে, আমিও অন্ধ হয়ে গিয়ে এই রকম করে তোমাদের সেবা নি। যোদ্ধা, তোমার শ্বশুর-মশায় সুন্দর বাড়ী, লোক-জন, সব ফেলে মলেন কি করে, আমি তাই ভাব্‌ছি—আর আশ্চর্য্য হচ্ছি!"

শশিভূষণ কহিল, "তিনি ডাক্তার ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁর মনটির মধ্যে বোধ হয় কবিতা দেবী সর্ব্বদাই উঁকি-ঝুঁকি মার্‌তেন।"

সর্ব্বানন্দ কহিল, "ভাই অমন লঘুভাবে তাঁর বিষয় নিয়ে কথা বলো না। ঠাকুরদা, এই সরোজ তোমার কে হয়?"

শশিভূষণ কহিল, "সরোজের পরিচয় এখনও পাওনি? এতক্ষণ পর্য্যন্ত যে তার থলি খালি হয়নি, এইটেই আশ্চর্য্য! ওর পরিচয় তবে দি। ও আমার শাশুড়ীর গুরুদেবের নাতনী। অন্ধ হবার পর থেকে ওর

চিকিৎসার জন্য শ্বশুর-মশায় ওকে এখানে নিয়ে আসেন। সেই থেকে ও এই হতভাগার জোগাড়-করা সম্পত্তি। শাশুড়ীর কন্যাটী মারা যাবার পর থেকে, কি জানি কেন হঠাৎ তাঁর খেয়াল ওঠে যে, গরীব-দুঃখীর অন্ধ ছেলে-মেয়েদের চোখের চিকিৎসায় তাঁর স্বামীর ত্যক্ত সমস্ত সম্পত্তি তিনি ব্যয় কর্‌বেন। এমন সময় আমি জুটে পড়ে তাঁকে আমার খেয়ালে যোগ দিতে অনুরোধ করি। তার পর থেকে এই যা দেখ্‌ছ। এরা ছাড়া আরও দু-চারটি ছেলে-মেয়ে এখানে আসে, কিন্তু তারা দিনে আসে দিনেই চলে যায়। সরোজের উপরই এদের সব ভার। সেই প্রোফেসর, আমি প্রিন্সিপাল মাত্র, যখন খুসী আসি, যখন খুসী চলে যাই।"

তাহাদের কথাবার্ত্তা চলিতেছে, এমন সময় সরোজিনী একজন দাসীর সাহায্যে তিনখানি রেকাবিতে মিষ্টান্নাদি লইয়া কক্ষে প্রবেশ করিল। শশিভূষণ হাসিয়া বলিল, "সরোজ, এই রকম করে কি তুমি অতিথি-সেবা কর না কি? অতিথিরা ত তৃষ্ণায় ছাতি ফেটে মর্‌বার মত হয়েছিল,—আগে থেকে জোগাড় করে রাখনি কেন?"

সরোজ কহিল, "তুমি যে আজই এঁদের আন্‌বে, তা ত বলে যাওনি। আপনারা ত্রুটি মার্জ্জনা করে মিষ্টিমুখ করুন।"

কার্ত্তিক কহিল, "ঠিক! আপনার যথেষ্ট বুদ্ধি আছে বটে, ঘুষ দিয়ে আগে মুখ বন্ধ করে দিন, তার পর আর আমাদের কিছুই বল্‌বার থাক্‌বে না।"

শশিভূষণ কহিল, "তোমার মত জ্যাঠা মশায়ের মুখে ঘুসি মার্‌লেও মুখ বন্ধ হবে না, তা ঘুষ! যাক্‌ লেগে পড়ি, এস। সরোজ, আমার চা কৈ?"

সরোজ কহিল, "সে আর বল্‌তে হবে না। লোকজন বেশী দেখে রঘুদা বামুন ঠাক্‌রুণের হাঁড়ি নামিয়ে বড় কেট্‌লিতে জল চাপাবার

চেষ্টায় ছিল, আমি বারণ করে দিয়ে ষ্টোভে চড়িয়েছি। আগে জল খেয়ে ঠাণ্ডা হও, তার পর চা খেয়ে গরম হয়ো। বিন্দি, তুই দেখ্‌গে, জল হ'ল কি না।"

বিন্দি দাসী চলিয়া গেলে শশী রাগিয়া বলিল, "এই যে দেখ্‌ছ ব্রাহ্মণীটিকে, ইনি চোখের মাথা খেয়ে অবধি লজ্জার মাথাও খেয়েছেন! ওগো, দুটো অপরিচিত মানুষ এখানে আছে, দেখ্‌তে পাচ্ছ না?"

সরোজ তাহার অন্ধ স্বভাবের বহির্ভূত ভাবে একটু জোরে হাসিয়া বলিল, "কি করে দেখ্‌তে পাব? আশাদিদি গিয়ে পর্য্যন্ত তুমি এমনই অন্ধকার হয়ে দাঁড়িয়েছ যে, আমাদের অন্ধকারও তোমার আগমনে তিন গুণ বেশী হয়ে দাঁড়ায়, তা দেখ্‌ব কি?"

শশিভূষণ কার্ত্তিকের পানে ফিরিয়া বলিল, "এঁর আক্কেলটা ত শুন্‌লে তোমরা! নিজের চক্ষুদুটো খেয়েও তৃপ্তি নেই! আবার আমার দুটীর উপরও টাঁক কর্‌ছ?"

সরোজ তেমনি হাসিতে হাসিতেই উত্তর দিল, "ধৃতরাষ্ট্রের চোখ ছিল এমন অপবাদ ত অতি বড় শত্রুতেও দিতে পারেনি। তাইতেই ত আমার আশাদিদি গান্ধারীর মত চোখ ঢাকেন। তোমার চোখ ছিল কবে যে, তা খাব?"

শশিভূষণ হতাশভাবে মাথায় হাত দিয়া বসিয়া কার্ত্তিক ও সর্ব্বানন্দর পানে চাহিতে লাগিল। কার্ত্তিক অত্যন্ত হাসিতে হাসিতে বলিল, "আঃ ঠাকুরদা, তোমার এমন হার—এ আমাদের পক্ষে যে কি উপভোগের জিনিস, তা আর কি বল্‌ব?"

সর্ব্বানন্দ এই সকল হাস্য-পরিহাসে যোগ দিতে না পারিয়া মণীশের হাতে একটা রসগোল্লা দিয়া বলিল, "এটা কি বল ত?" মণীশ নির্ব্বিবাদে সেটা উদরসাৎ করিয়া বলিল, "রসগোল্লা।"

কার্ত্তিক তাহার হাতে সর্ব্বানন্দর রেকাবিটা উঠাইয়া দিয়া বলিল, "বোকা কোথাকার! বল্‌তে হয়, আরও দু-চারটে না পেলে বুঝ্‌ব কি করে?"

বালক রেকাবি নামাইয়া দিয়া বলিল, "আমরা জল খেয়েছি সর্ব্বদাদা, আপনি খান।" জ্যোতিপ্রসাদের বোধ হয় প্রসাদ পাইবার ইচ্ছা হইয়াছিল, তাই সে একটু নড়িয়া-চড়িয়া বসিল। কার্ত্তিক তাহার ও সুকুমারীর হাতে সন্দেশ দিতে উদ্যত হইলে শশী বলিল, "ওরে শূয়ার, মেশে পৌঁছুতে রাত দশটা বেজে যাবে। বোকামি করিস্ নে, খেয়ে ফেল।"

ইতিমধ্যে বিন্দি দাসী তিন পেয়ালা চা লইয়া উপস্থিত হইল। সর্ব্বানন্দ জিজ্ঞাসা করিল, "তিন পেয়ালা কেন? আমরা ত চা খাই না।"

শশিভূষণ কহিল, "সরোজ আজ তোমাদের জাত মার্‌বে ঠিক করেছে। ওর হাতে যখন পড়্‌তে যাচ্ছ, আর আমার সাকরেদী যখন নিতে চলেছ—"

সরোজ কহিল, "তখন আপনাদের চক্ষু দুটীও যাবে, বুদ্ধিও খোঁড়াবে! আরও যে কি সব বিপদ ঘট্‌বে, তা মনেই আন্‌তে পার্‌ছি নে।"

কার্ত্তিক কহিল, "তার আর আশ্চর্য্য কি! এ বাড়ীর সমস্ত স্থানই বোধ হয় চক্ষু রোগের বীজাণুতে পরিপূর্ণ। আর কথায় বলে, সংসর্গজা দোষগুণা ভবন্তি।"

শশিভূষণ কহিল, "এই রে সর্ব্বনাশ কর্‌লে! সংস্কৃত আউড়েছ কি মরেছ! ঐ যে দেখ্‌ছ ব্রাহ্মণীটিকে, উনি এই আমার মত বর্ব্বরকে দিয়েও দু'খানা সংস্কৃত বই transcribe করিয়ে নিয়েছেন। অতএব চেপে যা, কার্ত্তিক, যদি ও টের পায় যে তুই ভাল সংস্কৃত জানিস্, তাহলে

তোকে এমন চৌচাপটে ধরে বস্‌বে যে, আর তোকে উদ্ধার করা যাবে না। তখন রোজ এসে একখানা করে বই শুনিয়ে যেতে হবে। বাইরের দুটি চক্ষুর মাথা খেলে কি হয়—ভিতরের আর একটি চোখকে দেবী খুব উজ্জ্বলভাবেই জগতের উপর স্থির রেখেছেন। ওঁর সেই তৃতীয় নয়নের দৃষ্টিলাভটি যার কপালে ঘটে, তার আর সহজে নিস্তার নেই! তাছাড়া—"

শশী কি বলিতে গিয়া থামিয়া গেল, কারণ সরোজ এবার সত্যই লজ্জিত হইয়াছিল। কার্ত্তিক কিন্তু থামিবার পাত্র নহে। এই অন্ধ নারীর সঙ্কোচহীন আলাপে তাহার মাথার মধ্যে এক অপূর্ব্ব খেয়াল জাগিয়া উঠিয়াছে। সরোজের অন্ধ-নয়নের অন্ধকারের ব্যবধান দুই হাতে সরাইয়া তাহার মনের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিবার একটা উদ্দাম চেষ্টা তাহাকে পাইয়া বসিল। সে বলিল, "আমি রাজী আছি।" শশী এইবার শঙ্কিত হইয়া বলিল, "তা হয় না, কার্ত্তিক! আমিই এ ক্ষেত্রে ওঁর একমাত্র কর্ণধার হয়ে থাক্‌বার দাবী রাখি। সে দাবীর স্বত্ব আর কাউকে বিলিয়ে দিতে পার্‌ব না।"

সরোজ ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, "বটে! আমরা যাই পৃথিবীতে আছি, তাই তোমার মত অকেজো লোকের দিনপাত হয়! তা স্বীকার না করে উল্টে কর্ণধারের খবর! আমরাই বরং এ কথা বল্‌তে পারি, তা জান!"

শশিভূষণ কৃতাঞ্জলি-পুটে নিজের কান সরোজের হাতের দিকে অগ্রসর করাইয়া দিয়া বলিল, "দেবি, ভৃত্যের অবিনয় ক্ষমা করে তার কর্ণটি করপল্লবে ধারণ করে এই দেবী যে জগতে মাত্র একা এরই, এটি সর্ব্ব-সমক্ষে প্রমাণিত করে দাসকে কৃতার্থ কর।"

সরোজ সে কথা কানে না তুলিয়া নিজ-মনে বলিল, "দয়ার দাবী জগতের প্রত্যেকেরই আছে। এ কারও স্বত্বের বস্তু নয়, কার্ত্তিক বাবু, আপনার ইচ্ছা হলেই স্বচ্ছন্দে আপনি আস্‌বেন।"

কার্ত্তিক এতক্ষণে রুদ্ধ নিশ্বাসকে মুক্ত করিয়া দিয়া বলিল, "বাঁচ্‌লুম্‌! আপনাদের রাজায়-রাজায়-যুদ্ধে উলু খড়ের প্রাণ যাবার যোগাড় হয়েছিল, আর কি! আপনার অভয়-বাণীই আমার পক্ষে যথেষ্ট।"

শশিভূষণ তাহার আশঙ্কাকে যথাসাধ্য দমন করিয়া কৃত্রিম কোপে চক্ষু রাঙ্গাইয়া বলিল, "তবে রে অকৃতজ্ঞ! একেবারে ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস্‌ খাওয়া! তুই কি ভেবেছিস, ঢুকে পড়্‌লেই হ'ল! এ সভার যোগ্য সভ্য হওয়ার যোগ্যতা তোর হাড়ের দিক্‌ দিয়েও যে নেই। তখন পালাবার পথ পাবি না, তাই বল্‌ছি, এইবেলা সাবধান হ।"

কার্ত্তিক অকুণ্ঠিত মুখে হাসিতে হাসিতে বলিল, "যোগ্যতা কি এক-দিনেই পাওয়া যায়? কতদিনের সাধনায় ক'বছর এফ-এ ফেল্‌ করে এমন যোগ্য হয়ে দাঁড়িয়েছ, বল দেখি? তেমনি—"

সর্ব্বানন্দ এতক্ষণে বাধা দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "চল কার্ত্তিক, আর না! ঠাকুরদা, আজ আমরা আসি।" কার্ত্তিককে একটু অনিচ্ছুক বুঝিয়া সে আবার বলিল, "মেশের ঠাকুর হয় ত এতক্ষণ চলে গেছে, আর দেরী নয়।" শশিভূষণ সাগ্রহে বলিল, "আজ না হয় এইখানেই সে কাজটা সারো! এই ব্রাহ্মণী দ্রৌপদীটির তত্ত্বাবধানে মেশের চেয়ে সে কাজটা এখানে একটু পরিপাটী রকমেই সম্পন্ন হবে।" সর্ব্বানন্দ রাজী হইল না, অগত্যা কার্ত্তিকও বাধ্য হইয়া তাহার অনুসরণ করিল।

৫

এ বৎসর ভীষণ বর্ষায় শিবরামপুর ও তন্নিকটস্থ বহু গ্রাম ডুবিয়া যাওয়ায় প্রজারা অত্যন্ত কষ্ট পাইতেছিল। জলের জন্য ধান্যাদির আবাদের ত যথেষ্টই ক্ষতি হইয়াছিল; তাহার উপর ম্যালেরিয়ার প্রকোপ অত্যন্ত বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং খাদ্যের অভাবে দলে দলে গবাদি পশুর মৃত্যু ঘটায়

জমিদার কালিকামোহন অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। তাঁহার নিজের আমলাদের মধ্যেও অনেকে জ্বরাক্রান্ত হইয়া খাজনা-আদায়াদি কার্য্যের অসুবিধা ঘটাইয়াছে। তাঁহার দুর্দ্ধর্ষ পাইক ও দরোয়ানদের মধ্যেও অনেকে শিবরামপুরের "ঘিউ-রোটীর" মায়া ত্যাগ করিয়া দেশে পলাইয়াছে। কেবল তাঁহার প্রধান শরীর-রক্ষী ঘনবরণ সিং দুই-তিনবার উল্টান্-পাল্টান্ খাইয়াও তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া যায় নাই। অন্তঃপুরেও অনেকে জ্বরাক্রান্ত হইয়াছে। শৈলজা স্বয়ং দুইবার শয্যাগ্রহণ করিয়া এখন তাহার মাতার সেবা করিতেছে। কালিকাবাবু একাকী সমস্ত গ্রামের তত্ত্বাবধান ও স্বীয় গৃহে ঔষধাদির ব্যবস্থা করিতে করিতে আজ দুইদিন হইতে ক্রমাগত কুইনিন সেবন করিয়া কোন প্রকারে হাঁটিয়া বেড়াইতেছেন। এমন সময় কোথা হইতে এক বেনামী পত্র আসিয়া তাঁহার কপালের চিন্তা-রেখাটিকে স্পষ্টতর করিয়া তুলিল। তিনি ব্যস্ত হইয়া ন্যায়রত্ন মহাশয়কে ডাকিয়া পাঠাইলেন। শিবচন্দ্র আসিলে তাঁহাকে সে পত্র দেখাইবামাত্র তিনি বলিলেন, এ কোন শত্রুর কাজ। কার্ত্তিক ও সর্ব্বানন্দর উন্নতিতে যারা হিংসান্বিত, তারাই এরূপ পত্র লিখ্‌তে পারে। মনোহরবাবুর ছেলেটি কি ইতিমধ্যে কোন পত্র দেয়নি?" কালিকাবাবু বলিলেন, "আজ কয়মাস হইতে তাহারও কোন পত্র পাওয়া যায় নাই।" শিবচন্দ্র বলিলেন, "শশিভূষণকে পত্র লিখিয়া না হয় এ বিষয়ে অনুসন্ধান করা হোক।" কালিকাবাবু মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "এ বিষয়ে তাহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে তাঁহার লজ্জা বোধ হইতেছে।" তাহাদের সম্বন্ধে এরূপ সন্দেহ করাও তাঁহার মতে অন্যায়। তথাপি অভিভাবকের কর্ত্তব্যানুসারে এ বিষয়ে অনুসন্ধান না করাও অন্যায়, এই জন্যই তিনি তাঁহার এটর্ণি শ্যামসুন্দরবাবুকে পত্র দিবেন স্থির করিয়াছেন। শিবচন্দ্র ন্যায়রত্নেরও তাহাই সমীচীন বলিয়া বোধ হইল।

ন্যায়রত্নের পত্নী মনোরমা দেবী কিন্তু বেনামী পত্রের কথা শুনিয়া ক্রোধে অধীর হইয়া বলিলেন, "কার্ত্তিককে যা'রা সন্দেহ করে বা তার বিরুদ্ধে যা'রা কুৎসা রটায়, হোক্ না কেন তারা যত বড় মারণ-উচাটন-বশীকরণ-পটু সাধু-সন্ন্যাসী, তবু তাদের মুখ খসে যাবে।" তাঁহার এই অভিমত কোন গূঢ় উপায়ে দেওয়ান-পত্নী নিস্তারিণী দেবীর শ্রুতিগোচর হইলে তিনিও গম্ভীরভাবে বলিলেন, "যদি সে পাপিষ্ঠা এই কথা বলিয়া থাকে, তাহা হইলে শঙ্করানন্দের ক্রোধানলে শীঘ্রই যেন সে ভস্মীভূতা হয়!"

কিন্তু কালিকাবাবু তাঁহার এটর্ণির নিকট হইতে যে পত্র পাইলেন, তাহা মোটেই আশাপ্রদ হইল না। তিনি লিখিয়াছেন, আজকাল সর্ব্বানন্দ ও কার্ত্তিকের পড়াশুনায় বিশেষ অমনোযোগ লক্ষিত হইতেছে এবং তাহারা প্রায় প্রতি সন্ধ্যায় এবং ছুটির দিনে সমস্ত সময়টুকুই বাহিরে কাটায়। কোথায় যায় সে সংবাদ এখনও 'টোর্ণি' মহাশয় সংগ্রহ করিতে পারেন নাই, তবে শীঘ্রই সে সংবাদ তিনি সংগ্রহ করিবেন, এমন আশাও দিয়াছেন।

কালিকা বাবু এ পত্র পাইয়া মর্ম্মাহত হইলেন। সন্দেহ ক্রমশঃ বিশ্বাসে পরিণত হইতে চলিল, কারণ ইতিমধ্যে আরও একখানি বেনামী পত্রে কার্ত্তিক ও সর্ব্বানন্দর গতিবিধির বিষয়ে সঠিক সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। কার্ত্তিক ও সর্ব্বানন্দ বাগবাজারের কোন এক দ্বিতল গৃহে যাতায়াত আরম্ভ করিয়াছে এবং সেই গৃহের সমস্ত ব্যাপারই সন্দেহ-জনক।

কালিকাবাবু আর থাকিতে পারিলেন না, তিনি সেইদিনই দুইখানা পত্রে সমস্ত ব্যাপার খুলিয়া লিখিয়া কার্ত্তিক ও শশিভূষণের নামে তাহা পাঠাইয়া দিলেন। দুই-তিন দিনের মধ্যে উত্তর আসিল।

কার্ত্তিক লিখিয়াছে—'সংবাদ সমস্তই সত্য, কিন্তু তাহাতে আশঙ্কা করিবার কিছুই নাই; সর্ব্বানন্দ ও কার্ত্তিক কোন এক পরোপকার-ব্রতে ব্রতী আছে। কিন্তু সে বিষয়ে কাহাকেও কোন কথা খুলিয়া বলিতে সে অনিচ্ছুক। তবে কালিকাবাবু বা পিতা যদি স্বয়ং আসিয়া এই বিষয় জানিয়া যাইতে চাহেন, তাহাতে কোন বাধা নাই। এ বিষয়ে কোন কথা কর্ণান্তর করিবার ইচ্ছা তাহার নাই; অপরের সন্দেহভঞ্জন করিবারও প্রবৃত্তি নাই। তবে পিতৃস্থানীয় কালিকাবাবুকে এবং পিতাঠাকুর মহাশয়ের কাছে তাহার গোপনীয় কিছুই নাই।"

কালিকাবাবুর উৎকণ্ঠা দূর হইল; এবং সেই কারণে তাঁহার যে জ্বরভাব দেখা গিয়াছিল, তাহারও শান্তি হইল। তিনি তৎক্ষণাৎ স্বহস্তে লিখিয়া দিলেন যে, এ-বিষয়ে আর তিনি কিছুই জানিতে চাহেন না। তবে পড়াশুনার পক্ষে ক্ষতিকর অত্যধিক পরোপকারের কার্য্য এখন একটু কমাইয়া অধ্যয়নাদিতে মনোনিবেশ করাই তাহাদের উচিত। কারণ পরোপকারের সময় বিদ্যার্জ্জনের কালের পরে আসাই যুক্তিসঙ্গত। বিশেষতঃ ছাত্রদের বিদ্যার্জ্জনই একপ্রকার তপস্যা।

কিন্তু কার্ত্তিককে পত্র পাঠাইয়া দেওয়ার একদিন পরেই শশিভূষণের পত্র পাইয়া কালিকাবাবু আবার ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। শশিভূষণ লিখিয়াছে, কার্ত্তিককে কলিকাতা হইতে স্থানান্তরিত করিয়া মফঃস্বলের যে কোন কলেজে ভর্ত্তি করিয়া দেওয়ার প্রয়োজন হইয়াছে, তাহা না হইলে সে কিছুতেই এবার পাশ করিতে পারিবে না। যদিও তাহার বর্ত্তমান কার্য্যে নৈতিক অবনতির কোন সম্ভাবনা নাই, কারণ সে যাহা করিতেছে, তাহা সকল উচ্চমনা ব্যক্তিরই কর্ত্তব্য; তথাপি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়াটাই যখন তাহার পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয়, তখন তাহাকে বর্ত্তমান পরোপকার-ব্রত হইতে নিবৃত্ত করাই আবশ্যক।

তবে সর্ব্বানন্দর কথা স্বতন্ত্র। সে পিতৃ-মাতৃহীন ব্রাহ্মণ-সন্তান। তাহাকে যে কার্য্যে শশিভূষণ নিয়োজিত করিয়াছে, তাহাতে সর্ব্বানন্দর আর্থিক ও মানসিক সর্ব্ববিধ উন্নতিই সম্ভবপর। অতএব তাহার বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকিয়া যাহাতে একমাত্র কার্ত্তিককে সরানো যায়, সেই ব্যবস্থা করার বিশেষ প্রয়োজন ঘটিয়াছে।

কালিকাবাবু মহা সমস্তায় পড়িয়া কি করিবেন স্থির করিতে পারিলেন না। আবার শিবচন্দ্রের ডাক পড়িল এবং বহু জল্পনা-কল্পনার পর স্থির হইল যে পরীক্ষার ফল দেখিয়া কর্ত্তব্য স্থির করা যাইবে, তবে ইতিমধ্যে বড়দিনের ছুটীতে অথবা লেক্‌চার্ শেষ করিয়া পরীক্ষার জন্ত প্রস্তুত হইবার সময় কার্ত্তিক যেন শিবরামপুরে চলিয়া আসে এই মর্ম্মে তাহাকে পত্র দেওয়া হোক।

কালিকাবাবুর মাতা ইতিমধ্যে মহা গোলযোগ বাধাইয়া দিলেন। তিনি বলিলেন, অরক্ষণীয়া কন্তা যে গৃহে এতদিন পর্য্যন্ত অবিবাহিতা থাকে, সে গৃহের অন্ন-জল তিনি গ্রহণ করিতে অক্ষম; অতএব শীঘ্র যদি শৈলজার বিবাহ না হয় তাহা হইলে তাঁহাকে অগত্যা বাধ্য হইয়া ৺কাশীধাম যাইতে হইবে। না হয় তিনি স্বয়ং যে কোন উপায়ে শৈলজার বিবাহ দিয়া শিবরামপুরের জমীদার বংশের সম্মান রক্ষা করিবেন। পুত্র কালিকামোহনের বুদ্ধি লোপ পাইয়াছে, নহিলে সমস্ত আত্মীয়-বন্ধুর অনুনয়, বিনয় ও ভয়-প্রদর্শনেও সে কেন অবিচলিত রহিয়াছে? সেদিন কালিকামোহনের মাতুল-পুত্র ত স্পষ্টই বলিয়া গেল যে ইহার পর আসিয়া শৈলজাকে যদি সে অবিবাহিতা দেখে, তাহা হইলে সে আর কালিকামোহনের গৃহে জলগ্রহণ করিবে না। ইহাতেও যদি কালিকাবাবুর চেতনা না হয়, তাহা হইলে তাঁহার মাতা আর অমন পুত্রের মুখদর্শন করিবেন না।

কালিকাবাবু বহু প্রকারে ভ্রাতাকে বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন তিনি বলিলেন, সমস্তই যখন ঠিক হইয়া আছে, তখন এত ব্যা হইবার প্রয়োজন কি! বাগ্‌দত্তা হওয়াও যা, ব্রাহ্মণ-কন্যার পক্ষে বিবাহ হওয়াও তাই। এখন কার্ত্তিকের বিদ্যালাভ করিয়া ফিরি আসারই কেবল অপেক্ষা! জগদম্বা দেবী কিন্তু বুঝিতে চাহিলেন না কালিকাবাবু তখন বাধ্য হইয়া শিবচন্দ্রকে ডাকিয়া পাঠাইয়া বলিলেন "এখন এর উপায় কি?"

শিবচন্দ্র কহিলেন, "উপায় আর কি! তাহ'লে এই অগ্রাণেই বিয়ের সমস্ত ঠিকঠাক করুন, আর আমিও কার্ত্তিককে সমস্ত কথ বুঝিয়ে পত্র দি।"

কালিকাবাবু কহিলেন, "কিন্তু কার্ত্তিক যদি অমত করে? সে বলে গিয়েছে, এফ-এ পরীক্ষায় পাশ না হয়ে সে আমাদের সঙ্গে দেখা করবে না। সে যে-রকম একগুঁয়ে তাতে আমার ভয় হয়, পাছে, কি করতে কি হয়!"

শিবচন্দ্র কহিলেন, "যদি তাই হয়, এমন কুসন্তানই সে হয়, যে, বাপমায়ের কথা বা আপনার মত হিতৈষীর কথা ঠেলে নিজের জেদ বজায় রাখে, তাহলে কোন্ সাহসে তার হাতে আপনার মেয়েকে আপনি তুলে দিতে চাচ্ছেন? আমার কথা যদি সে না শোনে, তাহ'লে আমি তার মুখ দর্শন করব না।"

কালিকাবাবু কহিলেন, "কি জানেন ন্যায়রত্ন মশায়, আপনার কার্ত্তিকটি আমায় যেন পেয়ে বসেছে! সদাই ভয় হয়, যদি তাকে না পাই! তার আশা ত্যাগ করতে হবে মনে হলে আমার সমস্তই যেন তিক্ত বোধ হয়। সেই ভয়ে আমি এতদিন পর্য্যন্ত চুপ করেই আছি। ও যখন আমার স্নেহটার অর্থ সম্পূর্ণ বুঝতে পারবে, তখন

আমার ধারণা আছে যে ও নিজেই এসে আমাকে আত্ম-সমর্পণ করবে। আমি সেই আশায় বসে আছি।"

শিবচন্দ্র হাসিয়া বলিলেন, "বৈবাহিক, আপনি নির্ভয়ে থাকুন। আমি স্বয়ং কার্ত্তিককে আপনার পায়ে এনে ফেলে দেব।"

৬

অনেক সাধ্য-সাধনা করিয়াও যখন নিদ্রা আসিল না, তখন বিরক্ত হইয়া কার্ত্তিক শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া ভিন্ন শয্যায় পাঠরত সর্ব্বানন্দকে বলিল, "সর্ব্ব-দা, আমি ছাতে চললুম, তোমার পড়া হয়ে গেলে ডেকো।" সর্ব্বানন্দ পুস্তক হইতে মুখ না তুলিয়া বলিল, "আচ্ছা।" কার্ত্তিক উপরে চলিয়া গেল।

কলিকাতার অবিশ্রাম কর্ম্মকোলাহল ক্রমশঃ থামিয়া আসিতেছে। কৃষ্ণাষ্টমীর গাঢ়-অন্ধকার আকাশ প্রকাণ্ড একটা বাটির মতই মাথার উপর চাপিয়া বসিয়া আছে। কার্ত্তিক ছাদের আলিসার উপর হস্তদ্বয় রাখিয়া আপনার নিদ্রাহীন ক্লান্ত ললাট তদুপরি স্থাপন করিল।

অন্ধকার! অন্তহীন রহস্যময় অন্ধকার! এই অন্তহীন অন্ধকার ভেদ করিয়া উহার অন্তরের লুকানো রহস্যকে জানিতে হইবে। কিন্তু কি উপায়ে? আলোক-প্রবেশে অন্ধকারের রহস্য কোথায় মিশাইয়া যায়! তাহার অন্ধকারত্ব, রহস্যময়তা বজায় রাখিয়া তাহার ভিতর প্রবেশ করিতে হইবে। কিন্তু কেমন করিয়া? আলোক চঞ্চল, গতিশীল। অন্ধকার স্থির, অবিচল; অথচ আলোকের সমস্তই স্পষ্ট, অন্ধকারের সমস্তই অজ্ঞাত। আলোক আপনাকে উন্মুক্ত করিয়া জানাইতে চাহে, অন্ধকার আপনার গোপন রহস্য লুকাইয়া

রাখে। যাহা চঞ্চল, যাহা অস্থির, তাহাই হইল জ্ঞানের কারণ তাহাই হইল প্রকাশের উপায়, আর যাহা স্থির, যাহা অচঞ্চল, তাহা মৌন, তাহাই নির্ব্বাক্! এ কি অপরূপ রহস্য!

আলোক সূচির মত বিঁধিয়া তরবারির ন্যায় চিরিয়া, সকল বস্তু অণু-পরমাণুকে ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া যাহা-কিছু অজ্ঞাত, যাহা-কিছু মৌন তাহাকে কথা কহাইয়া, স্পষ্টতার কোলাহলে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলে। আর অন্ধকার নীরবে অতি সন্তর্পণে আপনার হৃদয়ের গোপন কথাটুকু জ্ঞানের বাহিরে লইয়া গিয়া সযত্নে রক্ষা করে। সে কাহাকেও ব্যস্ত করে না, কাহাকেও কিছু বলিতে চাহে না অথচ আলোক চলিয়া গেলেই ধীরপদে আসিয়া সে নির্ব্বাক্ ধ্যানে বসিয়া যায়।

কিন্তু যদি কান পাতিয়া থাকি, তাহা হইলে শুনিতে পাই, অন্ধকারের গোপনতম প্রদেশ হইতে একটা মৃদু গুঞ্জন-ধ্বনি উত্থিত হইতেছে। কে যেন আপনাকে জানাইতে চাহিতেছে, অথচ তাহার বাহিরে আসিবার জো নাই, যেন তাহার স্পষ্টতর স্ফুটতর হইবার উপায় নাই! কে তুমি? কি তুমি? কে তুমি আপনাকে জানাইতে চাও,—অথচ আলোর মধ্যে নয়, স্পষ্টতার মধ্যে নয়, কোলাহলের মধ্যে নয়, কেবল তোমার গভীর অতল অন্ধকারময় রহস্যের মধ্যে, তোমার সীমাহারা দিশাহারা অন্তহীনতার মধ্যে, তোমার নির্ব্বাক্ স্থির অবিচল শান্তির মধ্যে? তোমাকে কেমন করিয়া জানিব? আমি আলোকের জীব, স্পষ্টতার প্রাণী, তোমার অন্ধকারের মধ্যে প্রবেশ করিতে গেলেই যে তোমার রহস্যের অন্তরালটুকু নিষ্ঠুর হস্তে ছিঁড়িয়া ফেলি! কেমন করিয়া তোমার কাছে পৌঁছিব? আমি তোমার নিকটে যাইলেই আমার সঙ্গী রহস্যহীনতা, স্পষ্টতা, আলোক-

পূর্ণতা তোমার রহস্যকে দূরে ঠেলিয়া দেয়। হে অজ্ঞেয়, হে অন্ধকারের গোপনতা, হে অনির্ব্বচনীয়ের অপ্রকাশ, তোমায়-আমায় মিলন কেমন করিয়া সাধিত হইবে?

কার্ত্তিক নিশ্বাস ফেলিয়া মাথা তুলিয়া পূর্ব্বাকাশের দিকে চাহিল। তখনও চন্দ্রোদয় হয় নাই; তথাপি তাহার পূর্ব্বাভাস পূর্ব্বদিক-চক্রবালস্থ ভাসমান মেঘখণ্ডের উপর প্রতিফলিত হইয়া জ্যোতির্ম্ময় চন্দ্রের উত্থানের পথে সোপানশ্রেণী রচনা করিতেছে। হঠাৎ কার্ত্তিকের মনে হইল, যদি তাহার শক্তি থাকিত, তাহা হইলে সে হাত দিয়া চাঁদকে ঠেলিয়া নামাইয়া দিত। তাহার কেবলই ইচ্ছা হইতে লাগিল, সে চীৎকার করিয়া বলে, আলো চাই না, অন্ধকার—অন্ধকার—অন্ধকার দাও। সব ডুবাইয়া, সব ভুলাইয়া, নেমে এস, হে অন্ধকার, হে চির-অজ্ঞাত, তুমি নেমে এস! আমার বাক্য থামাইয়া আমার সমস্ত চেষ্টাকে শান্ত করিয়া, আমার এই জন্ম-জন্মান্তের সঞ্চিত বিশালতাকে অভিব্যাপ্তিকে নিবিড় পেষণে ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতম করিয়া সূক্ষ্মতম করিয়া আমায় তোমার আপন করিয়া লও। আমায় তোমার মধ্যে হারাইয়া যাইতে দাও। আমি আর কিছু চাহি না, কেবল এক মুহূর্ত্তের জন্য এক নিমেষের জন্য তোমার রহস্যের মধ্যে ডুবিয়া যাইতে চাই, তোমার অন্ধকার গোপনতার মধ্যে আপনাকে সম্পূর্ণরূপে ভুলিতে চাই। ভুলাও, আমায় ভুলাও।

কার্ত্তিকের বিলম্ব দেখিয়া সর্ব্বানন্দ উপরে আসিয়া বলিল, "কার্ত্তিক, তুমি দিনেও পড়্‌বে না, রাতেও বই ছোঁবে না, শেষে যদি ফেল্‌ হও, তখন কি কৈফিয়ৎ দেবে?"

কার্ত্তিক আলিসার উপর মস্তক রক্ষা করিয়া বলিল, "একৃজামিন্‌ পাস্‌ করাই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য নয়। যা সহজেই জান্‌তে পারা

যায়, তাকে জেনে কি হবে? যাকে জান্‌তে কেউ পারে না, যাকে সহজে কেউ ধর্‌তে পারে না, আমি তাকেই ধর্‌তে চাই!"

সর্ব্বানন্দ কহিল, "অর্থাৎ কোন একটী স্ত্রীলোকের হৃদয়-রহস্য জানাই জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য! আর সব মিছে! কার্ত্তিক, তুমি আমার কথা শোনো, তোমার লেক্‌চার্ শেষ হয়েছে, তুমি বাড়ী গিয়ে এক্‌জামিনের জন্য তৈরী হওগে। এ-সব পাগ্‌লামি আর কতদিন চালাবে?"

পাগলামি! কার্ত্তিক ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "পাগল কে নয়? তুমি পাগল, ঠাকুরদা পাগল, বাবা পাগল, কালিকাবাবু পাগল, দুনিয়া পাগল! পাগল সকলেই! কেউ-বা এই জিনিষটার জন্য পাগল, কেউ-বা ঐ জিনিষটার জন্য পাগল। পাগলাগারদে বসে তুমি আমায় পাগল বল্‌ছ?"

সর্ব্বানন্দ কহিল, "মিছে তর্ক করে কি হবে? কিন্তু তোমায় বারবার সাবধান করে দিচ্ছি, কার্ত্তিক, কেবল আপন খেয়ালে চলো না। এতে যে তুমি কেবল আপনারই ক্ষতি কর্‌বে তা নয়, আরও দশজনকে জড়িয়ে নিয়ে তুমি অধঃপাতে যাবে। তোমার পতনে যদি আর কারও ক্ষতি না হ'ত, তাহলে কোন কথা কইতুম না! কিন্তু—"

কার্ত্তিক কহিল, "থাম একটু বুঝে বল দেখি, এই যে আর কারো কিছু-কিঞ্চিৎ খতির সম্ভাবনা রয়েছে, এতেই কি তুমি এত ব্যস্ত হয়ে ওঠো নি? তোমার আর কেউ যদি মিছিমিছি আমার সঙ্গে জড়িত হয়ে আমার জীবনটাকে দাসত্বের মধ্যে টেনে নিয়ে ফেল্‌বার চেষ্টায় না থাক্‌তেন, তাহলে তুমি কথাটি কইতে না।"

সর্ব্বানন্দ কহিল, "কার্ত্তিক, তুমি ত আমায় ভালবাস্‌তে!"

কার্ত্তিক কহিল, "এখনও বাসি, যদি তুমি তার প্রমাণ চাও, বল, আমি এই মুহূর্ত্তে তা প্রমাণ কর্‌তে পারি।"

সর্ব্বানন্দ কহিল, "প্রমাণ কর।"

কার্ত্তিক কহিল, "আমি আজই বাবাকে চিঠির উত্তর দিয়েছি। তিনি লিখেছিলেন, এই অগ্রাণ মাসে শৈলজার সঙ্গে আমার বিয়ে দেবেন স্থির করেছেন। আমি লিখে দিয়েছি যে আমি শৈলজাকে বিবাহ কর্ব না, সর্ব্বদাদা প্রস্তুত আছে, তার সঙ্গে সম্বন্ধ স্থির করুন।"

সর্ব্বানন্দ কহিল, "তুমি খুড়োমশায়ের কথা ঠেলে এই কথা লিখেছ? কার্ত্তিক, তোমাকেও জিজ্ঞাসা করি, তুমিও ঠিক করে বুকে হাত দিয়ে বল দেখি, এই যে কাজটা করে বসেছ, তোমার জন্মদাতা, জ্ঞানদাতা, তোমার সর্ব্বশ্রেষ্ঠগুরুর এই যে অপমান করেছ, এ কি শুধু আমারই জন্য? ঐ দেখ, চাঁদ উঠ্ছে,—ঐ চাঁদকে সাক্ষী করে বল যে এই কাজটি আমার জন্য করেছ, না, একটা অন্ধ রমণীর অন্ধকার হৃদয়ের মধ্যে স্থান পাবার জন্য? কি দেখেছ ঐ রমণীর দৃষ্টিশক্তি-হীন চোখে, যে তার জন্য নিজেকে এতদূর অধঃপতিত করেছ? কি আছে, কি পেয়েছ সরোজের কাছে? সেও মানুষ, তার হৃদয় ত তোমারই মত বাসনা-কামনার আবাসভূমি। সেও তোমারই মত সুখে হাসে দুঃখে কাঁদে,—তবে কি হিসেবে সে এত লোভনীয় হ'ল?"

কার্ত্তিক উচ্চ হাস্য করিয়া বলিল, "এক দিন তোমাকেও আমি এই প্রশ্ন করেছিলুম, কিন্তু তুমি কি কোন উত্তর দিতে পেরেছিলে? এ ক্ষেত্রে আমিই বা পার্ব কি করে? তবু তোমায় একটা উত্তর অমি দেবো, কারণ, এই এতদিন ধরে আমি বৃথাই সরোজের কাছে যাই নি। তার মধ্যে এমন জিনিষের আভাষ আমি পেয়েছি, যার বর্ণনা সহজে করা যায় না। তবু সেটা কি, শুন্বে? সেটা হচ্চে ওর অবোধ্যতা। যা সহজ, যা হাতের তেলোর মত নিতান্তই আমার কাছে স্পষ্ট এবং পরিচিত, তা আমি অত্যন্ত তুচ্ছজ্ঞান করি। যা দুষ্প্রাপ্য, যা রহস্যময়, চিরদিন আমি

তাই চাই! যা পাব না, তাকেই আমি পেতে চাই। না পাই, নাই পেলুম! আর না পাওয়াই আমার দরকার, কারণ পেলে হয়তো তাকে আর আমি চাইব না। তাই যা পাব না, তাকেই পাবার ইচ্ছা কর্‌ব, তাকেই মন-প্রাণ দিয়ে চাইব। এই জন্য যা সহজলভ্য, তা আমি অনায়াসে তোমার ভাগে ফেলে দিয়ে যা আয়াসলভ্য, তার দিকে আমি ছুটে চলেছি। তোমার কি সাধ্য আমায় ফেরাবে? সরোজ যদি অন্ধ না হ'ত, সরোজ যদি আমার জন্য হা-পিত্যেশে বসে থাক্‌ত, তাহলে ওর ত্রিসীমা আমি মাড়াতুম না। কিন্তু যেদিন প্রথম ওকে দেখ্‌লুম, সে-দিনকার প্রথম সহজ ব্যবহারে, একেবারে আমাকে তুচ্ছ করে, সামান্যের মত, অতি-যৎসামান্য একটা লোকের মত ব্যবহার দেখিয়ে ও আমায় আকৃষ্ট ক'রেছে। বাহ্যতঃ ওর কিছুই গোপন নেই, লুকোন কথা নেই তাই ওকে পরম রহস্যময়:বলে আমি বুঝ্‌তে পেরেছি। ওর অন্ধকার চক্ষুর অন্তরালে কি যে লুকানো আছে, ওর অতি-সরল অতি-স্পষ্ট ব্যবহারের মধ্যে একটা গভীরতম অন্ধকারের মত কি যে লুকানো আছে, তাই আমি জান্‌তে চাই। তোমাদের স্বামী-স্ত্রী ভাবে প্রতিদিনকার ভাত-ডালের মত করে আমি কিছুই পেতে চাই না। জানিনা, হয়তো তুমি আমার কথা কিছুই বুঝ্‌ছ না, তবে ঠাকুরদাকে একদিন বুঝিয়েছিলুম। যদিও সে কেবল অবাক হয়ে আমার পানে চেয়েছিল, তবু বোধ হয়েছিল যেন, সে আমায় কিছু কিছু বুঝতে পেরেছে, তাই সে দিন থেকে সরোজের কাছ থেকে আমায় দূর করে দেবার চেষ্টাও সে ছেড়ে দিয়েছে। আজ তোমায় বল্‌লুম, এখন তোমার যা অভিরুচি, তাই কর।"

কার্ত্তিক ফিরিয়া দূর আকাশে একটা নক্ষত্রের দিকে চাহিয়া রহিল। সর্ব্বানন্দ কার্ত্তিকের স্কন্ধে হস্ত দিয়া বলিল, "তবুও তোমায় ফির্‌তে হবে।"

কার্ত্তিক না ফিরিয়া বলিল, "হয়তো হবে, তাই বলে বর্ত্তমানকে ত্যাগ করতে পারিনে।"

সর্ব্বানন্দ কহিল, "আমি তোমার সমস্ত কথা সরোজের কাছে প্রকাশ করে বল্‌ব। তারপর—"

কার্ত্তিক কহিল, "তোমার সেটুকু কষ্টও স্বীকার কর্‌বার দরকার নেই, আমি নিজেই বল্‌ব। আমায় তুমি কি মনে কর? আমি কি—"

সর্ব্বানন্দ কহিল, "আমি মনে করি, তুমি স্বেচ্ছাচারী, পিতৃদ্রোহী, মনুষ্যনামের অযোগ্য প্রাণী! কি বল্‌ব তোমায়—"

কার্ত্তিক কহিল, "কিছু বলার প্রয়োজন নেই সর্ব্ব-দা আমি যা তাই।"

সর্ব্বানন্দ কহিল, "আমি ঈশ্বরের নামে শপথ করে বল্‌ছি যে, তোমায় যদি না ফেরাতে পারি, তাহলে এ জীবন ত্যাগ কর্‌ব।"

সর্ব্বানন্দ নামিয়া গেল। কার্ত্তিক কিছুক্ষণ ছাদের উপর পায়চারি করিয়া শেষে নামিয়া গিয়া বলিল, "সর্ব্ব-দা তোমার রাগ কাল সকালেই দেখো থাক্‌বে না, সব ভুলে তুমি বই পড়্‌তে লেগে যাবে।"

সর্ব্বানন্দ পাশ ফিরিয়া শয়ন করিল।

৭

পরমহংস শঙ্করানন্দ আজকাল পরম দয়ালু হইয়া উঠিয়াছেন। তাঁহার দয়ায় আজ কাল অনেক পাপী-তাপী উদ্ধার লাভ করিতেছে। তাঁহার এই জীবোদ্ধার-কার্য্যের জন্য আজ-কাল প্রতি সন্ধ্যায় একটি বৈঠক বসিয়া থাকে। এবং সেই সভায় শাস্ত্রীয় বহু গূঢ় তত্ত্বের আলোচনায় শিবরামপুরের বহু নর-নারী যোগদান করায় আজ-কাল পোড়া বাঙ্গলার অন্ধকার কোণ-গুলি আলোক-মালায় শোভিত ও উপদেশার্থীর কোলাহলে মুখরিত হইয়া উঠে। এমন কি এ কথাও রটিয়া গিয়াছে যে কমবখৎপুরের একজন

পাকা বিষয়ী লোক তাঁহার বিষয়-আশয় পুত্রকে দান করিয়া শঙ্করানন্দের উপদেশে সংসার ত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছেন,—তবে এখনও সমস্ত বিষয়ের সুবন্দোবস্ত হয় নাই বলিয়া তিনি এতাবৎকাল কাশীবাসী হইতে পারেন নাই, এবং কবে যে হইবেন, তাহারও স্থিরতা নাই।

এই সুনামের জন্ত স্বামীজি কেবল মাত্র তাঁহার শিষ্যাবলীর নিকটই নহে, তাঁহার রত্নগর্ভা জগজ্জননীর অংশরূপিণী জননী নিস্তারিণী দেবীর নিকটও বিশেষভাবে ঋণী। তিনি নানা উপায়ে পুত্রের অদ্ভূত কীর্ত্তিকলাপ জগৎসমক্ষে বহু গূঢ়ার্থ-বোধক কথাবার্ত্তায় প্রচারিত করিয়াছিলেন; এবং তাঁহারই জন্ত কালিকাবাবুর অতি-নিষ্ঠাবতী মাতাও ক্রমশঃ শঙ্করানন্দের দিকে আকৃষ্টা হইয়াছেন। এমন কি তিনিও মধ্যে মধ্যে জপমালা হস্তে লইয়া একজন দাসী বা অন্ত কোন আশ্রিতাকে সঙ্গে লইয়া রাত্রির অন্ধকারে উপরোক্ত ভাগবত-কথা-বৈঠকে যোগদান করিতে আসিতেন।

অদ্যকার বৈঠকে স্ত্রীলোকের কিরূপ স্বামী হওয়া উচিত, বেদী হইতে সেই বিষয়েই অমৃতময়ী উপদেশাবলী বর্ষিত হইতেছিল। ব্যাসদেবের জন্ত পরাশরের ন্যায় যোগীর প্রয়োজন, এই কথা কয়টি ঘুরাইয়া ফিরাইয়া নানা আকারে প্রচারিত হইতেছিল। যে স্বামী সংসারকে যোগবলে স্বর্গ করিয়া তুলিতে পারিবে, সমস্ত পাপকে যে সমাধি-নির্দ্ধৃত বুদ্ধিবলে পুণ্যে পরিণত করিতে পারিবে, যে সর্ব্ব দ্রব্য উপভোগ করিতে করিতে সতেজে বলিতে পারিবে, 'ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবির্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতং' একমাত্র সেই লোকই সৎপাত্র; তাহাকে কন্যাদান করাই প্রকৃত কন্যাদান। সেই সৎপাত্রের ঔরসে যে কুলপ্রদীপের জন্ম হইবে, সেই পুত্রই পিতৃকুল ও মাতৃকুলের ঊর্দ্ধতম চতুর্দ্দশ পুরুষ পর্য্যন্ত উদ্ধার করিতে সক্ষম। নহিলে সংসারে থাকিয়া আর উদ্ধারের কোন পন্থা নাই! নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে

অন্ননায়—অন্ননায় কি না, সংসারে চলিবার অর্থাৎ সংসার-ধর্ম্ম করিবার *আর কোন পন্থা নাই—নাই!*

জগদম্বা দেবী যখন গৃহে ফিরিলেন, তখন তাঁহার ভক্তিতে আপ্লুত হৃদয়ের মধ্যে কেবলি জাগিতে লাগিল, সংসার-ধর্ম্মের আর কোন দ্বিতীয় পন্থা নাই! সৎপাত্রে কন্যা দান না করিলে সংসারের উদ্ধার নাই। কিন্তু কোথায় পাই এমন সৎপাত্র? কেন, এই শঙ্করানন্দ কি সৎপাত্র নয়? সে ত অবিবাহিত, তাহার পিতামাতাকে ধরিয়া কি এই স্বামিজীর দ্বারা শিবরামপুরের জমিদার বংশের উর্দ্ধতম চতুর্দ্দশ পুরুষকে উদ্ধার করা যায় না? একবার চেষ্টা করিয়া দেখিতে দোষ কি!

জগদম্বা দেবীর যে চিন্তা, সেই কাজ। কিন্তু প্রভুপাদ শঙ্করানন্দ সে সংবাদ শুনিয়া কর্ণে অঙ্গুলি প্রদান করিয়া তাঁহার মাতাকে বলিলেন, "মা, যদি বিবাহই কর্‌ব তবে জীবোদ্ধার কর্‌ব কিরূপে? আমার যদি বিবাহ করাই প্রয়োজন হ'ত, তা হলে কোন্‌দিন তোমার কোলে মাথা রেখে আবার ঐ সংসারের মধ্যে ডুবে যেতুম। কিন্তু এ কথাও ঠিক যে শৈলজার মত "শক্তিই" আমার সহধর্ম্মিণী হবার উপযুক্ত। যা হোক, আমায় চিন্তা কর্‌বার অবসর দাও, ভগবানের প্রত্যাদেশ ছাড়া আমি কোন কাজেই হস্তক্ষেপ কর্‌তে পারি না। আরও কিছুদিন অপেক্ষা কর। তার পর যদি আমার প্রকৃত মাতা পরমা-প্রকৃতির আদেশ পাই, তা' হলে বিবাহ কর্‌লেও কর্‌তে পারি।"

জগদম্বা দেবী অন্তরাল হইতে এই আশা ও নিরাশাময়ী বাণী শুনিয়া অনেকটা আশ্বস্ত হইলেন। তিনি মনে মনে বুঝিলেন যে শঙ্করানন্দকে লাভ করা নিতান্ত সহজ ব্যাপার না হইলেও একেবারে দুরাশা নহে। তবে এখন কেবল তাঁহার পুত্রের মতের প্রয়োজন। তিনি সেই কার্য্যের ভার স্বয়ং গ্রহণ করিলেন; এবং অন্নজল-পরিত্যাগাদি

বহুবিধ সদুপায়ে পুত্রের মত আয়ত্ত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

শৈলজা তাহার পিতামহীর রকম-সকম দেখিয়া হাসিয়া অস্থির হইল। জগদম্বা দেবী ক্রুদ্ধা হইয়া বলিলেন, "অত হাসি কিসের?"

শৈলজা হাসিতে হাসিতে বলিল, "তুমি এই বুড়ো বয়সে না কি আবার বিয়ে কর্‌বে?"

জগদম্বা কহিলেন, "তা বর জুটিলেই করি, কিন্তু আমার দিদি থাকৃতে ত আর আগে আমার বিয়ে হতে পারে না, তাই তোর আগে একটা যুটিয়ে দি, তার পর আমার যা হয় হবে।"

শৈলজা কহিল, "ঠাক্‌মা তোমার পায়ে পড়ি, বল না, কেন, আবার তোমার বিয়ে কর্‌বার ইচ্ছে হ'ল? আচ্ছা, তা না হয় নাই বল্‌লে, কি করে বরের কাছে ঘোমটা দিয়ে বস্‌বে, তাই দেখাও না! আচ্ছা, তোমার বর যদি বলে, ছোলাভাজা খেতে হবে, তা হলেই বা তুমি কি কর্‌বে?"

জগদম্বা কহিল, "আ গেল যা বেহায়ী! তোর জন্যে আমি মর্‌ছি, আর তুই আমাকে গালাগাল সুরু কর্‌লি?"

শৈলজা কহিল, "গালাগাল কি রকম! তোমার আবার নূতন করে ছোলাভাজা মটরভাজা খাবার সখ হ'ল, আর আমি তা মুখে বল্‌তে পাব না!"

জগদম্বা কহিলেন, "দেখ্‌ শৈল, তোরা যতই পাগলামি কর না কেন, আমি কিন্তু কিছুতেই এই অগ্রাণ মাস পার হতে দেব না। কেন? কার্ত্তিক ছাড়া কি সংসারে সুপাত্র নেই? কার্ত্তিকের না হয়—"

শৈলজা কহিল, "ঐ নামের ঠাকুরের মত চেহারা, ঐ রকম গায়ে জোর, ঐ রকম তেজ, ঐ রকম দেব-সেনাপতি হবার মতই লোক চাই।"

জগদম্বা কহিলেন, "থাম্, থাম্, বেহায়া মেয়ে! এখনো যে তোর ওর সঙ্গে বিয়ে হয় নি লো! এর মধ্যেই এত!"

শৈলজা কহিল, "বামুনের মেয়ের বাক্‌দত্তা হওয়া যা, বিয়ে হওয়াও তাই। তোমায় যদি বলি, আবার বিয়ে কর্‌বে, তা হলে তুমি কি আর বিয়ে কর?"

জগদম্বা কহিলেন, "আমার সঙ্গে তোর তুলনা?"

শৈলজা কহিল, "কেন নয়? তুমিও মেয়ে মানুষ, আমিও তাই। তুমি যদি ঠাকুরদাদার উদ্দেশ করে এখনো বেঁচে থেকে ধর্ম্মকর্ম্ম কর্‌তে পার, আমিই কেন পার্‌ব না?"

জগদম্বা কহিলেন, "কুলীনের মেয়ের কথা দিলেই কিছু বিয়ে হয়ে যায় না। আমার খুড়িমার ছান্‌লাতলা থেকে বিয়ে ফিরে গিয়েছিল।"

শৈলজা কহিল, "তোমার খুড়িমা! সে তো সত্যি যুগের কথা! কলিযুগে তা হয় না। তোমায় বলে রাখ্‌ছি, ঠাক্‌মা, যদি তুমি মণিশঙ্করের কাছে আর কোন দিন ভাগবত শুন্‌তে যাও, তাহলে তোমায় কাশী পাঠিয়ে দেব।"

জগদম্বা কহিলেন, "আমার মরণ হয় ত বাঁচি! এ বাড়ীর কেউ আমার কথা শুন্‌বে না! মা গঙ্গা কবে আমায় নেবেন?"

শৈলজা কহিল, "তোমার একশো তেরো বছর পরমায়ু হোক! তুমি হরিনাম কর্‌তে কর্‌তে সজ্ঞানে গঙ্গা লাভ কর। আর কেন এ সব ব্যাপারে যোগ দিতে আস্‌ছ? দু' দণ্ড তুলসী তলায় বসে হরিনাম করগে যে কাজ হবে।"

জগদম্বা কহিলেন, "হায়, হায়, তিন দিনের মেয়ে! গাল টিপিলে দুধ বেরোয়! সে আমায় উপদেশ দিতে এল! হায়রে, যার জন্যে চুরি করি, সেই বলে চোর!"

শৈলজা হাসিতে হাসিতে প্রস্থান করিল ; আর জগদম্বা দেবীও জপ ভুলিয়া মালা গাছটী লইয়া বারবার মাথায় ঠেকাইতে লাগিলেন।

৮

সকাল হইয়াছে। শশিভূষণের শ্বশ্রূঠাকুরাণী চিন্ময়ী দাসী শয্যায় শায়িতা। তিনি একটু নড়িয়া চড়িয়া উঠিবার চেষ্টা করিতেই বিন্দু দাসী তাড়াতাড়ি তাঁহার পিঠের দিকে আর একটা বালিস আগাইয়া দিল। তিনি পূর্ব্বদিকের জানালাটা খুলিয়া দিতে বলিলেন। দাসী জানালা খুলিলে হঠাৎ চিন্ময়ীর দৃষ্টি একটা ইজিচেয়ারে-শায়িত শশিভূষণের উপর পতিত হইল। শশিভূষণ সারারাত্রি জাগিয়া ভোরের দিকে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। তাহার নিদ্রিত মুখের উপর প্রভাতের আলো আসিয়া পড়িবামাত্র সে জাগিয়া উঠিয়া বসিল। প্রভাত হইয়াছে দেখিয়া সে তাড়াতাড়ি ঘড়ির দিকে চাহিয়া বলিল, "মা, আপনি কাপড় ছেড়ে জপটা সেরে নিন, ওষুধ খাবার সময় হয়েছে।"

চিন্ময়ী হাসিয়া বলিলেন, "রোগীর আবার জপ-তপ! নিজের শরীরের বিষয় ছাড়া এ সময়ে কি আর অন্য চিন্তা আসে, বাবা? বিন্দু, গঙ্গাজল আর কাপড়খানা আন্ ত মা।"

বিন্দু প্রার্থিত বস্তু অগ্রসর করিয়া দিলে শশিভূষণ মুখ ধুইবার জন্য বাহিরে আসিয়া ডাকিল, "সরোজ!" সরোজ তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া বলিল, "এ কি শশিদা, তুমি কৈ তিনটের সময় আমায় ডাকনি?" শশিভূষণ কলতলায় মুখ ধুইতে ধুইতে বলিল, "যাঁহা বাহান্ন তাঁহা পয়ষট্টি! তিনটে পর্য্যন্তই যদি জাগ্‌লুম, তাহলে পাঁচটাই বা কি দোষ কর্‌লে?"

সরোজ কহিল, "না শশি দা, এ তোমার ভারী অন্যায়!"

শশিভূষণ কহিল, কিছু অন্যায় হয়নি ভাই। সমস্ত দিনটা পড়ে

আছে, যত ইচ্ছা জেগে থেকো। আর কথাতেই বলে, অন্ধের কিবা রাত্রি কিবা দিন! ও তোমার পক্ষে দুই সমান। তুমি যার কাছে যাও। আমাকে বাসায় ফির্‌তে হবে, তারপর কলেজ আছে।"

শ্বশ্রূঠাকুরাণী-সম্বন্ধে বিন্দি দাসী ও সরোজকে সমস্ত উপদেশ দিয়া শশিভূষণ চলিয়া যাইতে উদ্যত হইলে সরোজ বলিল, 'দাঁড়াও, তোমার চা'টা করে দি।" শশী বলিল, "চা খেতে গেলে দেরী হয়ে যাবে।" সরোজ ছাড়িল না, তাড়াতাড়ি তাহার জন্য চা চড়াইয়া দিয়া বলিল, "কার্ত্তিকবাবু বল্‌ছিলেন, তিনিও তোমার সঙ্গে এসে রাত জাগ্‌তে ইচ্ছুক।"

শশিভূষণ কহিল, "অর্থাৎ যেটুকু সময় তোমার কাছে কাটে! তোমার গন্ধটুকু শব্দটুকুও ওর কাছে এখন লোভনীয় কিনা!"

সরোজের মুখখানি শশীর এই বিদ্রূপে হঠাৎ এক মুহূর্ত্তের জন্য লজ্জারুণ রাগে রঞ্জিত হইয়া উঠিল এবং পরক্ষণেই একটা অতি করুণ বিষণ্ণতার ছায়াপাতে মনোহর শোভা ধারণ করিল। শশিভূষণ তাহা লক্ষ্য করিয়া বলিল, "সরোজ, সাবধান ভাই, আমার ভয় হচ্চে—"

সরোজ তাহাকে বাধা দিয়া বলিল, "কোন ভয় নেই শশিদা, অন্ধের রাতও নেই, দিনও নেই। দিন এলেও তার জন্য আসে না, রাত এলেও তার জন্য আসে না।"

শশিভূষণ হঠাৎ উঠিয়া আসিয়া সরোজের মাথার উপর হাত রাখিয়া বলিল, "সরোজ, সূর্য্য উঠ্‌লেই সরোজ প্রস্ফুটিত হয়, তা জানি, তবু যে আমার সরোজকে কেউ কৃপা করে দয়া দেখাবার জন্য ভালবাসবে, তোমার এ রকম অপমান আমি কিছুতেই সইব না! তুমি দয়ার পাত্রী নও, দয়ার ঢের ওপরে যা, সেই পূজাই তোমার প্রাপ্য! তাই তোমায় সাবধান কর্‌ছি।"

সরোজ চায়ের বাটি হাতে করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। কিন্তু তাহার

হাত কাঁপিয়া চা একটু পড়িয়া গেল। শশিভূষণ তাহার হাত হইতে চায়ের বাটিটা গ্রহণ করিয়া বলিল, "সরোজ, আমার কথায় রাগ কর্‌লে ?"

সরোজ কহিল, "আমি অন্ধ! আমার আবার রাগ-দ্বেষ লজ্জা-ভয় কি শশি-দা ?"

শশিভূষণ কহিল, "তোমার এ কথায় আমি সন্তুষ্ট হ'তে পার্‌লুম না।"

সরোজ কহিল, "কেমন করে হবে ? মিছিমিছি কাউকে কষ্ট দিলে কি কারও সুখ হয় ?"

শশিভূষণ কহিল, "আমায় ক্ষমা কর, বোন, আমি তোমার ভালর জন্যই বল্‌ছিলুম। কার্ত্তিককে আর অগ্রসর হ'তে দিয়ো না। সে বিবাহ-পণে বদ্ধ। সর্ব্বানন্দর কাছে যা শুনেছি, তাতে বুঝেছি যে কালিকা কাকার মেয়েটা তারই আশা-পথ চেয়ে বসে আছে। কালিকা কাকাও বহুদিন থেকে কার্ত্তিকের উপর আশা ভরসা—"

সরোজ কহিল, "থাম, তুমি, এবার সত্যিই আমি রাগ কর্‌ব। কেন তুমি এ সব কথা বল্‌ছ ? ভগবান আমায় দৃষ্টি-হারা করে পথের এক পাশ দিয়ে চল্‌বার মাত্র অধিকার দিয়েছেন ; আমি কি পথের সেই এক-ধার ছাড়া আর বেশী-কিছু চেয়েছি ? তুমি আমায় দয়া করে হাত ধরে নিয়ে যাচ্ছ, তাই আমার চলা হচ্চে, নইলে কোথায় এক পাশে পড়ে থাক্‌তুম, কেউ আমার খোঁজও রাখ্‌ত না। তোমার উপদেশ ছাড়া, তোমার হাতের নির্দ্দেশ ছাড়া, অবলম্বন ছাড়া যদি এক পা চলি, সেই দিন তুমি আমায় ঠেলে ফেলে চলে যেয়ো।"

শশিভূষণ সন্তুষ্ট মনে চলিয়া গেল। কিন্তু সরোজের মনে সে যে ব্যথা দিয়া গেল তাহার অনুভব সেই দিনকার প্রভাতের সমস্ত আনন্দ টুকুকে তীব্র তিক্ত রসে পরিণত করিয়া তুলিল। সরোজ ধীরে ধীরে একটা গবাক্ষ উন্মুক্ত করিয়া তাহার অন্ধ নয়ন বিস্ফারিত করিয়া

দিল। তাহার সমস্ত দেহ থাকিয়া থাকিয়া কাঁপিয়া উঠিতে লাগিল। তাহার অন্তরাত্মা হইতে যেন একটা ক্রন্দন-ধ্বনি উত্থিত হইতে লাগিল—আলো—আলো! হে লোক-চক্ষু, হে সর্ব্ব-প্রকাশ, হে স্বপ্রকাশ, তুমি তাহার কাছে এক মুহূর্ত্তের জন্য প্রকাশিত হও। তাহার এই সমস্ত দেহ একটী চক্ষুতে পরিণত হইয়া সর্ব্বরূপের কারণ-স্বরূপ তোমার রূপকে এক মুহূর্ত্তের জন্য অন্তরে গ্রহণ করিয়া তারপর পদ্মের মত মুদিত হইয়া যাক্। একবার—একটী বার মাত্র তোমার কিরণের আঘাতে তাহার এই চিরান্ধকারময়ী রাত্রি এক মুহূর্ত্তের জন্য অস্তগমন করুক! তারপর আসুক রাত্রি, আসুক অন্ধকার, তাহার আর কোন ক্ষোভ থাকিবে না!

হে প্রভাত, জীবন-প্রভাতে ক্ষণেকের জন্য দেখা দিয়া মধ্যাহ্ন আসিবার পূর্ব্বে চিররাত্রে পরিণত হইলে! ক্ষণেকের জন্য আমার চক্ষে ফুটিয়াছিলে, তারপর—আদিহীন অন্তহীন অপার অন্ধকার সাগরের মাঝ-খানে দাঁড় করাইয়া দিয়া চলিয়া গেলে! যে পথে সহস্র যাত্রী চলিয়াছে, সেই পথেই চলিতে হইবে ; অথচ তাহাদের পথের আলো পথকে উদ্ভাসিত করিয়া রাখিয়াছে, কিন্তু আমার নিকটে সেই পথই, তাহার দূরত্ব, তাহার বিস্তৃতি, তাহার অসংখ্য যাত্রীর সমাবেশ সমস্ত সঙ্গে লইয়া চির-অজ্ঞাতই থাকিয়া যাইবে! যাক্, অন্ধের কিবা রাত্রি, কিবা দিন—দুই সমান! অন্ধের চলাও যা না চলাও তাই। কেবল এইটুকু চাই, যেন পথের একধারে আমার একটু স্থান থাকে! হে অনন্তের যাত্রীর দল, অন্ধ বলিয়া আমায় ঠেলিয়া পদ-দলিত করিয়া যাইয়ো না। তোমরা যখন দেখিতে পাও, তখন এই অন্ধ যাত্রীকে এড়াইয়া পাশ কাটাইয়া চলিয়ো। আমায় পশ্চাতে ফেলিয়া চলিয়া যাও, কোন দুঃখ নাই, কিন্তু দয়া করিয়া আমায় ধূলায় লুটাইয়া দিয়া যাইয়ো না। আমি ধীরেই চলি আর দাঁড়াইয়াই

থাকি, আমি যেন দুই পায়ের উপর সোজা হইয়া থাকিতে পাই! হে আমার অন্ধকারের অন্ধ দেবতা, তোমার এই ক্ষুদ্র সেবিকাকে তোমার মৌন নীরবতার মধ্যে স্থির, নিশ্চল, উন্নত রাখিয়ো, ইহার অধিক আর কিছু চাহি না।

* * * * *

দ্বিপ্রহরে চিন্ময়ীকে ঔষধ পান করাইয়া সরোজ সুকুমারীকে ডাকিয়া লইয়া পাঠ-কক্ষে প্রবেশ করিল। সুকুমারী কিন্তু কিছুতেই পাঠে মন দিল না, কারণ সর্ব্বদাদা বলিয়াছিল, যতদিন না মার অসুখ সারে, ততদিন তাহাদের ছুটী। সরোজ বিরক্ত হইয়া বলিল, "তা হবে না, সুকু, মা এখন চিররোগীর মত হয়ে পড়্লেন। তিনিই আমায় বক্‌ছিলেন। আর বিশেষ, একদিন অবহেলা কর্‌লে তারপর দিন আরও মুস্কিলে পড়্বে। যাদের চোখ নেই, তাদের যখন আঙুল দিয়ে পড়্তে হয়, তখন স্পর্শটীকে প্রতিদিন সজাগ রাখ্‌তে হবে, নইলে কিছুতেই এগুতে পারা যাবে না।"

সুকুমারী কহিল, "তার কি দরকার! আমি ত একবার ছুঁয়েই বুঝ্‌তে পারি যে এটা আমার কোন্ পুতুল, এটা আমার কি জিনিষ! তবে অক্ষরের বেলায় রোজ রোজ হাত বুলুতে হবে কেন?"

সরোজ কহিল, "পুতুলটার ওপর তুমি যতখানি মন দিতে পার, ততখানি মন পড়ার ওপর দিতে পার না, তাই রোজ রোজ পড়ার দরকার।"

সুকুমারী অগত্যা একখানা মোটা কার্ডবোর্ড লইয়া তাহার তোলা অক্ষরে লিখিত বর্ণমালার উপর অঙ্গুলি বুলাইতে আরম্ভ করিল। সরোজ সুকুমারীর হাতের উপর আঙুল রাখিয়া তাহার হাতের গতি অনুসরণ এবং ভুল হইলে তাহা সংশোধন করিয়া দিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে বিরক্ত হইয়া সুকুমারী বলিল, "আচ্ছা সরোজ দিদি, যাদের চোখ আছে, তারা পড়ে কি করে?"

সরোজ কহিল, "চোখ দিয়ে।"

সুকুমারী কহিল, "আচ্ছা, তারা আঙুল দিয়ে কি করে? আমাদের মত পড়ে?"

সরোজ কহিল, "না, তারা আঙুল দিয়ে লেখে, তবে শুনেছি, পড়তেও পারে। তারা হাতের অনুভব দিয়ে চোখের অনুভবকে পড়ে।"

সুকুমারী বুঝিতে পারিল না, জিজ্ঞাসা করিল, "হাতের অনুভব দিয়ে চোখের অনুভব কি করে পড়ে? চোখের অনুভব আবার কি রকম?"

সরোজ মহাবিপদে পড়িল; এ কথা কি করিয়া সে তাহাকে বুঝাইবে? সে বলিল, "তুমি বড় হও, তারপর বুঝিয়ে দেব, এখন তুমি বুঝ্‌তে পার্‌বে না। কিন্তু সে যে বলিয়াছে, 'চক্ষুষ্মানে হাতের অনুভব দিয়া হাতের অনুভব পড়ে না, হাতের অনুভব দিয়া চোখের অনুভব পড়ে' এই কথা কয়টী সে কতকটা আত্মগত ভাবেই বলিয়াছিল, বালিকাকে উদ্দেশ করিয়া নয়। সে আজ সমস্ত দিন ধরিয়া ঐ কথাই ভাবিয়াছে। তাহার ক্রমাগতই মনে হইয়াছে যে চক্ষুষ্মানে কখনই স্পর্শের যথার্থ অনুভব পায় না, তাহাদের সমস্ত অনুভবই দৃষ্টির ভাষায় ঘটিয়া থাকে। অন্ধের কি যে ভাষা, কি যে অনুভব, তাহা তাহারা কিরূপে জানিবে? তাহারা আপনার অনুসারেই পরকে দেখে, পরের কার্য্যের বিচার করে। হায়, অন্ধের অনুভব যে অন্ধ নয়, কিরূপে সে তাহা অনুভব করিবে? এমন কি কেহ নাই যে অন্ধকে অন্ধেরই মত অনুভব করিবে? চক্ষুর প্রকাশকে সম্পূর্ণ-রূপে ভুলিয়া কেবল অন্তরের প্রকাশকে অন্তরে অন্তরে অনুভব করিবে? এমন কে আছে যে, সমস্ত বহির্মুখী দৃষ্টিকে অন্তর্মুখী করিয়া তাহাদের অন্তরের মধ্যে অনুভবানন্দস্বরূপ আপনাকে প্রকাশিত করিবে? যদি এমন কেহ থাক, এস, সরোজ তাহারই অপেক্ষায় তাহার বহিঃপ্রকাশহীন অন্তঃসরোজ পাতিয়া বসিয়া আছে!

সরোজ সুকুমারীকে সাহায্য করিতে করিতে অনুভব করিল, কে যেন সোপান অতিক্রম করিয়া উপরে আসিল এবং ক্রমশঃ পাঠ-কক্ষের দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইল। সুকুমারী পাঠ ত্যাগ করিয়া বলিল, "কে ?" সরোজের মুখ সহসা উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। কিন্তু তাহা ক্ষণেকের জন্য। পরক্ষণেই সে গম্ভীর মুখে বলিল, "কাৰ্ত্তিক বাবু, ওখানে দাঁড়িয়ে রৈলেন কেন ? ভিতরে আসুন।"

কার্ত্তিক প্রবেশ করিয়া একটা বেঞ্চে বসিয়া বলিল, "আমি কার্ত্তিক কেবল নামে, আমার যদি ময়ূর থাকৃত, তাহলে বোধ হয় আপনি আমার আগমন মোটেই টের পেতেন না। তা না হয়ে জুতোর ওপরই আমার আগমন-ঘোষণার দামামা বাঁধা রয়েছে। আজ আপনাকে আশ্চর্য্য করে দেবার জন্য এই দুপুরেই চলে এলুম।"

সুকুমারী কহিল, "কাৰ্ত্তিক-দা, আমার পড়্‌তে ভাল লাগ্‌ছে না, তবু সরো-দি ছাড়্‌বে না।"

কার্ত্তিক কহিল, "যারা মাষ্টার হয়, তাদের ঐটে বড় দোষ। পড়্‌তে ভাল লাগ্‌ছে না তবু তারা পড়াবেই, বসে থাক্‌তে ভাল লাগ্‌ছে না তবু তারা বসিয়ে রাখ্‌বে, কাজ কর্‌তে ভাল লাগ্‌ছে না তবু তারা বল্‌বে, কাজ কর, কর্ত্তব্য কর, নইলে ক্ষতি হবে। সুকু, আমারও পড়্‌তে ভাল লাগ্‌ছিল না, তাই আমি পালিয়ে তোমাদের কাছে এসেছি। কিন্তু তুমি ছোট্ট কি না, তাই তোমার পালাবার জো নেই, এ অত্যাচার সইতে হচ্চে। কি কর্‌বে, বল, পরাধীন হওয়ার ঐটেই মস্ত দোষ।"

সরোজ কহিল, "নিজেকে বড় হয়েছি মনে করা, কর্ত্তব্যের চাইতে ওপরে উঠেছি মনে করা, স্বাধীন হয়েছি মনে করা একটা মস্ত অহঙ্কার। আর অহঙ্কারই পতনের পূৰ্ব্ব লক্ষণ!"

কার্ত্তিক কহিল, "তা হবে! যে চারি দিক দিয়ে বদ্ধ,—ঘরের কোণে

বদ্ধ, পরের সাহায্যের দ্বারা বদ্ধ, নিজের দৃষ্টিহীনতার দরুণ বদ্ধ, সে কেমন করে বুঝবে যে মাঝে মাঝে ছাড়া পেতে, সকল বাধা থেকে, দৃষ্টির বাধা, জ্ঞানের বাধা, কর্ত্তব্যের বাধা, সব রকম বন্ধন থেকে মুক্তি পেতে ইচ্ছে হয়। মাঝে মাঝে ইচ্ছে হয়, যা বুঝিনে, যা জান্‌বার কোন উপায় নেই, যা একেবারে দৃষ্টির পূর্ব্বের অন্ধকারের মত সম্পূর্ণ অবোধ্য, অপ্রজ্ঞাত, সেই নিতান্তই অজানার মধ্যে আপনাকে হারাতে ইচ্ছে করে। যার বহির্দৃষ্টি নেই—"

সরোজ বাধা দিয়া কহিল, "তার অন্তর্দৃষ্টি থাকতে পারে না, সে বাইরে ভেতরে উভয় দিকেই অন্ধ, কেমন? কার্ত্তিকবাবু, হেঁয়ালিতে কথা বলতে কবে থেকে শিখ্‌লেন? আর দীন দুঃখী অন্ধদের অন্ধতা নিয়ে নিষ্ঠুরের মত বিদ্রূপ করতেই বা কে আপনাকে অধিকার দিলে? দুপুর বেলায়, সমস্ত কর্ত্তব্য ফেলে রেখে অন্ধদের নিয়ে খেলা করতেই বা কে আপনাকে বলেছিল? আপনি মনে করছেন যে, আমি কিছুই বুঝতে পারব না? কিন্তু নিজের বিষয় অতখানি অহঙ্কার রাখবেন না, কার্ত্তিকবাবু। আমরা অন্ধ বলে এতখানি অন্ধ নই! আমি অন্ধ বলে যে একেবারে দেখতে পাইনে তাও নয়! আমার বাইরে চোখ নেই বটে, কিন্তু যিনি সবারই পক্ষে চক্ষু-স্বরূপ, তিনি সর্ব্বদাই আমার অন্তরের মধ্যে চক্ষু হয়ে বসে আছেন। আপনি যা মনে করে এখানে একজন অসহায় অন্ধ নারীর কাছে আসেন, সে ভাবটা আমার অন্তরের চক্ষু স্পষ্ট দেখতে পায়। বাহিরের চোখে যা ধরা পড়েনা, ভেতরের চোখের কাছে তা খুব স্পষ্ট।"

কার্ত্তিক স্তম্ভিত হইয়া গেল। তাহার সমস্ত অভিমান, সমস্ত দর্প এক নিমেষে মন্ত্রমুগ্ধ বিষদন্তভগ্ন সর্পের মত মাটিতে লুটাইয়া পড়িল। কার্ত্তিক আর কোন কথা বলিতে পারিল না। এমন কি, সেই বিস্ফারিত

অন্ধ নয়নের দিকে ভাল করিয়া চাহিতেও পারিল না ;—তাহার বোধ হইল, যেন ঐ অন্ধ নয়ন হইতে এক অপূর্ব্ব জ্যোতি বাহির হইয়া তাহাকে দগ্ধ করিতেছে। কিন্তু কি তাহার অপরাধ? কি অপরাধে সে এই অন্ধ নারীর অন্তরস্থ তৃতীয় নয়নের বহ্নিতে এমনভাবে দগ্ধ হইতে লাগিল?

সুকুমারী তাহাদের কথাবার্ত্তার অর্থগ্রহণ করিতে না পারিয়া বলিল, "কি হ'ল সরো-দি, তুমি কাঁপছ কেন?"

সরোজ উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "কিছু না সুকু, চল, আমরা মার কাছে যাই, মাকে ওষুধ খাওয়াতে হবে।"

কার্ত্তিকও উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "কি পাপে আমায় এত বড় দণ্ড দিলে?"

সরোজ কহিল, "কি পাপে? আপনি এত বড় অন্ধ যে, নিজেকে ছাড়া আর কিছুই দেখতে পান না, অথচ ঐ দুটো চোখের এতখানি গর্ব্ব করেন! নিজের দিকে চেয়ে চেয়ে আপনি এতখানি অন্ধ হয়ে গিয়েছেন যে, আপনার সমস্তই যে অন্যে টের পেতে পারে, এটুকু পর্য্যন্ত আপনি বুঝতে পারেন না! আমি কি একটা খেলার পুতুল যে দুদণ্ড খেলা করবার জন্য আমার কাছে আপনি ছুটে আসবেন, আর আমি তাই সহ্য করব?"

কার্ত্তিক কহিল, "খেলা! আমি তোমায় নিয়ে খেলা করতে আসি! তোমার কাছে আসি বলে আমার ইহকাল পরকাল দুইই যেতে বসেছে! আমার দেবতার মত পিতা—তিনি আমায় ত্যাগ করতে উদ্যত, আমার পরম-হিতৈষী পিতৃতুল্য কালিকাবাবু আমার জন্য কাঁদছেন, আর হয়ত শৈলজাও আমার জন্য পথ চেয়ে বসে আছে। তোমার ঐ অবাধ্য অন্ধ নয়ন দিয়ে তুমি আমায়—"

সরোজ আগুনের মত জ্বলিয়া উঠিয়া বলিল, "এতেও বুঝতে পারছেন

না, আপনি কতখানি অন্ধ। আপনার উদ্দাম স্বেচ্ছাচারিতা যে আমার চাইতেও আপনাকে অন্ধ করেছে। যে নিজের জন্য সকল হিতৈষী বন্ধু আত্মীয়ের ভালবাসাকে তুচ্ছ করতে পারে, সে মানুষ নয়। আপনার নিজের অন্তরের দিকে ভাল করে না চেয়ে এই মন নিয়ে কি করে রোজ আমার কাছে আসতেন—আর আমিই বা কি করে সব বুঝে সব জেনেও আপনাকে সহ্য করেছি, এইটেই আমার ভারী আশ্চর্য্য মনে হচ্ছে। কিন্তু আর না, আর আমি আপনাকে কাছে আসতে দেব না। যে নিজের বাপ-মার নয়, বন্ধুর নয়, আত্মীয়ের নয়, এমন কি প্রাণ-দিয়ে ভালবাসারও নয়, সে কোন্ সাহসে অসহায় পরনির্ভরশীল অন্ধের কাছে আসে?"

কার্ত্তিক অবরুদ্ধ কণ্ঠে বলিল, "সরোজ, ক্ষমা কর। আর আমি এখানে আসব না। কিন্তু ঠিক জেনো যে তুমি আমার পক্ষে যত দুর্ল্লভ হয়ে উঠছ, ততই আমায় নির্দ্দয় ভাবে আকর্ষণ করছ। তুমি না চাইতে আমি আপনাকে দিয়েছি, এই আমার অপরাধ। তুমি লভ্য নও, তুমি নিতান্তই অন্ধকারের মত অবোধ্য, তাই তোমার এতখানি শক্তি! তোমায় বুঝতে পারি না তাই আসি। বুঝতে পারলে হয়তো আসতুম না। তুমি আমায় চাও না, তাই তুমি আমায় টানছ। যাক্, আবার কি বলতে কি বলব! আমি চলে যাচ্ছি, তোমরা তোমাদের কর্ত্তব্য কর। কর্ত্তব্যই তোমাদের কাছে যখন বড়, তখন আমার মত কর্ত্তব্যহীন বন্ধনহীন সংসার-থেকে-সম্পূর্ণ-বিচ্ছিন্ন জীব তোমার নিয়মে-বাঁধা জগতের মধ্যে বিপ্লব বাধাতে আর আসবে না।"

কার্ত্তিক চলিয়া গেল। সুকুমারী সরোজের হাত ধরিয়া টানিল। কিন্তু সরোজ বেঞ্চ খানার উপর অবসন্ন দেহে বসিয়া পড়িয়া দুই হাতের মধ্যে মুখ লুকাইল। সুকুমারী বলিল, "এস সরো-দি, মার ওষুধ খাবার সময় হয়েছে যে।"

সরোজ ভাবিল, ঠিক্, ওষুধ খাবার সময় হয়েছে! ওষুধ তেতোই হয়! প্রকাশ্যে বলিল, "বিন্দুকে ডেকে দাও, ওষুধ খাওয়াক্। আমি একটু পরে ওঁর খাবার তৈরি করে নিয়ে যাচ্ছি। তুমি যাও সুকু, খেলা করগে।"

সুকুমারী চলিয়া গেল, কিন্তু সরোজ উঠিল না। তাহার অন্তরের অন্ধকার ঘনতর হইয়া আসিয়াছে। যে আলো আসিতে চাহিতেছিল, সবলে সেই আলোর প্রবেশ-দ্বার সে আজ বন্ধ করিয়া দিয়াছে। সে চির-অন্ধকারের জীব, কাজ কি তার ক্ষণিকের আলোয়? কিন্তু মন যে কিছুতেই থামিতে চায় না! ঐ যে পদ-শব্দ ক্রমেই দূরে মিলাইয়া গেল, তাহার অশ্রুত ধ্বনির পিছনে অ-বদ্ধ মনটা কেবলই যে ছুটিতে চাহিতেছে! আর একবার মাত্র—একটীবার ঐ অতি-পরিচিত পদধ্বনি শুনিবার জন্য যে তাহার অন্তরের নির্ব্বাক অন্ধকার গুমরিয়া কাঁদিয়া উঠিতেছে! কেহ ত অন্ধের পানে আর অমন করিয়া চাহিয়া হৃদয়ের আলো লইয়া অন্ধকার হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করিতে চাহিবে না! জগতে তাহাকে অমন প্রাণ দিয়া চাহিবে, এত বড় হতভাগা ত আর একটাও এ সংসারে পাওয়া যাইবে না! তবে সে ঐ একটী মাত্র হতভাগ্যকে কেন এমন করিয়া দূরে ঠেলিয়া দিল?

আলো আসিতে আসিতে অর্দ্ধ পথে তাহারই ফুৎকারে নিবিয়া গেল! হায় আলো,—হায় অন্ধকারের চির-প্রার্থিত বস্তু, হায় আঁধার ঘরের কুড়াইয়া-পাওয়া মাণিক, তোমায় চাহি না,—এইটাই তুমি বুঝিয়া গেলে? হায় অন্ধতা, তুমি কি এমনি অন্ধকার যে, তোমার কিছুই কেহ কখনও বুঝিতে পারিবে না? তুমি কি চিরদিনই মৌন নির্ব্বাক থাকিয়া যাইবে?

৯

শিবচন্দ্র ন্যায়রত্ন পুত্রের পত্রের উত্তর পাঠাইয়া মনোরমা দেবীকে বলিয়া দিলেন, সে দিন হইতে কার্ত্তিকের নাম যেন তাঁহার গৃহে আর না লওয়া হয়। মনোরমা দেবীর মনে হইল সংসারের যত-কিছু কাজ-কর্ম্ম ছিল, সমস্তই শেষ হইয়া গিয়াছে—এখন একটা মস্ত ছুটির দিন আসিয়াছে। আর কাহারও জন্য কিছু করিতে হইবে না, কাহারও আশায় বসিয়া থাকিতে হইবে না, আশা-আশঙ্কা-উদ্বেগাদির দায় হইতে পরিত্রাণ লাভ করিয়া সুদীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া তিনি গৃহ-দেবতার সম্মুখে বসিয়া পড়িলেন। বাড়ীর সর্ব্বকর্ম্মের দাসী—লক্ষ্মীর মা বারংবার ঠাকুর-ঘরের দ্বার হইতে ফিরিয়া গিয়াছে। ঠাকুর বাড়ীর ব্রাহ্মণ দরোয়ান মা ঠাকুরাণীর রন্ধনের জন্য জল তুলিয়া দিয়া গিয়াছে, এমন কি দেওয়ান-গৃহিনী নিস্তারিণী দেবীর দাসী ক্ষেমিও নানা অছিলায় আসিয়া বারংবার শুনাইয়া দিয়া গিয়াছে, এ সমস্তই শঙ্করানন্দের অভিশাপের ফল,—তবুও মনোরমা দেবী উঠিলেন না। সমস্ত সংসার ব্যাপিয়া একটা বিরাট জড়তা, গুরুভার আলস্য চাপিয়া বসিয়াছে। পত্নীর অবস্থা দেখিয়া ন্যায়রত্ন মহাশয় গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "এমন করলে ত চলবে না, মনোরমা। আমরা আহারাদি ত্যাগ করতে পারি, কিন্তু ছাত্রেরা কি দোষ করেছে? তাদের দুবেলা দু মুঠো যদি না দিতে পার তা হলে তাদের বিদায় দিতে হয়। তুমি কি আমায় পৈতৃক বৃত্তি লোপ করাতে চাও?"

মনোরমা দেবী না উঠিয়া বলিলেন, "আর কার জন্য ও-সব? সব উঠিয়ে দাও।"

শিবচন্দ্র কহিলেন, "কি! পুত্রের অপরাধে পিতৃ-পিতামহের নাম লোপ করব? তার পূর্ব্বে বরং তোমাকেও ত্যাগ করতে পারি!"

মনোরমা দেবী কহিলেন, "যে স্ত্রী এত বড় পিতৃদ্রোহী সন্তানের জননী, তাকে যে স্ত্রী বলে এতদিন স্বীকার করেছ, এই তার পক্ষে যথেষ্ট, এখন তাকে বিদায় দাও, কিম্বা সংসারের পেট-ভাতায় দাসী করে রাখ, দুই সমান।"

শিবচন্দ্র কিছুক্ষণ নীরবে পত্নীর দিকে চাহিয়া রহিলেন। কত বড় আত্মধিক্কারে যে মনোরমা দেবী ঐ কথাগুলি উচ্চারণ করিলেন, তাহা প্রাণে প্রাণে অনুভব করিয়া তিনি তাঁহার মাথায় হাত রাখিয়া বলিলেন, "চন্দ্র-সূর্য্য সাক্ষ্য করে আমি যে প্রতিজ্ঞা করেছি, সে প্রতিজ্ঞা রাখতে পারলাম না, মনোরমা। যে সন্তান তার পিতার এত বড় অপমান করলে, যে সন্তান তার বাপের এত বড় ধর্ম্মচ্যুতির কারণ-স্বরূপ হ'ল, তার জন্য দুঃখ করাই দুঃখের অপমান! তুমি ওঠো, তুমি এমনভাবে অন্নজল ত্যাগ করে থাকলে গৃহদেবতা ক্রুদ্ধ হবেন। সংসারে থাকতে হলে অনেক রকম দুঃখ সইতে হয়, তা বলে ধর্ম্ম-ত্যাগ কর্ত্তব্য-ত্যাগ করবার অধিকার কারও নেই। ওঠো মনোরমা।"

স্বামীর কাতর অনুনয়ে মনোরমা দেবী আজ তিন দিনের পর কাঁদিয়া ফেলিলেন। আজ তিন দিন হইতে যে অশ্রু অবরুদ্ধ হইয়া অন্তর্লীন অগ্নির মত তাঁহাকে দগ্ধ করিতেছিল, সেই অশ্রু প্রবাহিত হইয়া বুক ভাসাইয়া দিল। অপমানিত মাতৃহৃদয় যে অশ্রুকে ঘৃণায় চাপিয়া রাখিয়া ছিল, আজ আর তাহা বাঁধন মানিল না। মনোরমা দেবী দেবতার সম্মুখে লুটাইয়া পড়িয়া বলিলেন, "আমায় নাও, দেবতা।"

ন্যায়রত্নের গৃহের সমস্ত সংবাদ অবগত হইয়া কালিকামোহন তাঁহার কন্যাকে মনোরমা দেবীর নিকট পাঠাইয়া দিলেন। শৈলজা আসিয়া মনোরমার পদতলে প্রণাম করিবামাত্র তিনি তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিলেন। শৈলজাও তাঁহাকে সান্ত্বনা দিবার মত

একটী কথাও খুঁজিয়া না পাইয়া কেবল মনোরমা দেবীর অশ্রুতে অশ্রু মিশাইয়া বসিয়া রহিল। এইরূপে কিছুক্ষণ বসিয়া থাকিয়া পরে অশ্রু মুছিয়া সে বলিল, "মা, আপনি ব্যস্ত হবেন না, বাবা বলেছেন, সমস্তই আবার ঠিক হয়ে যাবে।"

মনোরমা দেবী তাহার শিরশ্চুম্বন করিয়া বলিলেন, "যে অন্ধ তার হাতের কাছে এত বড় মাণিক থাক্‌তে আলেয়ার পেছনে ছোটে, তার জন্য আশা করাও আশার অপমান! যাও মা, আমাদের আশা আর করো না। তোমার বাবাকে বলো, সেই মহাপাপিষ্ঠের আশা তিনি আর না করেন। অযোগ্য পাত্রের জন্য এমন কন্যাকে অবিবাহিতা রাখা অন্যায়। আমাদের পাপে তোমরা কেন কষ্ট ভোগ কর?"

শৈলজা অবনত মস্তকে ধীরে ধীরে বলিল, "তা হয় না মা, বাবা বলেন বামুনের মেয়ের বাগ্‌দত্তা হওয়া যা, বিয়ে হওয়াও তাই।"

মনোরমা দেবী কহিলেন, "শাস্ত্রে কি আছে জানিনে, কিন্তু তাই বলে মেয়েকে জলে ফেলে দিতে বল্‌তে পারিনে ত। এর পরও যদি তোমার বাবা সেই লক্ষ্মীছাড়াটার সঙ্গে তোমার বিয়ে দেন, তাহলে যে তোমায় জীবনে অনেক কষ্ট ভোগ কর্‌তে হবে। যার এমন বাপ কেউ নয়, সর্ব্বানন্দের মত বন্ধু কেউ নয়, তোমার বাবার মত এত বড় হিতৈষীও কেউ নয়, সে কি জীবনে কখনও কারও হবে? তাকে আপন করা কারও সাধ্য নয়।"

শৈলজা ব্যস্ত হইয়া বলিল, "তবু তিনি আপনাদেরই সন্তান, সেটা ত মিথ্যা নয়। একবার যদি ক্ষণিকের মোহে তাঁর একটা ভুল হয়ে থাকে, তাই বলে কি তাঁকে আপনারা একেবারেই ত্যাগ কর্‌বেন? আপনারা ত্যাগ কর্‌লে তাঁর যে আর কোন উপায় থাক্‌বে না।"

মনোরমা শৈলজার মুখখানি তুলিয়া ধরিয়া কিছুক্ষণ পরম স্নেহে চাহিয়া

রহিলেন, পরে তাহার ললাট চুম্বন করিয়া কতকটা আত্মগতভ বলিলেন, "আশা আছে—আশা আছে—এই তুমিই আমার একম আশা!" শৈলজা লজ্জিত হইয়া বলিল, "এখন তাহলে আসি, মা এ আছেন।"

শৈলজা প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল।

* * * * *

এদিকে নিস্তারিণী দেবী দেওয়ান দুর্গাশঙ্করকে ধরিয়া বসিলেন, এ সময়ে মণিশঙ্করের সহিত শৈলজার বিবাহের চেষ্টা কর। দুর্গাশং বলিলেন, "কেন, শৈলজার অপরাধ? কার্ত্তিকের উপর তার বাপ র করেছে বলে কি শৈলজার আর সৎপাত্র যুটবে না?"

এই উত্তরের ফলে দুর্গাশঙ্করবাবুকে সে দিনটি যেরূপ অশান্তিে কাটাইতে হইয়াছিল, তাহার বর্ণনা নিষ্প্রয়োজন; এবং পরে যে তাঁহাে পরাজয় স্বীকার করিয়া নিস্তারিণী দেবীর কথানুযায়ী কার্য্য করিে হইয়াছিল, সে কথা বলা বাহুল্য।

সন্ধ্যার পর তিনি টোলে গিয়া ন্যায়রত্ন মহাশয়ের নিকট অি লজ্জিতভাবে উপবেশন করিলেন। তাঁহাকে তদবস্থ দেখিয়া ন্যায়র বলিলেন, "দেওয়ানজী, আপনি অমন ক'রে এসে বস্‌লেন যে! আমা সান্ত্বনা দিতে এসেছেন?" দেওয়ান লজ্জিত হইয়া বলিলেন, "আজ্ঞে ত নয়, আমিই কোন প্রার্থনা নিয়ে আপনার কাছে এসেছি।"

শিবচন্দ্র কহিলেন, "প্রার্থনা! আমার কাছে? কি প্রার্থনা, বলুন।

দেওয়ানজী কহিলেন, "কিন্তু বল্‌তে ভয় হচ্চে, পাছে আপি রাগ করেন!"

শিবচন্দ্র কহিলেন, "রাগ ক'র্‌ব! এমন কি প্রার্থনা? বলুন সাধ্যাতীত না হ'লে নিশ্চয় তা পূরণ কর্‌বার চেষ্টা ক'র্‌ব।"

দেওয়ানজী কহিলেন, "আপনি ব্রাহ্মণ, আপনার এইটুকু কথাই যথেষ্ট। আমি প্রার্থনা ক'র্‌ছি যে আমার মণির সঙ্গে শৈলজার বিবাহের সম্বন্ধ ক'রে দিন।"

শিবচন্দ্র কহিলেন, "আপনার মণির সঙ্গে? কি ভয়ঙ্কর! শৈলজার কোষ্ঠীতে কি সৎপাত্র যোট্‌বার মোটেই আশা নেই! আপনিই বলুন, মণির মত পাত্রের সঙ্গে—আপনার যদি কোন কন্যা থাক্‌ত—তার বিয়ে দিতে পার্‌তেন?"

দেওয়ানজী কহিলেন, "কিন্তু আমি পিতা!"

শিবচন্দ্র কহিলেন, "তেমনি শৈলজাও কোন পিতার সন্তান। আমি বল্‌লেও তিনি জেনে-শুনে কেমন ক'রে এমন অসৎপাত্রে মেয়ে দেবেন?"

দেওয়ানজী কহিলেন, "সৎপাত্রও যেমন পিতৃদ্রোহী কুসন্তান হ'তে পারে, অসৎপাত্রও তেমনি সঙ্গ, সময় ও অবসরের গুণে সৎপাত্র হ'তে পারে।"

শিবচন্দ্র আহত হইয়া বলিলেন, "দেওয়ানজী, এ আঘাত আমার প্রাপ্য বটে; আপনি ঠিকই করেছেন। আমার যেমন অহঙ্কার তেমনি তার উপযুক্ত প্রতিফল দিয়েছেন। আচ্ছা, বেশ আমি চেষ্টা কর্‌ব, যথাসাধ্য চেষ্টা কর্‌ব, যাতে মণির সঙ্গে শৈলজার বিয়ে হয়। কিন্তু—"

দেওয়ানজী কহিলেন, "কিন্তুর বিষয় আপনাকে চিন্তা ক'র্‌তে হবে না, ন্যায়রত্ন মশায়, কিন্তুর বিষয় আমার সমস্তই জানা আছে। আমি পিতা বলে এত বড় অন্ধ নই যে আমার ঐ বর্ব্বর সন্তানের কোন্‌ জায়গায় 'কিন্তু' আছে, তা দেখ্‌তে পাইনে। কিন্তু তবু আমি ওর জন্মদাতা, ওর পাপের ভাগ আমাকেও কতক বইতে হচ্চে এবং হবেও। তবু ওকে ত্যাগ ক'র্‌তে পারিনে। আপনার মত ন্যায়ের তুলা-দণ্ড ধরে কোন পিতাই বসে থাক্‌তে পারে না। বাপ যখন পুত্রের জন্ম দিয়েছে, তখন

পুত্রকে ধূলোমাটী-শুদ্ধ প্রাণপণে কোলের মধ্যে ধরে' পরের আঘাত থে
তাকে বাঁচাতে সে বাধ্য! ভগবান যেমন ন্যায়-অন্যায় বস্তু-অবস্তুর বিচ
কর্‌বার ক্ষমতা মানুষকে দিয়েছেন, তেমনি একটা অন্ধ প্রবৃত্তিও ত
সঙ্গে জুড়ে দিয়েছেন, সেটার নাম স্নেহ। ভগবান যেমন ধূলো দি
রাস্তার কঠোরতা বন্ধুরতা ঢেকেছেন, তেমনি স্নেহ দিয়ে সংসা
ধর্ম্মাধর্ম্ম কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের বন্ধুরতাও কতকটা দূর ক'রেছেন। ধূলোয় চে
অন্ধ ক'রে দেবে, পথ দেখ্‌তে দেবে না, তবু তাকে ছাড়্‌বার জো নে
ঝাড়্‌বার উপায়ও নেই। ঝাড়্‌লে সে ধূলো আরও নাকে-মুখে ঢুক্‌বে।'

দেওয়ানজী ন্যায়রত্নকে নমস্কার জানাইয়া চলিয়া গেলেন। শিবচন্দ্র প্রতি
নমস্কার বিস্মৃত হইয়া শূন্য দৃষ্টিতে বাহিরের দিকে চাহিয়া রহিলেন। ঠিক
ধূলা ঝাড়িতে গেলে আরও নাক-মুখ দিয়া সে প্রবেশ করে! তা করে বটে
শিবচন্দ্র প্রাণে-প্রাণে তাহা অনুভব করিতেছেন। হায় ধূলা, হায় প
ভুলানো, সব-ভুলানো অন্ধ-করা ধূলা, তোর হাত হইতে কিছুতে
পরিত্রাণ নাই!

১০

বন্ধন! চারিদিকেই বন্ধন! কর্ত্তব্যের বন্ধন, উচ্চ আশার বন্ধন
ধর্ম্মের বন্ধন, ক্ষুধা-তৃষ্ণার বন্ধন, এমন কি স্নেহেরও বন্ধন! স্বাধীনতা
নাম-গন্ধ এ জগতে নাই! এক পা এদিক-ওদিক ফেলিবার জো নাই
ফেলিলেই চারিদিক হইতে চীৎকার, ক্রুদ্ধ অভিশাপ, অথবা কাত
ক্রন্দন! যিনি গুরু, তিনি বলিতেছেন, ইহাই কর, আর কিছু করিতে
পারিবে না; যিনি ধর্ম্মোপদেষ্টা, তিনি বলিতেছেন, ইহাই কর্ত্তব্য, অন্য
কিছু করিলে পাপ হইবে; যিনি ভালবাসেন, তিনি বলিতেছেন, ইহা
কর; আর কিছু করিলে আমার কষ্ট হইবে, আমি কাঁদিব। অথ

কেহই একবার ভাবিয়া দেখিবেন না, আমার কি প্রয়োজন, আমি কি চাই। আমার ক্ষুধিত হৃদয় যাহার জন্য কাঁদিতেছে, তাহার দিকে চাহিবারও আমার অধিকার নাই, চাহিলেই হয় রক্ত চক্ষুর অগ্নিবর্ষণ, নয় কর্ত্তব্যের সিংহনাদ,—অথবা স্নেহের করুণ আর্ত্তস্বর! কার্ত্তিক অতিষ্ঠ হইয়া ভাবিল, এই বন্ধনের মূলোচ্ছেদ করিতেই হইবে!

বাহির হইতে টানাটানি করিলে সমস্ত বন্ধনগুলি একজোটে তাহাকে চাপিয়া ধরিয়া রাখিবে। কিন্তু একে একে প্রত্যেক বন্ধনের মূলদেশ তীক্ষ্ণধার অস্ত্রের দ্বারা আক্রমণ করিতে পারিলে হয়তো সে মুক্তিলাভ করিতে পারে। অতএব এখন হইতে তাহার একমাত্র কর্ত্তব্য হইল, সেই তীক্ষ্ণধার অস্ত্র সংগ্রহ করা এবং সর্ব্বপ্রযত্নে তাহা প্রয়োগ করা।

কার্ত্তিক তাহার পিতার পত্রের অতি বিনীত উত্তর লিখিয়া সর্ব্বানন্দ ও শশিভূষণের সম্মুখে ফেলিয়া দিল। শশিভূষণ তাহা পাঠ করিয়া চুপ করিয়া রহিল, কিন্তু সর্ব্বানন্দ কিছুক্ষণ কার্ত্তিকের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া অবশেষে গম্ভীরভাবে গীতার একটা শ্লোক আবৃত্তি করিল—

"সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে।
ক্রোধাৎ ভবতি সংমোহঃ সংমোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাৎ বুদ্ধিনাশঃ বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি॥"

কার্ত্তিক বলিল, "অর্থাৎ আমি নাশের দিকে যাচ্ছি! তোমাদের মনোবাঞ্ছাই পূর্ণ হ'য়েছে, তবু কেন নাশের দিকে যাব?"

শশিভূষণ কহিল, "অর্থাৎ এত বড় মিথ্যা চিঠি যখন তুমি লিখ্‌তে পেরেছ, তখন তোমার বুদ্ধিনাশ না হোক সম্মোহ পর্য্যন্ত হয়েছে। সম্মোহের পর যে যে অবস্থা শাস্ত্রে লেখা আছে, তাই দেখ্‌বার জন্য আমরা প্রস্তুত রইলুম। এখন যাও যেদিকে খুসি, আমরা আমাদের কাজ করি। আর তুমি বিরক্ত কর্‌তে এস না।"

কার্ত্তিক কহিল, "অর্থাৎ তোমরা আমায় ত্যাগ কর্‌লে।"

শশিভূষণ কহিল, "কিরে সর্ব্বা? তোর সে শ্লোকটা কি, সেই 'বোরগঙ্কতা'— ?"

কার্ত্তিক কহিল, "আমার অপরাধটা কি যে তোমরা এত বড় শাস্তি দিচ্ছ? সংসারে যে যা চায় সে তা পায় না, তাই বলে কি মানুষ কিছু চাইবেও না? এতবড় পরাধীনতা কি নিষ্ঠুরতা নয়? তোমাদের এতবড় নির্দ্দয়তার কি কোন শাস্তি কেউ দেবে না? এমন কি কেউ নেই—"

সর্ব্বানন্দ কহিল, "কৈ আর আছে! থাক্‌লে আর তোমার মত স্বার্থসেবী আত্মপরায়ণ জীবের কোন শাস্তি হয় না?"

কার্ত্তিক কহিল, "আরও শাস্তি চাই! আচ্ছা, প্রতিজ্ঞা করছি, জগতে সব-চাইতে বড় যা শাস্তি আমি তাই নেব। আমি বুঝেছি, সবাই যা চায়, আমি তা চাই না, এই আমার অপরাধ, সবাই যা করে আমি তা করিনে, এই আমার অপরাধ। আর সব চেয়ে অমার্জ্জনীয় অপরাধ এই যে আমি কারও পাকা ধানে মৈ দিই নি, আপনার সামান্য একটু কামনা নিয়ে জগতের একপাশে সরে থাক্‌তে চেয়েছিলুম। কিন্তু তা হ'তে পেল না, কারণ আমি পরাধীন!"

সর্ব্বানন্দ কহিল, "না, সব-চাইতে যা বড় অপরাধ, সেইটেই তুমি বল্‌লে না, তোমার সর্ব্বাধম অপরাধ এই যে তুমি স্বেচ্ছাচারী। নিয়মের সংসারে থেকে যে নিজেকে অনিয়মের অধীন করে তোলে, তাকে সংসার কখনই মার্জ্জনা করবে না।"

শশিভূষণ কহিল, "সংসারে একটা অদ্ভুত ব্যাপার দেখে আমি অবাক্ হয়ে গিয়েছি যে, জগতে যে বস্তু সব-চেয়ে ভাল, তাই যদি আবার কোন কারণে খারাপ হয় তাহলে তার মত খারাপ আর কিছু হ'তে পারে না;

ভাল বস্তু নষ্ট হলে তার দুর্গন্ধে অতিষ্ঠ হ'তে হয়। কার্ত্তিক, তোমার বাবাকে যখন তুমি ঠকাবার চেষ্টা ক'রেছ, তখনই বুঝেছি যে তোমার আর আশা নেই। বাপকে যদি ঠকাও তাহলে আর কোন্ পাপের ভয় তোমায় ঠেকিয়ে রাখ্‌বে ?"

কার্ত্তিক কহিল, "এই চিঠিতে বাবার চোখে যে ধূলো দেবার চেষ্টা করেছি, তাই বা তুমি কেমন করে জান্‌লে ? আর যদিই বা কারও চোখে ধূলো দি, তিনি ত ইচ্ছা ক'র্‌লে চোখ ঢাক্‌তেও পারেন ! তোমরা ত রয়েছ, তাঁদের সাবধান করে দাও না কেন ! লিখে পাঠাও যে কার্ত্তিক আর আপনাদের স্নেহের উপযুক্ত নেই। এখন তার চরিত্র, তার সুবুদ্ধি সমস্তই এমনি পচে উঠেছে যে তার দুর্গন্ধে তোমরাই ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠেছ ?"

শশিভূষণ কহিল, "স্নেহ জিনিসটা চিরদিনই নিম্নগামী। যে যত নীচ, যার চরিত্র যত অধঃপতিত, স্নেহপরায়ণ মানুষের, সাধু লোকের স্নেহ ততই তার দিকে ছুটে চ'ল্‌তে থাকে। তুমি যত নেমে যাবে, তোমার বাপ মা আর কালিকাবাবুর স্নেহ ততই তোমার দিকে ছুটে চ'ল্‌বে। প্রমাণ চাও, এই চিঠিখানা পাঠিয়ে দু'দিন অপেক্ষা কর, দেখ্‌বে, তাঁরা তোমার সব দোষ ক্ষমা করে আবার তোমায় তেমনি ভালবাস্‌ছেন। কিন্তু যদি তুমি মানুষ হও তাহলে তোমার সব কথা খুলে লেখা উচিত। তুমি কি হয়েছ সব কথা প্রকাশ ক'রে বল, তারপরও যদি তাঁরা তোমায় গ্রহণ করেন তাহলে আত্মসমর্পণ ক'র্‌বে।"

কার্ত্তিক কহিল, "আমি কি হয়েছি,—কি দোষ তোমরা দেখ্‌তে পেয়েছ, স্পষ্ট করে বল, তারপর আমি সেই কথা সত্য হোক আর মিথ্যা হোক কালিকাবাবুকে লিখে দেব।"

সর্ব্বানন্দ কহিল, "লিখে দাও যে তুমি মনে মনে ভয়ঙ্কর এক মতলব

এঁটে বসে আছ। অকারণে কতকগুলি নির্দ্দোষের উপর প্রতিশোধ নেবার মতলব ক'রেছ।"

কার্ত্তিক ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "প্রতিশোধ আমি নেবই, তবে তাতে কার যে বেশী অপকার হবে, আমার, কি অন্যের, তা ব'ল্‌তে পারি নে। যাক্, তোমাদের কথাই রাখ্‌লুম! এই আমি এখনি চিঠি লিখে দিচ্ছি—ঐ সব কথাই লিখ্‌ব।"

কার্ত্তিক আর একখানা পত্রে সর্ব্বানন্দ ও শশিভূষণ যে সব কথা বলিল, সমস্তই লিখিয়া ডাকে পাঠাইয়া দিল। শশিভূষণ আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, "এ রকম সয়তান আর একটীও দেখিনি। আগেকার কালে শুনেছি ডাকাতের দল খবর পাঠিয়ে ডাকাতি ক'র্‌ত, এখনকার কালেও যে তা হ'তে পারে তা জান্‌তুম না। কালিকাবাবুর হয়েছে এগুলেও নির্ব্বংশ, পেছুলেও নির্ব্বংশ! এমন চিঠি পেয়ে তিনি ত এখনি তেড়ে এসে ব'ল্‌বেন, বাবা কার্ত্তিক, তুমি যা-ই হও, তোমায় আমি ছাড়্‌তে পার্‌ব না।"

কার্ত্তিক সত্যই এইবার হাসিয়া ফেলিল; হাসিয়া বলিল, "তাহ'লে আমিই বা কি করি! আমারও যে আগে গেলে বাঘে খায়, পিছে গেলে ভূতে পায়! তোমরা যা ব'ল্‌ছ, তাই ক'র্‌ছি, তবু মন পাচ্ছিনে!"

শশিভূষণ কহিল, "আমাদের বিরুদ্ধেও কোন মতলব-টৎলব আছে না কি?"

কার্ত্তিক কহিল, "তা আমি যখন মতলব নিয়েই ঘুরে বেড়াচ্ছি, তখন তোমাদের বিরুদ্ধেও কিছু আছে বৈ কি! আর যদিই বা না থাকে, তবু ত আর তোমরা আমায় বিশ্বাস ক'র্‌বে না। যাই হোক, তুমি আমার একটা উপকার কর—আমার বিষয় যা-যা ধারণা তোমাদের হ'য়েছে, সমস্ত খোলসা করে কালিকাবাবুকে লিখে দাও। তারপর যা থাকে আমার ভাগ্যে, তাই হবে।"

কার্ত্তিক চলিয়া গেলে শশিভূষণ সর্ব্বানন্দকে বলিল, "সর্ব্ব, কার্ত্তিক যা ব'ল্‌ছে, তাই ক'র্‌ব ?"

সর্ব্বানন্দ কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিল, "না ঠাকুরদা, আমি কোন্ প্রাণে তা ক'র্‌তে ব'ল্‌ব ? কার্ত্তিক যা-ই হোক্ আমার ভাই। মায় পেটের ভাইয়ের চেয়েও ঢের বেশী। ও যে আমায় কত ভালবাসে, তা তুমি কি ক'রে জান্‌বে, ঠাকুরদা ? কত দিন কত মাস কত বৎসর এক সঙ্গে শোয়া বসা—এক চিন্তা, এক ধ্যান, এক জ্ঞান! রোগেও আমার সেবক, ভালবাসায়ও আমার সব-চেয়ে প্রিয়তম বন্ধু, হিতেচ্ছায়ও আমায় মায় পেটের ভাইয়ের চেয়েও বড়। ওকে কি আমি ত্যাগ ক'র্‌তে পারি ? মরি যদি ত একসঙ্গে ম'র্‌ব, পড়ি যদি ত এক সঙ্গে পড়্‌ব ; তবু ওকে ছাড়্‌তে পার্‌ব না। আমার জীবনে সব চেয়ে বড় কর্ত্তব্য ওকে ভালবাসা। ছেলেবেলা থেকে ও আমার যা, তা আমিই জানি, আর ভগবান জানেন!"

শশিভূষণ কহিল, "কিন্তু তবু কালিকা কাকার মেয়ে যদি ওকে বিবাহ ক'রে শেষ অসুখী হয় ? কার্ত্তিকের ভাব দেখে বোধ হ'চ্চে যে মনে মনে ও কি একটা ভয়ঙ্কর প্রতিজ্ঞা করেছে। ওর চরিত্র যতদূর বুঝেছি তাতে এই ব'ল্‌তে পারি যে, ও যদি একবার মন্দর দিকে বেঁকে, তাহলে অধঃপাতের চরম সীমায় না পৌঁছে থাম্‌বে না। সেইজন্য মনে হ'চ্চে, আমাদের কর্ত্তব্য এ বিবাহে বাধা দেওয়া।"

সর্ব্বানন্দ কহিল, "তাই যদি কর্ত্তব্য ব'লে তোমার বোধ হয়ে থাকে, তাহ'লে ও যখন সরোজকে এমন করে প্রাণ দিয়ে চাচ্ছে, তখন সরোজের কাছে যাবার পথই বা ওর পক্ষে বন্ধ ক'রে দাও না কেন ?"

শশিভূষণ কহিল, "কি জান ভাই, উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খলতাকে আমি কিছুতেই ভালবাসা বলে স্বীকার ক'র্‌তে চাইনে। কার্ত্তিকের মত

অতখানি শক্তি অতখানি তেজ কি সামান্য একটা অন্ধ নারীর ভালবাসায় আবদ্ধ থাকৃতে পারে ? যদি কার্ত্তিক সরোজকে পেত, তাহ'লে ফলে এই হ'ত যে সরোজের জীবনও বিফল হ'য়ে যেত, আর কার্ত্তিকও শীঘ্র অবসন্ন হয়ে নূতনতর উত্তেজনার জন্য ছুটে বেরিয়ে পড়ত।"

সর্ব্বানন্দ কহিল, "তোমার সঙ্গে এ বিষয়ে একমত হ'তে পারলুম না। তুমি হয়তো মিছি-মিছি দুটো জীবনকে বিফল ক'রে দিলে! তারপর যদি কার্ত্তিকের সঙ্গে শৈলজার বিবাহ ভেঙ্গে দেবার চেষ্টা কর, তাহলে হয়তো আরও একটা জীবন বিফল করে দেবে। আমার মতে তুমি আর এ বিষয়ে কিছু ক'রো না, ভগবানের যা ইচ্ছে তাই হোক্।"

শশিভূষণ এ কথার আর কোন প্রতিবাদ করিল না।

১১

পুত্রের কাতর প্রার্থনাপূর্ণ পত্র পাইয়া শিবচন্দ্রের অন্তর-ব [illegible] গভীর বেদনায় কম্পিত হইয়া উঠিল। কার্ত্তিক তাহার সমস্ত [illegible] বর্ণনা করিয়া তাহার অন্তরের সমস্ত গোপন কথা প্রকাশ করিয়া প[illegible]য়াছে, "আমার মনের এইরূপ অবস্থা জানিয়া-শুনিয়াও যদি বাবু [illegible] হাতে তাঁহার কন্যাদান করিতে উদ্যত হন, তাহা হইলে অগত্যা বিবাহ করিতে আমি বাধ্য। ইহা ছাড়া আপনার সঙ্গে কলিকাতায় আসিবার পূর্ব্বে যে কথা হয়, তাহাতে বুঝিয়াছিলাম, শৈলজার সঙ্গে আমার বিবাহ আপনার তত অভিপ্রেত নয়। তখন যদি বুঝিতাম যে, আপনিও বাবুর মতেই মত দিয়াছেন, এমন-কি চন্দ্র-সূর্য্য সাক্ষ্য করিয়া বাবুর কন্যাকে পুত্রবধূরূপে গ্রহণ করিতে স্বীকার করিয়াছেন, তাহা হইলে আমি এতদূর নীচ প্রকৃতির নই যে আপনি বাক্যদান করিয়াছেন জানিয়াও শৈলজাকে বিবাহ করিতে অস্বীকৃত হইব। যাহাই হউক, এখন আপনিই আমার বিচারক। আমি

আপনার অধম পুত্র; এ-রকম অবস্থাতেও যদি আপনি শৈলজাকে পুত্রবধূরূপে গ্রহণ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া থাকেন, লিখিবেন, আমি ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া আপনার সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিব। আমারও একটা সঙ্কল্প ছিল, যে সর্ব্বদাদার সঙ্গে শৈলজার বিবাহ দিব, কারণ সে শৈলজাকে অত্যন্ত স্নেহের চক্ষে দেখে; এমন-কি আমি এইরূপ হওয়ার দরুণ ক্রুদ্ধ হইয়া সেও আমায় ত্যাগ করিতে বসিয়াছে। চারিদিক হইতে এমনভাবে পরিত্যক্ত হইয়া আমি বাঁচিব কিরূপে? আপনি আমায় ত্যাগ করিয়াছেন, মার কোলেও আমার স্থান নাই, সর্ব্বদাদাও আমার সঙ্গ ত্যাগ করিল। আমি ভগবানের নিকট নিশ্চয়ই গুরুতর অপরাধী;—কিন্তু কি যে আমার অপরাধ, তাহা জানিতে পারিতেছি না, ইহাই আমার ক্ষোভ। তথাপি আমার অপরাধ থাকুক্ আর নাই থাকুক্, আমি আপনারই। পুত্র যত দোষী হোক, পিতা তাহাকে কিছুতেই পরিত্যাগ করিতে পারেন না। আপনি যদি আমায় ত্যাগ করেন, তাহা হইলে আমার আর দাঁড়াইবার স্থান কোথায়?"

শিবচন্দ্র পত্র পড়িয়া মস্তক কণ্ডূয়ন করিতে লাগিলেন এবং অজ্ঞাতে তাঁহার চক্ষু জলপূর্ণ হইয়া আসিল। পুত্র দোষী হোক্ আর নির্দ্দোষ হোক, এমনভাবে আত্মসমর্পণ করিলে তাহাকে কোলে না তুলিয়া লইয়া কি থাকা যায়? শিবচন্দ্র ব্যস্ত হইয়া পত্র-হস্তে কালিকাবাবুর নিকট উপস্থিত হইলেন।

কালিকাবাবুর কয়দিন হইতে ক্রমাগত জ্বর হইতেছিল। নানা চিন্তায় ইদানীং তাঁহার শরীর ভাঙ্গিয়া আসিয়াছে। তথাপি অক্লান্তকর্ম্মী কালিকাবাবু তাঁহার বিপুল জমিদারী ও বৈষয়িক কার্য্য সমস্তই প্রত্যহ নিয়মিতরূপে পরিদর্শন করিতেছিলেন।

জমিদারী কাছারির কাজ দেখিতে দেখিতে কার্ত্তিকের পত্র পাইয়া

তিনি হাতে লইয়া অন্যমনস্কভাবে ভাবিতেছিলেন, এখন খুলিবেন কি না। কি জানি, কেন, এ পত্র খুলিতে আজ কিছুতেই তাঁহার সাহস হইতেছিল না। দুই চারিবার নাড়িয়া চাড়িয়া তিনি উহা ডেস্কের মধ্যে রাখিয়া অন্য কার্য্যে মন দিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। এমন সময় পত্র-হস্তে ন্যায়রত্ন মহাশয় সেই স্থানে উপস্থিত হইলে তিনি কাছারি ছাড়িয়া পাশের ঘরে গিয়া একটা চেয়ারে বসিলেন। শিবচন্দ্রও তাঁহার অনুসরণ করিলেন।

শিবচন্দ্র তাঁহার পত্রখানা কালিকাবাবুর হস্তে দিলেন। কালিকাবাবু আদ্যন্ত পাঠ করিয়া বলিলেন, "এমন ছেলেকেও আপনি ক্রুদ্ধ হয়ে মর্ম্ম-পীড়িত করেছিলেন? ছিঃ! দাঁড়ান, আমাকেও সে আজ পত্র দিয়েছে, দেখি, তাতেই বা সে কি লিখেছে।" তিনি তখন স্বয়ং তাঁহার সেই পত্র-খানা আনিয়া পাঠ করিলেন, সেখানি পূর্ব্ব পত্রেরই অনুরূপ। উপরন্তু কার্ত্তিকের সম্বন্ধে সর্ব্বানন্দ ও শশিভূষণ যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছিল, তাহাও স্পষ্ট লেখা আছে। কার্ত্তিক কোন কথা গোপন করে নাই।

কালিকাবাবু পত্র পড়িয়া বলিলেন, "এখন আপনার মত কি?"

শিবচন্দ্র কহিলেন, "এমন অবস্থায় কি ক'রে বল্‌তে পারি যে, আপনি এই কার্ত্তিককে আপনার কন্যাদান করুন। সে ত স্পষ্টই ব'লেছে যে, সে অন্য-গত-চিত্ত; এ অবস্থায় আমি ত কোন রকামই বল্‌তে পার্‌ছি না যে, এই অনুপযুক্ত পাত্রে আপনি আপনার কন্যা সমর্পণ করুন।"

কালিকাবু কহিলেন, "অনুপযুক্ত! কি বল্‌ছেন আপনি? এতখানি সরলতার কি কোন মাহাত্ম্য নেই? কার্ত্তিক ত কোন কথা গোপন করেনি, এমন কি এই দেখুন, আমায় যে পত্র দিয়েছে, তাতে সে লিখেছে, সর্ব্বানন্দ আর শশিভূষণের মতে কার্ত্তিক বদমতলবি, স্বেচ্ছাচারী, আত্ম-সুখপরায়ণ! এমন কি এই পত্রে সে যে সরলতা দেখিয়েছে তাও তাদের

মতে ভাণ মাত্র! ওর সমস্তই মিথ্যা এই কথা তারা ব'লতে চায়। যে সাহস করে এ-সবও লিখতে পারে, তাকে সন্দেহ করবার কারণ আমি ত খুঁজে পাই না।"

শিবচন্দ্র কহিলেন, "ওর যখন প্রয়োজন যে আপনি ওকে ত্যাগ করুন, তখন ও কেন, মিথ্যে হোক্ সত্যি হোক্, নিজেকে দোষী করে পত্র লিখবে না? ওর ত এই প্রয়োজন যে আপনি ওকে এই বিবাহের দায় থেকে মুক্তি দেন।"

কালিকাবাবু কহিলেন, "কৈ ও ত মুক্তি চায় নি! ও ত স্পষ্ট ব'লেছে যে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ পুত্রকন্যা জগতে পাওয়া যায় না, তাই বলে বাপ-মা তাকে ত্যাগ ক'রলে সে ত নষ্টের দিকে যাবেই। সবাই ত্যাগ ক'রেছে বলে বাপ-মার তাকে ত্যাগ করা উচিত নয়, এমন কি যাতে আবার সে ঠিক পথে চলতে পারে, তাই তাঁদের করা উচিত।"

শিবচন্দ্র কহিলেন, "তবে কেন সে লিখলে যে তার কি দোষ, সে তা জানে না? তার মতে সে কোন দোষই করেনি। আমি তাকে যেমন চিনি, এমন বোধ হয় কেউ চেনে না। আমি জানি, যদি সে ঠিক বুঝে থাকে যে তার অন্যায় হ'য়েছে, তাহলে সে এখনি ছুটে এসে আমাদের কাছে মাপ চাইবে। এমন করে দূরে থেকে পত্রের দ্বারা কাজ সারবার চেষ্টা ক'রত না। এ পত্র যে ভাণ মাত্র যদিও সে কথা বিশ্বাস ক'রতে আমার মন চাইছে না, তবুও পুত্র-স্নেহে অন্ধ হয়ে আমি কেমন ক'রে বলি যে, আপনি সমস্ত বিষয় বিচার না করেই এই পুত্রকে কন্যা সম্প্রদান করুন?"

কালিকাবাবু কহিলেন, "ন্যায়রত্ন মশায় আপনার মত ন্যায়পরায়ণ লোকের কি এতবড় খল-স্বভাব পুত্র হ'তে পারে? না, আমি ব'লছি, এ পত্র ভাণ নয়। সে আমার কবল থেকে মুক্তি চাইতে পারে, কিন্তু

এ পত্র ভাণ নয়। সে স্পষ্টই তার নিজের বিষয়ে পরের যা ধারণা তাও লিখেছে। এখনো সে বালক মাত্র, তবে মনের এখন যে গতি, দু'দিন পরে তা থাক্‌বে না, এই আমার ধ্রুব বিশ্বাস। তাহলেও ব্যাপার যখন এই রকম দাঁড়িয়েছে, তখন শৈলজার গর্ভধারিণীর কি মত হবে, সেটা এখন জানা প্রয়োজন। আর শৈলজার মনের কথাও যখন জানি, তখন তার মত নেওয়াও প্রয়োজন। তাকে যখন এতদিন পর্য্যন্ত অবিবাহিতা রেখেছি, এবং সেও যখন ভাল-মন্দ বুঝ্‌তে শিখেছে, তখন তার মতটাও ফেল্‌বার নয়।"

শিবচন্দ্র কহিলেন, "এই অবকাশে আমিও আমার একটা কর্ত্তব্য সেরে নি। আমি দেওয়ানজীর কাছে প্রতিশ্রুত হয়েছি যে, তাঁর পুত্রের সঙ্গে আপনার কন্যার বিবাহের সম্বন্ধ ক'র্‌ব। সেই জন্য বল্‌ছি যে, যদিও আপনার কন্যা বাগ্‌দত্তা হয়ে রয়েছেন, তথাপি ঐ অন্য-পূর্ব্বা কন্যাকেও তিনি পুত্রবধূরূপে গ্রহণ কর্‌তে রাজী আছেন। আর যদি বলেন যে মণিশঙ্করের মত পাত্রে কি করে কন্যাদান কর্‌বেন, তাতে আমি এই বল্‌তে চাই যে, যদি ভাল পাত্র মন্দ হয়ে যেতে পারে, তাহলে মন্দই বা ভাল না হতে পার্‌বে কেন? আজ মণিশঙ্কর অপাত্র, হয়তো বিবাহের পর তার মতি গতি বদ্‌লাতে পারে।"

কালিকাবাবু হাসিয়া বলিলেন, "আপনার কর্ত্তব্য আপনি করেছেন। এখন তাঁকে বল্‌বেন যে তাঁর এই অনুগ্রহের জন্য চিরবাধিত হলুম। কিন্তু তাঁর পুত্রকে আমি কন্যা দিতে পার্‌ব না। হয়তো ন্যায়ের তর্কে তাঁর পুত্র পাত্র হ'তে পারে, কিন্তু ধর্ম্মের নামে যে অধর্ম্মের কাজ কর্‌ছে, তাকে কন্যাদান চিরদিনই অধর্ম্ম। অবশ্য এ কথাও তাঁকে ব'ল্‌বেন যে তাঁর এই অনুপযুক্ত প্রস্তাবের জন্য আমি তাঁর উপর কিছুমাত্র শ্রদ্ধাহীন হইনি। কারণ পিতা মাত্রেই পুত্রের মঙ্গল কামনা ক'রে থাকে।

বিশেষতঃ দেওয়ানজী আমার চির-হিতৈষী। তাঁর উপর চিরদিনই আমার যথেষ্ট শ্রদ্ধা আছে। তবে মণিকে কন্যাদান ক'র্‌তে পার্‌ব না।"

শিবচন্দ্র কহিলেন, "আমরা হয়তো মণিশঙ্করকে চিরদিনই ভুল বুঝে আস্‌ছি। কে জানে, ওর মধ্যেও হয়তো অনেক ভাল জিনিষ আছে, সময় আর অবসরের গুণে সেগুলি প্রকাশ পেলেও পেতে পারে। যাই হোক্‌, আপনি এ বিষয় চিন্তা ক'রে দেখ্‌বেন। কার্ত্তিকের প্রতি স্নেহাধিক্যে অন্যের প্রতি অযথা অন্যায় ক'র্‌বেন না। আর আপনি আমার কাছে যে বিষয়ে প্রতিশ্রুত হয়েছিলেন, তা থেকে আপনাকে আমি সম্পূর্ণ মুক্তি দিলুম!"

কালিকাবাবু কহিলেন, "কিন্তু আমি দিলুম না, এটা স্মরণ রাখ্‌বেন! আমি দেবদ্বিজের সাক্ষাতে যে প্রতিজ্ঞা ক'রেছি, তা থেকে সহজে চ্যুত হব না। তবে সবই যখন ভগবানের ইচ্ছায় ঘটে, তখন আমার আর অহঙ্কার ক'রে বল্‌বার কিছু নেই।"

শিবচন্দ্র চলিয়া গেলে কালিকাবাবু সেই দিনের জমিদারী সংক্রান্ত সমস্ত কার্য্য শেষ করিয়া অন্তঃপুরে চলিয়া গেলেন; এবং মধ্যাহ্নকৃত্য-সমাপনান্তে শয়নকক্ষে পত্নী ইন্দিরা দেবীকে ডাকিয়া আনিয়া কার্ত্তিকের পত্রদ্বয় পাঠ করিতে দিলেন। ইন্দিরা দেবী পত্র পড়িয়া বলিলেন, "এখন উপায়?"

কালিকাবাবু বলিলেন, "এখন তোমার মত কি? শৈলজা আমার একার নয়, তোমারও। শৈলজার ভাল-মন্দ কেবল আমার উপর নয়, তোমার উপরও সমানভাবে নির্ভর ক'র্‌ছে। তুমি বুঝে বল যে, বাগ্‌দত্তা কন্যাকে অন্য কোন পাত্রে এ অবস্থায় আমার দেওয়া উচিত কি না। একদিকে আমার দেব-সাক্ষাতে শপথ, আর একদিকে মেয়ের ভবিষ্যৎ মঙ্গল। কার্ত্তিকের মনের অবস্থা জেনেও যদি তাকে অসৎপাত্র জ্ঞান না

কর, অনুপযুক্ত না মনে কর, তা হলে কোন কথাই নেই, কার্ত্তিকের সঙ্গেই বিবাহ হবে। কিন্তু যদি তাকে অসৎপাত্র বলে সাব্যস্ত কর, তা হলে আমার ধর্ম্মচ্যুতিকে গণনার মধ্যেও এনো না।"

ইন্দিরা কহিলেন, "এ চিঠি পড়ে কেমন করে কার্ত্তিককে অসৎপাত্র ব'ল্‌ব? সে তো কিছুই গোপন করে নি। তবে মেয়ের ভবিষ্যৎ সুখ-দুঃখ! সে যদি সতীর কন্যা হয়, যদি কায়মনোবাক্যে আমি তোমায় ভক্তি ক'রে থাকি, তা হলে শৈলজা কখনই অসুখী হবে না। যে সুখী হব মনে করে, তাকে জগতের কোন দুঃখই বিচলিত কর্‌তে পারে না। সব রকম ক্ষতিই সে হাসিমুখে সইতে পারে।"

কালিকাবাবু কহিলেন, "বাঁচ্‌লুম ইন্দু, তোমার আশ্বাস পেয়ে আমি বাঁচ্‌লুম! না, আর আমার কোন দ্বিধা নেই। তবে একবার শৈলর মতটা জানা দরকার! কারণ সে এখন বড় হ'য়েছে, তাকে এই পত্র দেখিয়ে তার মত জেনে এসে আমায় বল।"

ইন্দিরা দেবী হাসিয়া বলিলেন, "তুমি ক্ষেপেছ! সে আবার কি ব'ল্‌বে? সে জানে যে তার বিয়ে হ'য়েছে, এখন একটা লোকাচার রক্ষার জন্য অনুষ্ঠানের প্রয়োজন শুধু বাকী। তবু তার মত জান্‌ছি।"

ইন্দিরা দেবী পত্র দুইখানি লইয়া চলিয়া গেলেন।

কালিকাবাবু বিমূঢ়ভাবে প্রতীক্ষার পর স্ত্রীকে ফিরিয়া আসিতে দেখিয়া ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, "কি বল্‌লে সে?"

"বল্‌বে আবার কি। যা তোমায় বলে গেলুম, তাই। মেয়ে অভি-মানে কেঁদে ফুঁপিয়ে অস্থির যে তোমরাও কিনা আমার নিজের একটা আলাদা মতের প্রতীক্ষা কর! আমি কি তোমাদের মেয়ে নই? আমি কি পরের পেটের মেয়ে?"

কালিকাবাবু চিন্তিত মুখে বলিলেন, "এ যে আরও ভাবনার কথা!

যোগ্য সন্তানও যদি এমন করে বাপ-মার উপর নির্ভর রাখে, তাহলে মা-বাপের দায়িত্ব যে ঢের বেড়ে যায়। তাই বল্‌ছি, একটু স্পষ্ট ভাবে যদি—"

"ওগো না গো, না, কেন মিছে ও-সব ভাব্‌ছ? নিজের মেয়েকে কি জন্ম থেকে জানি না? আমাদের ইচ্ছাই যে চিরদিন ওর মনে ঢুকে ওর ইচ্ছার আকারে বেরিয়ে এসেছে। এর চেয়ে আর স্পষ্ট করে সে কি বল্‌বে? আমি যখন বল্‌ছি, তখন স্বচ্ছন্দে তুমি এ কথায় নির্ভর ক'র্‌তে পার। আমি যে নিজের মনেই বুঝ্‌ছি, কার্ত্তিক ছাড়া আর কাউকে সে বিয়ে করার কথা মনে ভাব্‌তেই পার্‌বে না।"

কালিকাবাবু একটা নিশ্চিন্ততার নিঃশ্বাস ফেলিয়া শয়ন করিলেন।

১২

প্রভাতে উঠিয়া সরোজ তাহার অতি প্রিয় ফুলগাছগুলির ফুলের উপর হাত বুলাইতেছিল। শীতের প্রভাতে বেলী যুঁই ইত্যাদি অন্তর্হিত হইয়াছিল বটে, তবু গাঁদা একাই সমস্ত ফুলের অভাব পূর্ণ করিয়া অপূর্ব্ব শোভায় সমস্ত বারান্দা আলো করিয়া প্রস্ফুটিত হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত স্থানে স্থানে নানাজাতীয় গোলাপ শোভায়-গন্ধে বর্ষাভব সমস্ত পুষ্পের স্থান অধিকার করিয়া বিরাজ করিতেছিল। সমস্তই গন্ধময়, সমস্তই কোমল স্পর্শময়, সর্ব্বোপরি সমস্তই শোভাময়! কিন্তু অন্ধের পক্ষে এই পুষ্পরাশির যাহা পরিপূর্ণ প্রকাশ—সৌন্দর্য্যের প্রকাশ, তাহাই অস্তিত্বহীন! সরোজ স্পর্শ করিতে করিতে পুষ্পের সেই বহুপূর্ব্বদৃষ্ট শোভাময় প্রকাশকে স্মরণ করিবার চেষ্টা করিতেছিল। কিন্তু তাহার অন্তর এখন স্পর্শময়, স্পর্শই এখন তাহার কাছে একমাত্র প্রকাশ! মৌন ফুলগুলি কেবল স্পর্শের ভাষায় কথা কহিতেছে। দর্শনের অভাব-

জনিত দুঃখ স্পর্শের সুখে মিলাইয়া যাইতেছে। সরোজ একবার টব হইতে একটি, ও টব হইতে একটি এমনি করিয়া অনেকগুলি ফু আপনার অঞ্চল ভরিয়া ফেলিয়া উপরে যাইবার উদ্যোগ করিতে এমন সময় বাহিরের দরজায় পরিচিত শব্দ শুনিয়া সে ফিরিয়া দাঁড়াইল।

শশিভূষণ ভিতরে প্রবেশ করিয়া দ্বারসংলগ্ন চিঠির বাক্সের তা খুলিয়া কয়েক খানা পত্র বাহির করিয়া পড়িতে আরম্ভ করিল। সরো অগ্রসর হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কার কার চিঠি পেলে!"

শশী অন্যমনস্কভাবে বলিল, "যাক্, বাঁচা গেল।"

সরোজ কহিল, "কার চিঠি পেয়ে ও কথা ব'ল্‌ছ?"

শশিভূষণ কহিল, "তোমার শনির। শনিরাজকে রোহিণী ভেদ ক'ে যেতে দিই নি, চিরকালের জন্য ওঁর গতি সরিয়ে দিয়েছি, এর জন্য এই দশরথকে ধন্যবাদ দাও। এঃ, আজ যে অনেক ফুল তুলে ফেলেছ! যাক্, ভালই হ'য়েছে, শনির পূজো পাঠিয়ে দাও,—গ্রহরাজ কাঁচা-খেকো দেবতা!"

সরোজ হঠাৎ মুখ ফিরাইয়া বলিল, "কার কথা ব'ল্‌ছ, খুলে না ব'ল্‌লে আমি কি করে বুঝ্‌ব?"

শশী কহিল, "ঠিকই বুঝেছ, সরোজ। প্রকাশ করে বলা বাহুল্য মাত্র।"

সরোজ আর একটা গাঁদা তুলিয়া বলিল, "কি লিখেছেন তিনি?"

শশিভূষণ আর একখানা চিঠি খুলিতে খুলিতে বিরক্তভাবে বলিল, "লিখ্‌বে আর কি! লিখেছে, 'কাল আমার বিয়ে হয়ে গেছে, তোমাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়েছে। এখন এই দম্পতীকে আশীর্ব্বাদ করে যেয়ো। ১৮ই বৌভাতে তোমায় সবান্ধবে নিমন্ত্রণ ক'র্‌লুম।' সবান্ধবটার মানে বুঝেছ? এত বড় নিষ্ঠুর! আমার ইচ্ছে ক'র্‌ছে, এই চিঠিখানা ছিঁড়ে

ওর মুখের ওপর ফেলে দিতে পার্‌তুম, তাহ'লে রাগ কতক যেত। তার ওপর ভঙ্গী দেখেছ? আমার বাসার ঠিকানায় চিঠি দেয়নি, এই বাড়ীর ঠিকানায় দিয়েছে, অর্থাৎ যাতে এ চিঠির মর্ম্ম তোমার কানেও পৌছোয়। কি কাপুরুষের মত নিষ্ঠুরতা!"

শশিভূষণ পত্রখানা টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া ছিঁড়িয়া একটা টবের উপর ফেলিয়া দিয়া উপরে চলিয়া গেল। আর সরোজ! অন্ধ, আলোক-বর্জ্জিতা, প্রকাশ-শক্তি-হীনা সরোজ একটা দেওয়াল ধরিয়া সেই চির-পরিচিত পথ দিয়া উপরে যাইবার পথ খুঁজিতে লাগিল। যে পথে সে দৃষ্টিবান্ লোকেরই মত অতি দ্রুত সর্ব্বদা চলা-ফেরা করিতেছে, সেই পথেই আজ সে পথ-হারা! সমস্ত স্পর্শশক্তি স্পর্শের স্মৃতি নিমেষ-মধ্যে তাহার অন্তর হইতে লুপ্ত হইয়া গেল।

এই কিছুক্ষণ পূর্ব্বে সে স্পর্শের সুখে স্পর্শের আতিশয্যে দৃষ্টির প্রকাশকেও অবজ্ঞা করিতেছিল; কিন্তু মুহূর্ত্তে তাহার অন্তর সেই স্পর্শের জন্যই হাহাকার করিয়া উঠিল। একবার ঐ পত্রাংশগুলি সে স্পর্শ করিবে না? জীবনে একটীবার মাত্র সেই হস্তলিখিত পত্রের এতটুকু অংশকে স্পর্শ করিয়া তাঁহারই স্পর্শ সে অনুভব করিবে না? সরোজ ত কিছুই চায় না। দর্শন তাহার পক্ষে নাই, শ্রবণ তাহার পক্ষে এখন দুরাশা, যে স্পর্শ তাহার একমাত্র সম্বল, সেই স্পর্শের যোগেও সেই বাঞ্ছিত স্পর্শকে সে কখনও অনুভব করিতে পায় নাই। কিন্তু ঐ যে অনাদরে অপমানিতভাবে পতিত পত্রাংশগুলি সেই বাঞ্ছিত স্পর্শ বহন করিয়া আনিয়াছে, তাহাকে শশিভূষণ না হয় ঘৃণায় ফেলিয়া দিল, কিন্তু চির-বুভুক্ষিত তাহার অঙ্গুলি-নির্দ্দেশগুলি কি বলিয়া উহাদের ফেলিয়া চলিয়া যাইবে? সরোজ আর অগ্রসর হইতে পারিল না—ফিরিয়া দাঁড়াইল! অমনি কোথা হইতে সমস্ত স্পর্শশক্তি ফিরিয়া তাহাকে আশ্বস্ত করিল।

পুনর্লব্ধ শক্তিতে যেখানে সেই পত্রখণ্ডগুলি পড়িয়াছিল, অনুমান করিয়া লইয়া সে সেই স্থানে আসিয়া দাঁড়াইল। তারপর স্থিরভাবে কান পাতিয়া শুনিবার চেষ্টা করিল, কেহ কাছাকাছি নড়িতেছে চড়িতেছে কি না। শেষে যখন মনে হইল, নিকটে কেহ নাই, তখন অতি সন্তর্পণে সে হাতড়াইতে আরম্ভ করিল! হায়, হায়, এক টুকরা কাগজও তাহার হস্ত স্পর্শ করিতেছে না। একখণ্ড, যত ক্ষুদ্রই হোক, কিছু তাহাতে লেখা থাকুক আর নাই থাকুক, সেই পত্রের এককণা পাইলেই সরোজ বর্ত্তাইয়া যায়! দাও ঠাকুর, দাও দেবতা, সেই পত্রের এক টুকরা তাহাকেও দাও!

পাইয়াছি! পাইয়াছি! ওরে মৌন মূক, তোরা চীৎকার করিস্‌নে কেন এতক্ষণ? কেন চেঁচাইয়া বলিস্‌নে, এই যে আমরা, তোমার হারানো ধন, এই যে আমরা! পাইয়াছি, ওরে পাইয়াছি। হোক ছোট, হোক তুচ্ছ, তবু পাইয়াছি। সেই স্পর্শের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশ আমার এই উষার জগতকে স্পর্শের রসে ভরাইয়া ফেলিয়াছে। পাইয়াছি! ওরে অন্ধকার হৃদয়, শান্ত হ, একেবারে হারায় নাই। আলো আসিয়াছে, যায় নাই, একেবারে চির-অতীতের মধ্যে অস্ত যায় নাই—পাইয়াছি! সরোজ সেই কাগজখণ্ডকে তাহার সমস্ত শরীর দিয়া স্পর্শ করিল; শেষে মাথায় ঠেকাইল; তার পর ধীরে ধীরে কানের কাছে লইয়া গেল।

কথা কও! আমার চক্ষু নাই! তুমি কি বলিয়াছ, কি বলিতেছ, আমি চক্ষু দিয়া বুঝিতে পারিতেছি না! আমার স্পর্শ আছে, কিন্তু তার কাছে তুমি আজ মূক; স্পর্শ দিয়া কিছুই শুনিতে পাই না যে! কথা কও! বল, কি বলিতেছ? আমি তোমায় দূরে সরাইয়া দিয়াছি? সেই অভিমানে কি আজ তুমি মূক হইয়া অন্ধের নিকট আসিয়াছ? অন্ধের উপর প্রতিশোধ লইতে তুমি আজ মূকের মূর্ত্তিতে আসিয়াছ! আমি ত শুনিতে পাই, তাই কি তুমি কথাও পরিত্যাগ করিলে? এত

বড় প্রতিশোধ! আমি অন্ধ! তুমি মৌন! আমি যে শুনিতে চাহিতেছি, কিন্তু তুমি কিছু বলিবে না? কথা কও, কথা কও, অন্ধের সমস্ত অন্ধকার জগৎ ভরিয়া উঠুক,—তুমি একটীবার মাত্র কথা কও!

সহসা কাহার পদ-শব্দ শুনিয়া সরোজ তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইল এবং সেই কাগজের টুকরাটুকুকে আবরণে ঢাকিয়া আপনার শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিল। কিন্তু সে এতই উদ্‌ভ্রান্ত-চিত্ত হইয়াছিল যে তাহার পশ্চাতে আর একজনও যে সন্তর্পণে সেই কক্ষে প্রবেশ করিল, সে শব্দ সে অনুভবও করিতে পারিল না। তাহার অন্তরে এই কয় মুহূর্ত্তের জন্য যেন জগতের সমস্ত শব্দ স্তব্ধ হইয়া গিয়াছিল। একটীমাত্র পরিচিত শব্দের আশায় সে তাহার সমস্ত অন্তর্জ্জগতকে সেই কয় মুহূর্ত্তের জন্য শব্দহীন করিয়া ফেলিয়াছিল।

সরোজ অতি সন্তর্পণে সেই কাগজখানি তাহার মাথার শিয়রের একটা কুলুঙ্গীতে রাখিল, তার পর জোড়-করে তাহাকে প্রণাম করিয়া অঞ্চলস্থ সমস্ত ফুলগুলি তাহার উপর ঢালিয়া দিয়া দুই হাতের মধ্যে মুখ লুকাইয়া সেই স্থানে বসিয়া পড়িল।

শশিভূষণ তাহার নিকটে আসিয়া দাঁড়াইতেই সে তীর-বেগে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "শশি-দা, দয়া কর, আর এক মিনিট আমায় সময় দাও।"

শশী অবরুদ্ধ কণ্ঠে বলিল, "বোন্, এক মিনিট কেন, চির-জীবনের জন্যই ত ওকে দিতে পারতুম! হায়, হায়, এ আমি কি করলুম! আমি ত তোমায় বুঝতে পারি নি, সরোজ! সেই হতভাগা তোমায় এ কি করে গিয়েছে! সে যে আমার সরোজের সমস্ত দলগুলি ছিঁড়ে-খুঁড়ে দিয়ে গিয়েছে, তা ত' আমি জানতে পারিনি। হতভাগিনী, তাহলে তাকে অমন করে নিষ্ঠুরের মত তাড়িয়ে দিলে কেন? যে অন্ধ, সে কি নিজের প্রতিও অন্ধ!"

শশিভূষণ অতি যত্নে অতি ভক্তি-ভরে সেই ফুলগুলি সরাইয়া সে কাগজের টুকরাটুকু বাহির করিয়া কিছুক্ষণ সেই দিকে চাহিয়া রহিল পরে গভীর নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "হায়, অন্ধের পূজাও ঠিক জায়গা পৌঁছায় না! সরোজ, এ কি কাগজ তুমি এনেছ? এ ত কার্ত্তিকে সে চিঠি নয়, এ যে একখানা বাজে কাগজের টুকরো।"

সরোজ কাঁপিতে কাঁপিতে বসিয়া পড়িল। পূজা পৌঁছিল না! পূজ বৃথা হইল! অন্ধ আমি, তাই কি দেবতাও অন্ধ হইলেন! হতভাগিনী হাতখানি ধরিয়া কি এক মুহূর্ত্তের জন্যও তোমার পায়ের কাছে লইয়া যাইতে পারিলে না? হায় অন্ধতা! হায় অন্ধকারের অন্ধ দেবতা!

তৃতীয় খণ্ড

১

বিবাহের পর পাঁচ বৎসরের মধ্যে শৈলজার জীবনে বহু পরিবর্ত্তন ঘটিয়া গেল। তাহার সাধ্বী মাতার মৃত্যুর ছয় মাসের মধ্যে পিতা কালিকামোহনও সজ্ঞানে ৺গঙ্গালাভ করিলেন। মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি কার্ত্তিককে বলিলেন, "বাবা কার্ত্তিক, আমার সমস্তই তোমার হাতে দিয়ে যাচ্ছি। আমার উইলে তোমাকেই আমার স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি সবই দিয়ে গেলুম। কেবল মার নামে স্বর্গীয় কর্ত্তা যে মহাল আর নগদ টাকা দিয়ে গেছেন, তার ব্যবস্থা তাঁর নিজের হাতেই রইল। তাঁর উপর তোমার কোন কর্তৃত্ব থাক্‌বে না। তা ছাড়া আর সমস্ত বিষয়ের উপরই তোমার পূর্ণ কর্তৃত্ব। তুমি আমার দেব-কীর্ত্তি পিতৃ-কীর্ত্তি বাজায় রেখে সমস্তই স্বেচ্ছানুযায়ী ব্যবহার করতে পারবে। তবে শৈলর নামে আগে থেকে যে সম্পত্তি আছে, তা তারই নামে থাক্‌ল। তুমি ছাড়া যখন তার আর কেউ রইল না, তখন সে বিষয়ে আর তোমায় কি উপদেশ দেব? সর্ব্বদা তোমার পিতৃদেবের পরামর্শ নিয়ে কাজ করো, তাহলে কোন বিপদ হবে না।"

শৈলজা কালিকাবাবুর পায়ে হাত বুলাইতেছিল। কালিকাবাবুর কথায় সে কাঁদিয়া ফেলিল। কালিকাবাবু বলিলেন, "কেঁদো না, মা। স্বধর্ম্মে থেকে সংসারে কর্ত্তব্য করে শেষে গঙ্গা-নারায়ণ-ব্রহ্ম বলতে বলতে হাসতে হাসতে যে যেতে পাচ্ছি, এ কি কম সুখের কথা! জীবনে যা প্রার্থনা করেছিলুম, তা সমস্তই পেয়েছি। ভগবান যাকে এতখানি দয়া

দেখিয়েছেন, তার জন্য দুঃখ করা অন্যায়। আশীর্ব্বাদ করি, তোমরাও যেন শেষে এমনি করে মা গঙ্গার চরণে আশ্রয় পাও! যেন শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত বলতে পার, 'ভগবান্, তোমার অপূর্ব্ব করুণা!' ভগবানের রুদ্র মূর্ত্তি যেন তোমাদের কখনও না দেখতে হয়! জীবনে কখনও স্বধর্ম্মচ্যুত হয়ো না; তাহলে যত দুঃখই পাও না কেন সবই তাঁর করুণা বলে মনে হবে, তা হলে তাঁর রক্ত চক্ষুর তলে তাঁর গভীর করুণাই স্পষ্ট অনুভব করবে।"

কালিকাবাবু বক্তব্য শেষ করিয়া নিমীলিত নেত্রে বলিলেন, "তারা শিবসুন্দরি!" কার্ত্তিক তাঁহার মুখের দিকে ক্ষণকাল চাহিয়া অন্যদিকে মুখ ফিরাইল। শৈলজা স্পষ্ট দেখিল, স্বামীর নয়ন ও অধরের কোণে একটা হাসির রেখা ফুটিয়াছে। দেখিয়া শৈলজা অন্তরে শিহরিয়া উঠিল।

আজ পাঁচ বৎসর ধরিয়াই সে অনুভব করিয়াছে, তাহার ও স্বামীর মধ্যে একটা অতি-সূক্ষ্ম অথচ দুর্ভেদ্য ব্যবধান রহিয়া গিয়াছে। বাহিরে সে ব্যবধান কাহারও বুঝিবার সাধ্য নাই, কারণ কর্ত্তিকের ব্যবহার অত্যন্ত সরল এবং অমায়িক। সকলেই তাহার নিরহঙ্কার অথচ গম্ভীর ব্যবহারে সন্তুষ্ট। শৈলজাও এমন কোন কথা বা কাজ স্মরণ করিয়া বলিতে পারে না, যাহাতে কার্ত্তিকের স্নেহহীনতা বা অন্য কোন অপ্রীতিকর ভাব এতটুকুও প্রকাশ পাইয়াছে। আজ দুই বৎসর তাহার এক পুত্র হইয়াছে। পুত্রটি যেমন হৃষ্টপুষ্ট, তেমনি সুন্দর! কার্ত্তিক যখন বিদেশে তাহার পাঠক্রিয়া-সমাধায় ব্যস্ত, তখন সে মাঝে মাঝে পুত্রের জন্য নানাবিধ খেলানা, এবং যেদিন পুত্র হওয়ার সংবাদ পায়, সে দিন প্রসূতির জন্য নানাবিধ সৌখীন দ্রব্য ক্রয় করিয়া আনিয়াছিল। তাহার ব্যবহারে কোথায় যে ত্রুটি, সেটুকু শৈলজা কখনও স্পষ্ট ধরিতে পারে নাই; তবু তাহার অন্তঃস্থল হইতে একটা গভীর বিচ্ছেদের দীর্ঘশ্বাস উঠিয়া নৈশ

আকাশে মিলাইয়া যাইত। কার্ত্তিক যে অন্য-গত-চিত্ত, এ কথা ফুলশয্যার রাত্রেই সে প্রকাশ করিয়া বলিয়াছিল; সেজন্য তাহার যে ত্রুটি হইবে, সে ত্রুটির জন্য ক্ষমাও সে চির-জীবনের জন্য লাভ করিয়াছিল। কার্ত্তিক যে আর-কাহাকেও মনে মনে ভালবাসে, এটা তত দুঃখের নয়, কারণ শৈলজা সে দুঃখকে গণনায় আনিয়া জীবনের মধ্যে জমা-খরচ মিলাইয়া একটা ঠিক দিয়া বসিয়াছিল! সে দুঃখের খরচ সুখের জমার চেয়ে অনেক কম,—তবে কিসের দুঃখ! কিসের ব্যবধান! কিসের বিচ্ছেদ! কার্ত্তিক ভালবাসিতে পারে, তাহার হৃদয়ে যে স্নেহের তরঙ্গ খেলে, ইহা জানিতে পারিলেও যে শৈলজা অত্যন্ত স্বস্তি অনুভব করে। শৈলজার মনে হয়, কার্ত্তিকের হৃদয় হইতে এই পরম পবিত্র মন্দাকিনী, স্নেহের সুরধুনী-ধারা শুকাইয়া গিয়াছে। সে যেন ভালবাসিতেই পারে না! যদি তাহার হৃদয়ে ভালবাসিবার শক্তি সজাগ থাকে, তাহা হইলে শৈলজার কোন ভয় নাই। কারণ তাহার আশা আছে যে, ভগীরথের মত সাধনার দ্বারা সে সেই স্নেহ-মন্দাকিনীকে তাহার সংসারের উপর নামাইয়া আনিতে পারিবে। যদি তাহা কোন বাধায় অবরুদ্ধ হইয়া থাকে, তাহা হইলে সে তাহার প্রাণ দিয়াও সে বাধা সরাইয়া দিবে। কিন্তু যদি তাহা শুকাইয়া গিয়া থাকে, তাহা হইলে সে কি করিবে? তাহার মনে হয়, কার্ত্তিকের চরিত্রে সবই আছে, তবে প্রাণের মধ্যে যাহা থাকিলে মানুষ সজীব থাকে, কেবল সেইটুকুরই যেন অভাব ঘটিয়াছে! কার্ত্তিকের যেন প্রাণ নাই, সে যেন সংসারের চোখে এখন মৃত!

* * * * *

মহাসমারোহে কালিকাবাবুর শ্রাদ্ধ সমাধা করিয়া, গভীর রাত্রে কার্ত্তিক তাহার শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিল, শৈলজা বসিয়া বসিয়া নীরবে অশ্রু বর্ষণ করিতেছে। শয্যায় দুই বৎসরের শিশু দেবীপ্রসাদ নিদ্রিত।

কার্ত্তিক ধীর-পদবিক্ষেপে শিশুর শিয়রে যাইয়া তাহাকে চুম্বন করিল, পরে শৈলজার নিকটে আসিয়া বলিল, "শৈল, তোমার মুখখানা তোল ত, আমি দেখতে পাচ্ছি না।" শৈলজা দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া ডুকরিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

কার্ত্তিক কিছুক্ষণ নীরবে চাহিয়া থাকিয়া হঠাৎ শৈলজার মুখ হইতে হাত সরাইয়া লইল এবং তাহাকে আলোর দিকে ফিরাইয়া ধরিয়া বলিল, "শৈল, তোমার মুখে এত আলো! আমি সইতে পার্‌ছি না। উঃ—" কার্ত্তিক দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া মেঝের উপর বসিয়া পড়িল। শৈলজা চোখ মুছিয়া ব্যস্ত হইয়া বলিল, "কি হ'ল? তুমি অমন কর্‌ছ কেন? শোও, আমি বাতাস কর্‌ছি।" কার্ত্তিক উঠিয়া দাঁড়াইল এবং সেই সঙ্গে এমন উচ্চ রবে হাসিয়া উঠিল যে, সে হাসির শব্দ কক্ষে কক্ষে প্রতিধ্বনিত হইয়া নিম্নতলে কর্ম্ম-রত আত্মীয়-স্বজন, দাস-দাসী সকলের কর্ণে পৌঁছিল। কি বিকট উন্মাদের ন্যায় হাস্য! শৈলজা পিতৃবিয়োগ-দুঃখ ভুলিয়া গেল এবং তাড়াতাড়ি একখানা পাখা লইয়া কার্ত্তিককে বাতাস করিতে আরম্ভ করিল। কার্ত্তিক নিমীলিত নেত্রে অন্ধের মত হাতড়াইতে হাতড়াইতে খাটের দিকে অগ্রসর হইল। তাহাকে তদবস্থ দেখিয়া শৈলজা ব্যস্ত হইয়া একজন দাসীকে ডাকিয়া বলিল, "শীগ্‌গির ডাক্তার বাবুকে ডেকে আন্‌, উনি কি রকম কচ্ছেন।"

শৈলজা কার্ত্তিকের শয্যায় বসিয়া তাহার মাথায় গোলাপজল দিয়া বাতাস করিতে লাগিল। কার্ত্তিক মুদিত নেত্রে বলিল, "গরিব বামুনের ছেলের এত ঐশ্বর্য্য সইবে কেন, শৈল! তাই বোধ হয় মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে, না?"

শৈলজা কাতর হইয়া বলিল, "কেন তুমি অমন কর্‌ছ? কি হয়েছে,— তোমার পায়ে পড়ি, আমায় বল।"

আকাশে মিলাইয়া যাইত। কার্ত্তিক যে অন্য-গত-চিত্ত, এ কথা ফুলশয্যার রাত্রেই সে প্রকাশ করিয়া বলিয়াছিল; সেজন্য তাহার যে ত্রুটি হইবে, সে ত্রুটির জন্য ক্ষমাও সে চির-জীবনের জন্য লাভ করিয়াছিল। কার্ত্তিক যে আর-কাহাকেও মনে মনে ভালবাসে, এটা তত দুঃখের নয়, কারণ শৈলজা সে দুঃখকে গণনায় আনিয়া জীবনের মধ্যে জমা-খরচ মিলাইয়া একটা ঠিক দিয়া বসিয়াছিল! সে দুঃখের খরচ সুখের জমার চেয়ে অনেক কম,—তবে কিসের দুঃখ! কিসের ব্যবধান! কিসের বিচ্ছেদ! কার্ত্তিক ভালবাসিতে পারে, তাহার হৃদয়ে যে স্নেহের তরঙ্গ খেলে, ইহা জানিতে পারিলেও যে শৈলজা অত্যন্ত স্বস্তি অনুভব করে। শৈলজার মনে হয়, কার্ত্তিকের হৃদয় হইতে এই পরম পবিত্র মন্দাকিনী, স্নেহের সুরধুনী-ধারা শুকাইয়া গিয়াছে। সে যেন্ ভালবাসিতেই পারে না! যদি তাহার হৃদয়ে ভালবাসিবার শক্তি সজাগ থাকে, তাহা হইলে শৈলজার কোন ভয় নাই। কারণ তাহার আশা আছে যে, ভগীরথের মত সাধনার দ্বারা সে সেই স্নেহ-মন্দাকিনীকে তাহার সংসারের উপর নামাইয়া আনিতে পারিবে। যদি তাহা কোন বাধায় অবরুদ্ধ হইয়া থাকে, তাহা হইলে সে তাহার প্রাণ দিয়াও সে বাধা সরাইয়া দিবে। কিন্তু যদি তাহা শুকাইয়া গিয়া থাকে, তাহা হইলে সে কি করিবে? তাহার মনে হয়, কার্ত্তিকের চরিত্রে সবই আছে, তবে প্রাণের মধ্যে যাহা থাকিলে মানুষ সজীব থাকে, কেবল সেইটুকুরই যেন অভাব ঘটিয়াছে! কার্ত্তিকের যেন প্রাণ নাই, সে যেন সংসারের চোখে এখন মৃত!

* * * * *

মহাসমারোহে কালিকাবাবুর শ্রাদ্ধ সমাধা করিয়া, গভীর রাত্রে কার্ত্তিক তাহার শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিল, শৈলজা বসিয়া বসিয়া নীরবে অশ্রু বর্ষণ করিতেছে। শয্যায় দুই বৎসরের শিশু দেবীপ্রসাদ নিদ্রিত।

কার্ত্তিক ধীর-পদবিক্ষেপে শিশুর শিয়রে যাইয়া তাহাকে চুম্বন করিল, পরে শৈলজার নিকটে আসিয়া বলিল, "শৈল, তোমার মুখখানা তোল ত, আমি দেখতে পাচ্ছি না।" শৈলজা দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া ডুকরিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

কার্ত্তিক কিছুক্ষণ নীরবে চাহিয়া থাকিয়া হঠাৎ শৈলজার মুখ হইতে হাত সরাইয়া লইল এবং তাহাকে আলোর দিকে ফিরাইয়া ধরিয়া বলিল, "শৈল, তোমার মুখে এত আলো! আমি সইতে পার্ছি না। উঃ—" কার্ত্তিক দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া মেঝের উপর বসিয়া পড়িল। শৈলজা চোখ মুছিয়া ব্যস্ত হইয়া বলিল, "কি হ'ল? তুমি অমন কর্ছ কেন? শোও, আমি বাতাস কর্ছি।" কার্ত্তিক উঠিয়া দাঁড়াইল এবং সেই সঙ্গে এমন উচ্চ রবে হাসিয়া উঠিল যে, সে হাসির শব্দ কক্ষে কক্ষে প্রতিধ্বনিত হইয়া নিম্নতলে কর্ম্ম-রত আত্মীয়-স্বজন, দাস-দাসী সকলের কর্ণে পৌছিল। কি বিকট উন্মাদের ন্যায় হাস্য! শৈলজা পিতৃবিয়োগ-দুঃখ ভুলিয়া গেল এবং তাড়াতাড়ি একখানা পাখা লইয়া কার্ত্তিককে বাতাস করিতে আরম্ভ করিল। কার্ত্তিক নিমীলিত নেত্রে অন্ধের মত হাতড়াইতে হাতড়াইতে খাটের দিকে অগ্রসর হইল। তাহাকে তদবস্থ দেখিয়া শৈলজা ব্যস্ত হইয়া একজন দাসীকে ডাকিয়া বলিল, "শীগ্গির ডাক্তার বাবুকে ডেকে আন্, উনি কি রকম কচ্ছেন।"

শৈলজা কার্ত্তিকের শয্যায় বসিয়া তাহার মাথায় গোলাপজল দিয়া বাতাস করিতে লাগিল। কার্ত্তিক মুদিত নেত্রে বলিল, "গরিব বামুনের ছেলের এত ঐশ্বর্য্য সইবে কেন, শৈল! তাই বোধ হয় মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে, না?"

শৈলজা কাতর হইয়া বলিল, "কেন তুমি অমন কর্ছ? কি হয়েছে,—তোমার পায়ে পড়ি, আমায় বল।"

কার্ত্তিক কহিল, “কি আবার হবে? আমি আলো সইতে পারছি না।”

শৈল কহিল, “আলোটা কমিয়ে দিচ্ছি, না হয় নিবিয়ে দিচ্ছি।”

কার্ত্তিক আবার হাসিল। তেমনি বিকট হাসি! শৈলজা ভয়ে কাঁদিয়া ফেলিল। শিশুও জাগ্রত হইয়া সে ক্রন্দনে সশব্দে যোগ দিল। শৈলজা সেদিকে ভ্রূক্ষেপ মাত্র না করিয়া কার্ত্তিকের মুখের নিকট মুখ লইয়া গিয়া বলিল, “আর ভয় দেখিয়ো না, আমি যদি কোন দোষ করে থাকি—”

কার্ত্তিক কহিল, “দোষ! তোমার সবচেয়ে দোষ যে তোমার মুখে একরাশ আলো জ্বেলে নিয়ে তুমি আমায় তাড়া করে বেড়াচ্ছ। আমায় কয়েদ করে, আমার পালাবার পথ না রেখে, সেই আলো নিয়ে তাড়া করে বেড়াচ্ছ। অন্ধকার—আমি অন্ধকারকে চাই। আন্‌তে পার জগৎ-যোড়া সব-ভুলান সব-ডুবান অন্ধকার! যদি না পার, তাহলে কি হবে মিছে ডাক্তার ডেকে? আমার এ রোগ সারবে না। আমি পাগল হইনি, শৈল, কোন ভয় নেই। বাতাস করে কি হবে? আমার ভেতরটা হাঁপিয়ে উঠ্‌ছে, বাইরের বাতাসে কি হবে?”

শৈলজা কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিল, “আমি জানি যে তুমি আমায় বিয়ে করে সুখী হওনি—”

কার্ত্তিক কহিল “সুখী হইনি? ভুল, শৈল, তোমার ভুল! কিন্তু এ সুখের আলো আমার সইছে না। সুখ আমি চাইনে—আমি চাই দুঃখের অন্ধকার! চাই রূপরস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দহীন মৃত্যুর মত অন্ধকার! তা ত তুমি আমায় দিতে পারবে না!”

শৈল কহিল, “আমি তোমায় বুঝ্‌তে পার্‌ছি না। তুমি ত আমায় বিয়ে করে অবধি কষ্ট পাচ্ছ!”

কার্ত্তিক কহিল, "না শৈল, না, আমি খুব সুখী, অত্যন্ত সুখী। প্রয়োজনের চেয়ে ঢের বেশী সুখ তুমি আমার হাতের মুঠোয় এনে দিয়েছ। কিন্তু আমি যে সুখ চাইনে, শৈল!"

বাহিরে পদশব্দ হইতেই কার্ত্তিক উঠিয়া বসিল। শৈলজা সরিয়া গেল এবং ডাক্তার বাবু সেই কক্ষে নানাবিধ ঔষধ-সমেত প্রবেশ করিলেন। কার্ত্তিক স্বাভাবিক ভাবে হাসিয়া বলিল, "ডাক্তার বাবু, আপনি পাগল! অত শিশি নিয়ে এলেন! ওতে ওষুধ পাত্র বাছ্‌তেই যে সময় যাবে, রোগী দেখবেন কখন?"

ডাক্তার কহিল, "তুমি শোও কার্ত্তিক, শুয়ে কি হয়েছে, বল।"

কার্ত্তিক কহিল, "কিচ্ছু হয়নি, আপনি ফিরে যান। সারাদিন খেটে-খুটে মাথাটা একটু ঘুরে উঠেছিল—শৈল পাগল, ব্যস্তবাগীশ, তাই আপনাকে আবার এত রাত্রে কষ্ট দিলে।"

বাড়ীর পুরাতন ডাক্তার বহুদিন হইতেই কার্ত্তিকের ধরণ-ধারণ জানিতেন। তিনি সহজে ছাড়িবার পাত্র নন্; কার্ত্তিকের নাড়ী টিপিয়া বলিলেন, "কিছু ত হয়নি বল্‌ছ, এদিকে নাড়ী এত জোর কেন?"

কার্ত্তিক কহিল, "Pure excitement, শুধু, আর কিছু নয়! ঘুমোলেই সব সেরে যাবে।"

শৈলজা ডাক্তারকে ডাকিয়া ফিস্ ফিস্ করিয়া বলিল, "আপনি ওঁর কথা শুনবেন না, ওষুধ দিন।" শৈলজা তাহার নিকট সমস্তই বর্ণনা করিয়া বলিল, কোন দিন ত এমন করেন না। ডাক্তার বাবু তাঁহার কাঁচা-পাকা মাথাটি চুলকাইতে চুলকাইতে বলিলেন, "তাইত, কিছু ত বুঝতে পারছি না। যাই হোক, তুমি এই ঘুমের ওষুধটা খাইয়ে দিয়ো, তাহলে ও ঘুমিয়ে পড়বে 'খন।"

শৈল কহিল, "আপনি খাইয়ে দিন, আমার কথা শুনবেন না।"

কার্ত্তিক আবার সহজ হাস্যে শৈলজাকে আশ্বস্ত করিয়া বলিল, "শুনব, শুনব। দিন ডাক্তার বাবু, কি ওষুধ দেবেন, দিন। আপনাদের জ্বালায় অস্থির হ'তে হ'ল।"

কার্ত্তিক ঔষধ পান করিলে ডাক্তার বাবু চলিয়া গেলেন। শৈলজা আসিয়া নিকটে বসিতেই কার্ত্তিক উঠিয়া বসিয়া শৈলজাকে জড়াইয়া ধরিয়া তাহাকে চুম্বন করিল; তারপর শয়ন করিয়া বলিল, "মহারাণি, খাজনা ত দিলুম, এখন নিশ্চিন্ত হয়ে শোওগে। আমার কিছু হয় নি, তোমার সঙ্গে চালাকি করছিলুম, ভাবলুম, দেখি, একটু থিয়েটারী রকম করলে তুমি ভয় পাও কি না।"

শৈলজা তবু উঠিল না। তাহার শিশু পুত্র কাঁদিয়া কাঁদিয়া আপনিই আবার ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। তবে ঘুমাইতে ঘুমাইতেও সে মাঝে মাঝে ফুঁপাইয়া উঠিতেছিল। কার্ত্তিক বলিল, "ছেলে ফোঁপাচ্ছে, তবু তুমি এখানে বসে থাকবে? তাহলে এস, আজ বিছানা অদল-বদল হোক। আমি দেবুর কাছে গিয়ে শুই, আর তুমি আমার জায়গা অধিকার করে শুয়ে থাকো।"

শৈলজা অবরুদ্ধ কণ্ঠে বলিল, "যদি এক মিনিটের জন্যও তুমি আমি হ'তে, তাহলে আমার দুঃখ বুঝতে পারতে। তোমায় সুখী করতে না পেরে—"

কার্ত্তিক কহিল, "আবার ঝগড়া সুরু করলে! এখনি ত' সোলেনামায় সই করে দিলুম।"

শৈল কহিল, "কি করলে তুমি সুখী হও?"

কার্ত্তিক কহিল, "আবার! তা হলে আবার পাগল হব, তখন টের পাবে। আমি সুখী নই? শৈল, তুমি কি কিছু বুঝতে পার না?

আমি বলছি, আমি খুব সুখী, খুব আনন্দে আছি। এখন যাও, নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমোওগে।"

শৈল কহিল, "আজ আমি তোমায় ছেড়ে থাকব না।"

কার্ত্তিক কহিল, "বেশ! সুধায় অরুচি কার?"

২

সমস্ত দিন অন্ধ বালক-বালিকাদের জন্য পরিশ্রম করিয়া সরোজ সন্ধ্যার পর সুকুমারীকে বলিল, "সুকু, আজও সমস্ত দিন সর্ব্ব-দা ত এলেন না, কি হয়েছে বলতে পার?" সুকুমারী ছাদের উপরকার তুলসীতলা হইতে বলিল, "না সরো দি, তিনি কৈ কিছু ত বলে যান নি।"

সরোজদের গৃহের ছাদটি যেন একটি ক্ষুদ্র উদ্যান। সারি সারি টবে নানা জাতীয় বৃক্ষে থরে থরে বেশ যুঁই চামেলি গন্ধরাজ রজনীগন্ধা প্রভৃতি ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে। সদ্য বারিবিন্দু-লাভের আনন্দে অসংখ্য ফুল তাহাদের গন্ধ-সম্পত্তি চারিদিকে বিলাইতেছে। উপরে নবমীর চন্দ্র হাসিতেছে—নিম্নে পুষ্পগুলি শোভায় গন্ধে সমস্ত স্থানটুকু ভরাইয়া ফেলিয়াছে। আর ইহাদের মাঝে দাঁড়াইয়া এক দৃষ্টি-হীনা বালিকা, আর এক দৃষ্টি-হীনা রমণী—অন্ধ প্রকৃতির সম্মুখে দুই অন্ধ প্রাণী! প্রাণীদুটি শব্দ বা স্পর্শের দ্বারা প্রকৃতিকে জানাইতেছে যে তাহারা আছে, প্রকৃতিও গন্ধের দ্বারা তাহাদের অন্তরে প্রবেশ-লাভের চেষ্টা করিতেছে।

সরোজ হস্তদ্বারা গাছগুলি স্পর্শ করিতে করিতে দুই তিনবার সমস্ত ছাদটি প্রদক্ষিণ করিল; যেন সব গাছগুলির সঙ্গেই তাহার স্পর্শযোগ রাখার প্রয়োজন, যেন প্রতি ফুলটিই তাহার জন্য প্রতিদিন প্রস্ফুটিত হইয়া নূতন কোন গোপন সংবাদ দিবার জন্য তাহার স্পর্শের আশায় অপেক্ষা করে! কি জানি, যদি কাহারও নিকট হইতে কোন কথা শুনিতে ভুল

হইয়া যায়, এইজন্য সরোজ প্রতিদিন প্রভাতে, সন্ধ্যায় তাহাদের সঙ্গে স্পর্শের ভাষায় কথাবার্তা কহিয়া লয়।

সুকুমারী কিন্তু একটী ক্ষুদ্র দীপ জ্বালিয়া ছাদের এক কোণে যে তুলসীমঞ্চ আছে, তাহারই নিকটে বসিয়াছিল। সরোজের মত সে প্রতি সন্ধ্যায় এই ছাদটীতে আসে বটে, কিন্তু বেড়াইবার জন্য নয়,—সে আসে ঐ মঞ্চের কুলুঙ্গীতে প্রদীপ দিয়া বসিয়া থাকিবার জন্য। সরোজের পক্ষে যেমন এই কৃত্রিম উদ্যানটির সমস্তটুকু আছে, তাহার পক্ষে তেমনি কেবল ঐ কোণটুকুই আছে। সুকুমারী ঐ কোণটুকু হইতে সমস্ত গাছপালা সরাইয়া দিয়া একটী মাত্র তুলসী বৃক্ষকে স্বহস্তের জল-নিষেকে যথেষ্ট বড় করিয়া তুলিয়াছে, এবং নানা উপায়ে ঐ স্থানটুকুতে অন্ধকার সঞ্চিত করিয়া তাহার মধ্যস্থলে একটী ক্ষুদ্র দীপ জ্বালিয়া দিয়া দৃষ্টিহীন চক্ষে চাহিয়া থাকে, তারপর ধীরে ধীরে প্রণাম করিয়া চলিয়া যায়।

শশিভূষণের শ্বশ্রুঠাকুরাণী চিন্ময়ী দেবী ছাদে আসিয়া ডাকিলেন, "সরোজ।"

অপর প্রান্ত হইতে সরোজ বলিল, "যাই, মা।"

চিন্ময়ী বলিলেন, "আবার তোমার শরীর ভাল থাকছে না, তুমি হিমে আর থেকো না, সুকু—"

সুকু তাড়াতাড়ি প্রণাম করিয়া নিকটে আসিয়া বলিল, "মা, সরো-দিকে অত মেহন্নৎ করতে বারণ করে দাও। ওর সব কাজ এখন আমিই ত পারি, তবুও আমায় ও করতে দেবে না!"

সরোজ নিকটে আসিলে চিন্ময়ী বলিলেন, "আমি মনে করছি, আবার তোমায় কোথাও পাঠিয়ে দি।"

সরোজ কহিল, "আমি কি অফিশের কেরাণী, মা, যে বৎসরান্তে আমায় ছুটি নিতেই হবে?"

চিন্ময়ী কহিলেন, "তুমি কেরাণীর চেয়েও বেশী কেরাণী, মা। তাদে পাঁচটার 'পর ছুটি, তোমার তাও নেই। শশী তোমায় এমনি করে মারছে যে বুঝ্‌তেও পার্‌ছে না, দিন দিন তুমি ক্ষয় হয়ে যাচ্ছ, অথচ তোমা বল্‌লেও ত তুমি শুনবে না!"

সরোজ অন্যমনস্কভাবে একটা গাছের পাতা ছিঁড়িতে গিয়া হঠাৎ হা সরাইয়া লইয়া বলিল, "আমি—আমি এ বাড়ী ছেড়ে থাকলে, এই স বন্ধুদের কাছ থেকে দূরে থাক্‌লে, ভাল থাকিনে মা।" সরোজ অতি যে এক যূথিকার ঝাড়ের উপর ধীরে ধীরে হাত বুলাইতে লাগিল। চিন্ময়ী বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "তবে তুমি দিনকতক সব কাজ ছেড়ে দিয়ে চু করে বসে থাক।"

সরোজ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "তা হলে কি নিয়ে থাক্‌ব?"

তাহার স্বরে এমন একটা গভীর দুঃখ ধ্বনিত হইল যে চিন্ময়ী সম্মুখ হইতে সমস্ত শোভা, সমস্ত গন্ধ নিমেষে কোথায় অন্তর্হিত হইয় গেল। তিনিও নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "তবে আর আমি কি কর্‌ব?"

উভয়ে নীরব হইলে সুকুমারী বলিল, "চল, নীচে যাই।" তিন জ তখন দ্বিতলে নামিয়া গেল।

ঘণ্টাখানেক পরে শশিভূষণ এবং তাহার দুইটি নিতান্ত অনুগত ছা মণীশ ও জ্যোতিপ্রসাদ কলরব করিতে করিতে উপরে উঠিয়া আসিল মণীশ ও জ্যোতি এখন সতেরো-আঠারো বৎসরের হইয়াছে, তাই এখ তাহারা যাহা লইয়া তর্ক করিতেছিল, তাহা ঠিক বালকোচিত কলরবমা নহে। এবং এই কারণে শশিভূষণও তাহাদের তর্কে যোগ দিয়া জ্যোতি প্রসাদের পক্ষ সমর্থন করিতেছিল।

তর্কটা চলিয়াছিল অঙ্কের অক্ষর-শিক্ষার এক নূতন পদ্ধতি লইয়া মণীশ বলিল, "তা আপনারা যাই বলুন, আমি ঠিক বাঙ্‌লা আর ইংরিজ

অক্ষরের পক্ষপাতী। চেষ্টা করতে করতে আমাদের ক্ষমতা এতই বেড়ে যেতে পারে যে হয়তো পরে সাধারণ কালীর লেখাও আমরা ছুঁয়ে পড়্‌তে পার্‌ব। কিন্তু আপনার ঐ নতুন "বিন্দু-পদ্ধতি" চললে সমস্ত ভাষার অক্ষরের সঙ্গেই আমাদের যোগ হবার আশা চিরদিনের জন্য চলে যাবে।"

জ্যোতি কহিল, "তবু লেখবার আর transcribe করবার যে একটা মস্ত সুবিধা এতে পাওয়া যাচ্ছে। তা-ছাড়া, দশটা মাত্র বিন্দু নিয়ে তাদের কমিয়ে বাড়িয়ে নানারকমে সাজিয়ে যদি বর্ণমালার নতুন একটা আকৃতি সৃষ্টি করা যায়, তাতে সুবিধেই হবে। পুরোনো পদ্ধতিতে এক একটা অক্ষর এমন যে, পাঁচ আঙ্গুলের মধ্যেও পাওয়া যায় না, হাত নাড়তে নাড়তে কতকটা সময় যায়। এই বিন্দু-পদ্ধতিতে অক্ষরগুলোকে অন্ততঃ আঙ্গুলের ডগাটুকুর মধ্যে আবদ্ধ করে আনা যেতে পারবে। এতে বইগুলোও ছোট হয়ে আসবে, আর তা ছাড়া অক্ষর গুলো pointed হবার দরুণ অনুভবটাও শিক্ষার্থীর পক্ষে সহজ হবে। আমরা যে পদ্ধতিতে অভ্যস্ত হয়েছি, তাতে আমাদের যত দিন লেগেছে এতে বোধ হয় তার অর্দ্ধেক সময়ে সবাই তার চেয়ে ঢের বেশী শিখতে পারবে।"

শশী কহিল, "তা ছাড়া আর একটা জিনিষ তোরা দেখছিস্ না যে, এক transcription এর হায়রাণীটা এতে কতখানি কমবে। কেবল নিজের সুবিধাটুকু দেখলে ত চলবে না। Point systemএ অন্ধদের দ্বারাও নির্ভয়ে এবং নির্জ্জনে transcribe করিয়ে নিতে পারা যাবে।"

সরোজ কিছুক্ষণ তাঁহাদের তর্ক মন দিয়া শুনিয়া বলিল, "আমি কিন্তু মণীশের দিকে। যদি কোন কালে আমরা কালী দিয়ে লেখা অক্ষর পড়তে নাও পারি, তা হলেও সেই আশায় আমি চিরজীবন কাটাতে রাজি আছি। চক্ষু হারিয়ে সাধারণের সঙ্গে একটা মস্ত যোগ আমরা হারিয়েছি। যদি কোন দিন সাধারণ অক্ষরে লেখা কাগজ-পত্র পড়তে

পারি, তাহলে আর এক রকমে সেই যোগটুকু ফিরে পাই এবং সেই আশাতেই বেঁচে থাকব, নইলে আর কিসের আশা করব?"

শশিভূষণ বসিয়া বলিল, "তোমাদের নতুন করে কিছু শেখাতে যাচ্ছি না। তোমরা যা শিখেছ, তাই নিয়ে নাড়াচাড়া কর। কিন্তু আমি যখন অন্ধ বিদ্যালয়ের প্রিন্‌সিপাল, তখন আমার ছাত্রদের মঙ্গল আমায় দেখতে হবে ত। তুমি এখন হাতের-চেয়ে-আম বড় হয়ে গিয়েছ, তোমার উপর আর আমার হাত কি!"

সরোজ কহিল, "তবে কি তুমি আমার চাক্‌রিটা খাবার চেষ্টায় আছ। তা হলে তোমার চাকরির স্থায়িত্ব বিষয়েও কথা উঠবে।"

শশী কহিল, "তোমার চাকরি কে খায়, বোন? তোমার হ'ল ইম্পিরিয়াল সার্ভিশ। তবে সর্ব্বানন্দ এই Systemটা চালাবার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে—"

সরোজ কহিল, "তাই তাঁর টিকিটি পর্য্যন্ত দেখবার জো নেই।"

শশী কহিল, "জো থাকলেও যে তুমি তা চেপে ধরছ না, এইটেই বড় দুঃখ, নইলে—"

সরোজ শশীর কথায় বাধা দিয়া বলিল, "শশি-দা, তোমার যত বয়স বাড়ছে, ততই স্থান-কাল-পাত্রের জ্ঞান কমে আসছে। আমায় যদি এই রকম করে সকলের সামনে—"

শশিভূষণ উচ্চরবে হাসিয়া উঠিয়া বলিল, "স্থান ত আমাদের নিজেদেরই বাড়ী, কাল, রাত্রি প্রায় ন'টা, পাত্র দেখছি তুমি। এ তিনটের একটাও ত বুঝতে ভুল করছিনে। আর যে বললে, সকলের সামনে—সকলের মধ্যে তুমি, আমি—আর এ দুটো চেংড়া ত ফাও মাত্র। তবে অন্যায়টা কোথায় হ'ল?"

সরোজ কহিল, "একা রামে রক্ষা নেই, সুগ্রীব দোসর! তুমি যে

একাই একশ'। তোমার সামনে কোন কথা হ'লে তাইত সারা জগৎকে বলা হয়। ঢাকে কাটী দেওয়া যা, আর তোমাকে কিছু বলাও তাই। যাক্ ও কথা, যে কথা হচ্ছিল, তাই হোক।"

শশী কহিল, "তুমি যে মাঝে পড়ে আমাদের তর্কের মুণ্ডুপাত করলে। মণীশ, কি বলছিলে, বল। আমি খেই হারিয়ে ফেলেছি।"

মণীশ কহিল, "আমিও—"

জ্যোতি কহিল, "আর আমি—"

শশী কহিল, "অতএব তাড়াতাড়ি পেটে কিছু না দিলে আর বুদ্ধির গোড়ায় ধূনো এবং চায়ের বাষ্প না দিলে কিছুই হবে না।"

মণীশ ও জ্যোতি তাহাদের নির্দ্দিষ্ট কক্ষে চলিয়া গেল। সরোজ সুকুমারীকে ডাকিয়া চা প্রস্তুত করিতে বলিয়া দিল; তারপর শশিভূষণকে জিজ্ঞাসা করিল, "আজ কদিন থেকে সর্ব্বদাদাকে দেখছি নে কেন?"

শশী কহিল, "তুমি ক্রমাগত তাকে দাদা বল বলে সে রেগে চাকরিতে জবাব দিয়ে চলে গিয়েছে। সত্যি বলছি, সরো, আর কেন? ঢের ত হ'ল, এইবার ঠাণ্ডা হয়ে আমার এতদিনকার চেষ্টাটা সফল করে দাও।"

সরোজ কাতর কণ্ঠে বলিল, "শশি-দা, দয়া কর, আমায় এ দায় থেকে মুক্তি দাও। সত্যি বলছি, তোমায় না সন্তুষ্ট করতে পেরে আমি অনুতাপে মরতে বসেছি। কিন্তু আমি পারছি না, আমি পারব না। সর্ব্বদাদাও তোমারই কথামত আমায় বিয়ে করে অভাগিনীর উপকার করতে চাচ্ছেন বটে, কিন্তু এ উপকার যে আমি চাইনে। তুমি এত বোঝো, এটুকু কেন বুঝছ না যে বিয়ে করবার হ'লে কোন্ দিন করে ফেলতুম। এই তেইশ-চব্বিশ বছর বয়স পর্য্যন্ত যখন কেটে গেল, তখন আর কেন? আর কিসের জন্য? আমার মনের অবস্থা তুমি বুঝতে পারবে না। তোমাদের চোখ আছে, তোমরা এক রকম করে সব জিনিষ দেখ, আর

আমাদের চোখ নেই, আমরা আর এক রকম করে দেখি। তবে এই বড় আশ্চর্য্য যে নিজে আজ পর্য্যন্ত অবিবাহিত থেকে মৃতা স্ত্রীর উদ্দেশে জীবন উৎসর্গ করে থাকতে পারে, সে কেন বুঝতে পারে না যে—"

সরোজ বলিতে বলিতে থামিয়া গেল, লজ্জায় তাহার সমস্ত মুখ রাঙা হইয়া উঠিল। শশিভূষণ গম্ভীর মুখে বলিল, "যার আশায় বসে আছ, সে এখন বিবাহিত। স্ত্রী-পুত্র নিয়ে সে এখন সংসার গুছিয়ে তুলছে। তুমি যদি অন্তরে অন্তরে তাকে এমন ভাবে আকর্ষণ করতে থাক, তাহলে সে ধর্ম্মে মতি রেখে কি করে সংসারে চলবে? না, সরোজ, এ তোমার অন্যায় হচ্চে—নিজের পক্ষে বটে, তার পক্ষেও বটে। সে যদি তোমায় ভুলতে চেষ্টা করে, প্রবৃত্তিকে দমন করে, স্নেহময়ী স্ত্রী নিয়ে সুখী হবার চেষ্টা করে, তাহলে তুমিই বা কেন একটা মোহে নিজেকে আবদ্ধ রাখবে? তুমি কেন—"

সরোজ কহিল, "না শশি-দা, এ মোহ নয়—মোহ নয়—আমি তা পারব না। আমি অন্ধকারের জীব, এক মুহূর্ত্তের জন্য যে আলো এসেছিল, সে আলোকে ভুলতে আমি পারব না, তাকে অনাদর করতে পারব না। তাকে অপমান করে হতাদর করে তাড়িয়ে দিয়েছি, সেই স্মৃতি আমায় চিরদিন শত শত বেত্রাঘাত করছে, তবু সেই স্মৃতিই আমার সম্বল। অন্ধকার জীবনের বিষয় আলোর জীব বুঝতে পারবে না। আমার যে কি নিয়ে দিন কাটে, তা তুমি কি করে বুঝবে—?"

সরোজ চলিয়া গেল। শশিভূষণ তাহার দাড়ির মধ্যে হাত চালাইতে চালাইতে মাথা নাড়িয়া আত্মগতভাবে বলিল, "সরোজ, বোন, আমিও বুঝি।"

সুকুমারী চা লইয়া আসিলে শশিভূষণ বলিল, "সুকু, মার আহ্নিক হয়েছে?"

সুকুমারী বলিল, "হয়েছে।"

শশিভূষণ তাহার শ্বশ্রূঠাকুরাণীর কক্ষে প্রবেশ করিয়া বলিল, "মা, আপনার বড় মেয়েটিকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করুন।"

চিন্ময়ী কহিলেন, "আমিও সেই কথা বলছিলুম, ওকে আজ। ওকে তুমি দুদিন ছুটী দাও।"

শশী কহিল, "দু'দিন কেন, চিরজীবনের জন্য ছুটী দিলুম। সর্ব্ব শিবরামপুর থেকে আসুক, আমি নতুন লোক দেখছি।"

চিন্ময়ী কহিলেন, "সে কি, সর্ব্বানন্দ এখানে নেই? তাই বাছা এ, ক'দিন এখানে আসেনি, বটে? আহা, কার্ত্তিক কেমন আছে, শশী?"

সরোজ নিকটেই ছিল। সে অন্যমনস্কের ভাণ করিয়া কি একটা কার্য্যে ব্যাপৃত হইল। কিন্তু শশী তাহার মুখের ভাব লক্ষ্য করিয়া বলিল, "সে সর্ব্বানন্দকে কি একটা চিঠি লিখেছে। তাই পেয়ে সে তথনই চলে গিয়েছে।"

চিন্ময়ী কহিলেন, "কি চিঠি তুমি দেখনি?"

শশী মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বলিল, "দেখেছি বটে, কিন্তু সে বিষয়ে কাওকে কিছু বলতে বারণ আছে।"

চিন্ময়ী কহিলেন, "কি এমন গোপন কথা, শশি? কার্ত্তিকের কোন অমঙ্গল ঘটে নি ত?"

শশী কহিল, "ঠিক অমঙ্গল নয়, তবে সে বাঁদর নিজের অমঙ্গল ঘটাবার চেষ্টায় আছে। তাই সর্ব্বানন্দ তাকে সাবধান করতে গেছে। তবে এখনও ব্যস্ত হবার কোন প্রয়োজন নেই, আমরা যখন সময়ে খবর পেয়েছি, তখন সহজে কিছু ঘটতে দেব না। কিন্তু সবই ঈশ্বরের হাত।"

চিন্ময়ী রামায়ণ পড়িতেছিলেন, সেখানি মাথায় ঠেকাইয়া বন্ধ করিয়া

বলিলেন, "যদি কোন বিশেষ প্রতিবন্ধক না থাকে, আমাকেও বল্‌তে পার, আমিও হয়তো কোন উপকার করতে পারি।"

শশী কহিল, "না, মা, এ সব সামান্য ব্যাপারে আপনাকে কেন ব্যস্ত হতে হবে? আমরাই সব ঠিক করে নেব। সরোজ, আমি চললুম, তুমি কাল থেকে ছুটী ভোগ করতে সুরু কর।"

শশিভূষণ চলিয়া গেল; এবং সেই সঙ্গে সরোজের মনে অনেকখানি অশান্তি ও উৎকণ্ঠা জাগাইয়া দিয়া গেল। অমঙ্গল! তাঁহার অমঙ্গল! হায়, সে অন্ধ! সে নিরুপায়! কাহারও কোন উপকার সে করিতে পারে না!

৩

দেওয়ান দুর্গাশঙ্কর যখন পুত্রের অত্যধিক ধার্ম্মিকতায় প্রীত হইয়া সমস্ত বিষয়-সম্পত্তি দেবোত্তর করিয়া কাশী পালাইয়া গেলেন, তখন সহসা মণিশঙ্কর পরমহংস একদিনেই আপনার অবস্থা আমূল পরিবর্ত্তিত করিয়া ফেলিল। সে তাহার গর্ভধারিণীর পরামর্শ-অনুসারে এবং মুহুর্মুহু যকৃত-ঘটিত ব্যাধির তাড়নে একদিন তাঁহার ভক্তসভায় বলিয়া বসিল, "জ্ঞানে ও কর্ম্মে মুক্তি নাই, ভক্তিতেই মুক্তি। সকলের মূল ভক্তি, মুক্তি তার দাসী।" ভক্তগণ সকলেই গুরুর এই আকস্মিক পরিবর্ত্তনে কিঞ্চিৎ মনঃক্ষুন্ন হইয়া একে একে সরিয়া পড়িতে লাগিল, কারণ ভক্তিমার্গে পঞ্চমকারের অভাবই বিশেষভাবে লক্ষিত হয়, অন্ততঃ নব-গোস্বামী প্রভু মণিশঙ্করের আজকাল সেই পথ-অবলম্বন ব্যতীত উপায়ান্তরও ছিল না! গলায় তুলসীর মালা, মস্তকে দীর্ঘ শিখা, এবং সর্ব্বোপরি চিতা-জাতীয় ব্যাঘ্রের ন্যায় অথবা ডেড্‌লেটার অফিসের চিঠির ন্যায় সর্ব্বাঙ্গে তিলকের ছাপ লাগাইয়া প্রভুপাদ গোস্বামী আজকাল তাহার স্বল্প-সংখ্যক অনুগত ভক্তগণের মধ্যে

বলিয়া যে সমস্ত ভক্তিতত্ত্বের ব্যাখ্যা করে, তাহাতে আমিষের কোনরূপ গন্ধ না থাকায় অবশিষ্ট ভক্তগণ যদিও দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বটে, তথাপি মালপুয়া, ক্ষীর, ছানা, চিনি প্রভৃতি "মধ্বভাবে গুড়ং" এর নিতান্ত অভাব এখনও ঘটে নাই বলিয়া তাহারা এখনও নব বাবাজীকে ত্যাগ করিতে পারে নাই।

কিন্তু মণিশঙ্কর তাহার পূর্ব্ব আশ্রমে যে অসাধারণ শাস্ত্রজ্ঞান ও ব্যাখ্যা-নৈপুণ্য প্রকাশ করিয়াছিল, বর্ত্তমান আশ্রমের তাহার সে শক্তি অটুট রহিয়াছে। সে পূর্ব্বাশ্রমে যেমন তন্ত্রাদির ব্যাখ্যায় নিজের অদ্ভুত উদ্ভাবনী-শক্তি দেখাইয়া সর্ব্বলোকনমস্য হইয়াছিল, বৈষ্ণব-শাস্ত্র-ব্যাখ্যাতেও তাহার সেই শক্তি প্রকাশিত হইতেছে। এমন কি সাধারণের নিকট যে সমস্ত কথা নিতান্তই বৈষয়িক, সে সব কথার মধ্যেও সে ভক্তির গন্ধ পাইত এবং অপূর্ব্ব কৌশলে সেই সব কথার ভক্তিপক্ষে ব্যাখ্যা করিত।

একদিন তাঁহার কোন শিষ্য গুরুর উক্ত শক্তির পরিচয় লইবার জন্য বলিল, "প্রভু, এই শ্লোকটীর কি ভক্তিপক্ষে কোন ব্যাখ্যা হতে পারে?

'কুড়বা কুড়বা কুড়বা লিজ্জে।
কাঠায় কুড়বা কাঠায় লিজ্জে॥
কাঠায় কাঠায় গণ্ডা জান।
গণ্ডায় গণ্ডায় ধূল পরিমাণ'॥"

বাবাজী শ্লোক শুনিয়া অশ্রুপূর্ণ নেত্রে গদ্‌গদ বচনে বলিল, "আহা, এ যে মাথুর!" শিষ্য অবাক হইয়া বলিল, "প্রভু, ব্যাখ্যা করে আমার হৃদয়কে শীতল করুন।" প্রভু তৎক্ষণাৎ উক্ত শ্লোকের ব্যাখ্যা করিল :—

"কুড়বা কুড়বা অর্থাৎ ক্রূর অক্রূর কুড়বা লিজ্জে, অর্থাৎ সেই ক্রূর অক্রূর তিনি কুড়বাকে লইয়া যাইতেছেন। কুড়বা কি? কু অর্থাৎ

বেদ (প্রমাণ, যথা অন্নদামঙ্গলে 'কু-কথায় পঞ্চমুখ') অথবা কুটিল-হৃদয় কৃষ্ণ; ড় কি না লাঙ্গলী বলরাম; (ড়লয়োরভেদত্বাৎ) বা কিনা বায়ু অর্থাৎ ব্রজের প্রাণ-বায়ু কুড়বাকে লইয়া যাইতেছেন অর্থে কৃষ্ণ-বলরামকে এবং সেই সঙ্গে ব্রজের প্রাণ-বায়ুকে হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছেন; ইহাই সঙ্কেতের দ্বারা সূচিত হইতেছে। কাঠায় কুড়বা কাঠায় লিজ্জে অর্থাৎ কাঠের ন্যায় কঠিন-হৃদয় সেই অক্রূর কাঠায় কি না কাষ্ঠ-নির্ম্মিত রথে লিজ্জে লইতেছে। কাঠায় কাঠায় গণ্ডা জান অর্থাৎ সেই কাষ্ঠ-নির্ম্মিত রথে একগণ্ডা অর্থাৎ রাম, কৃষ্ণ, অক্রূর ও সারথি চারজন যাইতেছেন। আর গণ্ডায় গণ্ডায় ধূল পরিমাণ অর্থাৎ হতচেতনা কৃষ্ণগত-প্রাণা গোপিনী-গণ গণ্ডায় গণ্ডায় ধূলায় পড়িয়া গড়াগড়ি দিতেছেন।"

অর্থ শুনিয়া শিষ্যগণ কাঁদিয়া আকুল হইল। সাধু মণিশঙ্কর মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িতেছিল, এমন সময় নূতন জমিদার কার্ত্তিকচন্দ্র সেইস্থানে উপস্থিত হইয়া বলিল, "মণি, তোমার শাস্ত্র-ব্যাখ্যা এখন রাখ। তোমার বাপকে ত এই শাস্ত্রের অস্ত্রেই তাড়ালে। কিন্তু তিনি পালাতে পালাতেও যে এক কামড় দিয়ে গিয়েছেন, তারই জ্বালায় ভেক নিয়েছ। এখন যদি নিজের মঙ্গল চাও ত আবার সংসার-ধর্ম্মে মন দিয়ে ভালমানুষের মত বিয়ে-থা কর। আমি তোমার বাপের কাজে তোমাকেই বাহাল করব মনস্থ করেছি।"

সাধুজীর মূর্চ্ছিতপ্রায় অর্দ্ধ-নিমীলিত চক্ষু মুহূর্ত্তে বিস্ফারিত হইয়া উঠিল। আমতা-আমতা করিয়া সাধুজী বলিল, "আজ্ঞে—আমি ত বিষয় ত্যাগ করব, স্থির করেছি—কারণ—"

কার্ত্তিক কহিল, "কারণ তোমার সমস্ত বিষয়ই এখন তোমার পিতৃ-প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহের দেবোত্তর। বিষয়-বাসনা-ত্যাগের এর চাইতে গুরুতর কারণ থাকতেই পারে না, তুমি বুদ্ধিমানের মতই কাজ করেছ। কিন্তু

যখন শ্বশুর-মশায় তাঁর বিষয় "জামাত্রোত্তর" করেছেন, তখন তোমার মত নিষ্কাম দেবোত্তরজীবী অবিষয়ীকেই জামাইবাবুর বিশেষ প্রয়োজন। অতএব নির্ভয়ে 'ধনানি জীবিতঞ্চৈব পরার্থে প্রাজ্ঞ উৎসৃজেৎ' এই শাস্ত্র বাক্যানুসারে আমার দেওয়ানী খাসের প্রাজ্ঞ দেওয়ান মোহান্ত মহারাজ হতে পার। তোমার এতে মোহান্ত-গিরিরও অসুবিধা ঘটবে না, চাই-কি, জামাইবাবুও তোমার নিষ্কাম কর্ম্মের শিষ্যত্ব গ্রহণ করতে পারেন।"

মণি কহিল, "আজ্ঞে—"

কার্ত্তিক কহিল, "আজ্ঞে-টাজ্ঞে নয়—শোন, তোমার মা সেদিন আমাদের ওখানে গিয়ে অনেক কান্নাকাটি করছিলেন। তাঁর মতে তোমার পিতার দেওয়ানী কার্য্যে উত্তরাধিকার-সূত্রে তোমারই দখলি সত্ব জন্মেছে। তোমাকে উচ্ছেদ করা অসম্ভব। আমি তাঁর সঙ্গে আইনের তর্কে পরাস্ত হয়ে তোমার প্রাপ্য তোমায় ফিরিয়ে দিতে ইচ্ছুক। তবে যদি তুমি পরম-বকই থাকতে চাও, সাধারণ মানুষের মত না হও, তা হলে স্বতন্ত্র কথা। কিন্তু যদি দেওয়ানী গ্রহণে ইচ্ছা থাকে, তাহলে দার-পরিগ্রহাদি সাধারণ জীবের জীবনের নিয়মগুলোও মেনে নাও।"

মণিশঙ্কর কোন কথা বলিল না; মাথা চুলকাইতে লাগিল। তাহা দেখিয়া কার্ত্তিক আবার বলিল, "তা হলে তুমি এ বিষয়ে যা ভাল বোঝো, একটা স্থির করে আমায় বলো, আমি এখন চল্‌লুম।" কার্ত্তিক চলিয়া গেলে মণিশঙ্কর আপনার বহির্ব্বাসকৌপীনাদির দিকে চাহিয়া একটা নিশ্বাস ফেলিল।

কার্ত্তিক তাহার পিতার টোলে গিয়া দেখিল, সর্ব্বানন্দ বসিয়া শিবচন্দ্র ন্যায়রত্নের সহিত কথা কহিতেছে। কার্ত্তিক বলিল, "আমি তোমায় আসতে লিখলুম, আর তুমি আমার কাছে না উঠে বাবার কাছে এলে যে!"

সর্ব্বানন্দ বলিল, "তুমি আমায় আসতে দেখেও যখন কথা না ক'রে চলে গেলে, তখন আর কি করে তোমার বাড়ীতে উঠি ?"

কার্ত্তিক কহিল, "আমি যে কাজে যাচ্ছিলুম তাতে তুমি বাধা দিতে, তাই তোমার সঙ্গে কথা বলবার আগেই তাড়াতাড়ি সে কাজ সেরে এলুম। তুমি যে চিঠি পেয়েই রওনা হবে, তা জান্‌তুম না, নইলে আগেই সে কাজ সেরে রাখ্‌তুম।"

ন্যায়রত্ন কহিলেন, "কি কাজ, কার্ত্তিক ?"

কার্ত্তিক কহিল, "আজ্ঞে, মণিশঙ্করকে তার বাপের কাজে বাহাল ক'র্‌লুম। সেও সে কাজ নিতে স্বীকার হয়েছে।"

ন্যায়রত্ন কহিলেন, "মণিকে ? কাজটা কিন্তু ভাল হ'ল না।"

কার্ত্তিক কহিল, "ভাল-মন্দ ভগবানের হাতে। তার বাপ ঐ কাজে তাঁর সারা জীবন কাটিয়ে গেছেন, সরকারের যথেষ্ট উপকারও তিনি করে গেছেন। এখন তাঁর ছেলেকে ঐ কাজে বাহাল ক'রে তাঁর উপকারের প্রত্যুপকার না ক'র্‌লে অকৃতজ্ঞের কাজ হবে।"

সর্ব্বানন্দ কহিল, "আমি তোমার এই যথেচ্ছাচারিত্বে বাধা দিতে এসেছি।"

ন্যায়রত্ন কহিলেন, "যথেচ্ছাচারিতা ? সে কি সর্ব্ব ?"

সর্ব্বানন্দ কহিল, "হাঁ, যথেচ্ছাচারিতাই বটে। ও আমায় বারবার চিঠি দিয়েছে যে হয় আমি এসে ওর সমস্ত জমিদারীর ভার নি, না হয়ত ও মণিশঙ্করকে এই কাজে লাগাবে। আমি আমার উপস্থিত কাজ ফেলে ওর অধীনে কাজ ক'র্‌তে রাজী হইনি, তাই ও আমার উপর রাগ ক'রে মণিকে বাহাল ক'র্‌তে চাইছে। কালকের চিঠিতে ও লিখেছে যে মণিকে বাহাল করাই সাব্যস্ত। কি যে ওর মনে আছে, তা জানিনে, তবু ওকে এ কাজ ক'র্‌তে নিষেধ করুন, না হলে—"

কার্ত্তিক কহিল, "নাহলে কি হবে, সর্ব্বদা? এ ত আমার পৈতৃক বিষয় নয়! যদি স্বর্গীয় শ্বশুর মশায়ের উপকারী ভৃত্যের প্রত্যুপকার করি, তাতে কি আমার খুবই অপরাধ হবে?"

সর্ব্বানন্দ কহিল, "প্রত্যুপকার কর্‌তে চাও, ত বসে বসে মাসিক কিছু বৃত্তি ওর জন্যে বরাদ্দ করে দাও। তোমার বিষয়ের ভার ওর হাতে তুমি দিতে পাবে না। যার বাপ দেবোত্তর করে তার হাত থেকে নিজের বিষয় রক্ষা করে গেছেন, সেই লোককে কি করে তুমি বিশ্বাস করে দেওয়ানী দেবে?"

কার্ত্তিক কহিল, "অবিশ্বাসের কারণ ত এখনো কিছু ঘটেনি। কাজ হাতে পড়্‌লে সকলেরই বুদ্ধি খুলে যায়। তার প্রমাণ এই দেখ, আমি। আমার ত কোন পুরুষে জমিদারী ছিল না, তবু বিষয় হাতে পেয়ে কেমন চালাচ্ছি। মণি পাকা বিষয়ীর সন্তান, ও ত বিষয়ী হয়েই জন্মেছে। ওর চেয়ে উপযুক্ত লোক পাব কোথায়?"

শিবচন্দ্র কহিলেন, "সর্ব্ব, আমি একটা কথা বুঝ্‌তে পার্‌ছি না। এই সামান্য ব্যাপার নিয়ে তুমি এত ব্যস্ত হয়ে কলকেতা থেকে চলে এলে কেন? আমাকে লিখ্‌লেও ত' আমি এ সব কথা কার্ত্তিককে বল্‌তে পার্‌তুম।"

সর্ব্বানন্দ কহিল, "সব কথা আপনার সুমুখে বলা যায় না, খুড়ো-মশায়।"

কার্ত্তিক কহিল, "কেন বলা যাবে না? আমিই বল্‌ছি, আমি সর্ব্বদাদাকে আমার কাছে পাবার জন্য ওকে আমার সমস্ত এষ্টেটের দেওয়ানী নিতে অনুরোধ করে চিঠি লিখি। আমি ওর বিষ দৃষ্টিতে পড়া অবধি কি উপায়ে ওকে আবার কাছে পাব, তাই ভাব্‌ছিলুম। দেওয়ানজী যখন চাকরী ছেড়ে দিয়ে কাশী গেলেন, তখন একটা সুবিধে হ'ল। কিন্তু

এমনি আমার কপাল যে যাতে আমার এতটুকু সুবিধে হয়, তা সর্ব্ব-দা কখনই কর্‌বে না। তাই এখন এই উপায় অবলম্বন করেছি। মণির হাতে সব কাজের ভার দিলে বিষয় আমার নষ্ট হবার দিকেই যাবে, তখন যদি দয়া করে ও আমায় রক্ষা কর্‌তে আসে;—এই আমার আশা।"

সর্ব্বানন্দ কহিল, "তোমার উপর আমার এতটুকু শ্রদ্ধা নেই। তোমার চাকরি নেব যেদিন, সেদিন বুঝ্‌ব যে, আমার বুদ্ধি লোপ হয়েছে।"

কার্ত্তিক কহিল, "তা জানি সর্ব্ব-দাদা! বামুনের ছেলে কুকুরের বৃত্তি গ্রহণ কর্‌তে কখনই চাইবে না, বিশেষতঃ আমার মত জামাই বাবুর অধীনে। যে শ্বশুরের নামে বিকুচ্ছে সে যে নিজেই কুকুর, কুকুরের অধীনে চাকরি কোন ভদ্র লোকের ছেলেরই নেওয়া উচিত নয়, তুমি ত ব্রাহ্মণ-সন্তান। আমি আগেই এ সব কথা জান্‌তুম, তাই মণিকে দেওয়ান ক'র্‌বই ঠিক করেছিলুম। তোমায় ভয় দেখিয়ে যে একবার আন্‌তে পেরেছি, এইটুকুই আমার লাভ। তুমি আমায় বাঁচাতে এসেছ, কিন্তু আমায় বাঁচাতে পার্‌বে না। এখন কুকুরের অন্ন গ্রহণ কর্‌বার যদি ইচ্ছা থাকে ত এস। আর অতটা যদি দয়া করতে রাজী না হও, তবুও আমার জিত, কারণ তুমি আমাকে এখনও মন থেকে ঝেড়ে ফেল্‌তে পারনি, এটুকু আমি জান্‌তে পার্‌লুম।"

কার্ত্তিক হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেল, কিন্তু শিবচন্দ্র পুত্রের মুখের ভাব লক্ষ্য করিয়া শিহরিয়া বলিলেন, "সর্ব্ব, কার্ত্তিক আমার এ কি হতে চলেছে? ওর মুখ দেখে ওর গর্ভধারিণী দিন দিন শুকিয়ে যাচ্ছেন। কালিকাবাবুর কথা রাখ্‌তে গিয়ে এ আমি কি কর্‌লুম?"

সর্ব্বানন্দ কহিল, "কিছু অন্যায় করেন নি, খুড়োমশায়। সন্তান যদি পিতা-মাতার সদভিপ্রায় বুঝ্‌তে না পেরে মিছি মিছি নিজেকে নষ্ট করে ত তার জন্য কোন দুঃখ করা উচিত নয়। কালিকাবাবুর মত শ্বশুর,

শৈলজার মত স্ত্রী লাভ ক'রেও যে মূর্খ আপনাকে অপমানিত জ্ঞান করে, তার মঙ্গল কখনও নেই।"

শিবচন্দ্র কহিলেন, "বৌমা যে আমার কতখানি গুণবতী, তা তুমি জান না, সর্ব্ব। এমন স্ত্রী লাভ ক'রেও কার্ত্তিক অসুখী হ'ল!"

সর্ব্বানন্দ কহিল, "সুখ-শান্তি যে চায় না, দুঃখ-অশান্তিই যে চায়, তার ভাল ক'র্‌তে ভগবানও অক্ষম। যাক, খুড়োমশায়, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, আমার দেহে একবিন্দু রক্ত থাক্‌তে কার্ত্তিককে সম্পূর্ণ নষ্ট হ'তে কখনই দেব না। তবে সবই ভগবানের হাত।"

শিবচন্দ্র দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া সর্ব্বানন্দর সঙ্গে গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন।

৪

সর্ব্বানন্দ কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলে শশিভূষণ তাহাকে নিভৃতে ডাকিয়া বলিল, "কি করে এলে?"

সর্ব্বানন্দ বলিল, "তোমার লোকটিকে টাকা-কড়ি দিয়ে একটা ঘর ঠিক করে ওখানে বসিয়ে রেখে এলুম। কিন্তু আমার মনে হয় না যে ঐ রকম বোকা লোক কার্ত্তিকের সমস্ত কাজ-কর্ম্মে নজর রাখ্‌তে পারবে।"

শশিভূষণ কহিল, "বোকো একবার ওর ক্ষমতা! তোমার চোখেও ধুলো দিয়েছে! তুমিও বুঝ্‌তে পারনি যে ও কেমন লোক। ঐ রকম লোকের দ্বারাই কার্য্যোদ্ধার হবে। কার্ত্তিক বুঝ্‌তেই পারবে না যে ওর উপর আমাদের দৃষ্টি আছে, অথচ কাজ বেশ হয়ে যাবে।"

সর্ব্বানন্দ কহিল, "কিন্তু আমার মনে হয়, কার্ত্তিক কিছুই গোপন করবে না, ওর সয়তানী খোলাখুলি রকমেরই হবে। বিষয় আশয় বোধ

হয় ও ওড়াবে না, কারণ এতটা নীচ-প্রবৃত্তি ওর নয় যে, যে বিষয়ের ও ধর্ম্মত ট্রাষ্টিমাত্র, তা উড়িয়ে পুড়িয়ে নীচের মত প্রতিশোধ নেবে। কিন্তু খুড়োমশায়ের উপরও যখন ওর আক্রোশ হয়েছে, তখন আবার ওর দ্বারা সবই সম্ভব, মনে হয়। কি আশ্চর্য্য, ঠাকুর্দ্দা, সাধারণ মানুষে যা পেলে নিজেকে ভাগ্যবান মনে করে, তা পেয়েও নিজেকে ও এতখানি অপমানিত জ্ঞান ক'রছে!"

শশিভূষণ কহিল, "ওর কাছে নিজের ইচ্ছেটাই সব-চাইতে বড়। নিজেকে ও এত বড় করে চিরদিন দেখ্ছে যে অনিচ্ছায় পৃথিবীর উপর প্রভুত্ব পেলেও ওর মনস্তুষ্টি হবে না। যাক্ ও কথা, শৈলর সঙ্গে দেখা হ'য়েছিল?"

সর্ব্বানন্দ কহিল, "কাল তার সঙ্গে দেখা হয়েছিল।"

শশিভূষণ কহিল, "কি রকম দেখ্‌লে?"

সর্ব্বানন্দ কহিল, "দেখ্‌লুম যা, তা আর বলে কি হবে?"

শশিভূষণ কহিল, "তুমি কি বল্‌লে?"

সর্ব্বানন্দ কহিল, "আমি জিজ্ঞাসা ক'র্‌লুম, 'কেমন আছ, শৈল?' সে হেসে ব'ল্‌লে, 'ভালই আছি!' কিন্তু সেই হাসিটুকু অশ্রুর চেয়েও বেদনায় ভরা। সেজন্য আমি স্পষ্টই ব'ল্‌লুম, 'শৈল, তুমি আমায় সব কথা খুলে বল, আমি তোমার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী।' প্রথমে সে ত কিছুই ব'ল্‌তে চায় না, শেষে অনেক সাধ্য-সাধনায় ব'ল্‌লে, 'আমার দুঃখ কাউকে বোঝানো যাবে না।' আমি ব'ল্‌লুম, 'কেন যাবে না? তুমি বল, আমি বুঝ্‌ব। কার্ত্তিক কি এতদূর অধঃপাতে গেছে যে তোমাকেও সে কষ্ট দেয়?' শৈল তখন কেঁদে ফেলে বল্লে, 'অমন কথা আপনি ব'ল্‌বেন না। উনি প্রাণপণে আমায় সুখী ক'র্‌বার চেষ্টা ক'র্‌ছেন। কখনও অনাদর করেন নি, বা একদিনের জন্যও আমায় একটা রুক্ষ কথা বলেন

নি। সে বিষয়ে ওঁর কোন ত্রুটি নেই! কিন্তু আমিই হতভাগিনী তাই এমন স্বামী পেয়েও সুখী হ'তে পারছি না।' এতেই বুঝতে পারছ ঠাকুরদা, যে কার্ত্তিকের সয়তানী কি রকম সূক্ষ্ম ধরণের। বাইরে থেকে তার কিছুই বোঝবার জো নেই।"

শশী কহিল, "আর এতেই বুঝতে পারছ যে ওর সঙ্গে কি রকম সাবধানে চলতে হবে! ও-সব কথা যাক্—এখন এধারে এক মুস্কিলে পড়া গেছে যে, তোমার Point systemএ শিখতে কেউ রাজী হয় না। ছেলেদের বাপ-মা-রাও সব বাধা দিচ্ছে, মাষ্টাররা বাধা দিচ্ছে, এমন কি সরোজ পর্য্যন্ত রেগে আগুন হয়ে গিয়েছে। এমন উপায় কি?"

সর্ব্বানন্দ কহিল, "কারুর উপর পরখ না ক'রলে ত কেউ ওটা নিতে চাইবে না। যেমন ক'রে হোক্ একজনকে দিয়েও দেখতে হবে। আচ্ছা, সুকু, কি বলে?"

শশী কহিল, "ওর বয়স একটু বেশী হয়ে গিয়েছে না?"

সর্ব্বানন্দ কহিল, "চোদ্দ-পনেরো বছর বয়স বেশী নয়, ও বয়সে নতুন করে আরম্ভ করা চলে। ও যদি রাজী হয় ত আমি বলি তুমি নিজেই লেগে পড়।"

শশী কহিল, "তোমার system ভাই আমি নিজেই তেমন আয়ত্ত ক'রতে পারি নি। যদি পরীক্ষা ক'রতে হয় ত তুমিই কর। আমি আর নতুন ক'রে আরম্ভ করতে পারিনে।"

সর্ব্বানন্দ কহিল, "বেশ কথা, আমিই ক'রব।"

সন্ধ্যার পর সরোজ ও সুকুমারীর নিকট এ প্রস্তাব উঠিলে, সরোজ ব্যস্ত হইয়া বলিল, "আহা, সুকু বেচারীর এ কূল ও কূল দু' কূল নষ্ট ক'রবে? একে ত বেচারী অতি-কষ্টে যা হোক কিছু শিখেছে, তার উপর নতুন ক'রে আর একটা পদ্ধতির ভার ওর ওপর চাপিয়ো না, দোহাই

তোমাদের—ও বেচারী কিছু ব'লতেও পারবে না, অথচ তোমরা ওর জীবনের সমস্ত চেষ্টাটুকু ব্যর্থ করে দেবে। কেন? আর কোন ছোট ছেলে-মেয়ে কি অত বড় ইস্কুলের মধ্যে মিল্‌ল না, যে আমার সুকুকেই তোমাদের বৈজ্ঞানিক অত্যাচার সইতে হবে?"

সর্ব্বানন্দ কহিল, "তুমিও যদি সাধারণ অবুঝ লোকের মত বাধা দাও সরোজ, তাহলে আর আমাদের আশা নেই। আমি ব'লছি, সুকুর কোন ক্ষতি হবে না। ও যা শিখেছে, তাও ওকে ভুলতে দেব না, অথচ যদি ওর দ্বারা এই পদ্ধতিটা চালাতে পারি, তাতে সকলেরই উপকার হবে। আমি ব'ল্‌ছি যে যদি এর জন্য আমায় দিবা-রাত্রি পরিশ্রম ক'র্‌তে হয়, তা ক'র্‌তেও আমি প্রস্তুত আছি। এখন চাই কেবল তোমাদের সহকারিতা আর উৎসাহ। কিন্তু তোমরা যদি এমনভাবে বেঁকে দাঁড়াও তাহলে আমরা করি কি?"

সরোজ কহিল, "গতানুগতিকভাবে চলাই সাধারণের পক্ষে নিরাপদ, বিশেষ অন্ধের পক্ষে অচেনা পথ মাড়াতেই নেই। আমার এ বিষয়ে যা মত, তা তোমাদের জানিয়ে দিলুম, এখন তোমাদের যা ইচ্ছে হয় তাই কর।"

সর্ব্বানন্দ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "নিরুপায়!"

সে উঠিয়া দাঁড়াইতেই সুকুমারী তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল, "আমি আপনার নতুন পদ্ধতি শিখ্‌ব। সরো দিদি, তুমি আর বাধা দিয়ো না; যা হয় আমার ভাগ্যেই হবে।"

সর্ব্বানন্দ সকৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে সুকুমারীর অন্ধ নয়নের দিকে চাহিয়া বলিল, "সুকু, বাঁচালে তুমি। তোমায় যে কি বলে কৃতজ্ঞতা জানাব, তা ভেবে পাচ্ছি না। আমি বলছি, তুমি আমার উপর নির্ভর কর, এতে তোমার কোন ক্ষতি হবে না। আমি প্রাণপণ চেষ্টায় তোমায় এমন করে তুলব যে তুমি আমাদের ইস্কুলের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছাত্রী হবে।"

তুলবে যে সকলেই আশ্চর্য্য হয়ে যাবে। এর জন্য তোকে শশী কত আশীর্ব্বাদ করেছে।"

সরোজ কহিল, "শশিদা কখন এল ?"

চিন্ময়ী কহিলেন, "আমার ঘরে অনেকক্ষণ থেকেই ও এসে বসে ছিল। তোর সঙ্গে তর্কের ভয়ে এখানে আসে নি। সব্ব যখন গিয়ে খবর দিলে, তখন সে লাফিয়ে উঠল। তারপর দুজনে ইংরিজিতে কি বলাবলি সুরু করে দিয়েছে। সব্ব আমায় বল্‌লে যে আজ তার এত আহ্লাদ হয়েছে, যে রাজ্য পেলেও এমন হ'ত না। সব্বর মত মানুষের কথা ঠেলে সরোজ তুই কি করে অমত করিছিলি ?"

সরোজ কহিল, "আর আমার মতামতে কি যাবে-আসবে মা ? সুকু যখন নির্বিচারে আপনাকে সর্ব্ব-দার হাতে সঁপে দিয়েছে, তখন আমি বাধা দিলুম, আর না দিলুম, তাতে সুকুর কি ? সুকু এখন যতদিন ইচ্ছে যা-ইচ্ছে শিখুক না, এখন সুকুর ভার সর্ব্ব-দার উপর।"

চিন্ময়ী কহিলেন, "আহা, সব্বর মত মানুষের উপর নির্ভর করবে না ত কার উপর করবে ? ভালই করেছিস্ সুকু, দেখিস্, তোর খুব ভাল হবে।"

চিন্ময়ী মহানন্দে চলিয়া গেলেন। সুকুমারী মৃদু স্বরে বলিল, "সরো-দি, তুমি ভাই বড় দুষ্টু।"

৫

"আকরে পদ্মরাগাণাং জন্ম কাচমণেঃ কুতঃ ?" এই শাস্ত্র-বাক্য অক্ষরে অক্ষরে প্রমাণ করিয়া যখন মণিশঙ্করের পৈতৃক বিষয়-বুদ্ধি শিবরামপুরের বিস্তৃত জমিদারীর প্রত্যেক অংশে অনুভূত হইতে লাগিল, তখন শৈল ব্যস্ত হইয়া স্বামীকে ধরিয়া বসিল যে মণিশঙ্করকে

ছাড়াইয়া দেওয়া হোক। চারিদিক হইতে অত্যাচারের করুণ কাহিনী সে আর শুনিতে পারে না। কার্ত্তিক পূরাদস্তুর জমিদারী চালে উত্তর দিল, "জমিদারী রাখিতে হইলে, এরূপ না করিলে চলিবে কেন?" মণি যাহা করিতেছে, তাহা কার্ত্তিকের উপদেশানুসারেই করিতেছে, তাহাতে মণির কোন দোষ নাই।

শৈল কাঁদিয়া বলিল, "তা বলে কি গরীব বিধবার ব্রহ্মোত্তর বাজেয়াপ্ত কর্‌তে হবে, না, পূর্ব্বপুরুষরা যে-সব দেবোত্তর দিয়ে গিয়েছেন, পুকুর দিয়ে গিয়েছেন, সে-সব কেড়ে নিতে হবে?"

কার্ত্তিক কহিল, "দেবতা স্বয়ং কিছু ভোগ করেন না, মানুষই ভোগ করে। কতকগুলো বাজে লোক ভোগ কর্‌ছিল, না হয়, আমরাই সেগুলো ভোগ কর্‌লুম। দেবতার পক্ষে রামা যে শ্যামাও সে, কার্ত্তিক যে শৈলও সে। আর ব্রহ্মোত্তর? ব্রাহ্মণ আর গঙ্গা কলিতে লোপ পেয়েছে, অতএব ও সব দান অসিদ্ধ। কতকগুলো জোচ্চোরে ফাঁকি দিয়ে ভোগ কর্‌ছিল, আমি তাদের জব্দ করে দিয়েছি মাত্র।"

শৈল কহিল, "তা হ'লে কোন্ দিন তুমি বাবার ব্রহ্মোত্তরগুলোও কেড়ে নিয়ে ওঁকে টোল থেকে তাড়াবে বল?"

কার্ত্তিক হাসিয়া বলিল, "তা রামার পক্ষে যা কর্‌ব শ্যামার পক্ষেও তাই করা উচিত বৈ কি?"

শৈল স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া হঠাৎ হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, "জানিনা কি মতলবে তুমি আমার কাছে এ সব কথা বল! এ কি আমার পরীক্ষার জন্য—না—কিন্তু যাই হোক্—তুমি মণি-দাকে না তাড়াও, অন্ততঃ আমার জন্য যা-যা ও কেড়ে নিচ্ছে, তা ফিরিয়ে দাও। তুমি না দাও ত আমি দেব।"

কার্ত্তিক কহিল, "তা হ'লে সে খরচা তোমার নিজের এষ্টেট থেকে হবে, আমি দেব না।"

শৈল কহিল, "কেন ?"

কার্ত্তিক কহিল, "আমি ত মণির কোন অন্যায়ই দেখ্‌তে পাচ্ছি না।"

শৈল কহিল, "অন্যায় দেখ্‌তে পাচ্ছ না! মণি যা কর্‌ছে, সবই ঠিক ?"

কার্ত্তিক কহিল, "আমার ত তাই মনে হয়।"

শৈল কহিল, "তুমি এত দূর অন্ধ হয়ে গিয়েছ ?"

কার্ত্তিক কহিল, "সে কথা কি আজ জান্‌লে, শৈল ? আমার দুটী চক্ষুই গিয়েছে, এ দুটো যা দেখ্‌ছ, এ পাথরের।"

শৈলজা স্তম্ভিত হইয়া গেল। এ কি সেই কার্ত্তিক, চিরদিন যে অন্যায়ের বিরুদ্ধে সিংহের মত যুদ্ধ করিতে উদ্যত ছিল! এ কি সেই মানুষ!

গভীর দুঃখে শৈলজা কাঁদিয়া ফেলিল। কার্ত্তিক কিন্তু হাসিতে হাসিতে বলিল, "অন্ধকারের ঘুরঘুরে পোকাকে আলোয় ধরে রাখ্‌বার চেষ্টা কর্‌লে সে ত এম্‌নি করে চারিদিকে গর্ত্ত খোঁড়বার চেষ্টা কর্‌বেই। এর জন্য দুঃখ কেন কর্‌ছ, শৈল ? আমি ত বলেছি, সুখ আমায় সয় না! তাই চারিদিকে দুঃখের হাহাকার জাগিয়ে তুলে তার মধ্যে চক্ষু মুদে বসে হাস্‌বার চেষ্টা কর্‌ছি।"

শৈল কহিল, "না, আমি তোমায় এত অধঃপাতে যেতে দেব না! যদি তোমায় রক্ষা কর্‌তে না পারি ত আমি কিসের তোমার স্ত্রী ? কিসের আমার ভালবাসা ?"

কর্ত্তিক কহিল, "ঠিক বলেছ শৈল, কিসের ভালবাসা ? কিসের স্নেহ ? সবই মোহ, সবই বন্ধন !"

শৈল কহিল, "তুমি মরণাধিক মরণের দিকে ছুটে চলেছ। কিন্তু কেন যে তোমার এ মতিচ্ছন্ন হয়েছে, তা বুঝ্‌তে পার্‌ছিনে।"

কার্ত্তিক কহিল, "আমিই বুঝ্‌তে পার্‌ছিনে, তা তুমি! কিসের মোহে, কিসের আকর্ষণে আমার সমস্ত বুদ্ধি সয়তানীর দিকে ছুটে চলেছে, তা যদি বুঝ্‌তুম, তা হলে কি আমিই এমন হতে চাইতুম! আমি জানি না, তবু না জেনেই ছুট্‌তে হচ্চে, এমনি আকর্ষণ পতনের, এমনি আকর্ষণ মৃত্যুর, এমনি আকর্ষণ অন্ধকারের!"

শৈল কহিল, "আমি প্রাণ দিয়েও তোমায় বাঁচাব।"

কার্ত্তিক কহিল, "প্রাণ দিয়েও তুমি রক্ষা কর্‌তে পার্‌বে না।"

শৈল কহিল, "তবে কি দিয়ে তোমায় রক্ষা কর্‌ব?"

কার্ত্তিক কহিল, "সেইটেই তোমায় আবিষ্কার ক'র্‌তে হবে। আমি সেই আশায় বসে আছি। যেদিন সেইটে তুমি ধর্‌তে পার্‌বে, সেদিন দেখ্‌বে, আবার আমার চোখ ফুটেছে।"

কার্ত্তিক চলিয়া গেল। আর শৈলজা আকাশ-পাতাল ভাবিয়াও স্থির করিতে পারিল না, কার্ত্তিক কি চায়! সে অনেকবার কার্ত্তিককে বলিয়াছে, যে যদি শৈলকে বিবাহ করিয়া সে অসুখী হইয়া থাকে, তাহা হইলে সে কেন শৈলকে ত্যাগ করিয়া যাহাকে পাইলে সুখী হয়, তাহাকেই বিবাহ করে না? কিন্তু কার্ত্তিক যে তাহাতে রাজী নয়। তবে কার্ত্তিক কি চায়? কি পাইলে কার্ত্তিক আবার সুস্থ হইবে, আবার পূর্ব্বভাব ফিরিয়া পাইবে? শৈলজা ভাবিয়া কিছুই ঠিক করিতে পারিল না।

ইতিমধ্যে আর-একটা এমন ঘটনা ঘটিয়া গেল, যাহাতে কার্ত্তিক শৈলর নিকট আরও দুর্ব্বোধ্য হইয়া উঠিল। ন্যায়রত্নের পত্নী মনোরমা দেবী বহু দিন হইতে রোগে ভুগিতে ছিলেন। শৈলজা নানা উপায়ে

তাঁহাকে সুস্থ করিবার চেষ্টা করিতেছিল। কিন্তু তিনি কিছুতেই সুস্থ হইলেন না, পুত্রের নিষ্ঠুর ব্যবহারে মার প্রাণ একেবারে ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। ক্রমশঃ তিনি শয্যাগ্রহণ করিলেন এবং পরিশেষে একদিন আর দেরী নাই বুঝিয়া স্বামীর পদধূলি গ্রহণ করিয়া শৈলকে বলিলেন, "বৌমা, আজ আমার শেষ দিন, আজ যদি একবার সে হতভাগাকে দেখ্‌তে পেতুম, তাহলে মনে আর কোন ক্ষোভ থাক্‌ত না।"

শৈলজা তাহার স্বামীকে বহু অনুনয়, বিনয় করিয়াও শ্বশ্রূঠাকুরাণীর নিকটে আনিতে পারে নাই। কিন্তু আজ সে দৃঢ় স্বরে বলিল, "মা, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, আজ তিনি আস্‌বেন।" শৈল কার্ত্তিকের নিকটে গিয়া সব কথা বর্ণনা করিয়া বলিল, "আজ তোমায় তাঁর এই শেষ মুহূর্ত্তে যেতেই হবে। সর্ব্ব-দাদা তাঁর সব কাজ ফেলে যখন আজ পাঁচ দিন থেকে মার কাছে এসে বসে আছেন, তখন তুমি তাঁর একমাত্র সন্তান হয়ে মার কাছে তাঁর এ শেষ মুহূর্ত্তেও যাবে না? না, তুমি এত নীচ নও।"

কার্ত্তিক কহিল, "আমি যে অন্ধ, আমি যে কাকেও আর দেখ্‌তে পাচ্ছিনে, মার কাছে কেমন করে যাব?"

শৈল কহিল, "এস, আমি তোমার হাত ধরে নিয়ে যাব। যদি তুমি অন্ধই হয়ে থাক, তবু আমার চক্ষুই তোমার চক্ষু হবে।"

কার্ত্তিক পরম স্নেহে আজ জীবনে এই প্রথম তাহার স্ত্রীর হাত ধরিয়া বলিল, "আমার হাত ধরে তুমি কেমন করে সকলের সুমুখে রাস্তা দিয়ে যাবে?"

শৈল কহিল, "যার স্বামী অন্ধ, তার আবার লজ্জা কি! এস, আমি তোমার হাত ধরে নিয়ে যাব।"

কার্ত্তিক সত্যই পত্নীর হস্ত অবলম্বন করিয়া নিমীলিত নেত্রে মাতৃ-

সন্নিধানে উপস্থিত হইল; গিয়া বলিল, "মা, তোমার অন্ধ ছেলে এত দিন পথ দেখ্‌তে পায়নি বলে, কেউ তোমার কাছে আমায় পথ দেখিয়ে আনে নি বলে আস্‌তে পারে নি। আজ সে এসেছে। কি বল্‌তে চাও, বল।"

কার্ত্তিকের মুখের দিকে চাহিয়া মৃত্যুশয্যায় শায়িতা মা কাঁদিয়া উঠিলেন। কার্ত্তিক হাসিয়া বলিল, "কাঁদ্‌ছ কেন মা? আমি ত সুস্থ সবল শরীরে বেঁচে রইলুম। ভয় কি, আমার ১০৮ বৎসর পরমায়ু কোষ্ঠীতে লেখা আছে।"

সর্ব্বানন্দ ক্রুদ্ধ স্বরে বলিল, "মার এমন অবস্থা দেখেও যে সন্তান তাঁর শেষ সময়েও উপহাস করতে আসে—"

কার্ত্তিক কহিল, "তার শাস্তি আজীবন অন্ধতামিস্র নরকে বাস। ভয় কি সর্ব্ব-দা, তাই ত আমার হচ্ছে। মা, তুমি কি অভিশাপ দেবে, দাও।"

মাতা ক্ষীণ অশ্রুরুদ্ধ স্বরে বলিলেন, "আমার কাছে আয়, কার্ত্তিক—"

কার্ত্তিক বলিল, "কোথায় তুমি—আমি যে দেখ্‌তে পাচ্ছি নে।" শৈলজা তাহার হাত ধরিয়া শাশুড়ীর কাছে বসাইয়া দিল। মাতা পুত্রের বুকে হাত দিয়া বলিলেন, "বাবা, এই শেষ সময় আশীর্ব্বাদ কর্‌তে চাচ্ছি, আমার আশীর্ব্বাদ নিবি নে?"

কার্ত্তিক কহিল, "মা, আশীর্ব্বাদ কর, যেন এ চর্ম্ম চক্ষে আর না তোমায় দেখ্‌তে হয়।"

মনোরমা দেবী কহিলেন, "চোখ চেয়ে ফেল্ বাবা, তা হলেই দেখ্‌বি, সব পরিষ্কার হয়ে গেছে। নিজের চোখ নিজে বন্ধ করে রাখ্‌লে কে তোকে চোখ দেবে, বল্? আমি আশীর্ব্বাদ কর্‌ছি, আবার তুই সুস্থ হবি, আবার তুই আগেকার মত হবি।"

কার্ত্তিক হাসিয়া বলিল, "মা, তোমার কথা কবে সফল হবে!

কবে আবার আমি সংসারকে আমার সেই পুরোনো চোখে দেখ্‌তে পাব! কবে এই ভয়ঙ্কর বন্ধন, অন্ধকারের বন্ধন কেটে যাবে!"

মনোরমা কহিলেন, "যে দিন তুই নিজের জোরে সব ঘোর কাটিয়ে ফেল্‌বি।"

কার্ত্তিক কহিল, "তা পার্‌ব না মা, আমার হাত-পা বাঁধা। তোমরা যে বাঁধন বেঁধে দিয়েছ, তা যে বাপ-মায়ের বত্রিশ নাড়ীর বন্ধন, কে তাকে ছিঁড়্‌তে পার্‌বে?"

মনোরমা দেবী উত্তেজিত হইয়া বলিলেন, "কি, আমরা তোকে যে বাঁধনে বেঁধে দিয়েছি, তাতেই তোকে অন্ধ করেছি! ওরে সে বন্ধন যেন তোর অক্ষয় হয়! ওরে অন্ধ, যে দিন বুঝ্‌তে পার্‌বি যে কি আলো তোর চোখের সাম্‌নে ধরে দিয়েছি, সেই দিনই তোর সব ঘোর কেটে যাবে। তুই যদি নিজে চোখ বুজে থাকিস্‌, তাহলে কি করে সে আলো দেখ্‌তে পাবি?"

কার্ত্তিক কহিল, "মা, আমি আলো চাই নে, আমি যে অন্ধকারই চাই।"

মনোরমা কি বলিতে যাইতেছিলেন, এমন সময় শিবচন্দ্র সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া বলিলেন, "স্বকর্ম্মফলভুক্‌ পুমান্‌, মনোরমা, হরি নাম কর, কি যা-তা এ সময় বক্‌ছ? নারায়ণ বল, হরি বল!" মনোরমা চক্ষু মুদ্রিত করিয়া বলিলেন, "মা দুর্গা, কোলে নে মা। গঙ্গা-নারায়ণ-ব্রহ্ম।"

শ্রীভগবানের মধুর নাম শ্রবণ করিতে করিতে পতি-পুত্রের সম্মুখে মনোরমা দেবী দেহ ত্যাগ করিলেন। শ্মশানে তাঁহার দেহ ভস্ম হইয়া গেলে কার্ত্তিক বিকট স্বরে হাসিয়া বলিল, "মা, এইবার তুমি আমার অন্ধকারের দেশে গিয়েছ, এবার থেকে সর্ব্বক্ষণ তুমি আমায় দেখ্‌তে

পাবে। দেহ কিছুই না, ছাই যার অবশিষ্ট থাকে, তা নিয়ে কি হবে? তুমি ছাইয়ের দেহ ছেড়ে যে দেহ নিয়েছ, তাই তোমার যথার্থ দেহ।"

কার্ত্তিক পাগলের মত ছাই উড়াইয়া তাহারই এক অঞ্জলি এক-টুক্‌রা ছিন্ন বস্ত্রখণ্ডে বাঁধিয়া লইয়া গৃহে ফিরিয়া আসিল।

৬

শশিভূষণ হঠাৎ সর্ব্বানন্দর পত্র পাইয়া অভিভূত হইয়া পড়িল। সর্ব্বানন্দ লিখিয়াছে, "ঠাকুরদা, সর্ব্বনাশ হইয়াছে। কার্ত্তিক আমাদের বুঝি-বা অন্ধ হইয়া যায়! খুড়িমার মৃত্যুর দিন তাহার যে মূর্ত্তি দেখিলাম, তাহা জীবনে ভুলিব না। এখানে আসিয়া শুনিলাম, সে কিছু দিন হইতে দিনে একটা অন্ধকার ঘরের মধ্যে বসিয়া থাকে, রাত্রে বাহির হইয়া সংসারের কাজকর্ম্ম দেখে। বৈষয়িক কোন গোলমাল এখনও দেখা দেয় নাই বটে, কিন্তু যাহার বিষয়, সে এরূপ হইলে পরে যে কি ঘটিবে, তাহা কে বলিতে পারে? সে এতদিন পর্য্যন্ত তাহার মার সঙ্গে দেখাই করে নাই, কিন্তু খুড়িমার মৃত্যুকালে সে চক্ষু মুদিয়া শৈলর হাত ধরিয়া আসিয়া মার কাছে দাঁড়ায়। তখন-পর্য্যন্ত মনে করিতে-ছিলাম যে এ সমস্তই সয়তানী; কিন্তু খুড়িমার মুখাগ্নি করিয়া সে যখন বিকট হাস্য করিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল, তখন বুঝিলাম যে তাহার কিছুই কৃত্রিম নয়। সে যখন হাতড়াইতে হাতড়াইতে নদীতীর হইতে উপরে আসিয়া বসিল, তখন তাহার চোখের সমস্ত দীপ্তি নিবিয়া গিয়াছে। ইচ্ছা করিয়া কি মানুষ অন্ধ হইতে পারে? ভাই, তোমার ত এ বিষয়ে অনেক পড়াশুনা আছে, কোথাও কি পড়িয়াছ যে মানুষ কেবলমাত্র ইচ্ছা দ্বারা অন্ধতা আনয়ন করিতেছে—কোন ঔষধের দ্বারা নয়? কোন ঔষধের সাহায্যে যদি ইহা ঘটিয়া

থাকে, তাহা হইলে এই বেলা সাবধান হইতে হইবে। কিন্তু আমি সেদিন হইতে তাহার সমস্ত ঘর সমস্ত বাক্স-আলমারি-সিন্দুক পাতি-পাতি করিয়া খুঁজিয়াছি, যে লোকটী সর্ব্বদা তাহার নিকট থাকে, তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছি, কিন্তু কেহই বলিতে পারিল না যে, চুপ করিয়া বসিয়া থাকা ছাড়া সে অন্য কিছু করে। অথচ স্পষ্টই বুঝিতে পারা যাইতেছে যে কার্ত্তিক দিবসে ক্ষীণদৃষ্টি, কিন্তু রাত্রে তাহার অন্য ভাব। পূর্ণ তেজে সে সমস্ত কাজ তখন দেখা-শুনা করে, কৃত্রিম আলোয় তার দৃষ্টি সম্পূর্ণ স্বাভাবিক, সম্পূর্ণ সুস্থ। কিন্তু দিন আসিলেই সে যেন ভীত হইয়া একটা অন্ধকার ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া চুপচাপ বসিয়া থাকে। তাহাকে বাহিরে আনিবার চেষ্টা করিয়া দেখিয়াছি, সে বাহিরে আনিবার কথাতেই কাঁপিতে থাকে। নিতান্ত বাধ্য হইয়া বাহিরে আসিলে সে যেমন ত্রস্তভাবে হাত চাপিয়া ধরে, তাহাতে ভয় হয় যেন সে প্রতি পদক্ষেপেই পড়িয়া যাইবার ভয় করিতেছে। এ কি হইল, ভাই? সে এ কি করিয়া বসিল? আমি যে আর তাকে এক মুহূর্ত্তও ছাড়িয়া থাকিতে পারি না। ঠাকুরদা, কি করিব? কি উপায়ে কার্ত্তিকের চক্ষু দু'টী ফিরিয়া পাইব?"

শশিভূষণ পত্র পড়িয়া উত্তেজিতভাবে আপনার কক্ষমধ্যে পদচারণ করিতে লাগিল। সহসা পরক্ষণেই কি মনে করিয়া তাহার সেই গোপন কক্ষের দ্বার খুলিয়া মৃতা পত্নীর তৈলচিত্রের সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল। অন্ধকারে ঠিক তাহা দেখা যাইতেছিল না বলিয়া সে দরজা-জানালা খুলিয়া দিল। তবু দেখা যায় না! শশিভূষণ নেত্র মার্জ্জনা করিয়া চাহিয়া দেখিল, মূর্ত্তি যেন হাসিতেছে। সে মনে মনে বলিল, অন্ধতার এত আকর্ষণ! আজ কত বৎসর হল তুমি গিয়েছ, তবু তোমার ঐ অন্ধ নয়ন আমায় বেঁধে রেখেছে। কি দৃঢ় বন্ধন! কি ভীষণ আকর্ষণ!

চোখের আড়ালে গিয়েছ, তবু তোমার এত শক্তি! তোমায় এ জন্মে আর পাব না, তাই কি তোমার বন্ধন এত দৃঢ়? মৃত্যুর আড়ালে যে তোমার অশ্রুত বাণী, তোমার অলক্ষ্য দৃষ্টি আমায় মরণ-বন্ধনে বেঁধে রেখেছে। নড়বার-চড়বার শক্তি আর আমার নেই! হাতের গোড়ায় থাক্‌লে, বুকের অতি-কাছে থাক্‌লে হয়তো তোমায় এমন করে চাইতুম না, হয়তো তোমায় অবজ্ঞাই কর্‌তুম। কিন্তু এখন তুমি অপ্রাপ্য, এখন তুমি দুর্ল্লভ, তাই তোমার আশায় বসে আছি। পাব না, জানি, তবু পেতে চাই। এ এক অদ্ভুত প্রহেলিকা!

শশিভূষণ আবার সমস্ত দরজা-জানালা বন্ধ করিল; তারপর তাহার অন্ধ বিদ্যালয়ে চলিয়া গেল। কিন্তু সেখানেও আজ সে কোন আনন্দ পাইল না। তাহার কেবলি মনে হইতে লাগিল, জগতের সমস্ত আলো যেন নিবিয়া অন্ধকারে মিশিয়া যাইতে চাহিতেছে। আর সেই অন্ধকারের মধ্য হইতে একটী করুণ ধ্বনি কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিতেছে, "আলো, ওগো আলো!"

শশিভূষণ উদাস মনে সমস্ত দিন ঘুরিয়া ফিরিয়া সন্ধ্যার পর শ্বশ্রু-ঠাকুরাণীর গৃহের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। কিন্তু দ্বারের কড়া ধরিয়া টানিতে গিয়া তাহার হাত কাঁপিয়া উঠিল; একটা অজ্ঞাত আশঙ্কা তাহাকে আক্রমণ করিতেই সে সরিয়া গলির অপর পার্শ্বে গিয়া দাঁড়াইয়া শুনিবার চেষ্টা করিল, উপরে কোনরূপ শব্দ হয় কি না। না, কোন ভীতি-জনক শব্দ নাই, সমস্তই শান্ত, সমস্তই আগেকার মত। শশিভূষণ সবলে সকল দ্বিধা দূর করিয়া কড়া ধরিয়া টানিয়া দ্বার খুলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল।

সমস্তই সেইরূপ আছে! সেই আলো, সেই ফুল, সেই শোভা, সেই গন্ধ! তবু যেন কোথায় কে কাঁদিতেছে! শশিভূষণ দ্রুত পাদক্ষেপে

থাকে, তাহা হইলে এই বেলা সাবধান হইতে হইবে। কিন্তু আমি সেদিন হইতে তাহার সমস্ত ঘর সমস্ত বাক্স আলমারি-সিন্দুক পাতি-পাতি করিয়া খুঁজিয়াছি, যে লোকটী সর্ব্বদা তাহার নিকট থাকে, তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছি, কিন্তু কেহই বলিতে পারিল না যে, চুপ করিয়া বসিয়া থাকা ছাড়া সে অন্য কিছু করে। অথচ স্পষ্টই বুঝিতে পারা যাইতেছে যে কার্ত্তিক দিবসে ক্ষীণদৃষ্টি, কিন্তু রাত্রে তাহার অন্য ভাব। পূর্ণ তেজে সে সমস্ত কাজ তখন দেখা-শুনা করে, কৃত্রিম আলোয় তার দৃষ্টি সম্পূর্ণ স্বাভাবিক, সম্পূর্ণ সুস্থ। কিন্তু দিন আসিলেই সে যেন ভীত হইয়া একটা অন্ধকার ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া চুপচাপ বসিয়া থাকে। তাহাকে বাহিরে আনিবার চেষ্টা করিয়া দেখিয়াছি, সে বাহিরে আনিবার কথাতেই কাঁদিতে থাকে। নিতান্ত বাধ্য হইয়া বাহিরে আসিলে সে যেমন ত্রস্তভাবে হাত চাপিয়া ধরে, তাহাতে ভয় হয় যেন সে প্রতি পদক্ষেপেই পড়িয়া যাইবার ভয় করিতেছে। এ কি হইল, ভাই? সে এ কি করিয়া বসিল? আমি যে আর তাকে এক মুহূর্ত্তও ছাড়িয়া থাকিতে পারি না। ঠাকুরদা, কি করিব? কি উপায়ে কার্ত্তিকের চক্ষু দু'টী ফিরিয়া পাইব?"

শশিভূষণ পত্র পড়িয়া উত্তেজিতভাবে আপনার কক্ষমধ্যে পদচারণ করিতে লাগিল। সহসা পরক্ষণেই কি মনে করিয়া তাহার সেই গোপন কক্ষের দ্বার খুলিয়া মৃতা পত্নীর তৈলচিত্রের সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল। অন্ধকারে ঠিক তাহা দেখা যাইতেছিল না বলিয়া সে দরজা-জানালা খুলিয়া দিল। তবু দেখা যায় না! শশিভূষণ নেত্র মার্জ্জনা করিয়া চাহিয়া দেখিল, মূর্ত্তি যেন হাসিতেছে। সে মনে মনে বলিল, অন্ধতার এত আকর্ষণ! আজ কত বৎসর হল তুমি গিয়েছ, তবু তোমার ঐ অন্ধ নয়ন আমায় বেঁধে রেখেছে। কি দৃঢ় বন্ধন! কি ভীষণ আকর্ষণ!

চোখের আড়ালে গিয়েছ, তবু তোমার এত শক্তি! তোমায় এ জন্মে আর পাব না, তাই কি তোমার বন্ধন এত দৃঢ়? মৃত্যুর আড়ালে যে তোমার অশ্রুত বাণী, তোমার অলক্ষ্য দৃষ্টি আমায় মরণ-বন্ধনে বেঁধে রেখেছে। নড়বার-চড়বার শক্তি আর আমার নেই! হাতের গোড়ায় থাক্‌লে, বুকের অতি-কাছে থাক্‌লে হয়তো তোমায় এমন করে চাইতুম না, হয়তো তোমায় অবজ্ঞাই কর্‌তুম। কিন্তু এখন তুমি অপ্রাপ্য, এখন তুমি দুর্লভ, তাই তোমার আশায় বসে আছি। পাব না, জানি, তবু পেতে চাই। এ এক অদ্ভুত প্রহেলিকা!

শশিভূষণ আবার সমস্ত দরজা-জানালা বন্ধ করিল; তারপর তাহার অন্ধ বিদ্যালয়ে চলিয়া গেল। কিন্তু সেখানেও আজ সে কোন আনন্দ পাইল না। তাহার কেবলি মনে হইতে লাগিল, জগতের সমস্ত আলো যেন নিবিয়া অন্ধকারে মিশিয়া যাইতে চাহিতেছে। আর সেই অন্ধকারের মধ্য হইতে একটী করুণ ধ্বনি কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিতেছে, "আলো, ওগো আলো!"

শশিভূষণ উদাস মনে সমস্ত দিন ঘুরিয়া ফিরিয়া সন্ধ্যার পর শ্বশ্রু-ঠাকুরাণীর গৃহের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। কিন্তু দ্বারের কড়া ধরিয়া টানিতে গিয়া তাহার হাত কাঁপিয়া উঠিল; একটা অজ্ঞাত আশঙ্কা তাহাকে আক্রমণ করিতেই সে সরিয়া গলির অপর পার্শ্বে গিয়া দাঁড়াইয়া শুনিবার চেষ্টা করিল, উপরে কোনরূপ শব্দ হয় কি না। না, কোন ভীতি-জনক শব্দ নাই, সমস্তই শান্ত, সমস্তই আগেকার মত। শশিভূষণ সবলে সকল দ্বিধা দূর করিয়া কড়া ধরিয়া টানিয়া দ্বার খুলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল।

সমস্তই সেইরূপ আছে! সেই আলো, সেই ফুল, সেই শোভা, সেই গন্ধ! তবু যেন কোথায় কে কাঁদিতেছে! শশিভূষণ দ্রুত পাদক্ষেপে

উপরে গিয়া দেখিল, সব একইভাবে চলিতেছে। সুকুমারী তাহার সন্ধ্যার কর্ম্ম সারিয়া চিন্ময়ীর নিকটে বসিয়া গল্প করিতেছে; সরোজ সেই একইভাবে উপরের ছাদে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। শশিভূষণ উপরে সরোজের কাছে গিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "সরোজ, আজ তুমি ভাল আছ ত?"

সরোজ বিস্মিত হইয়া বলিল, "কেন শশীদা, ও কথা জিজ্ঞাসা কর্‌লে কেন? তোমার গলার আওয়াজ এত ভয়ের মত শোনাল কেন? কি হয়েছে, শশীদা? সর্ব্বদার চিঠি পেয়েছ ত? ওঁর খুড়িমা কেমন আছেন?"

শশী কোন উত্তর দিল না দেখিয়া সরোজ তাহার হস্ত স্পর্শ করিল, তারপর কাতরভাবে বলিল "তুমি অমন করে এসে দাঁড়ালে কেন? বল, তোমার পায়ে পড়ি, কি হয়েছে, বল?"

শশী কহিল, "কিছু হয়নি সরোজ, কেবল কার্ত্তিক—তুমি আজ ভাল ছিলে ত? তোমার—"

সরোজ উদ্বিগ্নভাবে বলিল, "তাঁর কি হয়েছে, বল। আমি ভালই আছি।"

শশী কহিল, "আঃ, বাঁচলুম। এ তাহ্‌লে তার নিজের দোষ। তুমি তাকে কিছু কর নি, তুমি মনে মনে তাকে আকর্ষণ করে, তার চিন্তা করে তোমার অন্ধতা তাকে দাওনি? আঃ বাঁচ্‌লুম, সরোজ, তোমার কোন দোষ নেই জেনে বাঁচ্‌লুম আমি।"

সরোজ কহিল, "আমি যে তোমার একটা কথাও বুঝ্‌তে পার্‌ছি না। কে অন্ধ হয়েছে? তুমি পাগলের মত কি বল্‌ছ?"

শশী বলিল, "আমি আজ পাগলের মত হয়ে গিয়েছি, সরোজ। আজ আমার সারাদিন মনে হয়েছে যে তুমি তার জন্য কেঁদে কেঁদে

তাকেও অন্ধ করে দিলে। কেন বল্‌তে পারিনে, আমার আজ কেবলি মনে হয়েছে যে তুমিই কার্ত্তিকের এই অন্ধতার কারণ, তুমিই—"

সরোজ বাধা দিয়া কহিল, "চুপ কর, তিনি অন্ধ হয়েছেন কি করে জান্‌লে ?"

শশী কহিল, "সর্ব্বর চিঠিতে জান্‌লুম।"

সরোজ কহিল, "কি লিখেছেন তিনি ?"

শশী পত্রের স্থূল মর্ম্ম তাহাকে জানাইল। সরোজ সমস্ত শুনিয়া বলিল, "শশিদা, আমায় নীচে নিয়ে চল।" শশিভূষণ সরোজের হাত ধরিয়া নিম্নতলে তাহার কক্ষে লইয়া গিয়া তাহাকে শয্যায় বসাইয়া দিল; তারপর তাহার শ্বশ্রুঠাকুরাণীর কাছে চলিয়া গেল।

সরোজ কিন্তু কাঁদিল না, কাঠের মত শয্যার উপর বসিয়া রহিল। কিছুক্ষণ পরে সুকুমারী আসিয়া দ্বার হইতে বলিল, "মা তোমায় ডাক্‌ছেন, সরোদি।" সরোজ সে কথা শুনিতে পাইল না। তাহার নিকট হইতে কোন উত্তর না পাইয়া সুকুমারী ভাবিল, সরোজ সে ঘরে নাই। সে শশিভূষণের নিকটে গিয়া বলিল, "কৈ, সরোদি ত তার ঘরে নেই।" শশিভূষণ ব্যস্ত হইয়া সেই কক্ষে আসিয়া দেখিল, সরোজ সেই একই ভাবে বসিয়া আছে। শশী তাহার নিকটে গিয়া মৃদু স্বরে ডাকিল, "সরোজ।" সরোজ নির্ব্বাক, নিষ্পন্দ। শশিভূষণ ব্যস্ত হইয়া তাহাকে নাড়া দিয়া বলিল, "সরোজ, বোন, অমন করে বসে রইলে যে!" সরোজ হঠাৎ চীৎকার করিয়া বলিল, "ছেড়ে দাও, এক মুহূর্ত্তের জন্য আমায় মুক্তি দাও।" শশিভূষণ সরোজের সংজ্ঞাহীন দেহ শয্যায় শোয়াইয়া দিল; এবং তাহার চীৎকারে চিন্ময়ীও সুকুমারীর সঙ্গে সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া সরোজের শুশ্রূষায় নিযুক্ত হইলেন।

ডাক্তার আসিল, নানারূপ সেবাশুশ্রূষা চলিল, কিন্তু সমস্ত রাত্রি ধরিয়া সরোজের ভাল করিয়া সংজ্ঞা হইল না। মাঝে মাঝে চীৎকার করিয়া সে বলে, 'আলো দাও, দৃষ্টি দাও' তারপর আবার মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে। এইভাবে সারারাত্রি কাটাইয়া ভোরের দিকে সরোজ কতকটা সুস্থ হইল এবং দিনের আলোর সঙ্গে সঙ্গে তাহার সমস্ত রোগের উপশম হইল। তাহাকে সুস্থভাবে ঘুমাইতে দেখিয়া শশিভূষণ বাহিরে চলিয়া গেল।

দ্বিপ্রহরে সুকুমারী সরোজকে ধরিয়া বসিল, "কি হয়েছিল, বল্‌তেই হবে।"

সরোজ হাসিয়া বলিল, "কিচ্ছু হয়নি ভাই, শশীদা আমায় ভয় দেখিয়েছিল।"

সুকু বলিল, "ভয় দেখিয়েছিল! কিসের ভয়?"

সরোজ কহিল, "তা না হয় নাই শুন্‌লে।"

সুকু কহিল, "কেন, আমি শুন্‌লে কি কিছু হানি হবে?"

সরোজ কহিল, "আর কারও হোক না হোক, তোমার হতে পারে।"

সুকু কহিল, "আমার কি ক্ষতি হবে! তুমি বল, আমি শুন্‌ব।"

সরোজ কহিল, "না সুকু, তোমার শুনে কাজ নেই।"

সুকু কহিল, "তুমি যদি শুন্‌তে পার ত আমি শুন্‌তে পাব না কেন? তোমার পায়ে পড়ি, বল, তুমি কেন ভয় পেয়েছিলে?"

সরোজ কহিল, "শশীদা বল্‌ছিল, যে অন্ধ, সে যদি মনে-মনে কারও কথা বেশী চিন্তা করে, তা হ'লে সে লোকটিও না কি অন্ধ হয়ে যেতে পারে। অন্ধতাও না কি কতকটা ছোঁয়াচে। কিন্তু ও-সব মিছে কথা, আমি ডাক্তার বাবুকে বেশ করে জিজ্ঞেস করে নিয়েছি যে অন্ধতা ছোঁয়াচেও নয়, আর অন্ধ যদি কাউকে চিন্তা

করে, তাহলে সে লোকটিও যে অন্ধ হয়ে যাবে, তারও কোন মানে নেই। অন্ততঃ ডাক্তারি শাস্ত্রে এমন ঘটনার একটীও উদাহরণ নেই।"

সুকুমারী বলিল, "কিন্তু যা কখনও ঘটেনি, তাও ত ঘট্‌তে পারে। যদি শশীদার কথাই সত্য হয়, তাহলে—"

সরোজ কহিল, "তাহলে কি সুকু?"

সুকুমারী বলিল, "তাহলে শশীদাদের আর আমাদের কাছে আস্‌তে দেওয়া উচিত নয় ত!"

সরোজ কহিল, "সব রোগেই টিকে দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। শশীদা অনেক দিন থেকে অন্ধ মানুষ ঘাঁট্‌ছেন; অন্ধ-রোগের টিকে ওঁর হয়ে গিয়েছে। এতদিন যখন ওঁর কিছু হয় নি, তখন ওঁর বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাক্‌তে পার।"

সুকুমারী বলিল, "কিন্তু—আর যাঁরা অন্ধ ইস্কুলে কাজ কর্‌ছেন?"

সরোজ কহিল, "তাঁরা ভগবানের উপর নির্ভর করে অনাথ-অন্ধদের উপকার কর্‌ছেন। তাঁদের কিছুই হবে না, বিশেষতঃ তাঁরা দু-চার ঘণ্টা মাত্র অন্ধদের সঙ্গে থাকেন!"

সুকুমারী বলিল, "কিন্তু যিনি প্রায় সারাদিনই আমাদের কাছে থাকেন?"

সরোজ কহিল, "কোন ভয় নেই, সুকু, অন্ধতা ছোঁয়াচে নয়, আমি ডাক্তার বাবুকে জিজ্ঞাসা করেছি। শশীদাও বলেছে, সেও কোন বইয়ে এ-রকম কোন রোগের কথা পড়েনি।"

সুকুমারী বলিল, "তাহলে তুমি এত ভয় পেয়েছিলে কেন?"

সরোজ কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া শেষে সুকুমারীকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "তোমার যেমন এমন একটা কথা আছে, যে কথা সকলকে বল্‌তে পার না, সেই রকম আমারও একটা কথা আছে।"

সুকুমারী বলিল, "আমার ত কোন কথাই তোমার অজানা নেই ; আর কারও কাছে গোপন থাক্‌লেও তোমার কাছে ত আমি কিছুই গোপন করি নি, সরোদি, তবে তুমি কেন আমায় তোমার কথা বল্‌বে না ?"

সরোজ বলিল, "না সুকু, না, সে কথা শুনে কাজ নেই। তোমার কথার মধ্যে শুধু আনন্দ, শুধু সুখ, আমার কথার মধ্যে কেবলই দুঃখ।"

কিন্তু সুকুমারী ছাড়িল না ; তখন সরোজ বাধ্য হইয়া সব কথা তাহাকে শুনাইল। সুকুমারী শুনিতে শুনিতে বলিল, "কার্ত্তিকদাকে আমার বেশ মনে আছে। কিন্তু তিনি ত দু'-তিন মাসের বেশী এখানে ছিলেন না, এরই মধ্যে এত বড় একটা ঘটনা ঘটে গিয়েছিল যে তার জের এখনও এমন ভাবে চল্‌ছে ! আশ্চর্য্য ! আর সে কথা আমরা কেউ ঘুণাক্ষরেও টের পাই নি ! মাও বোধ হয় এর কিছু জানেন নি ?

সরোজ কহিল, "মা একা কেন ? এমন যে ঘট্‌তে পারে, তা আমিই নিজের কাছে স্বীকার কর্‌তুম না। কিন্তু সংসারে অঘটনও বিস্তর ঘটে। জানিনে, তিনি আমার মধ্যে কি পেয়েছিলেন যে, আজ এমন করে আমায় পাগল করে দেবার চেষ্টা কর্‌ছেন। আমি তাঁরই ভয়ে অন্তরে-বাইরে আপনাকে গোপন করে রেখেছি ! তবু দূর থেকে তিনি এক ভয়ানক আকর্ষণে আমায় টান্‌ছেন ! সুকু, তুমি বুঝ্‌তে পার্‌বে না যে আজ প্রায় ছ' বৎসর ধরে আমি অন্তরে অন্তরে কি আকর্ষণই অনুভব করেছি ! তবু প্রাণপণে সেই নীরব আকর্ষণের বিরুদ্ধেই আমি যুদ্ধ ক'রে এসেছি। কেউ এ কথা বুঝ্‌তেই পার্‌বে না, কেউ এ কথা হয়ত বিশ্বাসও কর্‌বে না। যেদিন তিনি আমার কাছ থেকে চলে যান, সে দিন বলে গিয়েছিলেন যে 'তুমি আমার পক্ষে যতই দুর্লভ হয়ে গেলে, ততই তুমি আমায় বেঁধে

ফেল্লে।' সে কথার মধ্যে কতখানি সত্য ছিল, কাল আমি তা স্পষ্ট অনুভব করেছি। সেই লোকটির কতখানি শক্তি আছে, তা কাল এক নিমেষে বুঝেছি। তিনি কাল এক নিমেষে আমার সমস্ত অস্তিত্বটাকে এমন জোরে নাড়া দিয়ে গেছেন যে সমস্ত রাত কেবলি আমার মনে হয়েছে, তিনি আমার অন্তরের ঠিক মাঝখানটিতে বসে আমার প্রাণটাকে দু' হাতের মধ্যে চেপে ধরে পিষ্‌ছেন। এত দূরে থেকেও যিনি এতখানি শক্তি প্রয়োগ কর্‌তে পারেন,—জানি না, কাছে থাক্‌লে তিনি আমায় কি কর্‌তেন! তাঁকে এখন আমার এত ভয় হয়েছে যে যদি পৃথিবীর অপর প্রান্তে যাই, তবুও তিনি বোধ হয় মনে কর্‌লেই আমায় সেখান থেকে টেনে আন্‌তে পার্‌বেন! এখন আমার একমাত্র ভয়, কি ক'রে নিজেকে আমি তাঁর কাছ থেকে রক্ষা কর্‌ব, কি ক'রে তাঁর কাছ থেকে দূরে থাক্‌ব!"

সুকুমারী বলিল, "ওঃ, তাই বুঝি কাল তুমি মাঝে-মাঝে 'ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও' বলে চেঁচাচ্ছিলে। আমরা কেউ বুঝ্‌তেই পারিনি যে কেন ও কথা তুমি বল্‌ছিলে, আর কাকে উদ্দেশ করেই বা বল্‌ছিলে। আচ্ছা, তাহ্‌লে তুমি তাঁকে একদিনের জন্যও ভুল্‌তে পার্‌ছ না কেন? যদি তাঁর কাছ থেকে পালাতেই চাও, তবে এ তোমার কিসের আকর্ষণ? তুমি তাঁকে চাও না, তবু তাঁর অন্ধ হবার আশঙ্কায় একেবারে এমন হয়ে গেলে কেন?"

সরোজ কহিল, "সুকু, যে ভালবাসা মানুষকে এমন অশান্ত করে তোলে, সে ভালবাসাই নয়, রাক্ষসের ক্ষুধা। যে বাসনার তাড়নায়, কামনায়, উত্তেজনায় মানুষ নিজেকে এমন করে ছিঁড়ে-খুঁড়ে নষ্ট কর্‌তে চায়, সে যে মরণোন্মুখ রোগীর দুষ্ট ক্ষুধা! এ ত ভালবাসা নয়, এ যে ডাকাতের অত্যাচার!"

সুকুমারী বলিল, "না দিদি, এ তোমার অন্যায় সন্দেহ। তোমার পায়ে পড়ি, তুমি কার্ত্তিক দাদার অত অপমান করো না। তিনি ত তোমার কাছে আর একদিনও আসেন নি, তিনি ত তোমার কাছে 'দাও, দাও' বলে ভিক্ষে চাইতে আসেন নি। তিনি নিজেকে অমিতব্যয়ীর মত বিলিয়ে দিচ্ছেন, এই তাঁর অপরাধ। তুমি বাইরে যতই ঔদাসীন্য দেখাও, তোমার কালকের ব্যাপারে স্পষ্ট বুঝতে পেরেছি যে তোমার অন্তরাত্মা জানে, কার্ত্তিকদা তোমায় তাঁর প্রাণ দিয়ে চাচ্ছেন,—তাই তুমি কাল এত ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলে।"

সরোজ বলিল, "সুকু, তোর পায়ে পড়ি, তুই ও কথা বলিস্‌নে। তার চেয়ে বল্ যে তার সব মিথ্যে! সে আমায় চায় না, সে আমায় ডাক্‌ছে না, সে আমার জন্য জগৎ-সংসার অন্ধকারে ডুবিয়ে দিচ্ছে না। সে কেবল একটা দুর্বৃত্ত ইচ্ছার বশে আমাকে তার পায়ের কাছে টেনে নিয়ে গিয়ে লুটিয়ে দেবার চেষ্টায় আছে। বল্ যে সমস্তই তার দুষ্টুমি, কেবল আমাকে হারাবার জন্য এই ভয়ঙ্কর মায়াজাল বিস্তার করেছে। বল্, ওর কিছুই সত্য নয়।"

সুকুমারী কাঁদিয়া বলিল, "না—কখনই না! এত ভালবাসা মিথ্যে নয়, মায়া নয়, মোহ নয়। এ জীবন্ত স্নেহ, এ স্নেহ এ আকর্ষণ যে উপেক্ষা করে, সে প্রেমময় হরিকেও উপেক্ষা করে। এ স্নেহ যদি উপেক্ষা কর, তাহলে বল্‌ব, তুমি ভিতরে-বাইরে অন্ধ হয়েছ, তোমার ভিতরে-বাইরে অন্ধকার। আমি তা পার্‌ব না, সরোদি, আমি স্নেহকে বিশ্বাস করে নিঃসন্দেহে তাকে বুকে ধরে রাখ্‌ব।"

৭

শিবরামপুর এষ্টেটের ম্যানেজার মিষ্টার চ্যাটার্জ্জি ওরফে মণিশঙ্কর অধুনা ম্যানেজার সাহেব সেক্রেটারিয়েট টেবিলের সম্মুখে বসিয়া চিঠিপত্র লিখিতেছিল। নিকটেই আন্‌লায় তাহার র‍্যাংকেনের বাড়ির কোটটি ঝুলিতেছিল। মণিশঙ্কর পেণ্টালুন, সার্ট এবং তদুপরি ওয়েষ্ট কোট-সমন্বিত অবস্থায় বসিয়া কাজ করিতেছিল। এমন সময় বেহারা আসিয়া সেলাম করিয়া বলিল, "হুজুর, ঘোড়া তৈয়ার।" হুজুর লেখা হইতে মুখ না তুলিয়াই বলিল, "রাইডিং কোট ও জুতি লেয়াও, আউর দেখো, সর্ব্ববাবু আয়েহেঁ কেয়া নেহি।" বেয়ারা ম্যানেজার সাহেবের ঘোড়ায় চড়ার প্রকাণ্ড জুতা, চাবুক ও কোট সেই কক্ষের পার্শ্বস্থিত একটা ক্ষুদ্র কক্ষ হইতে আনিয়া ইজি চেয়ারের উপর রাখিয়া দিয়া বাহিরে চলিয়া গেল; এবং পরক্ষণেই ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "হুজুর, বাবু সাহেব আয়ে হেঁ।"

সর্ব্বানন্দ সেই কক্ষে প্রবেশ করিতেই ম্যানেজার সাহেব উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "Oh, Sorba Babu, you are so late, আমায় এখুনি যেতে হচ্ছে।"

সর্ব্বানন্দ কহিল, "বাঃ, কাল রাত্রে কথা হল খাওয়া-দাওয়ার পর গেলেই বেশ হবে, এর মধ্যেই মত বদ্‌লালে?"

মণি বলিল, "সাহেব-সুবোর কাণ্ড কিছুই বোঝ্‌বার জো নেই। এই দেখ, এখুনি একটা চিঠি পেলুম যে ম্যাজিষ্ট্রেট না কি স্বয়ং কাকেও কিছু না জানিয়ে আজ বিকেলে চারটের সময় কমবকৎপুরে আস্‌বে। নায়েব লিখ্‌ছে যে আগে থেকে তৈরী না থাক্‌লে গোলে পড়্‌তে হবে।"

সর্ব্বানন্দ কহিল, "তা হলে আর আমার গিয়ে কি হবে? ম্যাজিষ্ট্রেট যদি নিজে মিটিয়ে দিতে আসে, তাহলে ত ভালই হবে। তুমি বল্‌ছ,

প্রজাদের উপর কোন অত্যাচার হচ্ছে না, অথচ তাহা মিছিমিছি খাজনা বন্ধ করেছে। তোমার কথা যদি সত্য হয়, তাহলে এত ব্যস্ত হবার ত কোন দরকার নেই।"

মণি কহিল, "Oh, silly! তুমি বুঝ্‌তে পার্‌ছ না যে আমাদের পক্ষ থেকে সমস্ত বুঝিয়ে দেবার জন্য কেউ না থাক্‌লে they will make a mess of everything. আমাদের একজনকে উপস্থিত থাক্‌তেই হবে। প্রজাদের সঙ্গে কতকগুলা rogues যোগ দিয়েছে, আর তারাই চেষ্টা করে প্রজাদের সরকারের কাছ থেকে agricultural loan নিইয়ে দিয়েছে। সেই জোরেই ত বেটারা লড়্‌ছে, না হলে কোন্ দিন সব শাসিত হয়ে যেত।"

সর্ব্বানন্দ কহিল, "তাহলে আজ আর আমি যাচ্ছি নে। যদি ম্যাজিষ্ট্রেট এসে মেটাতে না পারে, তা হ'লে নয় আর একদিন যাওয়া যাবে।"

মণি বলিল, "তা বেশ, আমি তাহলে চল্‌লুম। তুমি বাবুকে আমার কথা জানিয়ে বলো যে আমি সব ঠিক করে দেব।"

সর্ব্বানন্দ কহিল, "কিন্তু সাহেব, কোন রকম under-hand practice চালিয়ো না।"

মণি কহিল, "Oh, everything is fair in love and war."

সর্ব্বানন্দ হাসিতে হাসিতে বাহির হইয়া গেল। মণিশঙ্করও মুহূর্ত্ত-মধ্যে চাবুক হস্তে বাহির হইয়া অশ্বারোহণে প্রস্থান করিল।

সর্ব্বানন্দ কার্ত্তিকের নিকট যাইতেছিল, এমন সময়ে কার্ত্তিকের শিশু-পুত্র দেবীপ্রসাদ তাহাকে দেখিতে পাইয়া তাহার ভৃত্যের কোল হইতে হাত বাড়াইয়া "জ্যাতা যাব, জ্যাতা যাব" বলিয়া চীৎকার আরম্ভ করিল। জ্যাঠা মহাশয় তখন বাধ্য হইয়া তাহাকে ক্রোড়ে লইয়া

বলিলেন, "দেবু, তোর বাবাকে আজ যে টেনে বাইরে আনিস্ নি?" দেবু সজোরে তাহার ক্ষুদ্র মস্তক আন্দোলিত করিয়া বলিল, "বাবা যাব না, বেলাতে যাব।"

—"চল্ তোর বাবাকেও ধরে আনি।"

—"না, বাবা কাঁদ্‌বে, আছ্‌বে না।"

— "তুমি ডাক্‌লে আস্‌বে, লক্ষ্মী বাবা আমার, চল।"

সর্ব্বানন্দ কার্ত্তিককে তাহার অন্ধকার কোটর হইতে বাহির করিবার কোন উপায় না পাইয়া অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিল, এমন সময় সহসা একদিন দেবীপ্রসাদকে কোলে লইয়া কার্ত্তিকের অন্ধকার কক্ষে প্রবেশ করিবামাত্র কার্ত্তিক ব্যস্ত হইয়া বলিয়াছিল, "ও কি, ও কি, ওকে এ ঘরে কেন? সর্ব্ব-দা, তোমার পায়ে পড়ি, ওকে এ ঘরে এনো না। আর-সব অত্যাচার সইব, কিন্তু ওকে এ ঘরে আন্‌লে সইতে পার্‌ব না।" কার্ত্তিক তাহার গৃহের সকলকেই বিশেষ করিয়া বারণ করিয়া দিয়াছিল যেন ঐ ঘরে দেবুকে না প্রবেশ করিতে দেওয়া হয়। সর্ব্বানন্দ কার্ত্তিককে বাহিরে আনিবার এই এক উপায় খুঁজিয়া পাইয়া আজকাল প্রত্যহই দেবুকে লইয়া সকালে-বৈকালে কার্ত্তিকের ঘরে প্রবেশ করিয়া তাহাকে ব্যস্ত করিয়া তোলে। পুত্র তাহার ঘরে প্রবেশ করিলেই সে তাড়াতাড়ি ঘরের সমস্ত দরজা-জানালা খুলিয়া দিয়া একটা কৃষ্ণবর্ণ কাঁচের eye-preserver চক্ষে দিয়া বসে।

সর্ব্বানন্দ দেবুকে লইয়া কার্ত্তিকের নিকট উপস্থিত হইল। কার্ত্তিক তাড়াতাড়ি গবাক্ষাদি উন্মুক্ত করিয়া দিয়া বলিল, "সব্ব-দা, কেমন জব্দ, দেবু কেমন তোমায় বেঁধেছে!"

সর্ব্বানন্দ কহিল, "দেবু ত' বাঁধেনি ভাই, বেঁধেছ তুমি। আর কেন কার্ত্তিক? আমায় ছেড়ে দাও ভাই। তুমি যদি একটু মনের

জোর কর, তাহলেই তোমার এ মানসিক রোগ, স্বকৃত উপসর্গ ঝরে পড়ে যাবে। দেবু, তোর বাবার হাত ধরে টেনে বাইরে নিয়ে চল্ ত বাবা।"

দেবু বিনাবাক্যব্যয়ে পিতার হাত ধরিয়া টানিতে আরম্ভ করিল। কার্ত্তিকও কাঁচপোকায় ধরা তেলাপোকার মত কাঁপিতে কাঁপিতে বাহিরে চলিল। সর্ব্বানন্দ কার্ত্তিকের অন্য হাত ধরিয়া তৎক্ষণাৎ তাহা পরিত্যাগ করিয়া বলিল, "না, আজ তোমায় নিজের শক্তিতে চল্‌তেই হবে, ছেলেকেও রাস্তার কাঁটা-খোঁচা খানাডোবা থেকে বাঁচাতে হবে। আমি তোমায় আজ একটুও সাহায্য কর্‌ব না।" কার্ত্তিক কাতরভাবে বলিল, "পড়ে যাব, সব্ব-দা, ধর। দেবু, বাবা আমার, একটু আস্তে চল।" সর্ব্বানন্দ স্বয়ং দেবুর হাত ধরিয়া বেগে অগ্রসর হইতে লাগিল। কার্ত্তিক তখন অগত্যা পুত্রের হাত ছাড়িয়া বসিয়া পড়িল এবং চোখের ঠুলি খুলিয়া দূরে নিক্ষেপ করিয়া দুই হাতে মুখ ঢাকিল। দেবু কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিল, "জ্যাতা, বাবা কাঁদ্‌ছে।"

সর্ব্বানন্দ গম্ভীরভাবে কিছুক্ষণ কার্ত্তিকের দিকে চাহিয়া শেষে বলিল, "চোখ চেয়ে ফ্যালো কার্ত্তিক, মোহ কেটে যাক, স্বপ্ন দূর হোক। এমন সুন্দর সকাল, আর তুমি ইচ্ছে করে অন্ধ হয়ে থাকবে?"

কার্ত্তিকের সমস্ত দেহ ক্ষণে ক্ষণে কাঁপিয়া উঠিতেছিল, সে কাতরভাবে দুই হাত বাড়াইয়া দিয়া বলিল, "বাবা দেবু, তোর হাত দুটো দে, নইলে—"

সর্ব্বানন্দ কহিল, "নইলে কি?"

কার্ত্তিক কহিল, "অন্ধকারে ডুবে মরি যে!"

সর্ব্বানন্দ কহিল, "বাঁচ্‌তে চাও? আলো চাও?"

কার্ত্তিক কহিল, "বাঁচতে চাইনে? আলোর জন্য আমি যে প্রাণ ফেটে মরে যাচ্ছি!"

সর্ব্বানন্দ কহিল, "তবে আলোকে ভয় কর কেন?"

কার্ত্তিক কহিল, "তা জানিনে সব্ব-দা। এতদিন প্রাণপণে আঁধারকে চেপেছিলুম কিন্তু যেই অন্ধকার আমার উপর নেমে আস্‌তে আরম্ভ করেছে, অমনি বুঝতে পেরেছি কি অমূল্য বস্তু আমি হারাতে বসেছি। কিন্তু এখন আর উপায় নেই। অন্ধকারের আত্মা, দুর্লভের শক্তি আমায় অভিভূত করে ফেলেছে ; এখন যতই তার কাছ থেকে মুক্ত হবার চেষ্টা কর্‌ছি, ততই সে আমায় চেপে ধর্‌ছে। যা কখনও পাওয়া যায় না, যে মূর্খ তাকেই দুঃসাহসিকের মত প্রাণপণে চায়, তারই বোধ হয় এই দুর্দ্দশা হয়। যা অপ্রাপ্য, তাকেই চাইতুম, তাই সে অপ্রাপ্য নিজে না ধরা দিয়ে তার সঙ্গী চির-অন্ধকারকে আজ প্রেতের মত আমার উপর চাপিয়ে দিয়েছে। এখন আর উপায় নেই।"

সর্ব্বানন্দ কহিল, "কি যে অপ্রাপ্য, তা ত বুঝ্‌তে পার্‌ছিনে। সেই বহুদিন পূর্ব্বে যে অন্ধ-রমণীর অন্ধ নয়নের আঘাতে মূর্খ তুমি অভিভূত হয়েছিলে, সে আজও তোমার জন্য তেমনিভাবে বসে আছে। সে তোমায় বুঝতে না পেরে প্রত্যাখ্যান করেছিল, আজও সেই অনুতাপে দগ্ধ হচ্ছে। কাল ঠাকুরদার চিঠি পেয়েছি যে তোমার এই অবস্থার কথা শুনে সে মূর্চ্ছাপন্ন হয়েছিল। তবে সংসারে অপ্রাপ্য কি? সুখ বল, শান্তি বল, স্নেহ বল, ভালবাসা বল, ধর্ম্ম বল, সব ত ইচ্ছে করলেই পাওয়া যায়। ভগবান সমস্তই সুলভ করে রেখেছেন, কেবল একটু চেষ্টা করে তা নিতে হবে। তবে যদি কেউ ইচ্ছে করে কিছু না নিতে চায়, ইচ্ছে করে দরিদ্র হয়ে ভিখারী হয়ে থাক্‌তে চায়, তার দেহি-দেহি রব চিরকালই থাক্‌বে। ওঠো কার্ত্তিক, উঠে তুমি সবলে বল, আমি রাজরাজেশ্বরী মায়ের সন্তান, আমি ভিখারী নই, তাহলেই দেখ্‌বে, তোমার কিছুই অপ্রাপ্য নেই, সবই পূর্ণ ভাবে তোমার ভাণ্ডারে বিরাজ কর্‌ছে। ওঠো ভাই ওঠো, কথা শোনো।

কার্ত্তিক সর্ব্বানন্দর হাত ধরিয়া উঠিয়া চলিতে চলিতে বলিল, "জগতে কিছুই অপ্রাপ্য নয়, বল্‌ছ, কিন্তু এই দেখ, তোমায় এত কাছে পেয়েও কৈ, পাচ্ছি না ত! তোমার-আমার মধ্যে কোথা থেকে একটা মৃত্যুর মত অন্ধকারের ব্যবধান এসে দাঁড়িয়েছে। আমি তোমায় হারিয়ে দিয়ে, তোমায় টেনে এনেছি, তবু তোমায় পাচ্ছি না। যদি কোন দিন সেই অপ্রাপ্যকে এমনি করে টেনে আন্‌তে পারি, সেইদিনই বোধ হয় এই মায়ার ঘোর কেটে যাবে। যে দিন দেখ্‌ব যে সেই আকাঙ্ক্ষার ধন, না-পাওয়ার-বস্তু আমার দুয়ারে ভিখারী হয়ে এসে দাঁড়িয়েছে, সেই-দিন বোধ হয় আবার সুস্থ হব। নইলে আর আমার উপায় নেই।"

সর্ব্বানন্দ কহিল, "কিন্তু তুমি যে বিবাহিত! এখন কোন্ সাহসে আবার তাকে তোমার কাছে টেনে আন্‌তে চাইছ?"

কার্ত্তিক কহিল, "যে রোগী, যে canine appetiteএ ভুগ্‌ছে, তার খাদ্যাখাদ্য-বিচার থাকে কখনো?

সর্ব্বানন্দ কহিল, "তুমি ঠিক বল্‌ছ যে যদি সে তোমায় এসে বলে যে, তোমায় সে চায়, তাহলেই তোমার এ রোগ সেরে যাবে?"

—"ঠিক কি করে বলি? এখন ত' আর আমি আমার অধীন নই; এখন আমায় ভূতে পেয়েছে। তবে এই রোগের কারণ যখন সে-ই, তখন সে আমার কাছে এসে তোমার মত পরাজয় স্বীকার কর্‌লে হয়তো আবার আমি সুস্থ হতে পারি।"

—"তাহলে আমি প্রতিজ্ঞা কর্‌ছি যে তাকে যেমন করে পারি তোমার পায়ের কাছে এনে ফেলে দেব! কিন্তু তোমাকেও একটা প্রতিজ্ঞা কর্‌তে হবে যে অন্ধ বলে তাকে নিয়ে তুমি খেলা কর্‌তে পাবে না।"

—"খেলা! যে আমায় এমন করে খেলাচ্ছে তার সঙ্গে আমি

কোন্ সাহসে খেলা কর্‌ব! তার পক্ষে যা খেলা আমার পক্ষে যে তা মৃত্যুর লীলা!"

—"কথার মার-পেঁচ ছেড়ে সোজা কথায় বল যে তাকে যদি তোমার কাছে আনি, তুমি তাকে বিয়ে কর্‌বে?"

—"বিয়ে? কি সর্ব্বনাশ! যা একেবারে না-পাওয়ার ধন, তাকে একেবারে ধূলোমাটির মধ্যে টেনে আন্‌ব? তা পার্‌ব না। বিশেষ শৈলকে আমি অত কষ্ট দেব কি করে? সে যে তাহলে মরে যাবে। না সর্ব্ব-দা, শৈলই আমার পথের আলো, শৈলই আমার পাওয়ার ধন, আমি তাকে এক মুহূর্ত্তের জন্যও যদি সে কষ্ট দি, তাহলে আমায় মর্‌তে হবে। একেই ত আমায় নিয়ে সে আজীবন কষ্ট পাচ্ছে, তার উপর ও কষ্ট তাকে দিতে পার্‌ব না।"

—"এটুকু বুদ্ধি ত বেশ আছে! তাহলে তুমি তার স্বামী হয়ে সারা-জীবন অন্যের উপর মন ফেলে রেখে বসে আছ কেমন করে? এতে বুঝি তার খুব সুখ হচ্চে?"

—"তুমি জান না, সর্ব্ব-দা, তুমি আমায় কখনও বোঝনি, আজও বুঝ্‌তে পার্‌বে না। আমি কেন সেই অন্ধকে এমন করে প্রাণপণে চাই, জান? সে পাবার বস্তু নয় বলে;—যা পাবার বস্তু, তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ যা' তা' আমার ভাগ্যে লাভ হয়েছে, আমি শৈলকে পেয়েছি। কিন্তু চিরদিনই আমার অন্তরাত্মা যাকে না-পাওয়া যায়, যার অন্ধকারের মধ্যে সমস্তই দিশেহারা পথহারা হয়ে যায়, তাকেই চাচ্চে, তার দিকেই আমার অন্তরের মানুষটির ছুটে যাবার প্রচণ্ড চেষ্টা। এই চেষ্টার সঙ্গে শৈলর প্রতি স্নেহ বা কর্ত্তব্যের কখনও বিরোধ ঘট্‌তে পারে না। সংসারে থেকেও যেমন মহাপুরুষেরা সেই চির অপ্রাপ্য অনন্তশায়ী নারায়ণের দিকে তাঁদের আত্মাকে ফিরিয়ে রাখেন, আমারও যেন কতকটা সেই

রকম হয়েছে। তবে তাঁরা যাকে চান, তাতে কেউ দোষ ধরতে পারে না, তাতে কোন দোষ ঘটেও না, তাই সংসার তাঁদের নিয়ে খুসী থাকে, সুখে থাকে। কিন্তু আমার প্রার্থিত বস্তু সংসারের বাইরে, সমাজের বাইরে, ধর্ম্মের বাইরে, এমন কি মানুষেরও বাইরে, তাই সকলের সঙ্গেই আমার বিরোধ চলেছে।"

কার্ত্তিক চলিতে চলিতে হঠাৎ থামিয়া বলিল, "সব্ব-দা, দেবু কৈ? তার আওয়াজ যে অনেকক্ষণ থেকে পাচ্ছিনে!" সর্ব্বানন্দ এতক্ষণ অবাক হইয়া কার্ত্তিকের কথা শুনিতেছিল, হঠাৎ কার্ত্তিকের কথায় তাহার চৈতন্য হওয়ায় সে চাহিয়া দেখে, দেবু উদ্যানস্থ পুষ্করিণীতে নামিয়া গিয়া একেবারে এমন একটা জায়গায় দাঁড়াইয়াছে, যেখান হইতে নড়িলেই সে একেবারে গভীর জলে পড়িয়া যাইবে। তখন সে তাড়াতাড়ি কার্ত্তিকের হাত ছাড়িয়া সোপান-শ্রেণী অবতরণ করিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু সে পৌঁছিবার পূর্ব্বেই তাহার পদশব্দে চমকিত হইয়া দেবু যেমন ফিরিয়া চাহিবে, অমনি সশব্দে জলে পড়িয়া ডুবিয়া গেল। কার্ত্তিক সে শব্দে চীৎকার করিয়া যেমন নামিতে যাইবে অমনি সেও পতিত হইয়া গুরুতর আঘাত পাইল। কিন্তু সর্ব্বানন্দর সে দিকে চাহিবার অবসর ছিল না; সে তাড়াতাড়ি লাফাইয়া পড়িয়া বালককে জল হইতে তুলিল। বালক জল হইতে উঠিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিল। কার্ত্তিকের শরীরে নানাস্থান কাটিয়া রক্ত পড়িতেছিল; কিন্তু সেদিকে ভ্রুক্ষেপমাত্র না করিয়া সে হাত বাড়াইয়া বলিল, "আমার কোলে দাও, সর্ব্ব-দা, আমার কোলে দাও।"

সর্ব্বানন্দ তাহার কোলে বালককে দিয়া তাহার গাত্র-বস্ত্র সমস্তই খুলিয়া দিল। দু-এক ঢোক জল তাহার উদরস্থ হইয়াছিল বটে কিন্তু সে কোথাও কোনরূপ আঘাত প্রাপ্ত হয় নাই। সর্ব্বানন্দ কার্ত্তিকের

ক্রোড় হইতে বালককে পুনর্ব্বার গ্রহণ করিয়া বলিল, "তুমি আস্তে আস্তে এস, আমি একে ওর মার কাছে পাঠিয়ে দিয়ে ডাক্তারকে খবর পাঠাই।"

কার্ত্তিক বলিল, "আমার কোলে রাখ ওকে, আমায় নিয়ে যেতে দাও।"

সর্ব্বানন্দ সে কথা শুনিল না, সে বালককে লইয়া দ্রুতগতি অন্তঃপুরে চলিয়া গেল। কার্ত্তিকও একজন মালির হাত ধরিয়া আপনার কোটরে গিয়া প্রবেশ করিল।

এদিকে সন্ধ্যার পর ম্যানেজার সাহেব ফিরিয়া আসিয়া সংবাদ দিল যে, ম্যাজিষ্ট্রেট আসিয়াছিল এবং সমস্ত বন্দোবস্তই এমন চমৎকার হইয়াছিল যে সাহেব আর টুঁ শব্দটী না করিয়া তাঁবুতে ফিরিয়া গিয়াছে।

কিন্তু ম্যানেজারের অন্ধকার কার্য্যাবলীর সঠিক সংবাদ সর্ব্বানন্দ কোন গূঢ় উপায়ে অবগত হইয়া কার্ত্তিকের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, "কার্ত্তিক, এই বেলা সাবধান হও। তোমার এই ম্যানেজার কোন্ দিন তোমায় বিষম বিপদে ফেলবে! আমার ভয় হচ্চে, কোন্ দিন তুমি কোন্ খুনী মকদ্দমার আসামী হয়ে না চালান যাও!"

কার্ত্তিক হাসিয়া বলিল, "ব্যাপার কি? মণির উপর চট্‌লে কেন?"

সর্ব্বানন্দ কহিল, "মণি আজ কি ক'রেছে জান?"

—"না। সে আজ শ্রান্ত, তাই রাতে আর আস্‌বে না। কালই সমস্ত জান্‌তে পারব।"

—"অতক্ষণ অপেক্ষা করার দরকার নেই, তুমি লোক পাঠিয়ে ওর কাছ থেকে সঠিক সংবাদ আনাও। আমি যা খবর পেয়েছি, তাতে ভয়ে আমার হাত-পা পেটের মধ্যে ঢোক্‌বার মত হয়েছে।"

—"তোমার চাল-কলা-খেকো সাহস, একটুতেই তাই ভয় লাগে।" জমিদারী রাখ্‌তে গেলে অনেক রকম দুঃসাহসের কাজ করতে হয়। জানই ত, None but the brave deserves the fair !"

—"অথবা তার চাইতে বল, None but the fool-hardy deserves the gaol ।"

—"কি হয়েছে, বল না ?"

—"কমবকৎপুরের প্রজাদের গোলমাল মিটুতে আজ ম্যাজিষ্ট্রেট স্বয়ং এসেছিল। তোমার ম্যানেজার নিজের লোকদের দিয়ে তাঁর পাল্কির ওপর ডাকাতি করায়, তারপর স্বয়ং অন্য লোকজন নিয়ে সেই কৃত্রিম ডাকাতদের তাড়িয়ে ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে এসে বলে যে প্রজারা ঐ পাল্কিতে ম্যানেজার আছে মনে করে তাকে খুন করতে আসে। ম্যাজিষ্ট্রেট্ ঘাগি লোক, সে বোধ হয় সব চালাকি বুঝে গিয়েছে! এখন দেখ, তোমার ম্যানেজারের অদৃষ্টে কি হয়!

সন্ধ্যায় কার্ত্তিকের সম্পূর্ণ অন্যরকম ভাব ;—সে উচ্চ হাস্য করিয়া বলিল, "ও একটি রত্ন। কালই ওর মাইনে বাড়িয়ে দেব ।"

সর্ব্বানন্দ কহিল, "কিন্তু কাল যদি ও জেলে যায় ?"

কার্ত্তিক কহিল, "ম্যানেজার হবার লোক জগতে আরও আছে ।"

সর্ব্বানন্দ কহিল, "অর্থাৎ ?"

কার্ত্তিক কহিল, "অর্থাৎ ও গেলে লোকের অভাব হবে না। ওর জন্য কান্নাকাটি করব, এত বড় গাধা আমি নই ।"

৮

সর্ব্বানন্দ শশিভূষণের পত্রে ব্যস্ত হইয়া কলিকাতায় উপস্থিত হইলে শশিভূষণ বলিল, "তুমি যদি কার্ত্তিককে নিয়ে এত ব্যস্ত হয়ে পড়, তা হলে তোমার এ সব কাজ চালাবে কে ?"

সর্ব্বানন্দ হাসিয়া বলিল, "তোমার কর্ম্ম তুমি কর লোকে বলে করি আমি ! তুমি যা করাচ্ছ, তাই আমি কর্‌ছি ; এখন যদি বল যে কার্ত্তিককে ছেড়ে দাও ত আমায় তাই কর্‌তে হবে।"

শশী কহিল, "এ-সব না হয় আমার কাজ, কিন্তু সুকুকে শেখাবার ভারটী যে নিয়েছ, সেটা ত' আর আমার কাজ নয় !"

সর্ব্বানন্দ কহিল, "সেটা তোমার কাজেরই off-shoot।"

শশী কহিল, "এই এত-বড় একটা কর্ত্তব্যের সমস্ত দায়িত্ব আমারই ঘাড়ে ! এর জন্য কি আর-কেউ দায়ী নয় ? আমি যদি না থাকি, তা হলে কি আর-কেউ এ কাজের ভার নেবে না ? এই হতভাগা-কেই চিরদিন এই কর্ত্তব্যের চাকার তলে পড়ে পেষণ-যন্ত্রণা সহ্য কর্‌তে হবে !"

শশী অসহিষ্ণু হইয়া উঠিয়া পাদচারণ করিতে লাগিল। সর্ব্বানন্দ কিছুক্ষণ নীরবে চিন্তা করিয়া শেষে দুঃখিতভাবে বলিল, "তা হলে কি কর্‌ব, বল ! কার্ত্তিককে এখন ত্যাগ কর্‌লে সে যে কি করে বস্‌বে, তা কে বল্‌তে পারে ?"

শশী কহিল, "সে কি কর্‌বে না কর্‌বে তাই কেবল ভাব্‌ছ, আমার বিষয় ত কৈ একটি বারও ভেবে দেখ্‌ছ না ?"

সর্ব্বানন্দ কহিল, "তোমার বিষয় কি আবার ভাব্‌ব, ঠাকুরদা ? তুমি যে সব চিন্তার বাইরে। তুমি নিজেকে যে চিরদিন পরের করে

রেখেছ। তোমার নিজের জন্য যদি নিজেকে এতটুকুও রাখ্‌তে, তা হলে তোমার জন্য জগৎশুদ্ধ লোক চিন্তা কর্‌ত। তোমার অস্তিত্বই পরের জন্যে! এই কার্ত্তিকের জন্যই তোমার কত চিন্তা, কত উৎকণ্ঠা দেখেছি। যারা তোমার কেউ নয়, তারাই তোমার সব; তাইত তোমার দেখাদেখি কত লোক পরার্থপর হয়ে উঠ্‌ছে। আজ যদি তুমি হঠাৎ নিজের জন্য চিন্তা সুরু কর, তা হলে যে সবই গোলমাল হয়ে যাবে!"

শশিভূষণ পদচারণ করিতে করিতে সহসা থামিয়া বলিল, "কি জানি সর্ব্ব, তোর সেই চিঠিটা পেয়ে পর্য্যন্ত আমার যেন সব ওলট পালট হয়ে যেতে সুরু করেছে। কার্ত্তিকের অবস্থা শুনে পর্য্যন্ত আমার মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে। এত বড় আত্মপরায়ণতা! আত্মহত্যা করে আপনাকে জাহির করা! এই দৃষ্টান্তের ফল যতই unhealthy হোক এর একটা বিকট সৌন্দর্য্য আছে, এতে মদের তীব্র নেশা আছে, এর অভিভূত করবার ক্ষমতা আছে। নইলে আমার মত লোকই বা কেন আজ ক'দিন নিজের চিন্তায় ব্যস্ত হবে? আমারই বা কেন বারবার মনে হবে যে, কি করলুম আমি! কি পেলুম আমি! নিজেকে ভুলে পরের কথা ভেবে ভেবে কি আমার লাভ হল! আজ ক'দিন কেবলি মনে হচ্চে যে, আমার অন্তরে বসে আমার ক্ষুধিত অন্তরাত্মাটা কেবলি কাঁদ্‌ছে। কি যে সে পায় নি, তা বুঝ্‌তে পার্‌ছি না, তবু এটা স্পষ্ট অনুভব হচ্চে যে সেই হতভাগা মনটা আমায় আবার ব্যস্ত কর্‌তে আরম্ভ করেছে। এখন কি দিয়ে তাকে থামাই? সে যাকে চায় বলে মনে হচ্ছে, তাকে ত আর মাথামুড় খুঁড়ে মর্‌লেও ফিরিয়ে আন্‌তে পার্‌ব না। এ কথাটা সে জানে, তবুও সে কাঁদ্‌বে! এখন এই অবুঝ প্রাণটাকে নিয়ে কি করি! যা অপ্রাপ্য, তারই জন্য এত কান্নাকাটী কেন? যা পেয়েছিস্, তাই নিয়ে খুসি থাক্ না বাপু!"

সর্ব্বানন্দ কহিল, "ঠাকুরদা, ঐ দেখ, তুমিও কার্ত্তিকের মত সুরু করলে। কার্ত্তিকও যে ঐ কথা বলে।"

শশী কহিল, "পাব না জেনেই মানুষ কাঁদে। পাব জান্‌লে হয় ত কাঁদ্‌ত না।"

সর্ব্বানন্দ কহিল, "মিথ্যে কথা! আকাশকুসুমও কেউ চায়? সোনার পাথরের বাটীর জন্য কান্নাকাটী কখনও কারও শুনেছ? মনে মনে মানুষ ঠিক জানে যে যা চাচ্ছি, তা পাওয়া গেলেও যেতে পারে, যা চাচ্ছি তা অপ্রাপ্য নয়, তাই মানুষ প্রার্থিত বস্তুর জন্য আদুরে ছেলের মত আছড়ে পড়ে কাঁদ্‌তে থাকে, যেন ভগবানের আর কোন কাজ নেই, সেই হতভাগাটার আব্দার রাখাই একমাত্র কাজ! ছি শশি-দা, তোমার মুখে আজ এই অনার্য্য দুষ্ট কথা শুনে আমার ভারি রাগ হচ্ছে। আমার মনে হয়, যে মানুষের চঞ্চল প্রকৃতি, যে অস্থির চিত্তের লোক, সে সুখেও অসুখী, দুঃখেও অসুখী। সে যদি ভাল অবস্থায় থাকে, তখন মন্দ অবস্থা পাবার জন্য সে মিছিমিছি কাঁদ্‌তে সুরু করে; সুখ যেন তার সইছে না, এইভাবে কাঁদ্‌তে সুরু করে। আর যে বাস্তবিক দুঃখী, তার ত কান্না-কাটির আর সীমা থাকে না। আসল কথা হচ্চে, মনের সাম্যাবস্থা, শান্তভাবটী হারালে মানুষের সব-চাইতে দুরবস্থা হয়। তোমায় আর কি বল্‌ব, ঠাকুর্দা, গীতার ভাষায় বলি, "ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্ব্বল্যং তক্তোত্তিষ্ঠ।"

শশী তাহার দীর্ঘ দাড়ির মধ্যে হাত বুলাইতে বুলাইতে হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, "আমিও অর্জ্জুন নই, তুমিও শ্রীভগবান নও; অতএব এই মশা মারতে গীতা-গদাঘাতের প্রয়োজন নেই। আমার মত ক্ষুদ্র প্রাণীর সুখ-দুঃখে যখন কোন মহাকবির টিকি আন্দোলিত হয়ে ওঠবার সম্ভাবনা নেই এবং যখন কোন অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র আমার এই দাড়ির শরাঘাতের ভয়ে তাঁর রাষ্ট্রের জন্য ভীত হয়ে উঠ্‌বেন না, তখন তোমার বাক্যবাণ সংহার

কর। মন আমার যতই চঞ্চল হোক, তাতে এই দাড়ির একগাছি চুলও যখন নড়্‌তে দেব না, তখন ভয় কি ভাই? তবে মনের মধ্যে মাঝে মাঝে যদি বাষ্প জমে, তখন তাকে বের করে দেওয়া উচিত, তাই তোমার কাছে দু'কথা বল্‌লুম। ওতে রাগ কর্‌তে নেই।"

সর্ব্বানন্দ হা হা করিয়া হাসিয়া বলিল, "তোমার দাড়ির শত বর্ষ পরমায়ু হোক; ওর এক এক গাছিতে যেটুকু সদ্বুদ্ধি আছে, তাই যদি অপরে পায়, তা হলেও সে সারা জীবনের জন্য ধন্য হয়ে যায়।"

শশী কহিল, "তোদের আদরেই ত' এটা অযথা বেড়ে যাচ্ছে। যাক্! সুকু যে এদিকে তোর জন্য প্রায় ক্ষেপে যাবার মত হয়েছে। কি যে তার মাথায় ঢুকিয়ে দিয়েছিস্, সে ত বাড়িশুদ্ধ লোককে পাগল করে তুলেছে; এমন কি সে দিন দেখি, মা শুদ্ধ চোখ বুজে ওর কাছ থেকে তোর সেই সব ছুঁচের ডগায় হাত বুলোন শিখ্‌ছেন; মাঝে মাঝে খোঁচাখুঁচিও খাচ্ছেন, তবু তাঁর উৎসাহ বেড়েই চলেছে, ভয় হচ্ছে, আমিই বা কোন্ দিন চোখ বুজে ওঁদের সঙ্গে লেগে পড়ি।"

সর্ব্বানন্দ কহিল, "তবেই বোঝো ঠাকুর্দা, সৎকার্য্যের কি শক্তি! একবার পরের মঙ্গল করব এই সংকল্প কর্‌লেই অমনি কোথা থেকে এত আনন্দ এসে সেই সঙ্গে যোগ দেয় যে তখন আর কিছুতেই নিজেকে সামলানো যায় না। তখন মানুষ যতক্ষণ না নিজেকে নিঃশেষে তাতে সঁপে দিতে পারে, ততক্ষণ আর কিছুতেই থাম্‌তে পারে না। এই সুকুমারীর কথাটাই ভেবে দেখ। তোমার বা তোমার শাশুড়ীঠাকরুণের কথা ছেড়েই দাও, কারণ তোমরা ত চিরদিনই পরের জন্য আপনাদের সঁপে রেখেছ; কিন্তু এই অন্ধ বালিকা কোথা থেকে এতখানি উৎসাহ এতখানি সদিচ্ছা লাভ কর্‌লে?"

শশী কহিল, "কোথা থেকে যে সম্পূর্ণভাবে পেয়েছে তা বল্‌তে

পারিনে, তবে কতকটা যে তার বর্ত্তমান গুরুর কাছ থেকে পেয়েছে এটা নিঃসন্দেহ। সেজন্য আশা করি সুকুর গুরুটী তাঁর প্রিয়শিষ্যাকে অকালে ত্যাগ করবেন না। তার এই প্রাণপণ চেষ্টার ফলে যেন সে গুরুর হাত থেকে তার সাধনার চরম সার্থকতা লাভ করে।"

সর্ব্বানন্দ লজ্জিতভাবে বলিল, "সাধনায় সিদ্ধি!"

শশিভূষণ তার দাড়িতে একটা প্রচণ্ড টান দিয়া বলিল, "তবে রে চোরেরা! একটিকে কেড়ে নিলে সেই হতভাগা কার্ত্তিক এসে, আর একটিকে নেবে তুমি? আমি আজই দাড়ি মুড়িয়ে শিব সেজে গিয়ে ওদের বলছি, "বর নে রে পূর্ণ-মনস্কাম তোর"—অর্থাৎ আমায় নেরে! আহা, আমার গান গাইতে ইচ্ছে করছে। বাজা, ঐ টেবিলটাই বাজা।"

সর্ব্বানন্দ কহিল, "আহা হা, অমন কাজ করো না। দাড়িওয়ালাদের মুখ থেকে বেদ-উপনিষদ বাইবেল কোরাণ ছাড়া অন্য কিছু বেরুলে আবার এখুনি কোন্ এক দাড়িওয়ালা জীবের সরস মাংসের কথা মনে উদয় হয়ে খিদে জেগে উঠবে।"

শশিভূষণ আসন ছাড়িয়া লাফাইয়া উঠিয়া বলিল, "Three cheers for the happy suggestion. ক্রমাগত Carbo-hydrates খেয়ে খেয়ে আমার মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে; আয়, নিউ মার্কেট থেকে এক সের মটন্ আনা যাক্।"

সর্ব্বানন্দ কহিল, "তোমার অন্ত পাওয়া ভার! এই কান্নাকাটি হচ্ছিল, আবার দশ মিনিট না যেতেই স্ফূর্ত্তির ধূম লেগে গেল।"

শশী কহিল, "spirit damp করিস্ নে, আজ ভাল করে রাঁধতে হবে। পেটে কিছু ভাল মন্দ জিনিষ না পড়াতে এতদিন মরে ছিলুম। এখন বেশ বুঝতে পারছি যে কেন এত দিন কোন কাজে মন দিতে পারি নি! ওরে বেটা রোঘো, যা, হগ সাহেবের বাজার থেকে এখুনি

ছু সের মটন নিয়ে আয়। এই নে ছুটো টাকা, আর যা-যা দরকার, সব গুছিয়ে আন্‌বি।"

সর্ব্বানন্দ কহিল, "আরে থাম থাম! একেবারে দমকা খরচ করে ফেলো না। ছু'-ছু'টো টাকা! কর্‌লে কি.? ওতে যে তোমার আট দিনের মাছ আর ষোল দিনের আলোর খরচ বন্ধ হয়ে যাবে।"

শশী কহিল, "তোকে আমার গিন্নিপনা থেকে বরখাস্ত কর্‌তে হবে। না খেতে দিয়ে তুই আমার ইহকাল-পরকাল সব খেলি। এবার থেকে তহবিল আমি রাখ্‌ব।"

সর্ব্বানন্দ কহিল, "তারপর ছু'দিন যেতে না যেতেই ত' আমার কাছ থেকে ধার করা সুরু হবে! সে হবে না, দাও তোমার এই ক'দিনের হিসাব, আর তহবিল।"

সর্ব্বানন্দ শশিভূষণের হাত বাক্স খুলিবার জন্য চাবিগুলি যেখানে সাধারণতঃ থাকিত সেই স্থানে হাত দিল; কিন্তু পাইল না! বিরক্ত হইয়া বলিল, "চাবি গুলো কি কর্‌লে?" শশিভূষণ মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বলিল, "বাগবাজারে ফেলে এসেছি।" সর্ব্বানন্দ রাগিয়া বলিল, "তা হলে কি করে খুল্‌ব?" শশিভূষণ অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া বলিল, "খোলাই আছে বোধ হয়।"

সর্ব্বানন্দ বিস্মিত হইয়া দেখিল, হাত বাক্‌সের তালা ভাঙ্গা। সে তখন ক্রুদ্ধ হইয়া অনুসন্ধান করিয়া দেখিল, আর একটা আলমারির কলেরও ঐ দশা ঘটিয়াছে, তাছাড়া অনেকগুলি নূতন দৈনিক প্রয়োজনীয় দ্রব্য ক্রয় করিয়া আনা হইয়াছে। সে শশিভূষণকে বিশেষরূপেই চিনিত। এই সমস্ত দ্রব্য যে বাক্‌সে বা আলমারিতে আছে, তাহার তালা ভাঙ্গিবার ভয়ে যে এগুলি কেনা হইয়াছে, তাহা সে তৎক্ষণাৎ বুঝিয়া লইয়া বলিল, "চাবিগুলো কি কাউকে পাঠিয়ে আনিয়ে নেওয়া যায় না?"

শশিভূষণ ঘর হইতে পলাইয়া গেল। কারণ চাবিগুলা বাগবাজারের বাড়ীতেও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না; তবে শশিভূষণের খুব বিশ্বাস যে চাবি সেইখানেই আছে।

সর্ব্বানন্দ বিরক্ত হইয়া রঘুনাথকে ডাকিল; কিন্তু রঘুনাথ শশিভূষণের উপযুক্ত ভৃত্য। সে ঐ বাটির নিম্নতলে বাহিরের দিকে যে চাউলাদির দোকান ছিল, তাহাতে সরু চাউল ঘৃত ইত্যাদির বরাত দিয়া একটা লৌহ তারের টোকা হস্তে লইয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছিল। সর্ব্বানন্দ বিরক্ত হইয়া স্বয়ং সমস্ত দ্রব্য যথাস্থানে স্থাপন করিয়া ঘরটিকে পুনরায় মনুষ্যবাসযোগ্য করিয়া তুলিল।

৯

মণিশঙ্করের অত্যাচারের ফল এতদিনে ফলিতে চলিল। ম্যাজিষ্ট্রেট স্বয়ং সমস্ত তদন্ত করিয়া তাহাকে এবং তাহার সাঙ্গোপাঙ্গ সকলকে পিনাল কোডের অনেকগুলি ধারার চার্জে অভিযুক্ত করিয়া চালান দেওয়াইলেন, এবং জমিদার কার্ত্তিকচন্দ্রের নাম ব্লাক বুকে তুলিয়া দিয়া তাহাকেও শাসাইলেন, ভবিষ্যতে যদি সে সাবধান না হয়, তাহা হইলে তাহার হাত হইতে এষ্টেটের ভার কাড়িয়া লওয়া হইবে। সর্ব্বানন্দ এ সংবাদ পাইয়া কার্ত্তিককে লিখিয়া পাঠাইল যে মণিশঙ্করকে বাঁচাইবার জন্য যেন চেষ্টার ত্রুটি না হয়; কারণ কার্ত্তিকের দোষেই সে এই বিপদে পড়িয়াছে। কার্ত্তিক সে পত্রের উত্তরে লিখিল যে একজন ম্যানেজার গেলে অন্য ম্যানেজার পাওয়া এই চাকুরী-লোলুপ বঙ্গদেশে খুবই সহজ, অতএব মণিশঙ্করের জন্য চিন্তা করিবার কোনই প্রয়োজন নাই; বিশেষতঃ উহারই জন্য যখন কার্ত্তিকের এত দুর্নাম, তখন যাহাতে মণির জেল হয় তাহাই করা কর্ত্তব্য; উপরন্তু ইহাতে ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট লুপ্ত প্রতিষ্ঠার পুনরুদ্ধারেরও বিশেষ সম্ভাবনা।

শৈলজা কার্ত্তিকের এই অভিমত শুনিয়া বলিল, "না, তা হবে না। তোমার জন্যই মণিদা যখন এই বিপদে পড়েছে, তখন তাঁকে বাঁচাবার চেষ্টা কর্‌তেই হবে। তুমি যদি না কর, বাবা বলেছেন; আমার তরফ থেকে তিনি তদ্বির করে তাকে বাঁচাবেন।"

কাত্তিক কহিল, "স্বামীকে ছেড়েও যে স্ত্রীর একটা অস্তিত্ব আছে, তুমি যে আমার ছায়ামাত্র নও, এটা তুমি বুঝতে পার্‌ছ দেখে আমার ভারী আনন্দ হচ্চে। আমি যদি অন্যায় করি, তুমি সাধ্যমত সে অন্যায়ের প্রতিবিধান কর্‌বে, এই হচ্চে কাজ। তাহলেই বুঝ্‌ব যে তুমি মানুষ, তুমি খেলার পুতুল নও।"

শৈলজা ব্যস্ত হইয়া বলিল, "অমন কথা বলো না। আমি তোমাকে লঙ্ঘন করে কোন কাজ কর্‌তে চাইনে, এত বড় দুর্ম্মতি যেন আমার না হয়। আমি যা কর্‌তে চাই, সে তোমার ভালর জন্যই। স্বামীকে ছাড়িয়ে কোন কাজ কর্‌লে স্ত্রীর পাপ হয়।"

কাত্তিক কহিল, "ভুল, মস্ত ভুল! স্বামীকে ভালবাসা ভক্তি করা ছাড়াও একটা বড় জিনিষ আছে, সেটা হচ্চে নিজের ধর্ম্ম, নিজের মনুষ্যত্ব। সেটা যেখানে নষ্ট হবার ভয় থাকে, সেখানে সমস্ত ত্যাগ করেও মানুষের তাকে রক্ষা করবার চেষ্টা করা উচিত। নইলে যিনি স্বামীর স্বামী, তাঁর কাছে গিয়ে কি জবাব দেবে?"

শৈলজা কহিল, "তুমি যদি এত বোঝো, তবে কেন নিজে এমন হয়ে যাচ্ছ?"

কার্ত্তিক কহিল, "আমি যে আর মানুষ নেই! নইলে দেখ্‌তে পাচ্ছ না যে, যারা আমাকে কত ভয় কর্‌ত, তারাও এখন আমায় তৃণ জ্ঞান করে। আমি নিজের ইচ্ছেটাকে যতদিন আমার অধীনে রেখেছিলুম, ততদিন কেউ আমার সুমুখে মুখ তুলে কথা বল্‌তে সাহস কর্‌ত না।

এখন আমি সেই ইচ্ছার অধীন হয়ে সেই ইচ্ছার বিচিত্র মায়াজালে বদ্ধ হয়ে গুটিপোকার মত আবদ্ধ হয়ে পড়্ছি। ইচ্ছাটা এখন আর আমার নয়, আমিই আমার ইচ্ছার—আমার মায়ার—আমার মোহের। না হলে আমার এমন দুটো চোখ থাক্‌তে আমি অন্ধ হয়ে যাই? অন্ধ আমি নই, তা বেশ জানি, তবু দিনের আলো আমার সহ্য হয় না। ইচ্ছে ছিল, যে আর কিছু দেখ্‌ব না, অন্ধ হয়ে তোমাদের উপর প্রতিশোধ নেব। তোমরা জান্‌তে পার্‌তে না, কিন্তু প্রথম প্রথম আমি atropin দিয়ে চোখের দৃষ্টি কমাতে চেষ্টা কর্‌তুম আরও কত ওষুধ ব্যবহার কর্‌তুম্‌ তার ঠিক নেই; কিন্তু তখনও আমার আমিত্ব সম্পূর্ণ বজায় ছিল, তাই কিছুতেই এই চোখ দুটো এদের শক্তিকে ছাড়্‌তে চাইত না। কিন্তু আজ আর কোন ওষুধ ব্যবহার করিনে, এদের শক্তিও বোধ হয় যথেষ্টই আছে, তবু যেই বাইরের আলো লাগে, অমনি কে যেন এদের বন্ধ করে দেয়, শতচেষ্টাতেও আর খুল্‌তে পারি না। আমার একটা আত্মার পাশে কোথা থেকে আর একটা অন্ধকারের প্রেতাত্মা এসে যেন অচল অটল হয়ে বসে আছে। রাত হলেই সেটা যেন বাইরের অন্ধকারের সঙ্গে মিশে যায়। তখন আবার নিজের শক্তি ফিরে পাই বটে; কিন্তু সারাদিন একটা বিশ্রী রকম শক্তির অধীন থাকার দরুণই বোধ হয় রাত্রেও আমি ঠিক মানুষের মত হতে পারি না।”

কার্ত্তিকের কথা শুনিয়া শৈল অবাক হইয়া গেল। সে কিছুতেই ভাবিয়া পাইল না যে, এই মানুষটী কোন্‌ শক্তির দ্বারা আবিষ্ট হইয়া সমস্ত বুঝিয়া-সুঝিয়াও এমন হইয়া আছে। যে এমন পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আপনার চরিত্রের অন্তঃস্থল পর্য্যন্ত দেখিতে পাইতেছে, সে কেমন করিয়া ভূতাবিষ্টের ন্যায় কাজ করিতেছে, তাহা শৈল কেমন

করিয়া বুঝিবে? শৈল কাঁদিয়া-কাটিয়া দেখিয়াছে, মান অভিমান করিয়া দেখিয়াছে অনাহারে অনিদ্রায় কত দিন কত রাত্রি কাটাইয়া দেখিয়াছে, কিছুতেই কার্ত্তিকের দৈনিক জীবন-যাত্রার গতি এক চুলও পরিবর্ত্তিত করিতে পারে নাই। কতদিন প্রভাত হইতে সন্ধ্যা, সন্ধ্যা হইতে প্রভাত পর্য্যন্ত একাসনে কার্ত্তিকের নিকট বসিয়া কাটাইয়াছে, তবু কি করিলে যে সে আবার সুস্থ হইবে, আবার তাহার পূর্ব্বাবস্থা সে ফিরিয়া পাইবে, তাহা ঠিক করিতে পারে নাই। অথচ ইহা সে স্পষ্টই বুঝিয়াছে যে কার্ত্তিক স্নেহহীন নহে, কার্ত্তিক তাহার পত্নীর সম্পূর্ণ মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী; তাহার উপর পুত্র দেবীপ্রসাদের সামান্য কষ্টও সে সহ্য করিতে পারে না। এমনি-পাছে তাহার নিকটে আসিলে দেবীপ্রসাদের কোনরূপ অমঙ্গল হয়, সে জন্য পুত্রকে তাহার নিকট দিনের বেলায় সে আসিতেই দেয় না।

শৈলজা নিরুপায় হইয়া এই পুত্রের সাহায্যেই সময় সময় স্বামীকে তাহার অন্ধকার কোটর হইতে বাহিরে আনিতে পারে বটে, কিন্তু তাহাতে তাহার নিজের হৃদয়ে যে কতখানি অভিমানের ব্যথা জাগিয়া উঠে, তাহা সহজেই অনুমেয়। তথাপি পাছে অভিমান দেখাইলে স্বামী আরও কি করিয়া বসে, এই ভয়ে সে মান-অভিমান দেখানো ইদানীং একপ্রকার ত্যাগই করিয়াছে। আজ স্বামীর মুখে তাহার অবস্থার এতটা সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ শুনিয়া সে গদ্গদ কণ্ঠে বলিল, "যদি সর্ব্বস্ব ত্যাগ করেও তোমায় ফিরে পাই, তাও আমি করতে পারি। কিন্তু তুমি কি যে চাও, কি হলে যে তোমার ভাল হয়, তাই বুঝতে পারছি না।"

কার্ত্তিক কহিল, "যেদিন তুমি আমা-থেকে সম্পূর্ণ পৃথক হয়ে একটা পুরা মানুষ হয়ে দাঁড়াতে পারবে, সেই দিন বুঝবে।"

শৈল কহিল, "তুমি আমায় ত্যাগ কর্‌লে যদি সুস্থ হও, তবে তাই কর না কেন? আজ কতদিন থেকে সে কথা ত' বল্‌ছি।"

কার্ত্তিক কহিল, "কাকেও ত্যাগ কর্‌বার ক্ষমতা যদি আমার থাকৃত, তাহলে ত' আমি মানুষই থাকৃতুম। আমি যে এখন বদ্ধ জীব, শক্তি থাকৃতে শক্তি-হীন! শৈল, তুমি আমায় বুঝ্‌তে পার্‌বে না, কেন মিছে কষ্ট পাচ্ছ? যাও, বেশীক্ষণ আমার কাছে থাকৃলে হয়তো তুমিও আমার মত হয়ে যাবে। আমি বলেছি ত' তোমায় ত্যাগ করা আমার পক্ষে অসম্ভব। তবে যেদিন তুমি—উঃ, সে কি দিন! যেদিন সেও হার্‌বে, তুমিও হার্‌বে, আমি জিতব—"

শৈল কহিল, "কোন্ দিন? কোন্ দিনের কথা তুমি ভাব্‌ছ? বল, তোমার পায়ে পড়ি।"

শৈলজা কার্ত্তিকের হাত চাপিয়া ধরিয়া অনুভব করিল, কার্ত্তিকের শরীর সঘন কম্পিত হইতেছে। কার্ত্তিক শৈলর পাশে বসিয়া তাহাকে অতিশয় আবেগে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "ছিঁড়ে ফেল, ছিঁড়ে ফেল, শৈল, এ বন্ধন! তুমি মুক্ত হয়ে দাঁড়াও, আমিও মুক্ত হয়ে দাঁড়াই। পার্‌বে?" শৈলজা কাঁদিয়া ফেলিল। কার্ত্তিক তখন তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া একটী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল। শৈলজা চোখ মুছিতে মুছিতে বলিল, "এ জীবনে তোমার সঙ্গে আমার যে সম্বন্ধ তাতে তোমায় ত্যাগ করা আমার পক্ষে অসম্ভব, শুধু অসম্ভব নয়, সে চিন্তাও পাপ। তুমি আমায় ত্যাগ করে সুখী হতে চাও, হও, কিন্তু আমায় তোমার আশায় চিরদিনই বসে থাকৃতে হবে।"

কার্ত্তিক কহিল, "দেখদিকি শৈল, কত বড় অন্যায়! কত বড় অত্যাচার! পুরুষ মানুষ যা ইচ্ছে কর্‌তে পার্‌বে, আর মেয়ে মানুষের বেলাতেই যত নিয়ম, যত বন্ধন, যত পাপের বিভীষিকা! কিন্তু তোমাকে

এই আমারই জন্য, এই আমাকে ভালবাস বলেই আমায় ত্যাগ করতে হবে। তোমাকে দিয়েই আমি তোমাদের জাতের উপর পুরুষমানুষের এই অন্যায় অবিচারের প্রতিশোধ নেব। তোমাকেই একদিন পূর্ণ শক্তিতে বল্‌তে হবে যে, তুমি আমায় চাও না!"

শৈল তাড়াতাড়ি কার্ত্তিককে বুকের মধ্যে টানিয়া লইয়া বলিল, "সেদিন বোধ হয় আমি মর্‌ব।"

কার্ত্তিক তাহার মুখে চুম্বন করিয়া বলিল, "না, সেই দিনই তুমি তোমার যথার্থ জীবনকে খুঁজে পাবে, শৈল। সেই দিনই সামনাসামনি মুখোমুখি হয়ে দু'জনে দাঁড়াতে পার্‌ব।"

শৈলজা স্বামীর বুকে মুখ লুকাইয়া বলিল, "তোমায় এক মুহূর্ত্ত না দেখ্‌লে আমি থাকিতে পারিনে। সেই আমি তোমায় বলব, তোমায় চাইনে, তুমি চলে যাও? তুমি আমায় যে দিন গলা টিপে মার্‌তে পার্‌বে, সে দিনও ও কথা বল্‌তে পার্‌ব কি না সন্দেহ।"

কার্ত্তিক কহিল, "তুমি স্বেচ্ছায় না পার, আমি তোমাকে দিয়ে তাই করাব। আমাকে ভালবাস বলেই তুমি আমায় বল্‌বে যে, আমায় আর চাও না। আমি সেদিনের আশায় আমার জীবনকে ধরে রেখেছি। ভগবান কি দয়া করে এমন দিন দেবেন না?"

শৈল কহিল, "দয়া? তাকে তুমি দয়া বল? ছি ছি, যদি তিনি আমায় তোমাকে ত্যাগ কর্‌তে বাধ্য করান, তাহলে তাঁর দয়াময় নামে কলঙ্ক হবে।"

কার্ত্তিক শৈলজার বাহুপাশ হইতে আপনাকে মুক্ত করিয়া বলিল, "কবে তোমায় বোঝাতে পার্‌ব, শৈল? হায়, জানি না, সে কবে!"

শৈলজা আর থাকিতে পারিল না। টলিতে টলিতে বাহিরে চলিয়া গেল। কিন্তু সেদিন তাহার কোন কাজ হইল না। ভূতাবিষ্টের ন্যায়

সমস্ত দিন অনাহারে থাকিয়া, সন্ধ্যার পর গৃহ-দেবতার মন্দিরে প্রবেশ করিয়া একপাশে সে পড়িয়া রহিল। সকলেই তাহার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিল। কিন্তু সে আজ কাহারও কোন কথা শুনিল না; গৃহদেবতার মন্দিরে অনাহারেই শয়ন করিয়া রহিল। দেবু কাঁদিয়া কাঁদিয়া বহুবার মাতার কাছ হইতে ফিরিয়া গেল, দাসদাসীগণ সাধ্যসাধনা করিয়া শ্রান্ত হইয়া পড়িল; তবু শৈলজা যেন চেতনা-হীন!

তাই কি হবে, ঠাকুর? আমি কি ইচ্ছা করে আমার হৃৎপিণ্ড ছিঁড়ে ফেলে দেব? এ আজ আমি কি শুনলুম, ঠাকুর! এ আমায় কেন শোনালে, নারায়ণ! স্বামী যখন এত জোর করে বলছেন, তখন নিশ্চয়ই তা হবে। কিন্তু তা হলে কি হবে? কি নিয়ে আমি থাকব? আমি যে আর ভাবতেও পারিনে।

শৈলজার মনে হইল সমস্ত জগৎ ব্যাপিয়া একটা ভয়ানক হাহাকার উঠিতেছে। সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করিয়া বিশ্ব-সংসার উল্কা-বৃষ্টির মত দিকে দিকে ছুটিয়া ভাঙ্গিয়া যাইতেছে। তাহার কেবলি মনে হইতেছে যে, যদি স্নেহ মিথ্যা, ভালবাসা মিথ্যা, ভক্তি মিথ্যা, ধর্ম্ম মিথ্যা, মায়া মোহের বন্ধনমাত্র, তবে সত্য বস্তু কি? কি? সত্য বস্তু কি কেবল সর্ব্বপ্রকার বন্ধন হইতে মুক্ত, উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খল উদ্দেশ্যহীন ছুটাছুটি? না, না, কিছুতেই তা নয়।

শৈলজা প্রাণপণ-বলে মনে মনে বলিল, "না, তা নয়। ধর্ম্ম সত্য, বন্ধন সত্য, স্নেহ সত্য, ভক্তি সত্য, ভালবাসা সত্য—সত্য, সত্য, সত্য! এ সত্যের জগৎ, মিথ্যার নয়। মিথ্যা যা, তাই মোহ, তাই মায়া, তাই মানুষকে সত্য হতে চ্যুত করে, পাগল করে, চিরদিনের পথ হইতে দূরে লইয়া গিয়া অন্ধকারের মধ্যে আপনাকে নষ্ট করিয়া ফেলে। শৈলজা ভক্তিভরে গৃহ-দেবতাকে প্রণাম করিয়া পূজা-কক্ষ হইতে বাহির হইয়া

প্রথমে দেবুকে কোলে লইয়া অশ্রুপ্লাবিত বদনে বারবার তাহাকে চুম্বন করিল; তারপর কিছু আহার করিয়া একজন দাসীকে সঙ্গে লইয়া শ্বশুর ন্যায়রত্ন মহাশয়ের নিকট চলিয়া গেল।

শিবচন্দ্র পুত্রবধূকে বসিতে বলিয়া প্রথমতঃ পৌত্রকে ক্রোড়ে লইয়া আশীর্ব্বাদ ও চুম্বন দান করিলেন। তার পর বলিলেন, "আজ সমস্ত দিন তোমায় দেখিনি কেন মা? দেবু বার বার আমায় খবর দিয়েছে যে তুমি আজ তাকে কোলে নাও নি। কি হয়েছে মা?"

বধূ তখন কন্যা যেমন স্নেহময় পিতার নিকট তাহার সমস্ত মর্ম্ম-কথা ব্যক্ত করে, সেইভাবে অসঙ্কোচে সমস্ত বর্ণনা করিয়া বলিল, "যদি এই হয় ত' কি হবে, বাবা?"

ন্যায়রত্ন সমস্ত শুনিয়া বলিলেন, "ভয় কি মা, তোমারই জয় হবে। কার্ত্তিক যখন সমস্তই বুঝতে পেরেছে, তখন মেঘ কেটে আস্ছে। আমি তোমায় বল্‌ছি, মা, তোমার কোন ভয় নেই। তোমার যদি পরাজয় হয়, তাহলে বুঝ্‌ব, সংসার মিথ্যা, ধর্ম্ম মিথ্যা, সমস্ত বিশ্ব-রচনাই মিথ্যা।"

শ্বশুরের নিকট অভয় পাইয়া শৈলজা তখনই তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিয়া শ্বশুর-গৃহে তাহার যে দৈনিক কর্ম্ম আজ অসম্পন্ন ছিল, তাহা সম্পন্ন করিয়া শ্বশুরকে আহারাদি করাইয়া স্বগৃহে ফিরিয়া গেল।

১০

আজ মহালয়া। আজ এমন একটা দিন যে-দিন ঘরমুখো বাঙ্গালীর 'ঘর-ছাড়া' প্রাণগুলি গৃহের দিকে ফিরিবার জন্য ছটফট করে। যাহারা ছুটিতে পায় তাহারা ছোটে, যাহারা পায় না তাহারা অতি-কষ্টেই আপনাদের সংযত রাখে। আজ এমন একটা দিন যেদিন হিন্দুর ঘরে ঘরে মেশামেশি, জানাজানি, কানাকানি, আসা-আসির একটা সাড়া

পড়িয়া যায়। আজ যেন বাঙ্গালীর জীবনে মায়ের প্রবল আহ্বান জাগিয়া উঠিয়া পথে ঘাটে, বাসে প্রবাসে, কাজে-অকাজে, যে যেখানে আছে, সকলকে মনে পাড়াইয়া দেয় যে, আজ ফিরিবার দিন, আজ মায়ের কোল ছাড়া, মার কাছ ছাড়া অন্য কোথাও তাহাদের যথার্থ স্থান নাই। মা যেন হঠাৎ এক শারদ প্রভাতের নির্ম্মল আকাশের তলে শ্যামল বসনে শিশির-মুক্তাবলি-হারে সজ্জিত হইয়া তাঁহার নক্ষত্রলোক কৈলাস হইতে নামিয়া আসিয়া দাঁড়ান! অমনি চারিদিকে ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকি পড়িয়া যায়, 'ওরে, মা আসিয়াছেন রে, মা আসিয়াছেন।' আর সকল শত্রুতা, সকল দ্বন্দ্ব, সকল হানাহানি টানাটানি থামিয়া গিয়া সমস্ত বঙ্গ সংসার হইতে মায়ের পূজার আয়োজনের জন্য স্নেহ, প্রেম, ভক্তির কোলাহল উত্থিত হয়!

আজ এমন একটা দিন, যেদিন সকলকেই মনে করিতে হইবে যে সে, এই বিশ্ব পরিবারের একান্নভুক্ত, সকলের আপনার জন। যাঁহারা বহুপূর্ব্বে চলিয়া গিয়াছেন, "অতীত কুলকোটীনাং সপ্তদ্বীপনিবাসিনাং সহ" আজ স্মরণ করিতে হইবে যে এই প্রকাণ্ড জগৎ একটি মহা আলয়— প্রকাণ্ড একান্নভুক্ত সংসার! ইহাকে সারা বৎসর ধরিয়া বহু কোটী অংশে বিভক্ত করিয়া রাখিয়াছি এবং এক একটী ক্ষুদ্রতম অংশকে আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ বলিয়া মনে ভাবিয়াছি। কিন্তু আজিকার এই শিশির-স্নাত শেফালির গন্ধ দিকে দিকে ছুটিয়া সমস্ত বঙ্গের হৃদয় একটী মাত্র গন্ধের বন্ধনে বাঁধিয়া ফেলিয়াছে! সমস্ত বঙ্গ দেশের শস্য-ক্ষেত্র আজ একই শোভায় একই গন্ধে সর্ব্বদিক ভরিয়া ফেলিয়া একই জননীর আগমন জানাইয়া দিতেছে। আজ একই জননীর উৎসুক স্তন হইতে ক্ষীরধারা পান করিতে হইবে; তাই আজ এত তাড়াতাড়ি, এত হুড়াহুড়ি! আজ তাই ভাগা-ভাগির আঁটাআঁটি ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া বিশ্বের প্রাঙ্গণে অনন্ত আকাশের

চন্দ্রাতপতলে সর্ব্বলোক মন্দিরে বিশ্ব-মাতার জন্য মঙ্গল ঘট স্থাপিত করিতে হইবে। মায়ের জন্য বিশ্ব-হৃদয়-সিংহাসন আম্র গঙ্গা জলে বিল্ব-দলে পূজিতে হইবে।

আজ মা স্বয়ং ডাকিতেছেন! কে বসিয়া থাকিবে? কে এমন মাতৃহারা সর্ব্বস্বহারা দিক্‌ভ্রান্ত পথিক আছে যে আজ মাকে ছাড়িয়া অন্য দিকে যাইবে? মাগো, তোমার গভীর উদাত্ত স্বরে ডাক, "কে আছিস্, ওরে মাতৃহারা স্নেহহারা কে আছিস্, ছুটে আয়! আজ আমি এসেছি, ওরে, আর ভয় নাই।" বল মা সেই বেদময়ী সমবেতকারিণী ঐক্য-সাধিনী বাণী, যাহা কোন্ সুদূর অতীতে সরস্বতী দৃষদ্বতী-তীরে প্রথম ধ্বনিত হইয়া উঠিয়া কতযুগের কত যুগান্তের মধ্য দিয়া আজও আমাদের কর্ণে এক হইবার মহামন্ত্র রূপে ধ্বনিত হইতেছে! বল সেই কথা, "সংগচ্ছধ্বং সংবদধ্বং সং বো মনাংসি জানতাং"—মিলিত হও এক কথা বল, তোমাদের চিত্তও এক হউক!' মনে বাক্যে কার্য্যে এক হও, মিলিত হও, এক মায়ের পুত্র বলিয়া আপনাকে স্বীকার কর। যাক্, সেই বাণী দিকে দিকে ছুটিয়া যাক্। সমস্ত জগতের হৃদয়ে সেই বাণী ধ্বনিত হউক—সকলে জাগিয়া উঠিয়া বলুক, "আমরা এক মায়ের ছেলে, আমরা পর নহি, আমরা নিতান্তই আপনার জন,—আমরা এক মায়ের এক মহা-আলয়ে একই স্তন্য-দুগ্ধে লালিত পালিত জীবিত রহিয়াছি। আমরা বহু তবু একের, আমরা বিচিত্র তবু একের, আমরা বিচ্ছিন্ন তবু একের সত্তায় সত্তাবান, একই কোলে আশ্রিত!'

শশিভূষণ তাহার পিতার নিকট চলিয়া গিয়াছে। অন্ধ বিদ্যালয়ের ছাত্রগণও ছুটি পাইয়াছে। সর্ব্বানন্দ আজ সকালে জাগিয়া ভাবিল, সে কোথায় যাইবে? তাহার যাইবার মত স্থান কোথায়? মন তাহার যাই-যাই করিতেছে, অথচ যাইবার মত, আজিকার মত দিনে আশ্রয়

পাইবার মত স্থান তাহার নাই! সর্ব্বানন্দ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া শয্যার উপর পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিল। এমন সময় রঘুনাথ আসিয়া তাহার শয্যার উপর কয়েক খানি পত্র ফেলিয়া দিয়া বলিল, "ছোট বাবু, আজ কি রান্না হবে,—বামুন ঠাকুর জিজ্ঞেস কর্‌ছেন।" সর্ব্বানন্দ উঠিয়া বসিয়া একখানা চিঠি খুলিতে খুলিতে বলিল, "আজ আমি এখানে খাব না, বাগবাজারে যাব, তোমরা যা হয় রেঁধে নাও গে।" রঘুনাথ হাসিয়া বলিল, "আজ আমারও নেমতন্ন আছে, বামুন ঠাকুরও কালীঘাটে যাবেন।"

সর্ব্বানন্দ কোন উত্তর দিল না দেখিয়া রঘুনাথ চলিয়া গেল। কিন্তু সর্ব্বানন্দ পত্র পাঠ করিতে করিতে অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল, কারণ কার্ত্তিক লিখিয়াছে যে আজ তিন দিন হইতে দেবুর সর্দ্দি কাশী হইয়া প্রবল জ্বর দেখা দিয়াছে। ডাক্তার বলিতেছে যে উহার ভয়ানক নিউমোনিয়া হইয়াছে, কি যে হইবে কে জানে!

সর্ব্বানন্দ তৎক্ষণাৎ শয্যা ত্যাগ করিয়া সার্ট গায়ে দিয়া বাহির হইয়া পড়িল; এবং পোষ্ট অফিসে গিয়া জরুরি টেলিগ্রামে দেবুর বিষয় প্রশ্ন করিয়া পাঠাইল; এবং কলিকাতা হইতে ডাক্তার লইয়া যাইবে কি না তাহাও টেলিগ্রামের উত্তরে জানাইতে লিখিল।

পোষ্ট অফিস হইতে গৃহে ফিরিয়া সর্ব্বানন্দ রঘুকে বলিল, "আমি এখনি বাগবাজারে যাচ্ছি, তুমি তোমার নেমতন্ন সার্‌তে বারোটার পর যাবে। আমার নামে কোন টেলিগ্রাম এলে যেমন করে পার তা নিয়ে রাখ্‌বে, আমি বারোটার মধ্যে নিশ্চয়ই ফির্‌ব।"

রাস্তায় চলিতে চলিতে সর্ব্বানন্দ মনে মনে বলিল, আগমনীর বাঁশী বাজিতে না বাজিতে এ কি বাঁশী বাজাইয়া তুলিলি, মা? আমি কোথায় যাইব, কোথায় যাইব, ইহাই ভাবিতেছিলাম বলিয়া কি এইভাবে আমায়

ডাকিতে হয় ? দেবুকে যদি বাঁচাইতে না পারি, তাহা হইলে কার্ত্তিকের সুস্থ হওয়ার যে আর কোন আশাই থাকিবে না !

সর্ব্বানন্দ ব্যস্তভাবে রান্না ঘরের দিকে যাইবামাত্র সরোজ জিজ্ঞাসা করিল, "আজ যে এত তাড়া সর্ব্ব-দা ? বেলা দশটা না বাজ্‌তেই খাবার তাগিদ কর্‌ছ ! মার আর সুকুর হুকুমে তোমার জন্য আজ যে কত রকম আহার্য্যের ব্যবস্থা হচ্ছে, তার আর ঠিক নেই। তোমার যদি অন্য কোন কাজ থাকে ত আজ আর তা হচ্ছে না, সেটা জেনে রেখো।"

সর্ব্বানন্দ কহিল, "তা হবে না, সরোজ, আমি গঙ্গাস্নান কর্‌তে যাচ্ছি। ফিরে এলে যা হয় তাই চাট্টি বেড়ে দিয়ো। আমায় আবার বারোটার আগেই বাসায় পৌঁছুতে হবে।"

সরোজ কহিল, "ব্যাপার কি ? বাসায় আজ কিসের আয়োজন করেছ ?"

সর্ব্বানন্দ কহিল, "কোন আয়োজন নেই, আমার একটা বিশেষ কাজ আছে।"

সরোজ কহিল, "তা হবে না, সর্ব্ব-দা ; আজ তোমায় ভাল করেনা খাইয়ে আমরা ছাড়্‌তে পার্‌ব না। আমাদের সমস্ত আয়োজন নষ্ট করো না।"

সর্ব্বানন্দ কহিল, "সরোজ, আমার বড্ড দরকার ; আজ আমায় মাপ কর, ভাই। আজ কিছুতেই দেরী কর্‌তে পার্‌ব না।"

ইতিমধ্যে সুকুমারী আসিয়া পড়িয়া বলিল, "বাঃ, তা কেমন করে হবে ? কাল আপনি নিজে যেচে নেমতন্ন নিয়ে গেলেন, মস্ত একটা খাবারের ফর্দ্দ দিয়ে গেলেন, আর আজ আপনার মত ঘুরে গেল ! এ হতেই পরে না, আমি মাকে বলে দিচ্ছি।"

সর্ব্বানন্দ ব্যস্ত হইয়া বলিল, "ও সুকু, শোনো, শোনো।" আর

শোনো! সুকুমারী চিন্ময়ীর নিকট চলিয়া গেল। সরোজ একটু চিন্তিতভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "কি হয়েছে সর্ব্ব-দাদা, আমায় বল্‌বে না?"

সর্ব্বানন্দ বলিল, "তোমাদের মিছিমিছি ব্যস্ত করে কি হবে?"

সরোজ কহিল, "না বল্‌লে আরও বেশী ব্যস্ত হব, তা কি বুঝ্‌তে পার্‌ছ না?"

সর্ব্বানন্দ বলিল, "দেবুর নিউমোনিয়া হয়েছে, হয় তো আজই তিনটের ট্রেনে আমায় ডাক্তার সঙ্গে করে শিবরামপুর যেতে হবে। আজ চিঠি পেয়েই টেলিগ্রাম করেছি, দেখি, সে এখন কি লেখে!"

সরোজ কহিল "টেলিগ্রামের কি উত্তর আস্‌বে, আমরা তা কি করে জান্‌তে পার্‌ব?"

সর্ব্বানন্দ কহিল, "ঐ দেখ, ঐ ভয়ে আমি তোমাকে কিছু বল্‌তে চাচ্ছিলুম না।"

সরোজ কহিল, "এই খবর আমার কাছে লুকিয়ে রাখ্‌তে?"

সর্ব্বানন্দ কহিল, "তোমাকেই আমার বিশেষ ভয়। যাক্, ব্যস্ত হয়ো না, ব্যস্ত হয়ে ত কোন লাভ নেই।"

আজ প্রভাতে উঠিয়া সরোজ মনের মধ্যে যতখানি উৎসাহ অনুভব করিয়াছিল, এক নিমেষে সে সমস্তই চলিয়া গেল। দেবু যে কার্ত্তিকের পক্ষে কতখানি, তাহা সে বহুবার সর্ব্বানন্দের মুখে শুনিয়াছে, সেই দেবীপ্রসাদের এমন অসুখ! না জানি, কার্ত্তিক তাহার অন্ধকার ঘরের মধ্যে কি করিতেছে! যে দেবীপ্রসাদের জন্য সরোজও এই দূর হইতে তীব্র আকর্ষণ অনুভব করে, না জানি, সেই পুত্রের জন্য কার্ত্তিকের অন্ধকার কারাগারের প্রাচীর আরও কত-না কঠিনতর, দুর্ভেদ্যতর হইয়া উঠিয়াছে! সরোজের মুখ উৎকণ্ঠায়, আশঙ্কায় বারবার বর্ণ পরিবর্ত্তন করিতে লাগিল। সর্ব্বানন্দ তাহার মানসিক অবস্থা অনুভব

করিয়া বলিল, "সরোজ, ব্যস্ত হয়ো না ভাই, ভগবানের ইচ্ছার উপর কারও হাত নেই। তিনি যা চাইবেন, তা হবেই। তাড়াতাড়ি আমায় যা হয় একটা ভাতে-ভাত দিয়ে বিদেয় করে দিয়ো। আমি স্নান করে আসি।"

সর্ব্বানন্দ স্নান করিতে চলিয়া গেল। আর সরোজ সেই রান্নাঘরের চৌকাঠের উপর বসিয়া পড়িয়াই ভাবিতে লাগিল। সুকুমারী ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "কি হয়েছে, সরো-দি? তুমি অমন করে বসে পড়লে কেন?" সরোজ কোন উত্তর দিল না। ভিতর হইতে রাঁধুনী ঠাকুরাণী বলিলেন, "সরোজ দি, তাহলে ভাতে-ভাত চড়িয়ে দি?"

সুকুমারী ব্যস্ত হইয়া বলিল, "কেন? কেন? কি হয়েছে?"

রাঁধুনী বলিলেন, "সর্ব্ববাবু বলে গেলেন যে ওঁকে এখুনি যেতে হবে, দেবু না কে, তার ভারী অসুখ করেছে। তাই শুনে সরোজ দি ভয়ে অমনি কাঁটা হয়ে বসে পড়েছে।"

সুকুমারী বুঝিতে না পারিয়া বলিল, "কি হয়েছে? কার অসুখ করেছে?"

সরোজ এইবার উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "বামুন দি, তুমি ভাতে-ভাত চড়িয়ে দাও। এস সুকু, আমরা উপরে যাই। দেবুর নিউমোনিয়া হয়েছে, এখান থেকে ডাক্তার নিয়ে সর্ব্বদাদাকে আজই যেতে হবে।"

সুকুমারী এবার সমস্তই বুঝিল। তাহারও মনে আজ অনেকখানি আনন্দ সঞ্চিত হইয়াছিল। সেও রাত্রি থাকিতে উঠিয়া সর্ব্বানন্দের জন্য বহু আয়োজন করিতেছিল। কিন্তু হায়! সমস্তই বৃথা হইল। সর্ব্বানন্দকে আজ সে কিছুতেই ধরিয়া রাখিতে পারিবে না।

সর্ব্বানন্দ আহারাদি সারিয়া গমনোদ্যত হইলে, সরোজ সঙ্কুচিতভাবে বলিল, "সর্ব্ব-দা, আমি কি কোন দরকারে লাগ্‌তে পারি না?"

সর্ব্বানন্দ বলিল, "তুমি আর এ বিষয়ে কি করতে পার ?"

সরোজ কহিল, "দয়া করে ভেবে দেখ সর্ব্ব-দা হয়তো আমার দ্বারাও কোন কাজ হতে পারে।"

সর্ব্বানন্দ তাহার কাতরতা দেখিয়া মনে মনে কি একটা কথা চিন্তা করিয়া বলিল, "হয়তো এ বিষয়ে তুমি অনেকখানি সাহায্যই করতে পারতে, কিন্তু আমি তা নিতে পারছি না।"

সরোজ কহিল, "কেন ?"

সর্ব্বানন্দ কহিল, "কেন—তা কি তুমি বুঝতে পারছ না ?"

সরোজ কহিল, "আমি বুঝতে চাইনে, আর বুঝবও না, সর্ব্ব-দা—"

সর্ব্বানন্দ বাধা দিয়া বলিল, "ছি সরোজ, ছেলেমানুষী করো না। মা কি মনে করবেন ? শশী ঠাকুরদা কি মনে করবে ? দশজনে কি ভাববে ? তোমার সেখানে যাওয়া হতেই পারে না। তবে—"

সরোজ কহিল, "কি তবে ? বল, কি বলছিলে ?"

সর্ব্বানন্দ কহিল, "জানিনে হয় তো যদি তোমাকে ছাড়া আর কোন উপায় না পাই, তখন ভগবান হয়তো আমাকে তোমার কাছেও সাহায্য নিতে বাধ্য করতে পারেন। তখন তোমার কাছে আসব, আজ তোমাকে আমার কোন প্রয়োজন নেই।"

সরোজ কহিল, "তোমার না থাকতে পারে কিন্তু আমার আছে, আমি আর থাকতে পারছি না। পলে পলে দণ্ডে দণ্ডে আমি এ মরণের দিকেই এগিয়ে চলেছি। তুমি কি একটুও দয়া করবে না ? এক দিনের জন্য, এক মুহূর্ত্তের জন্য কর্ত্তব্যের দিক্ থেকে সাধারণের মতামতের দিক্ থেকে ফিরে মানুষের অন্তরের দিকে করুণ দৃষ্টিতে চাও,—সহানুভূতি নিয়ে কাতর প্রাণীদের প্রাণের মধ্যে গিয়ে দাঁড়াও, সর্ব্ব-দা, তা হলেই তোমার মনে দয়া হবে।"

সুকুমারী নিকটেই দাঁড়াইয়াছিল। সে সরোজের হাত ধরিয়া কাতর-ভাবে বলিল, "সরো-দি, তুমি ত এমন অবুঝ ছিলে না! ছি, এ-সব কথা কেন বলছ? যাও, আপনার কাজে যাও! আর দাঁড়িয়ো না।"

সরোজ কহিল, "না, না, দাঁড়াও। একটা কথা শোনো, যাবার আগে, কি টেলিগ্রাম আসে, সেটা বলে যেও।"

সর্ব্বানন্দ কহিল, "আমি নিজে আসতে পারব না, সরোজ, কেন না বড্ড দেরী পড়ে যাবে, তাহলে। তবে বলে যাচ্ছি, রোজ চিঠি দেব, মাকে দিয়ে পড়িয়ে নিও। আর আজ টেলিগ্রামে কি খবর আসে, রঘু এসে বলে যাবে।"

সর্ব্বানন্দ চলিয়া গেলে সুকুমারী সরোজকে বলিল, "ছি সরো-দি, তুমি এমন হয়ে যাচ্ছ কেন?"

সরোজ কহিল, "তুই কি জানবি, সুকু, ঐ দেবু যে তাঁর কতখানি, তা যে তুই কিছুই জানিস্ নে। দেবু যদি না বাঁচে, তা হলে কি যে হবে, তা মনে কর্‌তে আমার সমস্ত দেহ-মন অসাড় হয়ে যাচ্ছে! আজ মহালয়ার দিনে এ কি কথা শুন্‌লুম, সুকু। আজকের আগমনীর বাঁশীতে আমি যেন বিজয়ার বিদায়ের কাতর কান্না শুন্‌তে পাচ্ছি! মা মঙ্গলময়ী, মঙ্গল ক'র মা।"

সরোজ কাঁদিতে কাঁদিতে উদ্দেশে জগৎজননীর পদে প্রণাম করিল।

১১

শিবরামপুরের জমিদার-গৃহে প্রতি বৎসর যেরূপ ধূমধামে পূজা হইয়া থাকে, এবার তদপেক্ষা অধিকতর আয়োজন হইয়াছে। সমস্ত হিতৈষী ব্যক্তির, সমস্ত আমলা-ফয়লার অনুরোধ-উপরোধ উপেক্ষা করিয়া জমিদার বাবু এ বৎসর পূজার উপচার বহুল পরিমাণে বাড়াইয়া তুলিয়াছেন। নৃত্য-

গীতের জন্য দুই দল যাত্রা, চার দল কবি, ছয় দল বাই এমন কি একদল থিয়েটার-পার্টিকে আনাইয়া স্থানে স্থানে আসর করিয়া বোধনের দিন হইতে আমোদ চালাইবার ব্যবস্থা হইয়াছে। কেহ স্বেচ্ছায়, কেহ-বা অনিচ্ছায় এই সমস্ত আয়োজনের তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত হইয়াছে। কার্ত্তিক কাহারও কথা শুনিতেছে না। আজ কয়দিন হইতে তাহার সম্মুখে লোকের তিষ্ঠানো দায় হইয়া উঠিয়াছে। অন্ধকার ঘর হইতে কেবল আজ্ঞাই প্রচারিত হইতেছে, সেখানে উপদেশ বা মন্ত্রণা দিবার জন্য কাহারও যাইবার সাধ্য নাই। সর্ব্বানন্দ এই সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া বকিয়া ঝকিয়া সারা হইয়াছে, তবু কার্ত্তিক অচল, অটল।

দেবু যখন রোগ-যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করিতেছে, তখন বহির্ব্বাটীতে ও অন্তঃপুরে, সর্ব্বত্রই একটা বিরাট কোলাহল। সর্ব্বোপরি চারিটী যে তোরণ রচিত হইয়াছে, তাহার উপর হইতে ক্রমাগত আগমনীর বাঁশী বাজিতেছে। শৈলজাও যেন এ কয়দিনে পাগলের মত হইয়া গিয়াছে। তাহার ইচ্ছা, তাহার পুত্রকে লইয়া এই বীভৎস কোলাহল হইতে সে দূরে পলাইয়া যায়। কিন্তু স্বামীর মূর্ত্তি দেখিয়া সে ইচ্ছা সে প্রকাশ করিয়া বলিতে পারিতেছে না। সর্ব্বানন্দ কাতর হইয়া সপ্তমীর প্রভাতে কার্ত্তিকের ঘরে প্রবেশ করিয়া বলিল, "পুত্র-হত্যা কর্‌বার যদি ইচ্ছা না থাকে, তা হলে এখনই এ-সব থামিয়ে দাও। দেবু কাল সারারাত ঘুমোতে পারে নি।"

কার্ত্তিক কহিল, "দেবু ঘুমোতে পারে নি,—তাতে শিবরামপুরের জমিদারের কি এসে যায়? তার মস্ত নাম-ডাক, ভারী সম্ভ্রম, সে-সব রাখ্‌তে হবে ত! আমার ছেলে মর্‌ছে, সে কথা সে শুন্‌বে কেন?"

সর্ব্বানন্দ কহিল, "তোমার পায়ে পড়ি কার্ত্তিক, তুমি একটু স্থির হও।"

কার্ত্তিক কহিল, "আমার চাইতে স্থির কে? আমার যেটুকু প্রাণ ছিল, তাও মা দুর্গা এসে কেড়ে নিচ্ছেন। তাই ত' ভাল করে তাঁর পূজার বন্দোবস্ত করেছি। মা এসেছেন, লোকে পাঁঠা-মহিষ বলি দিচ্ছে। আমি শিবরামপুরের জমিদার, আমার ত একটা বড় রকম কিছু করার দরকার, আমি আমার ছেলে বলি দেব। পারবে কেউ আমার সঙ্গে?"

সর্ব্বানন্দ অনেক বুঝাইল। কার্ত্তিক একটা বিকট হাস্যে তাহার সমস্ত যুক্তি-তর্ক উড়াইয়া দিয়া বলিল, "চারি দিক থেকে অন্ধকার পাথরের পাঁচিলের মত ঘিরে আস্ছে। আসুক, কিন্তু আমিও দেখে নেব। ডুবে মরিত' এমন করে ডুব্ব, যাতে তোমরা বুঝ্তে পার্বে যে কাকে বেঁধে রেখেছিলে, কাকে ডুবিয়ে মার্লে। বুনো সিংহকে শেকল দিয়ে বাঁধ্লে সমস্ত ঘরখানাকে ভেঙ্গে-চুরে সে সেই ঘর চাপা পড়ে' তবে ত মর্বে! এখন এ হয়েছে কি?"

কার্ত্তিক বদ্ধ জন্তুর মত একটা সুগভীর শব্দ করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে হঠাৎ থামিয়া অতি করুণস্বরে ডাকিল, "দেবু, বাবা আমার—" এবং পরক্ষণে সর্ব্বানন্দর নিকটে আসিয়া তর্জ্জন করিয়া বলিল, "বেরোও এ ঘর থেকে, এ ঘরে আমি একা থাক্ব—অন্ধকারের মধ্যে আমি একা—একা।" সর্ব্বানন্দ জোর করিয়া কার্ত্তিককে নিকটস্থ বিছানায় শোয়াইয়া দিয়া একটা জানালা খুলিয়া দিল। বাহিরের আলো কার্ত্তিকের মুখের উপর আসিয়া পড়িতেই দুই হাতে সে মুখ ঢাকিয়া পাশ ফিরিয়া বালিসে মুখ লুকাইল। সর্ব্বানন্দ একখানা পাখা লইয়া তাহাকে বাতাস করিতে করিতে বলিল, "কার্ত্তিক, বল, তুমি কি চাও?"

কার্ত্তিক কাতর কণ্ঠে উচ্চারণ করিল, "আলো, আলো—অন্ধকারে ডুবে যাচ্ছি। আলো দাও। আলোকে অবজ্ঞা করেছিলুম অপমান করেছিলুম,

সেই পাপে সে আমার সামনে থেকে আজ তার ক্ষীণ রশ্মিটুকুও সরিয়ে নিচ্চে। দাও, আলো দাও, আলো, সর্ব্ব-দা আলো দিয়ে আমায় বাঁচাও।"

সর্ব্বানন্দ কহিল, "চোখ চেয়ে ফেলো, কার্ত্তিক, চেয়ে দেখ, আকাশ-ভরা আলো এসে তোমার দরজায় দাঁড়িয়েছে। তুমি তাকে ডেকে নাও।"

কার্ত্তিক উদ্‌ভ্রান্তের ন্যায় একবার মাথা তুলিয়া চাহিল। কি ভীষণ উন্মাদের ন্যায় দৃষ্টি! সর্ব্বানন্দ অপর দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিল, "কি দেখ্‌ছ, কার্ত্তিক?"

কার্ত্তিক পুনরায় বালিসে মুখ লুকাইয়া বলিল, "দেখছিলুম,—তোমার কথা সত্য কি না, অন্ধকার আমার কাছে হেরে আমার পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়েছে কি না! সে না গেলে ত আর আলো আমার কাছে আস্‌তে পার্‌বে না!"

সর্ব্বানন্দ কহিল, "এমন অবস্থাতেও তুমি পাগলামি ছাড়বে না? আলো-অন্ধকার, ছাইপাঁশ, সেই সব অর্থহীন প্রলাপ বক্‌বে? যাক ছাই, তোমার যা ইচ্ছে যায়, তুমি তাই কর, কিন্তু ঐ ছোট্ট ছেলেটা ত কোন দোষ করে নি, ওর উপর এ অত্যাচার কেন? ওকে বাঁচ্‌তে দাও। এই সব গোলমাল থামিয়ে দিয়ে নমো-নমো করে কোনমতে মায়ের পূজা সারো।"

কার্ত্তিক কহিল, "আমার কষ্ট হচ্চে, কি শৈলর কষ্ট হচ্চে, কি দেবুর কষ্ট হচ্চে, এ কথা আর সবাই শুন্‌বে কেন? আমরা যদি কেউ মরি, তাঁতে ত কারও কিছু আস্‌বে-যাবে না। তবে কেন তাদের প্রাপ্য আমোদে বাধা দেব? যদি তারা শোনে যে দেবু মরেছে, তাহলে তারা মা দুর্গার সাম্‌নে দাঁড়িয়ে মনে মনে বল্‌বে, 'মা, জমিদারের ছেলেটাকে নিয়েছ, তা বেশ করেছ, তুমি যা ভাল বুঝেছ করেছ, কিন্তু দেখো মা,

আমার ছেলেটিকে নিয়ো না। আমার ছেলেটিকে যে বাঁচিয়ে রেখেছ, এর জন্য এই নাও আমার নৈবিদ্দি, এই নাও আমাদের প্রণাম।' তাদের মধ্যে যদি কারো আমার মত অবস্থা হত ত আমিও যে রকম কথা ভাব্‌তুম, যে রকম কাজ কর্‌তুম, তারাও তাই কর্‌ছে, কেন না, তারাও মানুষ। তুমি মানুষকে এখনও চেন নি, সর্ব্ব-দা।"

সর্ব্বানন্দ কিছুক্ষণ চুপ করিয়া কি-একটা কথা চিন্তা করিল, শেষে বলিল, "তা হলে আমি দেবুকে এখান থেকে সরিয়ে টোলে খুড়ো মহাশয়ের ঘরে নিয়ে গিয়ে রাখ্‌ছি। আর আমি কিছুতেই তোমার কথা শুন্‌ব না।"

কার্ত্তিক কহিল, "কি! তুমি আমার কাছ থেকে দেবুকে কেড়ে নিয়ে যাবে?"

সর্ব্বানন্দ কহিল, "তুমি যদি রাক্ষসের মত তাকে মার্‌বার বন্দোবস্ত কর, তাহ'লে সাধ্য মত তাকে বাঁচাবার চেষ্টা কর্‌তে হবে বৈ কি!" কার্ত্তিক লাফাইয়া উঠিয়া অন্তঃপুরাভিমুখে ছুটিল, কিন্তু দুই-চারি পা যাইতে না যাইতেই ধরাশায়ী হইল। সর্ব্বানন্দ তাহাকে আরও দুই-একজন লোকের সাহায্যে তাহার কোটরে আনিয়া শয়ন করাইল। কার্ত্তিক তখন সংজ্ঞাহীন!

সর্ব্বানন্দ বহু চেষ্টা করিয়াও যখন তাহার মূর্চ্ছা ভাঙ্গাইতে পারিল না, তখন ব্যস্ত হইয়া সে ডাক্তারের নিকট সংবাদ পাঠাইল। ডাক্তার আসিয়া নানাবিধ ঔষধাদি প্রয়োগে প্রায় দুই ঘণ্টার উদ্যোগে কার্ত্তিককে সম্পূর্ণ সুস্থ করিলেন। সর্ব্বানন্দর আদেশে পূজা স্থানের সমস্ত শব্দ বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু কার্ত্তিক জাগিয়াই বলিল, "এ কি, নবৎ বাজ্‌ছে না কেন?" ডাক্তার তৎক্ষণাই কার্ত্তিকের আজ্ঞা পালন করিতে আদেশ দিলেন।

সর্ব্বানন্দ কার্ত্তিককে না জানাইয়া দেবীপ্রসাদকে সন্তর্পণে বুকে তুলিয়া টোলে লইয়া গেল। শৈলজা শিবচন্দ্রের দিকে কাতরভাবে চাহিয়া বলিল, "বাবা, হিতে বিপরীত হবে না ত ?"

শিবচন্দ্র ম্লান মুখে বলিলেন, "কোন ভয় নেই মা, আমার কাছে সে কিছুই কর্‌তে পার্‌বে না। তবে আমার ভয় এই, এখানে যদি দেবুর ব্যাধির আরও বৃদ্ধি হয়, তা হলে কি কর্‌ব ?"

শৈলজা কহিল, "এই ত ওর আপনার ঘর, এ ঘরে যদিও ভাল না হয়, তা হলে আর কোথাও আশা নেই।"

সন্ধ্যার পর কার্ত্তিক যখন তাহার পুত্রের ঘরে উপস্থিত হইয়া দেখিল, সে ঘর শূন্য, তখন সে সর্ব্বানন্দকে ডাকাইয়া পাঠাইয়া বলিল, "দেবুকে এ ঘর থেকে নিয়ে গেছ ? ভাল করনি সর্ব্ব-দা। এর ফল ক্রমেই টের পাবে।"

সর্ব্বানন্দ ক্রুদ্ধভাবে বলিল, "তা পাই পাব, তাই বলে তোমার মত বাপের তত্ত্বাবধানে ছেলেকে রাখ্‌তে পারি নে!"

কার্ত্তিক কহিল, "শৈলকে একবার পাঠিয়ে দেবে ?"

সর্ব্বানন্দ "দিচ্ছি" বলিয়া চলিয়া গেল। কার্ত্তিক পুত্রের ত্যক্ত শয্যার উপর পড়িয়া অতি মর্ম্মভেদী কণ্ঠে অথচ মৃদুস্বরে ডাকিল, "দেবু, ফিরে আয় বাবা!" কতক্ষণ যে সে এইভাবে ছিল, তাহা তাহার স্মরণ নাই ; কিন্তু যখন তাহার সংজ্ঞা হইল, তখন সে দেখিল, শৈলজা তাহার নিকটে বসিয়া তাহাকে বাতাস করিতেছে। কার্ত্তিক হঠাৎ তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল, "শৈল, সত্যই কি দেবু আমায় ছেড়ে গেল ?" শৈলজা এই অপ্রত্যাশিত ভয়ানক প্রশ্নে ভীত হইয়া প্রায় কাঁদ-কাঁদ ভাবে বলিল, "ষাট্, ও কি কথা বল্‌ছ তুমি ? তুমি চল, তোমায় আমি নিতে এসেছি,—দেবু ডাক্‌ছে।"

কার্ত্তিক একদৃষ্টে শৈলর মুখের দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া মৃদু স্বরে বলিল, "ডাক্‌ছে কিন্তু আমি যাব না! কেমন প্রতিশোধ নিচ্ছি, শৈল? আমি অন্ধ হয়ে যাচ্ছি, দেবুও চলে যাচ্ছে,—কেমন, আমায় বেঁধে রাখ্‌বে? আমার যেটুকু আলো ছিল, তাও আমি নষ্ট কর্‌ছি, যদি চোখে জল আসে ত চোখ উপড়ে ফেল্‌ব, তবু দেবুকে আর দেখ্‌তে যাব না। এইখানেই পড়ে থাক্‌ব, আমায় কেউ তোমরা আর এখান থেকে অন্য কোথাও নিয়ে যেতে পার্‌বে না। হয় এইখানে আমারও শেষ হবে, না হয়, অন্ধকার কারাগার থেকে একেবারে পূর্ণ আলোর মধ্যে আমি মুক্তি পাব!"

একজন দাসী আসিয়া সংবাদ দিল, দেবু মাতার জন্য ক্রন্দন করিতেছে, শৈলজা আর অপেক্ষা করিতে পারিল না, কাতরভাবে বলিল, "আমায় যে শাস্তি হয় দিও, কিন্তু চল, একবার ছেলেটার কাছে চল।"

কার্ত্তিক তর্জ্জন করিয়া বলিল, "যাও তুমি, আমি যাব না।"

শৈলজা উপায়ান্তর না দেখিয়া চলিয়া গেল। কার্ত্তিক সে রাত্রে কিছু আহার করিল না। মায়ের প্রসাদ লইয়া অনেক রাত্রে স্বয়ং শিবচন্দ্র আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কার্ত্তিক তখন তাড়াতাড়ি উঠিয়া পিতৃ-চরণে প্রণাম করিয়া তাঁহার প্রদত্ত আহার্য্য হইতে যৎসামান্য গ্রহণ করিয়া বলিল, "বাবা, আমায় দয়া করুন, এই ঘরে আমায় থাক্‌তে দিন।"

"তোমার সুমতি হোক" বলিয়া শিবচন্দ্র চলিয়া গেলেন।

সপ্তমী গেল, মহা অষ্টমীও চলিয়া গেল, কিন্তু দেবীপ্রসাদের ব্যাধি না কমিয়া বৃদ্ধির দিকেই চলিয়াছে। কলিকাতা হইতে যে ডাক্তার আসিয়াছিলেন, তিনি নবমীর দিন সর্ব্বানন্দকে নিভৃতে ডাকিয়া বলিলেন, "আশা ত মোটেই দেখ্‌ছি না। এক অক্সিজেন inhale করানো ছাড়া

এখন আর ওষুধও কিছু নেই।" সর্ব্বানন্দ কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিল, "তাই বলে আপনি এখন কোথাও যাবেন না।"

ডাক্তারটি ভদ্র; তিনি বলিলেন, "না, না, আমি কোথাও যাচ্ছি না। তবে আপনাদের আগে থেকে জানিয়ে রাখলুম।"

সর্ব্বানন্দ টেলিগ্রাম করিয়া আর একজন ডাক্তার আনাইবার বন্দোবস্ত করিল বটে কিন্তু প্রকৃতই যাহার সর্ব্বনাশ হইয়া যাইতেছে, সেই কার্ত্তিককে কিছুতেই তাহার পুত্রের নিকট আনিতে পারিল না। শৈলজা বুদ্ধিমতী। সেও তাহার পুত্রের অবস্থা দেখিয়া সমস্তই বুঝিতে পারিতেছিল; তথাপি পাছে কি করিতে কি হয়, এই জন্যই শুধু স্বামীকে ব্যস্ত করে নাই। কিন্তু তাহার স্বামীর অমতে পুত্রকে শ্বশুরালয়ে আনিয়া শেষে যে তাঁহাকে বাঁচাইতে পারিতেছে না, এই দুঃখেই তাহার প্রাণটা ছিঁড়িয়া যাইতেছিল। সপ্তমীর রাত্রে স্বামী যাহা বলিয়া ফেলিয়াছিলেন, শেষে যে তাহাই ঘটিতে চলিল! ইহা দেখিয়া সে অনাহারে অনিদ্রায় দিন রাত্রি যাপন করিতেছিল। তাহার কেবলই মনে হইতেছিল যে হয়তো কার্ত্তিকের কাছে থাকিলে দেবুকে এমনভাবে হারাইতে হইত না। হায়, হায়, এখানে আসিয়া সে এ কি করিল! এই দেবুকে যদি ফিরাইতে না পারে, তাহা হইলে সে কি করিয়া কার্ত্তিকের সম্মুখে গিয়া আবার কোন্ মুখে দাঁড়াইবে?

আজ বিজয়ার সন্ধ্যা। বর্দ্ধিষ্ণু শিবরামপুরের বহু গৃহ হইতে আজ বহু দুর্গাপ্রতিমা বাহির হইয়া গ্রামের রথতলায় সমবেত হইয়াছে। বহু ঢাক-ঢোলের শব্দে সারা গ্রাম মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে। রথতলায় প্রকাণ্ড মেলা বসিয়াছে। জমিদারের আজ্ঞায় কোন অনুষ্ঠানেরই ত্রুটি হয় নাই। আনন্দময়ীর আগমন ও অবস্থান যেরূপ সাড়ম্বরে হইয়াছিল, তাঁহার বিজয়াও তেমনি আলোকে গন্ধে শব্দে বিরাট হইয়া উঠিয়াছে।

দুঃখ করিবার বা পরের দুঃখের বিষয় চিন্তা করিবার অবসর আজ কাহারও নাই।

জমিদার মহাশয় তাঁহার দ্বিতল কক্ষের বাতায়ন হইতে স্বীয় প্রতিমার বিজয়া প্রোসেশনের আলো দেখিতে ছিলেন। পাশে কেবল একজন তাঁহার ভৃত্য। সেই মধ্যে মধ্যে তাঁহার অনুজ্ঞা বহন করিয়া লইয়া গিয়া অনুষ্ঠানের ত্রুটি সংশোধন করিতেছিল। অবশেষে বহু আলোক জনতা ও নানাবিধ বাদ্যের শব্দ সঙ্গে লইয়া মা যখন চলিয়া গেলেন, তখন কার্ত্তিক সহসা দুই হাত উর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত করিয়া চীৎকার করিয়া বলিল, "ওঃ, আর পারিনে, ফিরে আয়, একেবারে সব আলো নিয়ে যাস্‌নে! ওরে দেবু, ফিরে আয়।"

ভৃত্য তাহাকে ধরিয়া না ফেলিলে সে পড়িয়া যাইত। কিন্তু সে যখন কার্ত্তিককে ধরিল, তখন কার্ত্তিক প্রায় সংজ্ঞাহীন। ভৃত্য তাহাকে ধীরে ধীরে লইয়া গিয়া শয্যায় শয়ন করাইয়া দিল এবং ডাক্তারকে সংবাদ দিতে গেল।

কিন্তু প্রতিমা-বিসর্জ্জনের বাজনা বাজিয়া উঠার সঙ্গে সঙ্গেই যেন দেবীপ্রসাদেরও জগৎ-সংসার হইতে বিদায়ের সময় আসিয়া উপস্থিত হইল! সর্ব্বানন্দ ছুটিয়া আসিয়া কার্ত্তিককে বলিল, "যদি একবার দেখ্‌তে চাও ত এখনই এস।"

কার্ত্তিক তখন বিকট হাস্য করিয়া বলিল "আমি ত বিসর্জ্জন দিয়েছি, আবার কেন ডাক্‌তে এসেছ?"

সর্ব্বানন্দ কহিল, "ওরে রাক্ষস, তোর নিজের ছেলে যে!"

কার্ত্তিক কহিল, "অন্ধকারের ছেলে কখন আলো হয়? তুমি ভুল করছ সর্ব্ব-দা, আমার আবার ছেলে কোথায়? কা তে কান্তা কস্তে পুত্রঃ!"

সর্ব্বানন্দ তাহার সমস্ত বল প্রয়োগ করিয়া কার্ত্তিককে কোনমতে টানিয়া আনিয়া তাহার পুত্রের মৃতুশয্যার পাশে দাঁড় করাইয়া দিল। কার্ত্তিকের সে সময়ের সে মূর্ত্তি বর্ণনার অতীত! শৈলজা কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহার পায়ের নিকটে আসিয়া বলিল, "ওগো তোমারই দেবু, তুমি ফিরিয়ে আনো। তোমারই ছেলে,—ওগো শোনো, একবার শোনো!" কার্ত্তিক কাঁপিতে কাঁপিতে গিয়া শয্যার উপর আছড়াইয়া পড়িয়া বলিল, "নিয়ে গেছিস্, রাক্ষসি! সত্য সত্যই নিয়েছিস্! একটুও আমার জন্য রাখ্‌লিনে? ওঃ, আলো,—আলো, একটু আলো—"

শৈলজা কার্ত্তিকের পায়ের উপর মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেল।

১২

ক্ষণজন্মা পুরুষ মণিশঙ্কর অনেক কষ্টে ফৌজদারী আইনের কবল হইতে মুক্তিলাভ করিলেও শিবরামপুর এষ্টেটের ম্যানেজারি চাকরিটি তাহাকে খোয়াইতে হইল। চাকরি খোয়াইয়া উক্ত গ্রামেই সে মহা-আড়ম্বরে জ্যোতিষিক মতে আয়ুর্ব্বেদীয় ও হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা আরম্ভ করিয়া দিল। 'জ্যোতিষিক মতে'—এই কথা কয়টী সাইন বোর্ডে বড় বড় অক্ষরে লিখিবার তাৎপর্য্য এই যে রোগীর রোগও ভোগের কাল জানাইয়া কতদিন ধরিয়া তাহাকে ঔষধ সেবন করিতে হইবে এবং আন্দাজ কত টাকা তাহাকে ব্যয় করিতে হইবে তাহাও বলিয়া দেওয়া হইত; উপরন্তু রোগী বাঁচিবে কি না, এবং মরিলেও অন্তত পরজন্মে সে রোগমুক্ত হইবে কি না তাহাও সে সঠিক জানিতে পারিত!

অল্প দিনের মধ্যেই তাহার চিকিৎসার খ্যাতি চতুর্দ্দিকে বিস্তার লাভ করার নানা কারণের মধ্যে কেহ কেহ বলিত যে প্রাণী-বিজ্ঞানে ও শারীর বিজ্ঞানে তাহার অপূর্ব্ব অধিকারই অন্যতম। সেই কথার পোষকতায়

কেহ কেহ না কি ইহাও বলিয়াছেন যে মণিশঙ্কর প্রাণীগণের শ্রেণী-বিভাগের মধ্যে নানা প্রকার পরিবর্ত্তন আনয়ন করিয়াছে—যথা, অশ্বকে সে না কি মাংসাশী জীবের মধ্যে, না হয়, অন্তত অণ্ডজ জীবের মধ্যে ফেলিতে চায়, কারণ তাহার ঘোড়াটী অনেকবারই তাহাকে দংশন করিয়াছে এবং অশ্বের ডিম্ব প্রসব সম্বন্ধেও একটা প্রবাদ-বচন প্রচলিত আছে। অর্থাৎ, যাহা রটে তাহার কিছু ত বটে—এই শ্রুতি কখনও মিথ্যা হইতে পারে না! অতএব কোন কোন অশ্ব নিশ্চয়ই অণ্ডজ জীব।

শারীর বিজ্ঞান সম্বন্ধেও তাহার জ্ঞান এতই সূক্ষ্ম যে তাহা আছে কি না বুঝা যায় না! সে প্রমাণ করিয়াছে যে জীবে উপরকার চোয়াল নাড়িয়া আহার করে; দেহে যত নাড়ী আছে সমস্তই উদরের বত্রিশ হস্ত পরিমিত নাড়ী হইতে উদ্ভূত এবং প্লীহা ও যকৃৎ উভয়ই মূর্ত্তিমান রোগযন্ত্র, অঙ্গ ব্যবচ্ছেদ করিয়া উভয় যন্ত্রকে বাহির করিয়া ফেলিয়া দিতে পারিলে সর্ব্ব প্রকার রোগ হইতে মানব মুক্তিলাভ করিতে পারে।

সে তাহার প্রচণ্ড গবেষণার বলে বিশেষভাবেই ইহা প্রমাণিত করিয়াছে যে ইংরাজেরা আমাদের দেশের জন-সাধারণকে চিরকাল দুর্ব্বল করিয়া রাখিবার জন্যই দেশে কুইনাইন নামক বিষের আমদানি ও প্রচার করিতেছেন। ম্যালেরিয়া জ্বর আর কিছুই নহে, সে ঐ বিষেরই কার্য্য। এই মতের পোষকতায় সে আরও বলে যে আমাদের দেশে অতীত যুগে বহুপ্রকারের জ্বর ছিল বটে কিন্তু ম্যালেরিয়া জ্বরের উল্লেখ নিদান চরক সুশ্রুত পাঁচন-সংগ্রহ প্রভৃতি কোন গ্রন্থে নাই; অতএব ইহা যে কুইনাইনেরই আমদানি হইতে উদ্ভূত সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

চিকিৎসা ব্যবসায় ব্যতীত আরও একটি অপূর্ব্ব ব্যবসায় সে তাহার জ্যোতির্ব্বিদ্যা বা অন্য কোন গুণের দরুণ প্রবল-ভাবে চালাইতেছিল। সে আর কিছুই নয়, পুলিশের গোয়েন্দাগিরি। আজ কাল সন্ধ্যার পর হয়

সে দারোগার আটচালায় না হয় তাহার ডিস্‌পেনসারিতে রাত্রি সাড়ে নয়টার পর কয়েকজন গুপ্তচরের সহিত বসিয়া জল্পনা-কল্পনায় ব্যাপৃত থাকিত। সে চিকিৎসা-ব্যপদেশে বহু গৃহের গুহ্য কথা জ্ঞাত হইয়া তাহা হইতে বেশ দুই পয়সা উপার্জ্জনও করিতেছিল।

মণিশঙ্করের মাতা মনোরমা দেবীও ইতিমধ্যে তাঁহার সংসারটী বেশ গুছাইয়া লইয়াছেন। পুত্রের বিবাহ দিয়া পৌত্রের মুখ দেখিয়াছেন এবং তাঁহার হাতেও বেশ দুই পয়সা জমাইয়া স্বামীর নিকট গমন করিয়া শেষ বয়সে ৺কাশীবাস করিবার কল্পনাও তাঁহার মনে এখন মধ্যে মধ্যে উদয় হইতেছে। পুত্রকে পূর্ণরূপে সংসারী করিয়া তিনি একদিন তাঁহার কাশী-গমনের ইচ্ছা প্রকাশ করিলে মাতৃভক্ত পুত্র বলিল, "সে কি হয় মা, এর মধ্যেই কাশী যেতে দেব কেন? আমি মনে মনে যে ফন্দী আঁটছি তাতে যে তুমি না হলে চলবেই না।"

মাতা কহিলেন, "কি ফন্দী?"

পুত্র কহিল, "তুমি ত জান যে কালিকা বাবুর দৌহিত্রকে বিষ দিয়ে মেরে ফেলে কার্ত্তিক এখন পাগলের ভাণ করে পড়ে আছে।"

মাতা কহিলেন, "কি ভয়ানক! সে কি কথা বলিস্ রে?"

পুত্র কহিল, "এই কথা এবং তাই প্রমাণ কর্‌তে হবে।"

মাতা কহিলেন, "অমন কাজ করো না, বাবা। ওদের অন্নে আমাদের দেহ, ওদের অপকার কর্‌বার চেষ্টা কর্‌লে—"

পুত্র কহিল, "দোষীকে শাস্তি না দিলে সমাজ বল, ধর্ম্ম বল, কিছুই টেঁক্‌বে না। বিশেষতঃ আমি কালিকাবাবুর বংশের ত কারও কিছু কর্‌তে চাচ্ছি না। কার্ত্তিকের সঙ্গে আমার আজন্মের বিবাদ, তাকে জব্দ কর্‌তেই হবে। ফৌজদারীতে যখন আমি ওরই জন্য পড়ি তখন ওই আমায় জেলে দেবার চেষ্টা করেছিল।"

মাতা কহিলেন, "কিন্তু ওর স্ত্রী, ওর বাপ, ওর বন্ধু তোমায় বাঁচিয়েছেন। না মণি, আর ও সব নয়। এখন্ যা কর্‌ছ, তাই কর। আর ওদের দিকে নজর দিয়ো না, তাহলে যা আছে তাও যাবে।—আমি এ বিষয়ে তোমায় কোন সাহায্য কর্‌ব না, এমন কি যদি জান্‌তে পারি তুমি ঐ চেষ্টা কর্‌ছ, তাহলে সব কথা প্রকাশ করে দেব, না হয় এখান থেকে চলে যাব।"

মণিশঙ্কর তাহার মাকে চিনিত। তিনি যদি কোন বিষয়ে অমত করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে স্বমতে আনয়ন করা মণির সাধ্যাতীত। মণি অগত্যা নিরুপায় হইয়া বাহিরে চলিয়া গেল।

১৩

আঘাতের প্রতিঘাতই প্রকৃতির নিয়ম। যত জোরে আঘাত দিবে, ঠিক তত জোরেই সে আঘাত ফিরিয়া আসিয়া আঘাতকারীকে প্রতিঘাত করিবে। কার্ত্তিকের অস্বাভাবিক বলপ্রয়োগ, সংসারের উপর স্বজনের উপর সর্ব্বোপরি নিজের উপর বলপ্রয়োগ, সমস্তই ফিরিয়া আসিয়া একসঙ্গে তাহাকেই আঘাত করিল। সে মনে করিয়াছিল যে, বল-প্রয়োগে সে প্রমাণ করিয়া দিবে, স্নেহ কিছুই নয়, ধর্ম্ম কিছুই নয়, সমাজ-বন্ধন কিছুই নয়, বন্ধন-হীন স্বেচ্ছাচারিতাই একমাত্র সত্য। তাহাকে যে তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে সুখী করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে, ইহাও অধীনতা, ইহাতেও তাহার আত্মার অপমান করা হইয়াছে। সে জোর করিয়া প্রমাণ করিতে চাহিয়াছিল যে জগতের সমস্তই নিয়মের অধীন বটে কিন্তু মানুষের আত্মাই একমাত্র স্বাধীন বস্তু। আত্মার একমাত্র সুখ আপনার স্বাধীনতাকে অনুভব করা। সমস্ত উৎসর্গ করিয়া সে প্রমাণ করিতে চায় যে পূর্ণ স্বাধীনতাই মানবাত্মার স্বসত্তানুভব, তাহাই তাহার একমাত্র

সত্য অভিব্যক্তি। সে কিছুতেই বুঝিবে না যে মানুষের জীবনও জগৎ-ব্যাপী মহা নিয়ম-চক্রের উপর অধিষ্ঠিত। সে বলপ্রয়োগে প্রমাণ করিতে চাহিয়াছিল যে মানুষের জন্যই নিয়ম, নিয়মের জন্য মানুষ নয়। কিন্তু এই জগৎ-ছাড়া, স্বভাব-ছাড়া উচ্ছৃঙ্খলতা তাহাকেই যেমন আঘাত করিল এমন আর কাহাকেও নয়। জোর করিয়া অন্ধ হইতে গিয়া সে কাহার কি ক্ষতি করিল? নিজের অসীম স্নেহের বিরুদ্ধে বলপ্রয়োগ করিয়া প্রাণাধিক পুত্রকে বিসর্জ্জন দিয়া সে কাহার কি ক্ষতি করিল? এই পরম-স্নেহময়ী শৈলজার উন্মুখ ভাল বাসাকে সবলে পদ-দলিত করিয়া সে কাহার অনিষ্ট করিল? সমস্ত সংসারকে সে একটা কাল্পনিক স্বেচ্ছাচারী স্বাধীনতার জন্য নষ্ট করিতে গিয়া কাহাকে বেশী আঘাত দিল? সংসার ত সেই আপন নিয়মেই চলিতেছে, সেই ত প্রভাত তেমনি প্রতিদিন আসিতেছে, সেই ত প্রতি সন্ধ্যায় কর্ম্মক্লান্ত মানব আপন-নীড়ে স্নেহ-ভালবাসার বন্ধনের মধ্যে ফিরিয়া আসিতেছে, সেই ত সমস্ত জগৎ একই নিয়মে সুখে-দুঃখে হাসিতেছে, কাঁদিতেছে। লোকসান ত আর কাহারও হইল না! কৈ, কেহ ত বুঝিতে চাহিল না যে এই অনন্ত বন্ধনের মধ্যে এই সমাজ, সংসার, স্নেহ, কর্ত্তব্য, ধর্ম্ম প্রভৃতির মধ্যে সুখ নাই—সুখ আছে, কেবল স্বেচ্ছার স্বাধীনতায়, সুখ আছে কেবল বন্ধন-হীন ইচ্ছা-শক্তির পরিচালনায়, সুখ আছে কেবল পাখীর মত অনন্ত আকাশে আপন ইচ্ছা-অনিচ্ছার দুই পক্ষ মেলিয়া উড়িয়া বেড়ানোয়?

দেবুর মৃত্যুর পর সাত-আট দিন কার্ত্তিকের কোন প্রকার সংজ্ঞা ছিল না। সে যেন কিছুদিনের জন্য একেবারে অতল অন্ধকারে তাহার অস্তিত্বকে সম্পূর্ণরূপে হারাইয়া ফেলিয়াছিল। তারপর অনেক সেবা-শুশ্রূষায় যখন সে ক্রমশ সুস্থ হইতে লাগিল, তখন তাহার মনে ধীরে ধীরে সমস্ত পূর্ব্ব স্মৃতিই সজাগ হইয়া উঠিতে লাগিল। তাহার অবসন্ন

মন যখন ক্রমশ তাহার লুপ্ত শক্তিটুকু আবার ফিরিয়া পাইতেছিল, দেহ যখন তাহার হারানো স্বাস্থ্য পুনর্লাভ করিতেছিল, তখন একদিন শৈলজা তাহার পুত্রশোক, তাহার দিবারাত্রি পরিশ্রমের উত্তেজনা, তাহার বহু রাত্রি-জাগরণের ক্লান্তি, সর্ব্বোপরি তাহার নারী-হৃদয়ের সর্ব্বংসহা শক্তিকে দুই চোখের দৃষ্টির মধ্যে পুঞ্জীভূত করিয়া কার্ত্তিকের মুখের উপর ঝুকিয়া পড়িয়া বলিল, "বল, তুমি কি হলে সুস্থ হবে?" কার্ত্তিক তখন অতি ক্লান্তভাবে অথচ স্নেহ-সকাতর দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া চাহিয়া বলিল, "আর কেন, শৈল? আর ও কথা নয়।"

শৈল কহিল, "না, তা হবে না। আমি বল্‌ছি যে আজ আমি সব পার্‌ব। আমি এত দিন যা সহ্য করেছি, তাতে যদি কিছু শিক্ষা লাভ করে থাকি, কিছু শক্তি পেয়ে থাকি ত, সেই জোরে বল্‌ছি যে আজ আমি সমস্তই পার্‌ব।"

কার্ত্তিক উত্তেজিতভাবে উঠিয়া বসিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না; আজ কত বর্ষব্যাপী প্রচণ্ড চেষ্টার শ্রান্তি তাহার সমস্ত দেহ-মনের উপর চাপিয়া বসিয়াছে। এতদিন ধরিয়া নিজের উপর যে অত্যাচার সে করিয়াছে, তাহার প্রতিক্রিয়া প্রবলভাবে আক্রমণ করিয়া তাহার দেহ-মন সমস্তই অবসন্ন করিয়া দিয়াছে। তাই শৈলজা যখন তাহার চোখের উপর উজ্জ্বল চক্ষু রাখিয়া বলিল যে সে সমস্তই পারিবে, তখন কার্ত্তিক নিমীলিত নেত্রে বলিল, "আমি যে আর পারব না, শৈল। আমার সমস্ত শক্তি চলে গিয়েছে। আমি যা চাইতুম, তাকে চাইবার মত শক্তি আর আমার কৈ?"

শৈল কহিল, "তুমি কি চাইতে?"

কার্ত্তিক কহিল, "আমি চাইতুম, মুক্তি—"

শৈল কহিল, "তোমায় আমি তাই দিলুম। আমিই তোমার একমাত্র

বন্ধন—অন্য যে বন্ধন ছিল ভগবান তা কেটে দিয়েছেন। এখন আমি সর্ব্বান্তঃকরণে বল্‌ছি, তুমি মুক্ত।”

কার্ত্তিক একদৃষ্টে শৈলজার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। এই কি সেই শৈল? যে একদিন এই ব্যাপারের উল্লেখমাত্রেই কাঁদিয়া কাঁদিয়া সমস্ত দিন অনাহারে অনিদ্রায় দেবমন্দিরে পড়িয়াছিল! কত বড় আঘাতে যে এই স্নেহময়ী নারী আজ এই কথা বলিতে সক্ষম হইয়াছে, তাহা অনুভব করিয়া কার্ত্তিক শিহরিয়া উঠিল। ভীতভাবে শৈলজার হাত ধরিয়া সে বলিল, “শৈল, তুমি আমায় ত্যাগ কর্‌বে?”

শৈল কহিল, “ত্যাগ করবার সম্বন্ধ তোমায় আমায় নয়, কিন্তু তুমি মুক্ত—তোমায় আমি আর চাই না।”

কার্ত্তিক কহিল, “কিন্তু আমি যে এখন তোমায় চাই।”

শৈল কহিল, “ভয় নেই! এই অসুস্থ অবস্থায় তোমায় ফেলে আমি কোথাও যাব না— আমি কোন দিনই কোথাও যাব না। কিন্তু যে মুক্তি তুমি চেয়েছ, আজ তোমায় তা আমি দিচ্ছি। সুস্থ হয়ে তুমি যা চাও, যাকে চাও, তার কাছে অনায়াসে তুমি যেতে পার। আমিও বুঝেছি, ভালবাসা বল, আর যাই বল, সবই বন্ধন। যখন বন্ধনে সুখ নাই, সুখ আছে কেবল স্বেচ্ছাচারিতায়—তখন তোমার সুখের পথে দাঁড়িয়ে কেবল যে তোমাকেই আমি হত্যা কর্‌ছি, তা নয়, নিজেরও হয়ত মস্ত অপকার কর্‌ছি। তোমাকে আমার ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ করেছিলুম, কিন্তু দেখ্‌লুম, ছায়াকে বেঁধে রাখা যা, তোমাকে বাঁধ্‌বার চেষ্টা করাও তাই। তাই বল্‌ছি—”

কার্ত্তিক উপাধানে ভর দিয়া উঠিয়া বসিয়া বলিল, “শৈল, আমার শক্তি, বল, তেজ—সব গিয়েছে, হয় ত আমায় চোখও গিয়েছে, কিন্তু এখন সেই স্বাধীনতা নিয়ে আমি কি কর্‌ব?”

শৈল কহিল, "তা ভাব্‌বার অধিকার আর আমার কৈ? দস্যুবৃত্তি করেঁ তুমি আমার সে অধিকার কেড়ে নিয়েছ।"

কার্ত্তিক কহিল, "যদি আবার দিই?"

শৈল কহিল, "আমি নেব না।"

কার্ত্তিক কহিল, "কেন?"

শৈল কহিল, "যা দিতে পারা যায়, তা কেড়েও নেওয়া যায়। আজ তুমি যা দিচ্ছ, কাল তা কেড়ে নিতে পার। অগ্নি সাক্ষী করে ধর্ম্ম সাক্ষী করে যে বন্ধন তুমি স্বীকার করেছিলে, তাই যখন নাগপাশ বলে চির দিন মনে করে এসেছ, তখন এই দুর্ব্বলতার সময় যা দেবে, তার জোর কত টুকু? আমি বেশ বুঝেছি, আর তোমায় বেঁধে রাখ্‌লে তুমিও নষ্ট হবে, আমিও চিরদিন দুঃখ পাব। তার চেয়ে ভগবান যেটুকু-যা আমারই জন্য মেপে রেখেছেন, সেইটুকু পাবার জন্যই আজ থেকে আমায় তৈরি হতে হবে। তুমি মনে কর্‌ছ, আমি অভিমান করে এ-সব কথা বল্‌ছি? অভিমান আর কার উপর কর্‌ব? তুমি মান-অভিমানের বাইরে গিয়েছ। এখন তোমায় বেঁধে রাখ্‌লে নিশ্চয়ই অন্যায় করা হবে, কারণ বাঁধন যদি এক পক্ষে হয়, তা হলে সেটা দাসত্ব। তুমি যখন আমায় বাঁধ নি, তখন আমিই বা আমার বন্ধন রাখ্‌ব কেন? আমার দিক থেকে তোমাকেও আজ আমি মুক্তি দিলাম।"

কার্ত্তিক নিশ্বাস ফেলিয়া শুইয়া পড়িল; ক্ষণপরে বলিল, "ঠিক হয়েছে। এই আমার উপযুক্ত। শৈল, তুমি যদি আমার মত জীবকে ভালবাস্‌তে, তাহলে নিজেরই অপমান কর্‌তে। আজ যে সে অপমানের বোঝা আমার মাথায় ফিরিয়ে দিতে পেরেছ, এর জন্য আমি সুখী। না, এত সুখের যোগ্য আমি নই। আমার জন্য যে তুমি আহার নিদ্রা ত্যাগ করে বসে থাক্‌বে, সংসারের এ ভয়ানক অত্যাচার। ঠিক হয়েছে

—শৈল, এতদিনে তোমার আসল মানুষটার জয় হয়েছে। সে আমার মত মানুষের পায়ে চিরদিন ফুল বেল পাতা ঢেলে পূজো কর্‌বার মত এত হীন নয়! সে—”

শৈল কহিল, “সে যে কিসের উপযুক্ত, সে যে কি, তা আর কেন ভাব্‌ছ? সে যা, তাই। এখন তোমার নিজের কথা চিন্তা করে দেখবার সময় এসেছে।”

কার্ত্তিক মুদিত নেত্রে বলিল, “আর এখন তা ভাব্‌তে পার্‌ছি না। এই এত বড় একটা ভয়ানক সৌভাগ্য, এই এতদিনকার প্রার্থিত বস্তু পেয়ে প্রাণটা যে কি কর্‌বে, তা এখনও ভেবে দেখ্‌তে পারেনি। ভেবে দেখ্‌বার ক্ষমতাই নেই—বোধ হচ্ছে যেন মনের পক্ষাঘাত হয়েছে, নইলে এমন ভয়ঙ্কর সুখের আঘাতে সে সাড়া দিচ্ছে না কেন? যাও তুমি, আর মিছে বসে থেকো না।”

শৈলজা ধীর পদে চলিয়া গেল। কার্ত্তিক ক্ষণকাল জড়ের মত পড়িয়া থাকিয়া শেষে উঠিয়া বসিল।

এই স্বাধীনতা? এই মুক্তি? ইহাকেই পাইবার জন্য সে না করিয়াছে কি! মাতৃহত্যা, পিতৃহত্যা, এমন কি যাহার জন্য সমস্তই, সেই আপনাকে পর্য্যন্ত সে হত্যা করিতে উদ্যত হইয়াছিল। কিন্তু কোথায় আনন্দ? কোথায় মুক্ত পথে অবাধ সঞ্চালনের বিরাট সুখ? যাহার জন্য করতলগত স্বর্গকে সে ত্যাগ করিল, সেই মহাবস্তু কৈ? বুকের মধ্যে কৈ তাহার অনুভূতি? মুক্তি, মুক্তি—মুক্তিই ত বটে!

কার্ত্তিক ধীরে ধীরে শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। তারপর কি মনে করিয়া গবাক্ষের নিকটে গিয়া একহাতে চোখ ঢাকিয়া অপর হস্তে জানালাটা খুলিয়া দিল। অমনি বহুদিনের বিরহের পর আলোকের সহিত মিলনের হাসিতে সেই কক্ষের সমস্ত বস্তু হাসিয়া উঠিল।

কার্ত্তিক সাহসে ভর করিয়া ধীরে ধীরে চোখের উপর হইতে হাত সরাইয়া লইল—কিন্তু অনেক দিনের অনভ্যস্ত চোখে আলো সহ্য হইল না। কার্ত্তিক পুনরায় চক্ষু মুদিয়া মনে মনে বলিল, "না, তা হবে না—এ মুক্তি সইতেই হবে। আলো যখন ফিরে পেয়েছি, তখন সইতেই হবে।"

কিন্তু আলো কিছুতেই সহিল না। অন্ধকার নির্ম্মমভাবে তাহার অন্তরে বাহিরে আঁটিয়া বসিয়াছে! ইহার হাত হইতে বুঝি মুক্তি নাই! কার্ত্তিক চক্ষু মুদিয়া শয্যায় আসিয়া শয়ন করিল।

হায় আলো! হায় সর্ব্বলোকচক্ষু! তুমি ত্যাগ করিলে! অন্ধকারের দৈত্যের হাতে আমায় ত্যাগ করিয়া গেলে! তাই হোক, আমিও অন্ধকারের হাতেই আপনাকে সঁপিয়া দিব।

কার্ত্তিক হঠাৎ কাতর কণ্ঠে ডাকিল, "শৈল—"

শৈলজা পাশের ঘর হইতে আসিয়া বলিল, "কি?"

কার্ত্তিক কহিল, "সমস্ত দরজাগুলো খুলে দিতে পার?"

শৈলজা দ্বারগুলা খুলিয়া দিলে কার্ত্তিক আবার বলিল, "আমার গায়ে আলো লাগ্‌ছে?"

শৈল কহিল, "লাগ্‌ছে।"

কার্ত্তিক কহিল, "খুব লাগ্‌ছে?"

শৈল কহিল, "জানালা দিয়ে যতটা আস্‌ছে, ততটা লাগ্‌ছে।"

কার্ত্তিক কহিল, "কিন্তু আমি আরো আলো চাই।"

শৈল কহিল, "তুমি যে এতদিন অন্ধকার, অন্ধকার করে কাঁদ্‌তে,—আজ এত আলো চাইছ কেন?"

কার্ত্তিক কহিল, "চিরকালের জন্য বিদায় নিতে হবে যে—তাই শেষ দেখা-শোনা করে নিচ্ছি।"

শৈল কহিল, "সে কি! তুমি—"

কার্ত্তিক কহিল, "ভয় নেই, আমি মর্‌তে যাচ্ছি নে। মরবার জন্যই কি এত বড় একটা লঙ্কাকাণ্ড কেউ করে? মর্‌ব কেন? মরণের উপরে যা, তাই যে আমি পেয়েছি, আমি অমর হয়ে গিয়েছি। ভয় নেই, শৈল, আমার মরণ নেই। আমি মলে এই এত বড় ভয়ঙ্কর সুখটা—মুক্তির সুখটা—হজম কর্‌বে কে? তুমি যাও—নিজের কাজ করগে যাও,—আমি এখন একা—একা থাক্‌ব।"

শৈল আবার চলিয়া গেল।

* * * * *

প্রভাতে উঠিয়া শৈলজা কার্ত্তিকের ঘরে গিয়া দেখিল, সমস্ত জানালা দরজা খোলা, কার্ত্তিক ঘরে নাই। বিস্মিত হইয়া শয্যার দিকে সে চাহিয়া দেখিল, একখানা কাগজ পড়িয়া আছে। তাড়াতাড়ি সে খানা সে খুলিয়া দেখিল, কার্ত্তিকের চিঠি।

কার্ত্তিক লিখিয়াছে,—

"শৈল,

আমি চলিলাম। যখন মুক্তি পাইয়াছি, তখন তাহার পূর্ণ স্বাদ আমায় পাইতেই হইবে। দিনে বাহির হইতে পারি নাই, কারণ আলোতেই আমার ভয়। রাত্রির অন্ধকারই আমার আলো—তাই রাত্রে বাহির হইতেছি।

সিন্দুক দেরাজ ইত্যাদির চাবি আমার মাথার শিয়রেই রহিল। সমস্ত ঠিক করিয়া গুছাইয়া রাখিয়া যাইতেছি। যখন আমি মুক্ত, তখন তোমার কোন জিনিসই লওয়া উচিত নয় মনে করিয়া আমার কাছে যাহা কিছু ছিল, সে সমস্তই যথাস্থানে রাখিয়া দিয়াছি। রাত্রে বাবার নিকট হইতে চুরি করিয়া একখানা কাপড় ও গায়ের কাপড় আনিয়াছিলাম।

তাহাই গায়ে দিয়া বাহির হইতেছি। যদিও জানি যে এ সমস্ত লইয়া গেলে তুমি কিছুই বলিতে না, তথাপি তোমার কিছুই লইব না, প্রতিজ্ঞা করিয়া এই কাজ করিলাম। তুমি কখনও আমার নিকট হইতে কিছুই পাও নাই, আমিই বরং তোমার নিকট হইতে অযাচিতভাবে অজস্র পাইয়াছি। তোমার এ বিষয়ে সুবিধা আছে, কিন্তু আমার সে সুবিধা ছিল না। সেই সুবিধার জন্য বাবার জিনিস চুরি করিলাম—আমার ন্যায়-অন্যায়ের ধর্ম্মশাস্ত্রে এটা তত দোষের বলিয়া বোধ হইল না।

তুমি যাহা বলিয়াছ, তাহা যদি সত্য হয় তাহা হইলে নিশ্চয় আমার জন্য তুমি দুঃখ করিবে না। আমি দুঃখ-কষ্টের উপযুক্ত নই, এ কথাটা মনে ভাবিয়া নিশ্চিন্ত হইও।

কোথায় যাইব জানিতে চাহিয়ো না—কারণ আমিই তাহা ঠিক জানি না—এই আলোক-ভীত চোখ দুইটা আমায় কোথায় লইয়া যাইবে, তাহার ঠিক কি !

আশীর্ব্বাদ করি, সর্ব্বান্তঃকরণে আশীর্ব্বাদ করি, তুমি সুখী হও—ভগবান্ যেন তোমায় শান্তি দেন। আমি যাহাই হই, এই কথাটুকু বিশ্বাস করিও যে আমি তোমার চির-মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী। আমি তোমার জীবনের শনিগ্রহ ছিলাম—গ্রহ কাটিয়া গেল, এখন তুমি নির্ভয়ে নিজের জীবন নিজে গড়িয়া তুলিও। ইতি

নিত্যশুভাকাঙ্ক্ষী কার্ত্তিক।”

চিঠি পড়িয়া শৈলজা কাঠের মত হইয়া গেল। প্রভাতের মৃদু আলো তাহার চোখে অত্যন্ত তীব্র ঠেকিল—সে মুখ ঢাকিয়া শয্যার উপর শুইয়া পড়িল।

শশিভূষণের ভৃত্য রঘুলাল প্রভাতে উঠিয়া বাহিরের দরজা খুলিয়াই দেখে, বাড়ীর রোয়াকের উপর কে-একজন শুইয়া আছে। দরজা খুলিতেই সেই ব্যক্তি ফিরিয়া বলিল, "কে? ঠাকুর-দা?"

রঘুলাল তাহার মুখের দিকে চাহিল, মুখখানা যেন চেনা-চেনা বোধ হইল। সে প্রশ্ন করিল,

"আপনি কে? কাকে খুঁজছেন?"

"শশিবাবুকে। তিনি বাড়ীতে আছেন?"

"আছেন, এখনো উঠেন নি।"

"সর্ব্ববাবু?"

"তিনিও আছেন। আপনি চোখ বুজে রয়েছেন কেন?"

"আমার চোখে আলো সয় না, তাকাতে পারি না। আমায় ওপরে নিয়ে যেতে পার?"

রঘুলাল আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, "আসুন।"

"আস্‌ব কি করে? আমার হাত ধর।"

"এলেন কি করে?"

"রাত্তিরে এসে এখানে শুয়ে আছি। রাতে আমার কষ্ট হয় না। তুমি আমায় ওপরে নিয়ে চল।"

রঘুলাল কার্ত্তিকের মূর্ত্তি দেখিয়া অবাক্ হইয়া গেল। যেন কবর হইতে উঠিয়া-আসা মানুষ! রঘুলাল একবার ভাবিল, নিশ্চয় পাগল; আবার ভাবিল বাবুদের নাম করিতেছে যখন তখন নিশ্চয়ই তাঁহাদের চেনা মানুষ। সাত-পাঁচ ভাবিয়া সে কার্ত্তিকের হাত ধরিয়া উপরে লইয়া গেল। সর্ব্বানন্দ সেইমাত্র দরজা খুলিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। হঠাৎ চাহিয়া দেখে—কার্ত্তিক!

এই দুদিন পূর্ব্বে সে পত্র পাইয়াছে যে কার্ত্তিক তখনও সম্পূর্ণ সুস্থ হয়

নাই। ইহারই মধ্যে সে এমনভাবে এখানে আসিয়া উপস্থিত! সর্ব্বানন্দ তাড়াতাড়ি রঘুলালের হস্ত হইতে কার্ত্তিকের হস্তটা টানিয়া লইয়া বলিল, "কার্ত্তিক!"

কার্ত্তিক। হাঁ আমিই বটে—

সর্ব্ব। কিন্তু চেহারা দেখে যে তা বোধ হচ্চে না। মনে হচ্চে যেন পরলোক হতে তোমার Spiritটা ফিরে এসেছে।

কার্ত্তিক। পরলোক হতেই বটে, এখন ইহলোকে কি হয় তাই দেখ্‌তে এসেছি। আমি আর দাঁড়াতে পার্‌ছি না, আমায় তোমার বিছানায় নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দাও।

সর্ব্বানন্দ তাড়াতাড়ি তাহাকে নিজ কক্ষে লইয়া গিয়া শুয়াইয়া দিয়া বলিল, "আর কে এসেছে?"

কার্ত্তিক বলিল, "আর কেউ নয়—আমি একলা এসেছি।"

সর্ব্ব। একলা? এই অবস্থায়?

কার্ত্তিক। হ'লেই বা এই অবস্থা, তবু আমি মুক্ত তাই আস্‌তে পেরেছি, বদ্ধ থাক্‌লে নড়্‌তে-চড়্‌তে পার্‌তাম কি? শৈল আমায় মুক্তি দিয়েছে।

সর্ব্বানন্দ ভীত হইয়া বলিল, "সে কি? শৈল? সে কেমন আছে?"

কার্ত্তিক। সে ভালই আছে বোধ হয়—তাকে সুস্থই দেখে এসেছি।

সর্ব্ব। তবে?

কার্ত্তিক। তবে আর কি? সারা জীবনের সাধনা ফলেছে, সে আমায় ছেড়ে দিয়েছে।

সর্ব্ব। বুঝ্‌তে পার্‌লাম না।

কার্ত্তিক বলিল, "ভাই, আর কথা কইতে পার্‌ছি না। কাল থেকে একপ্রকার অনাহারে আছি। একজন আমায় অন্ধ দেখে দয়া করে

কিছু খেতে দিয়েছিলেন তাই বেঁচে আছি। তিনি কলকাতা আস্‌ছিলেন, আমাকে একখানা গাড়ী ভাড়া করে তুলে দিয়েছিলেন তাই তোমার এখানে আস্‌তে পেরেছি। ভাড়াও তিনি দিয়েছেন, আবার পাঠিয়ে দিতে হবে। এখন আমি একটু ঘুমুব, তারপর সব কথা বল্‌ব। জানালাগুলো বন্ধ করে দাও।”

সর্ব্বানন্দ তাহাই করিল। তারপর বাহিরে গিয়া শশিভূষণকে ডাকিল। শশিভূষণ বাহিরে আসিয়া বলিল, “ডাকাডাকি কেন?” সর্ব্বানন্দ তাহাকে সমস্ত কথা বলিল। শশিভূষণ ব্যস্ত হইয়া বলিল, “তাইত, এখন উপায়?”

“উপায় আর কি, নিশ্চয়ই ও পালিয়ে এসেছে। এখনি টেলিগ্রাম কর্‌তে হবে—তুমি ডাক্তার ডেকে আনো, আমি টেলিগ্রাম করে আসি।”

ডাক্তার আসিয়া দেখিয়া শুনিয়া বলিল, শরীরের ওপর দিয়ে ভয়ানক অত্যাচার গিয়েছে। এখন বাঁচা না বাঁচা ভগবানের হাত, তবে—”

শশিভূষণ বলিল, “তবে আর কিছু নেই। সবই ভগবানের হাত। আপনি যদি দরকার বোঝেন আর যাকে হয় সঙ্গে করে আন্‌তে পারেন। মোদ্দা প্রাণপণ চেষ্টা কর্‌তে হবে।”

দশ বার দিন যমে-মানুষে টানাটানির পর কার্ত্তিক প্রথম যখন সংজ্ঞালাভ করিয়া চক্ষু মেলিল, তখন নিশীথ রাত্রি। মৃদু আলোকে কক্ষটি আলোকিত, তাকের উপর একটা ঘড়ি টক্‌টক্ করিতেছে। দূরে কে একজন একখানা আরাম-চেয়ারে শুইয়া ঘুমাইতেছে। কার্ত্তিক মাথা তুলিয়া বিস্মিতভাবে চারিদিকে চাহিতে চাহিতে হঠাৎ দেখিল, শিয়রে কে একজন বসিয়া মৃদু মৃদু বাতাস করিতেছে। এ কি! এ কে? কার্ত্তিক বিস্মিতভাবে চাহিয়া চাহিয়া মাথা নামাইয়া বলিল, “কে আপনি?”

উপবিষ্ট ব্যক্তি চমকিত হইয়া বলিল, "আমি সরোজ।"

কার্ত্তিক। "সরোজ? কে সরোজ? শৈল কৈ?"

সরোজ লজ্জিতভাবে বলিল, "আপনি যে কলকাতায় এসেছেন, আপনাকে আমরা—"

কার্ত্তিক। কলকাতায়? কলকাতায় আমি কি করে এলাম? কে আন্‌লে?

সরোজ। সে কথা পরে শুন্‌লেই হবে। আপনি চুপ করে এখন একটু ঘুমুবার চেষ্টা করুন।

কার্ত্তিক। না না, তা হবে না, কলকাতায় আমি কি করে এলাম? শৈল এনেছে বুঝি? আমার কি খুব অসুখ বেড়েছিল? কৈ কিছু মনে পড়্‌ছে না ত? শৈল ঘুমুচ্ছে?

সরোজ। তিনি এখানে নেই।

কার্ত্তিক। সে কি! কোথায় সে?

সরোজ। বোধ হয় বাড়ীতেই আছেন।

কার্ত্তিক। তবে আমায় কে আন্‌লে? কি করে এখানে এলাম? এ কার বাড়ী? ও কে শুয়ে রয়েছে?

সরোজ। উনি সর্ব্ববাবু।

কার্ত্তিক। সর্ব্ব-দাদা? কি আশ্চর্য্য! আমার কিছুই মনে পড়্‌ছে না যে! কবে আমি এখানে এসেছি?

সরোজ। আজ বার দিন হ'ল।

কার্ত্তিক। আপনি কি করে আমার খবর পেলেন? সর্ব্ব দাদা ডেকে এনেছে বুঝি? সর্ব্ব-দাকে ডাকুন।

সরোজ। উনি এই ক'রাত্রি জেগে আজ একটু ঘুমিয়েছেন। আপনার কিছু দরকার আছে কি?

কার্ত্তিক। কিছু না—আপনি বসুন। বার দিন হ'ল এসেছি!

কার্ত্তিক কিছুক্ষণ নীরবে চিন্তা করিল। কিন্তু কিছুই স্মরণ করিতে পারিল না। শিবরামপুর হইতে বাহির হওয়ার পর হইতে কলিকাতা আসা পর্য্যন্ত সমস্ত ব্যাপারই ভীষণ যন্ত্রণার আক্রমণে সংজ্ঞালোপের সঙ্গে-সঙ্গেই, স্মৃতি হইতেও লোপ পাইয়াছিল। ক্ষণকাল বিফল চেষ্টার পর হঠাৎ সে প্রশ্ন করিল, "কিন্তু শৈল এল না কেন?"

সরোজ নীরবে রহিল। কার্ত্তিক পুনরায় ঐ প্রশ্ন করায় বলিল, "তা ত' আমি জানি নে—তাঁকে আনতে সর্ব্ব-বাবু গিয়েছিলেন, কিন্তু তারপর কি হয়েছে সর্ব্ব-বাবু আমায় বলেন-নি।"

কার্ত্তিক পুনরায় নীরবে চিন্তা করিতে লাগিল। ক্ষণপরে মৃদুস্বরে বলিল, "আমি কলকাতায়—শৈল নেই! আচ্ছা, বাবা কৈ?"

সরোজ। তিনিও আসেন-নি।

কার্ত্তিক হতাশভাবে নিশ্বাস ফেলিয়া পাশ ফিরিল। তারপর কিছুক্ষণের মধ্যেই আবার ঘুমাইয়া পড়িল।

প্রভাতে সর্ব্বানন্দ জাগিয়া উঠিয়া সরোজকে বলিল, "একি, আমায় তিনটের সময় জাগাওনি কেন? কেমন আছে কার্ত্তিক? রাত্রে আর কিছু করে-নি? যা তা বকে-নি?"

"না" বলিয়া সরোজ উঠিয়া বাহির হইয়া গেল। সর্ব্বানন্দ কার্ত্তিকের নিকটে আসিয়া জ্বরের উত্তাপ পরীক্ষায় জন্য গায়ে হাত দিবামাত্র সে চক্ষু মেলিল। সর্ব্বানন্দ বলিল, "এখন কেমন বোধ হচ্চে, কার্ত্তিক?"

কার্ত্তিক। ভালই বোধ হচ্চে সর্ব্ব-দা, আমার কি খুব অসুখ করেছিল?

সর্ব্ব। তা তোমার মনে পড়ছে না?

কার্ত্তিক। না, এ তোমরা কোথায় আমায় এনেছ বলত?

শিবরামপুরের একটা ঘরে শুয়ে ছিলাম—রাতে জেগে দেখি এক অচেনা যায়গায় এসেছি—মাথার শিয়রেও এক অচেনা মানুষ।

সর্ব্ব। অচেনা মানুষ! সরোজকে চিন্‌তে পার-নি?

কার্ত্তিক। প্রথমে পারিনি। কিন্তু কি করে যে এখানে এলাম তা আমার কিছুই মনে পড়্‌ছে না।

সর্ব্ব। তোমার অসুখ সারুক, তারপর বল্‌ব। যে ব্যাপার লাগিয়েছিলে তাতে আমাদেরই সব ভুল হয়ে গিয়েছিল তা তোমার! যাক, মুখে দুটো কুলি করে এই ওষুধটা দাও।

যথানির্দ্দিষ্ট কার্য্য সারিয়া সর্ব্বানন্দ বলিল, "আমি এখন চল্লাম।"

কার্ত্তিক ব্যস্ত হইয়া বলিল, "কোথায় যাচ্ছ?"

সর্ব্ব। ভয় নেই, তুমি ভাল জায়গাতেই আছ। বাগবাজারে ঠাকুরদার শ্বশুরবাড়ীতে আছ। এঁরা তোমার যা করেছেন তা কোন আত্মীয়তেও করে না।

কার্ত্তিক। তা ত' বুঝ্‌তেই পার্‌ছি; কিন্তু এখানে কেন আন্‌লে?

সর্ব্ব। সব কথা পরে জেনো ভাই, আর হয়তো আপনিই মনে পড়্‌বে। দু'দিন মাথাটা হতে বিকারের ঘোর কাটুক। তুমি ব্যস্ত হয়োনা, এঁরা তোমার আপনার লোক। আর সরোজ—

কার্ত্তিক। কৈ তিনি?

সর্ব্ব। তাকে ডেকে দিয়ে যাচ্ছি—বেচারী সারারাত জেগেছে।

কার্ত্তিক। না না ডেকো না—সর্ব্ব-দাদা, তুমি জেনেশুনে কেন আমায় এখানে নিয়ে এলে?

সর্ব্ব। আমি জেনেশুনেই এনেছি—ভালোর জন্যই এনেছি। সব কথা পরে বল্‌ব।

সর্ব্বানন্দ আর দাঁড়াইল না। কার্ত্তিক চুপ করিয়া শুইয়াছিল।

হঠাৎ মুক্ত গবাক্ষ-পথে বাহিরের দিকে চাহিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেল। বাহিরটা এত সুন্দর এত উজ্জ্বল হইল কি করিয়া! কোথা হইতে এই অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য আসিয়া ঐ রক্তাভ প্রভাত আকাশে, গৃহের ঐসব ছবিগুলির উপর ছড়াইয়া পড়িয়াছে! কার্ত্তিক অবাক হইয়া তাহার নূতন ফিরিয়া-পাওয়া নয়ন দুইটী দিয়া আলোক-সুধা পান করিতে লাগিল। তাহার অন্তরও আলোকে ভরিয়া উঠিল। বহুক্ষণ একদৃষ্টে আকাশের দিকে তন্ময়ভাবে চাহিয়া সে চুপ করিয়া রহিল। হঠাৎ কাহার পদশব্দে ফিরিয়া দেখে, সরোজ এবং আর একজন অপরিচিতা রমণী। কার্ত্তিকের সমস্ত দেহ কম্পিত হইয়া উঠিল। সে যেন একটা ভয়ানক ধাক্কা খাইয়া একেবারে শয্যার আর এক প্রান্তে সরিয়া গেল। তাহার খাটের শব্দ শুনিয়া সরোজ তাড়াতাড়ি নিকটে আসিয়া বলিল, "আপনি জেগেছেন?"

কার্ত্তিক উত্তর দিল না। আর কোন শব্দ না পাইয়া দ্বিতীয় রমণী বলিল, "উনি বোধ হয় আবার ঘুমিয়ে পড়েছেন।"

সরোজ। তবে যে সর্ব্ববাবু আমায় আসতে বল্লেন! ডেকে দেখ্‌ব, সুকু?

সুকুমারী। না, ঘুম ভাঙ্গিয়ে কাজ কি! তুমি না হয় ব'স, আমি কাজ সারি না।

সুকুমারী চলিয়া গেল। সরোজ দু-একবার ইতস্ততঃ করিয়া একখানা চেয়ারে বসিয়া পড়িল। কার্ত্তিক ভয়ে ভয়ে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। এই সেই সরোজ! চির-ব্যবধানময় চিররহস্যময় সেই অন্ধ রমণী! ঐ সেই অন্ধনয়ন দুটী, যাহার অতল অন্ধকারের গোপন শক্তি তাহার উপর কত না অত্যাচার করিয়াছে। আজ যেন সেই শক্তিময়ী মূর্ত্তি ঝড়বৃষ্টির পর রৌদ্রোদ্ভাসিত অপসরণশীল মেঘের মত দূর দিগন্তে ঢলিয়া পড়িয়াছে।

সরোজকে নীরবে দেখিতে দেখিতে ধীরে ধীরে কার্ত্তিকের সমস্ত স্মৃতিই ফিরিয়া আসিতে লাগিল। এই ছয় সাত বৎসরের ভয়ানক দুর্য্যোগ তাহার মনের চতুর্দ্দিকে ছবির ন্যায় নৃত্য করিতে করিতে ঘিরিয়া ধরিল। কার্ত্তিকচন্দ্র ব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিল, "সরোজ, আর কেন, আমায় ছেড়ে দাও! একজন বাইরের মুক্তি দিয়েছে, তুমি ভিতরকার মুক্তিটাও দাও।"

সরোজ চমকিত হইয়া চেয়ারের হাতলটা চাপিয়া ধরিল। তাহার মুখ দিয়া একটী কথাও বাহির হইল না। কার্ত্তিক আবার বলিল, "এই এতবড় অত্যাচার আমি তোমার জন্য সহ্য কর্‌লাম—"

সরোজ। আমার জন্য!

কার্ত্তিক। হ্যাঁ, তোমারই জন্য—তোমারই জন্য আমার দৃষ্টি যেতে বসেছিল, তোমারই জন্য সব শক্তি হারাতে বসেছিলাম, এমন-কি তোমারই অন্তরের অন্ধকার মানুষটা আমাকে চির-অন্ধকারে ডুবিয়ে দিচ্ছিল, অন্তরে বাইরে আমি মরতে বসেছিলাম। কিন্তু ভগবান দয়া করে মেরে ধরে আমায় সব ভুলুচ্ছেন; আমি আবার আমার নিজেকে ফিরে পাচ্ছি। তুমি দয়া করে আমায় মুক্তি দাও।

সরোজের অন্ধনয়ন জ্বলিয়া উঠিল, কিন্তু পরক্ষণেই সে আলোক নিবিয়া গেল। সে দুইহস্তে মুখ ঢাকিয়া বলিল, "আমি—আমি, আমারই দোষ! তুমি নিজে এই অঘটন ঘটিয়ে আমার সব নষ্ট করে দেবার উদ্যোগ করে, আত্মীয়-স্বজন সকলের ওপর অত্যাচার করে এখন অন্ধ নারীর ওপর সব দোষ চাপাচ্ছ? আমি কি করেছি, কি কর্‌তে পারি আমি? কোথায় এককোণে পড়ে থাকৃতাম, কেউ আমার কথা জান্‌তেই পার্‌ত না। তুমিই আমার গোপনতা নষ্ট করে এখন সমস্ত দোষের বোঝা আমার কাঁধে চাপিয়ে দিচ্ছ! মানুষ এত অবিচারক এতবড়

নিষ্ঠুর হতে পারে তা জান্‌তাম না। আমি চক্ষু হারিয়েছিলাম কিন্তু নিজেকে হারাই নি; কিন্তু তুমি দস্যুর মত আমার তাও কেড়ে নিচ্ছিলে —ভগবান বাঁচিয়েছেন, নইলে—”

কার্ত্তিক আর থাকিতে পারিল না, কাঁদিতে কাঁদিতে উঠিয়া বসিয়া বলিল, “থাম—থাম, তুমি রাক্ষসটাকে আর জাগিও না। এ যে সর্ব্বগ্রাসী ক্ষুধা,—এতো দেবতার সুধার পিপাসা নয়! আমার মধ্যে এ লুকিয়ে ছিল, কিন্তু তুমিই ত' একে জাগিয়ে ছিলে?”

সরোজ। না, আমি জাগাই নি—আমি ওকে চিনি না, জানি না। আমি অন্ধ, আমি সামান্য নারী—আমার কি ক্ষমতা যে রাক্ষস নিয়ে খেলা করি? তুমি নিজে তাকে জাগিয়েছিলে, ভগবান তাকে মার্‌ছেন। যে যা চায় ভগবান তাকে তাই দেন, তুমি দেবতাকে চাওনি, দৈত্যকে চেয়েছিলে তাই পেয়েছিলে; আমি কি চেয়েছিলাম তা অন্তর্য্যামী জান্‌তেন তাই সেই জিনিষ আমি পেয়েছি।

সরোজ নীরবে অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিল। কার্ত্তিক চাহিয়া চাহিয়া বলিল, “সরোজ, এই আমার নবপ্রভাতটাকে চোখের জল দিয়ে ম্লান করে দিও না। আলো যে এত সুন্দর তা ত' জান্‌তাম না। অন্ধকার থেকে বেরিয়ে আমি বেঁচেছি। তুমি আমায় ভুলে যাও—রাত্রের দুঃস্বপ্নের মত আমাকে মন থেকে একেবারে দূর করে দাও। রাক্ষস বলে ভেবো মানুষ বলে নয়, দুঃখী বলে নয়, ব্যথিত বলে নয়—স্বেচ্ছাচারী অহঙ্কারী হত্যাকারী বলে মনে করো, তা-হ'লে আমায় ভুল্‌তে পারবে। ঘৃণা কর্‌তে চেষ্টা করো তাহ'লেই সব সহজ হয়ে আস্‌বে। আমি তোমায় ভয় কর্‌ছি, তুমি আমায় ঘৃণা ক'রো। বল, পার্‌বে?”

সরোজ চুপ করিয়া রহিল। কার্ত্তিক পুনরায় বলিল, “কেন পার্‌বে না? আমি কি মানুষ? আমি কি মানুষের মান্য জানি! ভক্তি

ভালবাসা আমার যে কিছুই নেই। নইলে এমনটা কি কেউ কর্‌তে পারত? আমি তোমার দোষ দিচ্ছি বটে, কিন্তু সেটা কেবল মনকে চোখ ঠারা হচ্ছে। তবু আমায় তাই কর্‌তে হবে, তোমায় ভয়ই কর্‌তে হবে, নইলে যে উপায় নেই, নইলে মুক্ত হবে কি করে?"

সরোজ উঠিয়া দাঁড়াইল, তারপর ধীরে ধীরে কার্ত্তিকের পায়ের কাছে বসিয়া পড়িয়া বলিল, "তুমি মুক্ত হও, সুস্থ হও, আমি যে চিরদিন ভগবানের কাছে এইটেই প্রার্থনা করে আস্‌ছি। তুমি যা আমায় দিয়েছিলে তাতে যে আমার কোন অধিকার নেই, এই কথাটাই যে চিরদিন আমি আপনাকে বুঝিয়েছি। আমি ত কখনো কিছু চাইনি, তুমিই ঝড়ের মত ঝাঁপিয়ে পড়ে আপনাকে দিয়ে সব উল্টে-পাল্টে দিয়েছ। কিন্তু আজ যখন শান্ত হয়েছ তখন তোমার পা ছুঁয়ে বল্‌ছি, আমি তোমার কাছ থেকে কিছু চাই না। তুমি যা দিয়েছিলে তা যে মৃত্যুর মত ভয়ঙ্কর কে তা সহ্য কর্‌বে? তুমি আমায় বিশ্বাস কর—আমি কিছু চাই না। তুমি ভুল বুঝ না, আমি কখনো কারও কাছে কিছু চাই-নি, চাইব না। ভগবান যখন আমায় অন্ধকারে ডুবিয়ে রেখেছেন, তখন তাই আমার স্বর্গ। কিন্তু তোমাকেও আমার এক অনুরোধ, তুমি যাকে ছেড়ে এসেছ তাকেই তোমার অন্তরের মানুষটি চাইছেন। এই ব্যারামের বিকারের অবস্থাতেও সেই তোমার অন্তর্য্যামীর কোলে বসেছিল, আমি দেখ্‌তে পেয়েছি। স্নেহ-ভালবাসা কি মানুষকে এমন করে পোড়ায়? তোমার ব্যাধির দুষ্ট ক্ষিদে সেরে গিয়েছে, এইবার সুস্থ হও। আমি যা পেয়েছি তাই আমার পরম লাভ,—তুমি আমার জন্য ভেবো না। আমি তোমার পা ছুঁয়ে বল্‌ছি আমার কোন দুঃখ নেই—আমাকে ভয় করার কিছু দরকার নেই।"

সরোজ কার্ত্তিকের পদস্পর্শ করিয়া প্রণাম করিল। কার্ত্তিক চুপ,

করিয়া রহিল। তাহার উত্তেজনা ধীরে ধীরে অপসৃত হইতেছিল, সরোজের অন্ধ নয়নের দিকে কিছুক্ষণ এক দৃষ্টে চাহিয়া শেষে নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "বাঁচ্‌লাম, সরোজ, তুমি আমায় বাঁচালে। তুমি যে হার মেনেছ, আগে হলে এইটেকেই বড় করে দেখ্‌তাম, কিন্তু তোমার পরাজয়কেই এখন আমার সব চাইতে ভয় হয়েছিল।"

সরোজ। আমায় ভয় কর্‌বার কিছু নাই—বরঞ্চ তোমাকেই তোমার ভয়ঙ্কর আত্মঘাতী শক্তিটাকেই আমার ভয় ছিল; কিন্তু তোমার মাথার শিয়রে দিনের পর দিন রাতের পর রাত কাটিয়ে আমার সব ভয় চলে গিয়েছে—আমি যে তোমার অন্তর্য্যামীর অন্তরের কথা টের পেয়েছি। সে যে কি চায়, কাকে চায়, তুমি এতদিন তা মনোযোগ দিয়ে শোন নি, তাই মরীচিকার পিছনে ছুটেছিলে। কিন্তু আর তাঁর কথা না-শুনবার যো নেই—তিনি জেগেছেন, ভগ্নী শৈল চিরায়ুষ্মতী হোক—সে জিতেছে। আমারও ভয় ভেঙ্গে গিয়েছে। এখন তোমার কোন ভয় নেই। ভয় যতদিন ছিল কেবলই পুরাণের হিরণ্যকশিপুর মত—কংশের মত—রাবণের মত তোমাকে ভয়ঙ্কর ভেবেছি, কেবলি তোমার প্রচণ্ড আকর্ষণে চারিদিকে তোমাকেই দেখেছি। ভগবান সে ভয় আমার কাটিয়ে দিয়েছেন—তাঁকে প্রণাম করি।

সরোজ উঠিয়া গবাক্ষের নিকটে গিয়া তাহার অন্ধনয়ন মুদিত করিয়া জোড়হস্তে প্রণাম করিল। তাহার দেহ মৃদু মৃদু কম্পিত হইতেছিল—যেন সে নয়ন না থাকাতে তাহার সমস্ত দেহ দিয়া দেব-আশীর্ব্বাদের আলোককে অন্তরের মধ্যে গ্রহণ করিল।

তারপর অতি আনন্দে তাহার ও কার্ত্তিকের দিনগুলি কাটিয়া গেল। শেষে একদিন সে সরোজকে বলিল, "সরোজ, বাড়ী যাব।"

সরোজ। শশি-দাকে বল।

কার্ত্তিক। বলেছি, সে বলে আরও দুদিন যাক।

সরোজ। তুমি ত এখন উঠ্‌তে পার না, এত তাড়াতাড়ি কেন?

কার্ত্তিক। সরোজ, আমি ক'দিন থেকে ভাব্‌ছি তুমি আমার সঙ্গে শৈলের কাছে চল, আমার হয়ে একটু ওকালতি কর্‌তে হবে।

সরোজ। ওগো অন্ধ মানুষ, তার কিছু দরকার হবে না।

কার্ত্তিক। না, সরোজ, হবে—আমি তার অন্তরটাকে যে একেবারে শুকিয়ে দিয়ে এসেছি। নৈলে সে একবারও আমার খোঁজ নিলে না।

সরোজ। যদি শুধু খোঁজ নিত তাহলেই ভয়ের কথা ছিল, যখন নেয়-নি তখন কোন ভয় নেই। তোমার বাবাও ত খোঁজ নেন নি, কিন্তু তিনি কি তোমায় ভুল্‌তে পারেন? তুমি যে একেবারে তাঁর বুকের মানুষটার অংশ। আমরা প্রতিদিন তাঁদের পত্র দিয়েছি। আর সর্ব্ব-দাদা যা দেখে এসেছেন তা যেদিন শুন্‌বে সেদিন তুমি এক মিনিটও এখানে থাক্‌তে পার্‌বে না।

কার্ত্তিক। আমি তাই শুন্‌ব সরোজ, তাই তুমি আমায় বল। বাবা আমার জন্য কি করেছেন? মা গিয়েছেন, বাবা আছেন, তবু আমি এমন পিতৃমাতৃহারার মত হয়ে রয়েছি কেন? তিনি কেন এলেন না? আর শৈল—আমার সর্ব্বংসহা শৈলজা—না সরোজ, আমি আজই যাব, তুমি নিয়ে চল।

সরোজ হাসিয়া বলিল, "অন্ধ মানুষের উপর নির্ভর কর্‌ছে—"

কার্ত্তিক। খোঁড়ামানুষে। তুমি সর্ব্বদাদাকে ডাকিয়ে পাঠাও—রাস্‌কেলটা সারাদিন আমার ওপর পাহারা বসিয়ে আমাকে সত্যি-সত্যি খোঁড়া করে দেবে দেখ্‌ছি। না, আর তা হচ্চে না—আমি শুয়ে থাক্‌ব না—এই আমি উঠ্‌লাম—আর শোবো না।

কার্ত্তিক সত্যসত্যই উঠিয়া দাঁড়াইল; সরোজ তাড়াতাড়ি নিকটে

আসিয়া হাত ধরিয়া বলিল, "চল, ছাতে গিয়ে বসবে. বেলা পড়ে এসেছে।"

কার্ত্তিককে একখানা আরাম-কেদারায় শোওয়াইয়া সরোজ বলিল, "তুমি চুপ করে শুয়ে থাক, আমি আবার এসে নিয়ে যাব।"

সরোজ চলিয়া গেলে কার্ত্তিক সন্ধ্যাকাশের দিকে চাহিয়া একটা গভীর নিশ্বাস ফেলিল।

বেল-যুঁই-চামেলী সেই কৃত্রিম উদ্যানে আবার তেমনি শোভায় তেমনি গন্ধে ফুটিয়া উঠিয়াছে। সমস্ত স্থানটির মধ্যে একটা অপূর্ব্ব নিপুণতার একটা আন্তরিক স্নেহের—একটা গভীর অচঞ্চল আনন্দের অস্তিত্ব যেন সমস্ত লতায়-পাতায়-পুষ্পে-গন্ধের মধ্যে জাগিয়া রহিয়াছে। এই উদ্যান-খানি যেন স্বয়ং সরোজ। কার্ত্তিক হাত বাড়াইয়া একঝাড় জুঁই-পুষ্পের স্তবক স্পর্শ করিতে করিতে মনে মনে সরোজকে অজস্র আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিল।

তারপর শুভদিনে কার্ত্তিক, সরোজ ও সর্ব্বানন্দকে লইয়া শিবরামপুর যাত্রা করিল। গ্রামে পৌঁছিয়াই সরোজ ও সর্ব্বানন্দকে শৈলজার নিকট পাঠাইয়া দিয়া স্বয়ং পিতার নিকট চলিয়া গেল।

সর্ব্বানন্দ ও তৎপশ্চাতে একজন অপরিচিত রমণীকে দেখিয়া শৈলজা বিস্মিত হইয়া বলিল, "একি সর্ব্ব-দাদা! ইনি কে?"

সর্ব্বানন্দ। ইনি সন্ধির দূত। ইনিই তোমার সরোজ-দিদি, এঁকে প্রণাম কর।

শৈলজা প্রণাম করিতেই সরোজ হাত বাড়াইয়া বলিল, "আমি যে অন্ধ ভাই, তোমার হাতখানা আমায় দাও।"

শৈলজা তাহার হাত ধরিতেই সর্ব্বানন্দ বলিল, "আমি এখন খুড়ো-মশাইয়ের কাছে চল্লাম, সরোজ!"

সরোজ হাসিয়া বলিল, "যাও—কোন ভয় নেই, আমি সব ঠিক করে নেব।"

সর্ব্বানন্দ চলিয়া গেলে সরোজ বলিল, "কোথায় বস্‌ব?"

শৈলজা তাহাকে একখানা পালঙ্কে বসাইয়া বলিল, "আমি আপনার বিষয় অনেক শুনেছি কিন্তু আপনাকে কখনো দেখিনি।"

সরোজ। এখন দেখতেও পেলে, কিন্তু আমি কখনই তোমায় দেখ্‌তে পাব না। তোমার মুখখানায় আমায় একবার হাত দিতে দেবে?

শৈলজা তাহার হাতখানা লইয়া তাহার মুখের উপর রাখিতেই সরোজ তাহাকে বুকের মধ্যে টানিয়া লইয়া বলিল, "তোমার ত' জয় হবেই ভাই—তোমার পলাতক মানুষটিকে এনে পৌছে দিয়েছি; আমাদের শেষ চিঠি পেয়েছিলে?"

শৈলজা। পেয়েছিলাম। আপনাকে প্রথমে কত কি ভেবেছি, কিন্তু আপনাকে দেখে কিছুতেই বুঝ্‌তে পার্‌ছি না যে আপনি কি করে ওঁকে এমন করেছিলেন। আপনার মধ্যে এতবড় আগুন কোথায় ছিল যাতে ঐ মানুষটা এমন হয়ে পুড়ে ছাই হতে বসেছিল?

সরোজ। ভুল, ভাই, ভুল—আমি জ্ঞানতঃ কোন অপরাধে অপরাধী নই ত'! তবে বোধ হয় যার জীবন ঠিক খড়ের গাদার মত, পুড়বার শক্তি তারই থাকে,—একটা স্ফুলিঙ্গ বা দিয়াশলাইএর কাঠির কতটুকু শক্তি যে, সে অগ্নিকাণ্ড করে?

তারপর শৈলজা ও সরোজ বসিয়া বসিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া অনেক কথাবার্ত্তা কহিল। শেষে সরোজ বলিল, "ভাই, মান অভিমান কিছুই নয়, সেইজন্য বল্‌ছি ও-সব কথা জীবনে কখনো তুলো না। ওতে তুমিও সুখী হবে না, সেও নয়। কি হবে ছুটো অন্যায়কে মনে রেখে? দুঃখ-টাকেই চিরদিন মনে রাখ্‌তে হবে, সুখকে নয়? তুমি যা হারিয়েছিলে

বলে মনে করে রেখেছ, তাই ভগবানের খাতায় জমার ঘরে পড়েছিল সে খোঁজ ত' তুমি পাওনি! উনি তোমার কাছ থেকে চলে গিয়ে তোমার সেই জমার ভাণ্ডারটা নিজে ঘাড়ে করে এনেছেন। এখন স্বেচ্ছাবন্দীকে বন্দী কর। আশীর্ব্বাদ করি, এবারকার বন্ধন যেন মঙ্গলের হয়।"

শৈল। কিন্তু তুমি? তোমার কি হল?

সরোজ। আমি? আমার জন্য ভেবো না, আমি লাভই করেছি। যে লোকসান হতে বসেছিল তা হতেই ভগবান এমন বস্তু লাভ করিয়ে দিয়েছেন, যাতে আমার এই ভিতরকার চির-অন্ধকার একেবারে উজ্জ্বল হয়ে গিয়েছে।

শৈল। কি তা?

সরোজ। তা না-হয় নাই শুন্‌লে।

শৈল। তা হবে না দিদি, আমায় শুন্‌তেই হবে।

সরোজ। আমি যদি না বলি?

শৈল। তাহলে আমার যেমন হচ্ছে সেই রকম একটা-কিছু অনুমান করে নেব। না সরোজ-দিদি, আমায় বল্‌তেই হবে!

সরোজ কিছুক্ষণ ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, "হয়তো তাতে তোমার দুঃখ হবে।"

শৈল। তা হোক, তবু আমি শুন্‌ব।

শৈলজা ও সরোজ মুখোমুখী হইয়া বসিয়াছিল। সরোজ খুব জোরে শৈলজার হাতখানা চাপিয়া ধরিল। শৈলজা একদৃষ্টে সরোজের অন্ধ চক্ষুর দিকে চাহিয়া চাহিয়া বলিল, "বল।"

সরোজ সজলনয়নে বলিল, "জানি না, তুমি আমার কথা বুঝবে কি না—তবু তোমায় বল্‌তেই হবে; কারণ তোমার সঙ্গে একটা বুঝা-পড়া হওয়ার দরকার। আমি যা পেয়েছি তার নাম ভালবাসতে পারা।

সংসারে যারা স্নেহ করতে,—স্নেহ দিতে পায় না তারাই সব-চাইতে হতভাগ্য। আমি যে তাঁকে ভালবাসতে পেরেছি তাই আমার পরম ভাগ্য। আমার মত অন্ধ হতভাগার অন্ধকার মনের মধ্যে কেউ কি ঢুকতে যেতো ?—কেউ না। উনিই সেই অন্ধকারকে ভেদ করে ঢুকেছিলেন। সেইটেই আমার পরম লাভ। আমি আর-কিছু চাই না—চাইব না; কারণ আর কিছু পাওয়া আমার উচিত নয়—আমায় সইবে না।”

শৈল। কে বল্লে সইবে না—আমি বলছি নিশ্চয় সইবে! আমি তোমায় যেতে দেবনা!

সরোজ। ভুল বুঝ না বোন্—আমার এর-চাইতে বেশী পাওয়া হবে না, আমি যা চাই তা কি কারুর হাতে করে এনে দেবার সাধ্য আছে? কতটুকু দিয়ে তুমি আমায় সন্তুষ্ট করবে? তুমি ত' ভাই মেয়েমানুষ—তুমি ত জান, কত-বড় আমাদের ক্ষিদে! সেই ক্ষিদে তুমি কতটুকু দিয়ে পুরুবে? তার চাইতে এই যা পেয়েছি এইটুকু যাতে না হারাই তাই আমায় ক'রতে হবে। ভালবাসা এসেছে, তাকে পূর্ণভাবে কাজে লাগাতে হবে। যে না ভালবাসতে জানে সে কি দুঃখের সংসারে কোন কাজে লাগে? সেই শুকনো প্রাণ যে কেবল শুকিয়ে দেবার জন্যই সংসারে ঘুরে মরে। তুমি বেশ করে বুঝে দেখ, তুমি যা দিতে চাচ্ছ তাতে আমার অন্তর ভরবে না—অতএব মিছে চেষ্টা ক'র না। উনিও তাতে কষ্ট পাবেন, আমিও পাব।

শৈলজা চাহিয়া চাহিয়া হঠাৎ সরোজের গলা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল। অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে হঠাৎ বলিল, “এইবার বুঝেছি, তুমি কি! তুমি এমন নইলে ঐ অতবড় প্রচণ্ড শক্তিকে এমনভাবে জাগাতে পার! দিদি, তুমি এ-দেশের এই রাতদিনের মানুষ নও—যে দেশ আলো-আঁধারের

একেবারে ওপারে, তুমি সেই দেশ থেকে এসেছ। তোমার পায়ের ধূলো নিয়ে—”

“থাম, থাম—আমিও মানুষ ভাই—”

শৈলজা থামিল না ; সরোজের কোলের মধ্যে মুখ লুকাইয়া আনন্দে কাঁদিতে লাগিল। আর সেই অশ্রুবন্ধনে এই দুই রমণীর চিত্ত চির-কালের মত আবদ্ধ হইয়া গেল।

স্বেচ্ছাচারী

শ্রীবিভূতি ভূষণ ভট্ট

ভাদ্র—১৩২৪

মূল্য ১।০ টাকা মাত্র

প্রকাশক—শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়,
"গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স,"
২০১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

প্রিণ্টার—শ্রীবিহারীলাল নাথ,
"এমারেল্ড্ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্"
৯, নন্দকুমার চৌধুরীর দ্বিতীয় লেন, কলিকাত

স্বেচ্ছাচারী

প্রথম খণ্ড

১

পিতা-মাতার একমাত্র সন্তান হওয়া অনেক রকমেই অপ্রার্থনীয়; বাপ-মা এবং ছেলে—উভয়ের পক্ষ হইতেই এ কথা বলা চলে। কার্তিকচন্দ্রের জন্মের মাসছয়েক পরে অন্নপ্রাশনের সময় পিতা-মাতার মধ্যে তাহার নাম-করণ লইয়াই মস্ত একটা মতভেদ ঘটিয়া গেল। পিতা নাম রাখিলেন, হরিদাস; মাতা রাখিলেন, কার্ত্তিকচন্দ্র। এবং কালক্রমে তাহার মাতার জোরজবরদস্তি ও কান্নাকাটিতে পুত্রের কার্ত্তিকচন্দ্র নামই বাহাল রহিয়া গেল। পিতা যদিও আপনার পিতৃ-সত্ব জাহির করিবার জন্য পুত্রকে মাঝে মাঝে হরিদাস বলিয়াই ডাকিতেন, তথাপি কোন দিক হইতে কোনরূপ সাড়া না পাইয়া তিনিও শেষে বিরক্ত হইয়া তাহাকে তাহার মাতৃদত্ত নামেই ডাকিতে আরম্ভ করিলেন।

বিরোধের মধ্যেই যাহার জন্ম, তাহার পুষ্টিও সেই বিরোধের মধ্যেই হইতে লাগিল। কার্ত্তিকের মাতার উক্ত নাম রাখিবার নানা প্রকার কারণের মধ্যে একটি কারণ এই যে কার্ত্তিকচন্দ্র দেখিতে ঠিক কার্ত্তিকেরই মত। অথচ এই পুত্রের নাম রাখা হইবে কি না, হরিদাস। হরে! ছি, ও যে চাকর-বাকরদের নাম! কার্ত্তিক কি বাবুদের বাড়ী তামাক

সাজিবে, না, ভাত রাঁধিবে যে তাহাকে হরি নামে ডাকিতে হইবে? ছি, কার্ত্তিকের বাপের কি কিছুমাত্র বিবেচনা নাই! যে ছেলে পরে হাকিম-সদরালা হইবে, তাহার নাম হইবে কি না, হরিদাস! বামুন যেন কি!

কার্ত্তিকের পিতা শিবচন্দ্র ন্যায়রত্ন একজন সংকুলীন অথচ দরিদ্র ব্রাহ্মণ। গ্রামের জমিদার মুখোপাধ্যায়-গোষ্ঠীর পৈতৃক টোলের বৃত্তি ও ব্রহ্মোত্তরের উপর নির্ভর করিয়া এবং দুই-এক ঘর শিষ্য-সেবকের বার্ষিকের আয়ে তাঁহার সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ হয়। অধ্যয়ন-অধ্যাপনা ও পূজা-পাঠেই তাঁহার অধিকাংশ সময় কাটিয়া থাকে। তথাপি তিনি তাঁহার একমাত্র পুত্রের ভবিষ্যৎ উন্নতির জন্য গ্রাম্য এণ্ট্রান্স্ স্কুলে তাহাকে ভর্ত্তি করিয়া না দিয়া স্বয়ংই তাহার অধ্যয়নাদির ভার লইলেন। ইহাও কার্ত্তিকচন্দ্রের মাতার সহিত তাঁহার মতদ্বৈধের আর একটি কারণ।

এইরূপ বিরোধের মধ্যে যাহার জন্ম ও বৃদ্ধি, বুদ্ধিও যে তাহার প্রথম হইতেই একটু 'বিরোধী' রকমের হইবে, ইহা অত্যন্ত স্বাভাবিক। সেইজন্য কার্ত্তিকচন্দ্রের প্রকৃতিতে প্রথম হইতেই কতকগুলি পরস্পর বিরোধী গুণের বিকাশ দেখা দিল। সে তাহার পিতার টোলের ছাত্র-দের সহিত সযত্নে ও তীক্ষ্ণ মেধার সহিত অধ্যয়নাদি করিত বটে, তথাপি সে তাহাদের দলে প্রথম হইতেই একটি মূর্ত্তিমান্ বিপ্লবের ন্যায় বিরাজিত ছিল। কিন্তু তাহার মুখের পরম গম্ভীর ভাব দেখিয়া কেহ তাহাকে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে শাসন করিতেও পারিত না। উপরন্তু অধ্যাপকের একমাত্র সন্তান বলিয়া সে অনেক গুরুতর অপরাধ করিয়াও মার্জ্জনা পাইত। বিশেষতঃ তাহার মাতাঠাকুরাণীর ভয়ে ছাত্রদিগকে কার্ত্তিকের বিষয়ে অনেক খানি সঙ্কুচিত থাকিতে হইত।

টোলের ছাত্র সর্ব্বানন্দের ব্যাকরণের আদ্য পরীক্ষার সময় অতি সন্নিকট। সে রাত্রি জাগিয়া ব্যাকরণের সূত্র কণ্ঠস্থ করিয়াছে এবং অনেক রাত্রে প্রদীপ নিবাইয়া শয়ন করিয়া প্রত্যুষে উঠিয়াই তাহার ব্যাকরণখানির জন্য হাতড়াইতেছে,—ইচ্ছা, প্রাতঃকৃত্য সারিয়া আসিয়াই পড়িতে বসিবে। কিন্তু দেখা গেল, তাহার মাথার শিয়রের পুস্তক-রাশি বিপর্য্যস্ত এবং ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত; সর্ব্বোপরি সেই অতি-যত্নের মুগ্ধবোধখানি যে কোথায় গিয়াছে, কেহই তাহা বলিতে পারে না।

কে করিল? কে করিল? আর কে?—কার্ত্তিকচন্দ্র। কিন্তু সে কোথায়, তাহারও কোন সন্ধান পাওয়া গেল না। পিতা বিরক্ত হইয়া শিশুর অনুসন্ধানে তাহাকে নিতাই ঘোষের দাওয়া হইতে ধরিয়া আনিয়া প্রশ্ন করিলেন, "কেন তুমি এ কাজ কর্‌লে?" কার্ত্তিকচন্দ্র পরম গম্ভীর-ভাবে বলিল, "সারা রাত্রি পড়ে সর্ব্ব দাদার মাথা খারাপ হয়ে যাবে, পরীক্ষায় ফেল হবে, তাই ওর বইখানা সরিয়ে রেখেছি।" পিতা ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, "শীঘ্র এনে দাও! আর যদি এ রকম কর, তা হলে তোমায় বিশেষ শাস্তি দেব।" কার্ত্তিকচন্দ্র নির্ব্বিকার চিত্তে সর্ব্বানন্দেরই একটা ভাঙ্গা বাক্স হইতে সেই প্রার্থিত পুস্তকখানি বাহির করিয়া দিয়া বলিল, "সর্ব্বদাদা, সারাদিন গ্যাজর গ্যাজর করো না, বল্‌ছি, আমার শুদ্ধ মাথা খারাপ হয়ে যাবে।" সর্ব্বানন্দ হাসিয়া বলিল, "তুমিও যখন পরীক্ষা দিতে যাবে, তখন এমনি করেই গ্যাজর গ্যাজর কর্‌বে।" কার্ত্তিকচন্দ্র অত্যন্ত অবজ্ঞা-ভরে একটা অদ্ভুত শব্দ করিয়া চলিয়া গেল।

ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত সত্য যে শীতকালেই গরম জামা-কাপড় গায়ে দিতে হয়, কিন্তু আমাদের কার্ত্তিকের নিকট সে সত্য একেবারে বন্ধ্যার পুত্রের ন্যায়ই মিথ্যা। বৈশাখের রৌদ্রে সকলে যখন ঘামিয়া অস্থির

হইতেছে, তখনই তাহার প্রাতর্ভ্রমণের সময়। সে মধ্যাহ্নে আহারাদি সারিয়া মাতুলালয় হইতে প্রাপ্ত লাল মোজা ও গরম কোটে শোভিত হইয়া ছত্রহীন মস্তকে ঐ সময় সমস্ত গ্রামটা প্রদক্ষিণ করিয়া আসে। কেহ আপত্তি করিলে সে বলে, "সবাই যা করবে, তাই যে করতে হবে, এর কি মানে? সব জিনিষেরই যখন দুটো দিক আছে, তখন সব কাজেরই বা দুটো দিক না থাক্‌বে কেন?" সে যে একজন নৈয়ায়িকের পুত্র, এ কথা নানাপ্রকারে প্রমাণ করিয়া কার্ত্তিকচন্দ্র এই অল্পবয়সেই ন্যায়ের মূর্ত্তিমান্ ফক্কিকারস্বরূপ ঘুরিয়া বেড়াইত। এবং তাহার অকালপক্ক মুখের নিকট কাহারও কোনরূপ আপত্তি টিঁকিত না বলিয়া তাহার মাতা মনোরমা ঠাকুরাণী প্রতিবেশিনীদিগকে মাঝে মাঝে গর্ব্বিত হাস্যে বলিতেন, "বামুন আমার এমন ছেলেকে টোলে ভর্ত্তি করতে চায়!" তাঁহার কথায় কেহ যদি সমবেদনা প্রকাশ করিয়া কিছু বলিত, অমনি তিনি বলিতেন, "ছেলে যদি আমার বাঁচে তাহলে ও নিশ্চয় একটা হাকিম টাকিম হবেই। তবে যে ওর শরীর!" অবশ্য কার্ত্তিকচন্দ্রের ভগ্ন স্বাস্থ্য সম্বন্ধে প্রতিবেশিনীদিগের সহিত হয়ত তাহার মাতার আন্তরিক অমিল থাকিতে পারে,—কারণ কার্ত্তিকচন্দ্রের দিব্য নধর গৌর কান্তি,—তথাপি মনোরমা দেবীর মুখের সম্মুখে সকলেই তাঁহার কথায় সায় দিয়া যাইত।

কার্ত্তিকচন্দ্রের এইরূপ বহুবিধ গুণ থাকা সত্ত্বেও একটা বিশেষ দোষ ছিল এই যে সে পড়াশুনায় অতি দ্রুত অগ্রসর হইতেছিল। ইহারই মধ্যে সে ব্যাকরণ ও কাব্যে তাহার পিতার অনেক বর্ষীয়ান্ ছাত্রকেও পরাস্ত করিতেছিল; এবং ন্যায় শাস্ত্রেরও দুই-একটা বুকনি তাহার অবিদিত ছিল না।

অপরাহ্নে দেবায়তনের নাট মন্দিরে বসিয়া অধ্যাপক শিবচন্দ্র তাঁহার

কতকগুলি ছাত্রের সহিত ন্যায়ের "অভাব" বস্তু সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছিলেন। একজন বুদ্ধিমান্ ছাত্র, নাম ব্রহ্মপদ, অধ্যাপকের সহিত ঐ বিষয়ে মৃদুভাবে তর্ক করিতেছিল। নিকটে বসিয়া কার্ত্তিক-চন্দ্র একটী পারাবতের পদদেশে ঘুঙুর ও গলদেশে বিচিত্র বর্ণের ফিতা জড়াইতে ব্যস্ত ছিল। অধ্যাপক যখন ছাত্রের তর্কে কিঞ্চিৎ উষ্ণভাবে উত্তর প্রত্যুত্তর করিতেছিলেন, ঠিক সেই সময় কার্ত্তিকচন্দ্র হঠাৎ পারাবতটীকে তুলিয়া লইয়া একেবারে অধ্যাপক ও ছাত্রগণের মধ্যস্থলে ফেলিয়া দিয়া সশব্দে হাসিয়া উঠিল। পিতা ক্রুদ্ধ হইয়া তাহার দিকে ফিরিবামাত্র সে গম্ভীর স্বরে বলিল, "আপনি অভাব বস্তু বোঝাতে পার্ছেন না, আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি। ব্রহ্মদাদা, তোমার বুদ্ধি নেই। এই অভাব বস্তুর দরুণই তুমি বুঝিতে পার্ছ না। অতএব অভাব বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার কর কি না? এই দেখ, এই রনু (পক্ষীটীর নাম) কেমন অভাব বস্তু বোঝে। ও বেশ বুঝেছিল যে ওর পায়ে ঘুঙুরের অভাব আছে, তাই এতক্ষণ চুপ করে তাই পর্ছিল, তোমার মত তর্ক করেনি। কিন্তু তুমি এমনি বোকা, তোমার বুদ্ধি নেই, এই অভাব বস্তুটা পর্য্যন্তও তুমি জান না।"

ছাত্রেরা অনেকে মুখ ফিরাইয়া হাস্য সম্বরণের চেষ্টা করিতে লাগিল, কিন্তু ব্রহ্মপদ ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, "ন্যায়রত্ন মহাশয়, চিরদিন কি আমাদের এইরকম অত্যাচার সইতে হবে?" অধ্যাপক স্বয়ংও বিরক্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু পুত্রের এই অদ্ভুত যুক্তি শুনিয়া তিনিও না হাসিয়া থাকিতে পারিলেন না। ব্রহ্মপদ ক্রুদ্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। কার্ত্তিকচন্দ্র তখন তাহার পৃষ্ঠদেশে মৃদু একটা চপেটাঘাত করিয়া বলিল, "এঃ, তোমায় অভাব বস্তুতেই পেয়ে বসেছে—বুদ্ধির অভাবের সঙ্গে হাসিরও অভাব হয়েছে—হাস্‌তে পর্য্যন্ত ভুলে গেছ! ছি!"

কার্ত্তিকচন্দ্র হাসিতে হাসিতে পারাবতটীকে লইয়া প্রস্থান করিল। অধ্যাপক তখন নানা কথায় ছাত্রকে শান্ত করিয়া পুনরায় অধ্যাপনায় মন দিলেন।

২

শিবরামপুরের কালিকামোহন মুখোপাধ্যায়ের বয়স যাহাই হউক, তাঁহার গুরু গম্ভীর চাল-চলনের জন্য কেহই তাঁহার বয়স অনুমান করিতে সাহস করিত না। বনিয়াদী জমিদারী চালের সমস্ত খুঁটিনাটিই সযত্নে তিনি পালন করিয়া চলিতেন। প্রাতঃকৃত্য-সমাপনের সময় সেই যেমন বহু বৎসর পূর্ব্বেও জলচৌকিতে বসিয়াই পাইকদের ডাকিয়া নিকটে আনিতেন, আজও তাঁহার সে চালের পরিবর্ত্তন ঘটে নাই। সেই বেলা দেড়টার পর কাছারি হইতে উঠিয়া দুইটা পঁয়ত্রিশ মিনিটের সময় আহারে উপবেশন আজিও অব্যাহত ভাবে চলিতেছে। নিদ্রার সময়, উদ্যান পরিদর্শনের সময়, পিতামহের আমলের সেই হল্‌দে রঙের মোটা লাঠিটি লইয়া ভ্রমণের সময়—এ সব কিছুরই একচুল নড়চড় হয় নাই। এমন কি কেহ কেহ বলে, বাবু তাঁহার পিতার মৃত্যুর পর প্রথম পুণ্যাহের দিনে যে বস্ত্রখানি যে-ভাবে পরিধান করিয়াছিলেন, আজও সেইরূপ বস্ত্র সেই ভাবে সেই তাঁতিদের নিকট হইতেই ক্রয় করিয়া পরিধান করিয়া থাকেন। অধিক কি, এই চাল বজায় রাখিবার জন্য তিনি সহরাদিতে গমনাগমনও একপ্রকার ছাড়িয়া দিয়াছিলেন।

তাঁহার ভয়ে ব্যাঘ্র ও ছাগশিশু একত্র জলপান করিত কি না, এ পর্য্যন্ত তাহার কোন সঠিক সংবাদ পাওয়া যায় নাই, তবে অনেক নর-ব্যাঘ্র অর্থাৎ ভোজপুরী পাহালবানকে তিনি পুষিতেন; এবং বহু দরিদ্র আত্মীয়-অনাত্মীয় শ্রেণীর লোক তাঁহার আশ্রয়ে পালিত হইত। তাঁহার প্রাসাদতুল্য প্রকাণ্ড অট্টালিকা বহু লোক-লস্কর ও জীব-জন্তুর কলরবে

মুখরিত থাকিত। অশ্বশালায় অশ্ব, গোশালায় গাভী, অতিথিশালায় অতিথি, স্তম্ভের শিখরে পারাবত, কড়ি বরগার ফুকরে ফুকরে চড়ুই তালচঞ্চু,—পাকশালায় পাচকের কলরব, দাস-দাসীগণের বচসা, অন্তঃপুরে বিধবার দল—তাঁহার সংসারে কিছুরই অভাব ছিল না। তথাপি কোন কোন বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি বলিতেন যে কালিকাবাবু পুত্র-সন্তান-অভাবে অন্তরে অন্তরে অত্যন্ত ম্রিয়মাণ ছিলেন। অবশ্য এ কথা বাহিরের কেহ বুঝিতে পারিত না। কারণ কালিকাবাবুর একমাত্র কন্যা শ্রীমতী শৈলজাসুন্দরী অন্ততঃ বাহ্যতঃ তাঁহার পুত্রের অভাব পূর্ণ করিয়া, বরং তাহার অধিক হইয়াই, বিরাজ করিতেছিলেন।

এই শৈলজাসুন্দরী যখন মাত্র দেড় বৎসরের, তখনি ইঁহার নামে একটী বড় মৌজা ক্রয় করা হয় এবং এতাবৎকাল পর্য্যন্ত বহু পত্তনি, দরপত্তনি, সেপত্তনি মাহাল পিতা ইঁহার নামে ক্রয় করিয়াছেন। এমন কি ইঁহার সমস্ত বিষয়াদি তত্ত্বাবধানের জন্য পৃথক সেরেস্তা গোমস্তা কারকুন পাইক নিযুক্ত করিয়া কালিকামোহন স্বয়ং "গার্জ্জেন" নাম স্বাক্ষর করতঃ ইঁহার বিষয়-কর্ম্ম চালাইতেছিলেন। কন্যার নামে পৃথক "বিষয়-আশয়" করা তাঁহার অপত্য স্নেহের যতখানি নিদর্শন, তদপেক্ষা শিশু কন্যাকে ইতিমধ্যেই জমিদারী করিয়া দেওয়ার একটা অহঙ্কারকেই বিশেষভাবে প্রকাশিত করিয়াছিল। শৈলজাসুন্দরী যদিও এখনও অষ্টম বর্ষ অতিক্রম করেন নাই, তথাপি ইহারই মধ্যে তাঁহার নাম বড় বড় মকদ্দমায় বাদী অথবা প্রতিবাদীরূপে জগৎ সমক্ষে প্রচারিত হইতেছিল। এমন কি ইঁহার নামীয় একটা মকদ্দমা প্রিভিকাউন্‌সিল্ পর্য্যন্ত গিয়া একটী "লিডিং" কেসের মূর্ত্তিতে বর্জ্জয়েস অক্ষরে I. L. R. এর অঙ্ক শোভিত করিয়াছে। যদিও উক্ত শৈলজাসুন্দরী উক্ত মকদ্দমায় পরাজিত হইয়াছিলেন, তথাপি, তিনি তাঁহার পিতার পিতৃপিতামহগণের প্রসিদ্ধ

নামকে সুদূর শ্বেতদ্বীপ পর্য্যন্ত বিস্তৃত করিয়া কালিকাবাবুর জমিদারীর প্রজাগণের হৃদয়ে জলাতঙ্কের ন্যায় বিরাজ করিতেছিলেন। এরূপ কন্যার পিতা হইয়া কালিকাবাবু আপনাকে ধন্যই মনে করিতেছিলেন।

এ হেন কন্যার বিবাহ দিতে হইলে অনেক চিন্তা, অনেকখানি সতর্কতার প্রয়োজন, শৈলজাসুন্দরীর পিতাও এ কথা বিশেষভাবে বুঝিতেন। অবশ্য এরূপ অবস্থায় সম্বন্ধ বা প্রস্তাবের অভাব কখনই হইতে পারে না, কারণ শৈলজা ধনী পিতার ধনী সন্তান। বহু দিক হইতে নানা প্রকার প্রার্থনীয়-অপ্রার্থনীয় সম্বন্ধ ইতিমধ্যেই ঝাঁকে ঝাঁকে আসিয়া উপস্থিত হইতেছিল। কিন্তু পিতা কালিকামোহনের এ পর্য্যন্ত কোনটিই মনঃপূত হয় নাই। কালিকামোহনের বৃদ্ধা মাতা এখনও জীবিতা আছেন; এবং তিনিই গৌরী-দানে পুণ্য সঞ্চয়ের লোভে এখনও ৺কাশীধামে যাইয়া বাস করিতে পারেন নাই। তবে ব্যাপার যেরূপ দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে গৌরী ত দূরের কথা, কন্যকা-দানও সন্দেহজনক হইয়া উঠিয়াছে।

শৈলজার বিবাহ-বিষয়ে ইনিও ইঁহার পুত্রের চিন্তার অংশ-ভাগিনী হইয়াছিলেন। কারণ বিবাহ দিয়া এই একমাত্র কন্যাকে একেবারে পর করিয়া দিতে কালিকামোহনও যেমন অনিচ্ছুক, তাঁহার মাতা জগদম্বা দেবীও তদ্রূপ। কিন্তু শৈলজাসুন্দরীর মাতা অর্থাৎ জমিদারী সেরেস্তায় যাঁহার নাম "বৌরাণী" লেখা হইয়া থাকে, তাঁহার ইচ্ছা কিঞ্চিৎ অন্যরূপ ছিল বলিয়াই প্রকাশ। শুনা যায়, তিনি না কি ঘরজামাই করার একান্ত বিরোধী। তিনি তাঁহার কোন কোন অন্তরঙ্গের নিকট মনের ভাব প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, যদি বিবাহই দিতে হয়, তাহা হইলে একেবারে দান করিয়া ফেলাই উচিত। কন্যার পরিবর্ত্তে একটী পুত্র লাভ করা কোনক্রমেই বাঞ্ছনীয় নহে, কারণ তাহাতে কন্যাই স্বামীর স্থান

অধিকার করিয়া দাম্পত্য জীবনের সমস্ত সুখ-শান্তি হারাইয়া ফেলে। স্ত্রীলোক যদি একেবারে স্বামীতে মিশিয়া যাইতে না পারে, তাহা হইলে বিবাহের প্রধান উদ্দেশ্যই নিষ্ফল হইয়া যায়। অবশ্য তাঁহার মত যে গৃহের বধূর মত বলিয়াই যথাবিধি উপেক্ষিত হইয়াছিল, এ কথা বলা বাহুল্য মাত্র।

একমাত্র কন্যার উপর যে মাতার এতখানি স্নেহ-হীনতা প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছিল, সেই মাতা যে তাঁহার শ্বশ্রূঠাকুরাণী ও স্বামী মহাশয়ের নিকট ইহার জন্য কিঞ্চিৎ লাঞ্ছিত হইবেন, ইহা স্থির সিদ্ধান্ত; তথাপি ইঁহার দুর্বুদ্ধি যে ইনি স্বীয় মতের একচুলও পরিবর্ত্তন করিতে পারেন নাই। স্ত্রী-বুদ্ধি (অর্থাৎ পত্নীর বুদ্ধি) চিরদিনই প্রলয়ঙ্করী! শাস্ত্র কি মিথ্যা হয়!

জমিদার মহারাজ ও তাঁহার মাতা এইভাবে চিন্তাযুক্ত হইয়া কালাতিপাত করিতেছেন, এমন সময় একদিন কালিকামোহনের দৃষ্টি অকস্মাৎ কাত্তিকচন্দ্রের উপর পতিত হইল।

কার্ত্তিকচন্দ্র তাহার মধ্যাহ্ন-ভ্রমণের সময় কখনও কখনও জমিদারী কাছারী, এমন কি জমিদারী প্রাসাদের অন্তঃপুর পর্য্যন্ত শুভাগমন করিত। তাহার অদ্ভুত চাল-চলন ও বেশভূষা সদর গোমস্তা হইতে পাইক দরোয়ান ঝাড়ুদার ফরাশ পর্য্যন্ত সকলের নিকটই পরিচিত ছিল; এমন কি অন্তঃপুরের দাস-দাসী, পাচিকা ও অন্যান্য "দীনাঃসমাশ্রিতা" বিধবাগণের নিকটও সে ন্যায়রত্ন মহাশয়ের পুত্র-রত্ন বলিয়া সমাদৃত, পরিচিত এবং সর্ব্বদোষে উপেক্ষিত হইত। তবে এতাবৎকাল পর্য্যন্ত সে বাবু মহারাজ অথবা তাঁহার মাতা "বুড়ী রাণীমার" মনোযোগ আকর্ষণ করিতে পারে নাই। কিন্তু জমিদারী কাছারীর দালানের পারাবত-দলের সহিত ইহার পরিচয় ঘনিষ্ঠতম ছিল। এবং সেই সামান্য কারণ হইতে সহসা কার্ত্তিকচন্দ্র একদিন "বাবু মহারাজের" রাজকীয় দৃষ্টি আকর্ষণ করিল।

স্থান জমিদারী কাছারীর সম্মুখস্থ প্রকাণ্ড নাটমন্দির—অর্থাৎ যেখানে নানা উপলক্ষে বৎসরের মধ্যে অন্ততঃ সার্দ্ধ দ্বাবিংশবার যাত্রা, নাচ, গান হইয়া থাকে। কাল মধ্যাহ্ন; এবং পাত্র আমাদের কার্ত্তিকচন্দ্র ও কতকগুলি বাগ্দি, চাঁড়াল প্রভৃতি নিম্ন শ্রেণীর লোক। উপলক্ষ দ্বিবিধ,—কার্ত্তিকচন্দ্রের পক্ষে "মুক্ষি" নামক এক প্রকার পারাবত-বংশের উপর অত্যাচার এবং তাহাদের বংশধরগণের দুই-একটীকে পিনাল কোডের এব্‌ডাক্‌সন ধারানুযায়ী কার্য্যের দ্বারা বে-আইনি স্থানান্তর-করণ, এবং বাগ্দিগণের পক্ষে জমিদার মহারাজের নিকট হইতে পথ-করের দায় হইতে মুক্তিলাভ করা।

কার্ত্তিকচন্দ্র একজন উক্ত শ্রেণীর লোককে আদেশ করিল, "রামু, এই মৈ খানা চেপে ধর ত, আমি উঠ্‌ব।"

রামু ওরফে রামা বাগ্দি ক্ষীণস্বরে প্রতিবাদ করিয়া বলিল, "দাদা-ঠাকুর, বাবু মহারাজের সামনে কেমন করে এ কাজ কর্‌ব?"

কার্ত্তিকচন্দ্র একবার অবজ্ঞার দৃষ্টিতে কাছারীর কক্ষের দিকে চাহিয়া বলিল, "কেউ কিছু বল্‌বে না, তুমি ধর।"

রামু তখন কাতর হইয়া বলিল, "দাদাঠাকুর, আমরা দরবার করতে এসেছি, এখন যদি দেওয়ানজী কোন কারণে বিরক্ত হন, তা হলেই সর্ব্বনাশ!"

কার্ত্তিকচন্দ্র বিস্মিত হইয়া বলিল, "দরবার! সে আবার কি? দরবার ত' নবাব-বাদশারা কর্‌তেন, তোমরা তা কি করে কর্‌বে?"

রামু কহিল, "আজ্ঞে মিছিমিছি আমাদের ওপর পথকর চাপানো হয়েছে, সেই কথা মহারাজের কাছে নিবেদন পেতে এসেছি।"

কার্ত্তিক কহিল, "তা কর্‌লে কি হবে?"

এই প্রশ্নে সেই বিষণ্ণ জোড়হস্ত ব্যক্তিগণের মুখেও একটা অস্ফুট

হাসির রেখা দেখা দিল। রামু ভাবিল, এই কার্ত্তিকচন্দ্রকে দিয়াই হয়ত তাহাদের এ বিষয়ে কিছু উপকার হইতে পারে। মজ্জমান ব্যক্তির তৃণাবলম্বনের ন্যায় রামচন্দ্র ইহাকেই অবলম্বন করিতে মনস্থ করিয়া বলিল, "দাদাঠাকুর, আপনি যদি আমাদের হয়ে দু'কথা বলে দাও, তাহলে আমি নিজেই কবিতোর ধরে দেব।"

কার্ত্তিক কহিল, "কাকে কি বল্‌তে হবে, বল, আমি এখনই বল্‌ছি।"

রামু কহিল, "দেওয়ানজীকে আর মহারাজকে বল্‌তে হবে—"

কার্ত্তিক কহিল, "মহারাজ! সে আবার কে?"

রামু কহিল, "আজ্ঞে, বাবু মহারাজ—"

কার্ত্তিক কহিল, "ওঃ, বুঝেছি। আচ্ছা, কি বল্‌তে হবে?"

রামু কহিল, "বল্‌বেন যে এরা গরীব, এদের উপর আবার পথকর বসানো কেন? আমাদের যে চাকরান জমি আছে, তার জন্য ত আমরা তাঁবেদার হামেহাল হাজির আছি। রাত-বিরেত মানিনে, যখনই ডাক পড়ে, হুজুরে হাজির হয়ে কাজ করে দি। এর ওপরও যদি আবার খাজনা দিতে হয়, তা হলে আমরা দাঁড়াই কোথা? এই সব কথা একটু গুছিয়ে কাকুতি মিনতি করে যদি বল্‌তে পার, তাহলে দাদাঠাকুর আমরা আপনার কেনা হয়ে থাক্‌ব।"

কার্ত্তিকচন্দ্র আর দ্বিরুক্তি না করিয়া যেখানে শিবরামপুরের জমিদার কালিকামোহন ও তাঁহার প্রবলপ্রতাপ দেওয়ান দুর্গাশঙ্কর বসিয়া কাগজ-পত্র দেখিতেছিলেন, একেবারে সেইখানে উপস্থিত হইয়া গম্ভীর মুখে বলিল, "আপনার কাগজপত্র রাখুন, দেওয়ানজী, আপনি রামু বাগ্দিদের খাজনা মাপ করে দিন। ওরা গরীব, ওরা খাজনা দেবে কোথা থেকে?"

হঠাৎ জমিদারী কাছারির মৃদু গুঞ্জনধ্বনি থামিয়া গেল। যুগপৎ সকলেরই দৃষ্টি কার্ত্তিকচন্দ্রের উপর পতিত হইল। দেওয়ান মহাশয়ের চক্ষু

তাঁহার চশমার উপর দিয়া তেজ উদ্‌গীরণ করিয়া এই নির্ভীক বালকের উপর স্থাপিত হইল। দেওয়ানজী গম্ভীর ভাবে বলিলেন, "কি বল্‌ছ, কার্ত্তিক ?"

কার্ত্তিক কহিল, "আমি বল্‌ছি, কেন আপনারা এই গরীব রামুদের ওপর অত্যাচার কর্‌ছেন ? আমি ওদের অবস্থা জানি, ওরা খাজনা দিতে পার্‌বে না।"

গোমস্তা, মুহুরী ও অন্যান্য কর্ম্মচারীরা ভয়ে বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া রহিল। কারণ এই দুর্দ্ধর্ষ দেওয়ানকে ভয় করে না, এরূপ ব্যক্তি দশ-বারো ক্রোশের মধ্যে একটিও ছিল না। এমন কি স্বয়ং জমিদার মহাশয়ও ইঁহার মান্য রক্ষা না করিয়া কথা বলিতে সাহস করিতেন না। ইঁহার হাঁক-ডাকে বড় বড় ভোজপুরী দরোয়ানদেরও কলেবর কম্পিত হইত। আর সামান্য প্রজারা ত ইঁহাকে দেখিলে বাত্যাতাড়িত শুষ্ক পত্রের ন্যায় সুদূরে পলায়ন করিত—কিম্বা যদি নিতান্তই দুর্ভাগ্যবশতঃ ইঁহার রোষ-দৃষ্টির সম্মুখে আসিয়া পড়িত, তাহা হইলে বাত্যাহত কদলীর ন্যায় ভূমি ভিন্ন তাহাদের অপর আশ্রয়-স্থান আর কোথাও থাকিত না।

এ-হেন দেওয়ানের চশমা ও পিঙ্গল চক্ষুর সম্মুখে দাঁড়াইয়া চতুর্দ্দশ বর্ষীয় বালক যখন প্রভুর ন্যায় আজ্ঞা প্রদান করিল, তখন সকলেরই হৃদয়ে একটা আশু বিপদ-পাতের আশঙ্কা দেখা দিল। কার্ত্তিকচন্দ্র কিন্তু কোন দিকে লক্ষ্য না করিয়া বলিল, "দেওয়ানজী, আপনি গোমস্তাদের বলে দিন, ওরা যেন আর এদের ওপর অত্যাচার না করে!"

দেওয়ান আপনার গাম্ভীর্য্যের শিখর হইতে না নামিয়া বলিলেন, "যাও কার্ত্তিক, এখন বিরক্ত করো না। অন্য সময় তোমার আর্জী শোনা যাবে।"

কার্ত্তিক কহিল, "অন্য সময় আবার কি ? এই ত সময়! এখনই

ত' কাছারি হচ্ছে। এখনই ওরা এসেছে, যা হয় এখনই হুকুম দিয়ে দিন। ওরা আবার কতবার হাঁটাহাঁটি কর্‌বে?"

দেওয়ান সিংহ-গর্জ্জনে বলিলেন, "কে আছিস্ রে, ঐ বাগ্দি হারাম-জাদাদের দূর করে দে ত! এত বড় আস্পর্দ্ধা! যা কার্ত্তিক, এখন গোল করিস্‌নে, বল্‌ছি, নইলে—"

কার্ত্তিকচন্দ্র গম্ভীরভাবে বলিল, "দেওয়ানজী, আপনি রাগই করুন আর যাই করুন, ওদের খাজনা মাপ না কর্‌লে আমি এখান থেকে উঠ্‌ছিনে। বাবু, আপনি ত রয়েছেন, আপনিই একটা হুকুম দিন না!"

দেওয়ানজীর আর সহ্য হইল না; তিনি জমিদারি-চালে হুকুম দিলেন, "ঘনবরণ সিং, এই ছোঁড়াটার কান ধরে ওর বাপের কাছে রেখে আয় তো।"

ঘনবরণ সিং নিকটে আসিয়া দাঁড়াইয়া হস্ত প্রসারিত করিয়া বলিল, "চলিয়ে ঠাকুরজী।"

কার্ত্তিকচন্দ্র সহসা কাছারির চৌকির উপর উঠিয়া তাহার গালে প্রচণ্ড এক চড় কসাইয়া বলিল, "ছাতুখোর, তুই আমার গায়ে হাত দিতে আসিস্!"

কালিকামোহন এতক্ষণ সকৌতুকে বালকের অদ্ভুত ভাব-ভঙ্গী লক্ষ্য করিতেছিলেন। সহসা তাঁহার প্রসিদ্ধ পাইককে এইভাবে অপমানিত হইতে দেখিয়া তিনি হাসিয়া বলিলেন, "ঘনবরণ, বাইরে যা। কি বাবা কার্ত্তিক, তুমি কি দরবার কর্‌ছ—আমার কাছে কর।"

কার্ত্তিক কহিল, "দরবার! কে দরবার কর্‌ছে? দরবার নবাব-বাদশা এরাই করে, আর কে কর্‌তে পারে! আমি এই কথা বল্‌তে এসেছি যে, যারা আপনারই কাজ করে, তারাই আপনার কাছ থেকে মাইনে দাবী কর্‌তে পারে। তা না হয়ে আপনি তাদের কাছ থেকে খাজনা নেবেন কি হিসেবে?"

কালিকামোহন বেগতিক দেখিয়া হাসিয়া বলিলেন, "আচ্ছা, আচ্ছা, আমি ওদের খাজনা মাপ করে দেব। যাতে কেউ ওদের খাজনা না নেয়, তা করে দেব। তুমি যাও, এই রোদ্দুরে ঐ গরম কোটটা খুলে ফেলো।"

কার্ত্তিকচন্দ্র বিজয়-গর্ব্বে গম্ভীর মুখে ফিরিয়া যাইতে যাইতে বলিল, "গরম জামা খোলা না খোলা, সে আমার ইচ্ছে।"

কার্ত্তিকচন্দ্র নাট-মন্দিরে নামিয়া দেখে, তাহার বাগ্দি বন্ধুরা বেগতিক দেখিয়া পূর্ব্বাহ্লেই পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিয়াছে। তখন সেই বিজয়-সংবাদ স্বয়ং সে তাহাদিগকে দিবার জন্য উন্নত মস্তকে দেউড়ীর মধ্য দিয়া দরোয়ানদের জ্বলন্ত দৃষ্টি উপেক্ষা করিতে করিতে চলিয়া গেল।

৩

মধ্যাহ্নে দেবায়তনের কূপে স্নান করিতে করিতে ব্রহ্মপদ ও আর একটি ছাত্র, নাম শ্যামাপ্রসন্ন, এই দুইজনের মধ্যে গভীরভাবে তর্ক চলিতেছিল। শ্যামাপ্রসন্ন বলিল, "কাব্য পড়বার জন্য ব্যাকরণ বা অলঙ্কার শাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপত্তির প্রয়োজন নেই। কবিতার ভাব বোঝা সহজ বুদ্ধিতেই হয়।"

ব্রহ্মপদ ন্যায়ের ছাত্র, তথাপি সে ব্যাকরণের উপাধিও লাভ করিয়াছিল বলিয়া প্রতিবাদ করিয়া বলিল, "কখনই নয়; ব্যাকরণ আর অলঙ্কার শাস্ত্রকে অবলম্বন করেই কাব্য, নইলে সে কাব্য কাব্য নামেরই যোগ্য হতে পারে না।"

"অর্থাৎ, তোমার মতে আগে ব্যাকরণ তৈরি হয়েছিল, তার পর কাব্যসৃষ্টি! আগে রাস্তা তৈরি, তারপর লোক-চলাচল! কি বুদ্ধি!"

"ব্যাকরণের সৃষ্টি যে আগে হয়েছিল, এ কথা জোর করে বলা যায় না, তবে—"

মেসের তুই একজন সহৃদয় ব্যক্তির সাহায্যে এবং শিবচন্দ্র ও তৎপুত্রের সেবায় সর্ব্বানন্দ সে যাত্রা বাঁচিয়া গেল। পরে সর্ব্বানন্দ কতকটা সুস্থ হইলে কার্ত্তিকচন্দ্র একদিন তাহার পিতাকে বলিল, "বাবা, আমি বাড়ী যাব।"

শিবচন্দ্র বলিলেন, "আর চারপাঁচ দিন পরেই আমি সর্ব্বানন্দকে নিয়ে বাড়ী ফির্‌ব, তখন যেও।"

কিন্তু কার্ত্তিকচন্দ্র সে কথায় কান না দিয়া বলিল, "এই মেসের একজন আজই বাড়ী যাচ্ছেন, তাঁর সঙ্গেই আমি যাব। তিনি টিকিট করে দেবেন, তারপর ষ্টেশন থেকে আমি বাড়ী যেতে পার্‌ব। আমার মন কেমন কচ্চে।" শিবচন্দ্র পুত্রকে চিনিতেন। তিনি আর প্রতিবাদ না করিয়া তাহার যাওয়ার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন।

প্রভাতে কার্ত্তিকচন্দ্র যখন টোলে প্রবেশ করিতেছিল, তখন কয়েকজন ছাত্র তাহাকে দেখিতে পাইয়া ছুটিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "খপর কি, কার্ত্তিক ?"

কার্ত্তিক বিষণ্ণ মুখে বলিল, "খপর আর কি! কাল সব শেষ হয়ে গেছে।"

সমবেত ছাত্রদের সকলের মুখ হইতে যুগপৎ একটা বিস্ময় ও ভয়সূচক শব্দ বাহির হইল। কার্ত্তিক তীব্র দৃষ্টিতে সকলের মুখের দিকে একবার চাহিয়া লইল। কিছুক্ষণ নীরবে থাকিয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ব্রহ্মপদ বলিল, "এই যে পরশু পত্র পেয়েছি, সর্ব্বানন্দের অবস্থা অনেক ভাল।"

কার্ত্তিকচন্দ্র আর কোন উত্তর না দিয়া মাতৃসন্নিধানে চলিয়া গেল। কিন্তু তাহার ওষ্ঠে সে সময় যে তীব্র ব্যঙ্গের ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছিল, সকলেই তাহা লক্ষ্য করিল। ব্রহ্মপদ গম্ভীর মুখে বলিল, "কার্ত্তিককে

আমার বিশ্বাস হয় না। ন্যায়রত্ন মশায় এলেন না কেন? নিশ্চয়ই এ-সব ওর দুষ্টামি।”

দুই একজন মাথা নাড়িয়া বলিল, “এত বড় মিথ্যা কথাটা কি ও বল্‌বে! আর এতে ওর লাভই বা কি হবে?”

ব্রহ্মপদ কহিল, “লাভ-অলাভ নিয়ে ওর দুষ্টুমির পরিমাপ হয় না। এত অল্প বয়সে এতখানি দুষ্ট বুদ্ধি আমি ত আর দেখিনি।”

কার্ত্তিক তাহার মাতার নিকট কোন কথা গোপন করিল না, সেই জন্য কিছুক্ষণের মধ্যেই সত্য সংবাদ প্রকাশ হইয়া পড়িল। ক্রুদ্ধ ব্রহ্মপদ মনোরমা ঠাকুরাণীর নিকট যাইয়া কার্ত্তিকচন্দ্রের দুষ্টামির কথা নিবেদন করিয়া প্রতিকার প্রার্থনা করিল। কিন্তু কার্ত্তিকচন্দ্র ততক্ষণে একটা চাদরে আপাদমস্তক আবৃত করিয়া শুইয়া বলিল, “সারা রাত্তির ঘুমুই নি, এখন আমায় বকিয়ো না।” মাতা তখন হাসিয়া ঘরের দ্বার-জানালা বন্ধ করিতে করিতে বলিলেন, “কি কর্‌ব বাবা, ওঁর আদরেই ও ক্রমশ এমন দুষ্টু হয়ে উঠ্‌ছে। যাক্‌, উনি আসুন, এলে ওর যা-হয় একটা বিশেষ শাস্তি কর্‌ব। এখন একটু ঘুমুক।”

তারপর কিছুদিন পরে সশরীরে সর্ব্বানন্দ ও শিবচন্দ্র গ্রামে ফিরিয়া আসিলেন, আসিয়া কার্ত্তিকচন্দ্রের বিরুদ্ধে নালিশও শুনিলেন; কিন্তু ইহাতে মৃদু হাস্য ব্যতীত কোনরূপ শাস্তির ব্যবস্থা হইল না দেখিয়া ব্রহ্মপদ হাড়ে হাড়ে জ্বলিয়া গেল।

৪

সর্ব্বানন্দ এখন সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়াছে, তথাপি এখনও পুস্তকে মনোনিবেশ করিবার অনুমতি পায় নাই। প্রত্যহ সকালে বৈকালে তাহাকে বেড়াইয়া আসিতে এবং যথাসময়ে আহারাদি করিয়া শয্যা গ্রহণ করিতে

হয়। এই ভ্রমণের সময় কার্ত্তিকচন্দ্রও কোন কোন দিন তাহার সঙ্গে থাকে।

আজ সে তাহার চাদরখানি কাঁধে ফেলিয়া বাহির হইবামাত্র কার্ত্তিক-চন্দ্র একখানা পিচের ডাল চাঁচিতে চাঁচিতে তাহার অনুসরণ করিল। সর্ব্বানন্দ হাসিয়া বলিল, "কার্ত্তিক, তুমি আজ দুপুরে বেড়াতে যাও নি কেন ?"

"তুমি ত' আজ-কাল পড়্‌তে পাও না—তাই তোমার পড়া, আমার পড়া, দু'জনের কাজই আমি সেরে রাখ্‌ছিলাম।"

সর্ব্বানন্দ হাসিয়া বলিল, "ঐ রে, তাহলে আমার মাথাটি খেয়েছ, বোধ হয়,—সমস্ত বই, পুঁথিপত্র ঘেঁটে ঘুঁটে—"

"বেশ খিচুড়ি তৈরি করে রেখেছি, চমৎকার হজম হবে 'খন। এখন যে কাজে যাচ্ছ, চল। সব সময় বই, বই। কি যে হয় তার ঠিক নেই।"

উভয়ে কিছুদূর অগ্রসর হইয়াছে, এমন সময় দূরে একটা পরিচিত টমটমের ঘোড়ার গলার ঘুঙুরের ঝুন্‌ঝুন্‌ শব্দ শুনা গেল। জমিদার কালিকাবাবুর কন্যা শ্রীমতী শৈলজাসুন্দরী তাঁহার খাস দাসী ও দরোয়ানের সহিত সান্ধ্য-ভ্রমণে বাহির হইয়াছেন। ইহা তাহাদের প্রতিদিনের অভ্যাস, তাই কার্ত্তিক বা সর্ব্বানন্দ কাহারও তেমন লক্ষ্য করিবার বিষয় ছিল না। তাহারা পথের এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া গাড়ীটাকে পথ ছাড়িয়া দিল। কিন্তু গাড়ীটা সবেগে অগ্রসর হইতে না হইতে একটা দুর্ঘটনা ঘটিয়া গেল।

অপর দিক হইতে একখানা গরুর গাড়ী কার্ত্তিকদের দিকে অগ্রসর হইতেছিল। পল্লীগ্রামের গোজাতীয় জীবগণ যে কখন কি কারণে ভয় পায় তাহা বলা যায় না। সেই গাড়ীর বলদদ্বয় সহসা সেই গাড়ীসমেত সশব্দে পার্শ্বস্থ নালার মধ্যে নামিয়া পড়িল। গাড়ীতে দুই একজন

স্ত্রীলোক আরোহী থাকায় একটা ভয়ানক হৈ-চৈ ও আর্ত্ত শব্দ উত্থিত হইল। শুনিয়া সর্ব্বানন্দ ও কার্ত্তিকচন্দ্র ছুটিয়া ঘটনাস্থলে গেল।

দুর্ঘটনায় কাহারও তেমন আঘাত লাগে নাই বটে কিন্তু স্ত্রীলোকদের বাহিরে আনিতে ও গাড়োয়ানকে শকটের তলদেশ হইতে বাহির করিতে অনেকটা বেগ পাইতে হইল। ইতিমধ্যে মহামহিমান্বিতা শৈলজাসুন্দরী তাঁহার টমটম থামাইয়া গাড়ীর উপর দাঁড়াইয়া মজা দেখিতেছিলেন। গো-শকটের তলদেশ হইতে গাড়োয়ানকে যখন অদ্ভুতভাবে টানিয়া বাহিরে আনা হইল, তখন তিনি হাসিয়া তাঁহার টমটম হইতে প্রায় পড়িয়া যাইবার মত হইলেন। কার্ত্তিকচন্দ্র ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে গাড়ীটাকে টানিয়া তুলিতে সাহায্য করিয়া উঠিয়া যখন দেখিল, টমটমের উপর উন্নত পাগড়ি দরোয়ান ও কোচম্যান চুপ করিয়া বসিয়া আছে, তখন ক্রোধে তাহার সর্ব্বশরীর জ্বলিয়া গেল ; তদুপরি ঐ হাস্যোচ্ছ্বসিতা বালিকার সহানুভূতিহীন হাস্যের শব্দে সে আর স্থির থাকিতে পারিল না। এক লম্ফে টমটমের উপর উঠিয়া বিরাশী শিক্কা ওজনের এক চড় উঁচাইয়া সে বলিল, "ফের যদি তুমি হাস্‌বে, তাহলে বুঝ্‌তে পার্‌বে। ওদের নালায় ফেলে দিয়ে বসে বসে হাসি! চড় খেয়ে হাস্‌তে পার ত' বুঝি।" দাসী দরোয়ান ও কোচম্যান তিনজনেই অবাক এবং ত্রিংশ সহস্র মুদ্রা আয়ের সম্পত্তিশালিনী শ্রীমতী শৈলজাসুন্দরী ভীত ত্রস্তভাবে বসিয়া পড়িয়া তাহার দাসীকে চাপিয়া ধরিলেন। অপূর্ব্বদৃশ্য!

সর্ব্বানন্দ তাড়াতাড়ি টমটমের নিকটে আসিয়া কার্ত্তিককে নামাইয়া আনিল। কার্ত্তিক গাড়ী হইতে নামিয়া কোচম্যানকে বলিল, "হারামজাদা, ফের যদি বসে বসে এই রকম করে মজা দেখিস্‌, তাহলে তোদের ছড়ি পেটা করব।" কোচম্যান আর দ্বিরুক্তি না করিয়া গাড়ী হাঁকাইয়া

দিল। কিন্তু শ্রীমতী শৈলজাসুন্দরীর সে দিন আর সান্ধ্য ভ্রমণ হইল না; কাঁদিতে কাঁদিতে গাড়ীকে বাড়ী ফিরিতে আদেশ দিলেন।

এদিকে সর্ব্বানন্দ মহাভীতভাবে কার্ত্তিককে বলিল, "এ তুমি কি করে বস্‌লে! ছেলেমানুষের ওপর রাগ দেখিয়েই বা তোমার কি লাভ হ'ল? তা ছাড়া এই রকম করে একটা বিপদকে ডেকে এনেই বা কি লাভ হ'ল? ওরা ত এখনি গিয়ে বাবুকে বলে দেবে, তারপর কি হবে, কে বল্‌তে পারে?"

কার্ত্তিকচন্দ্রের রাগ পড়িয়া আসিয়াছিল, তাই সে উচ্চহাস্য করিয়া বলিল, "আমার ওপর কেউ রাগ করে না, তোমার ভয় নেই।"

সর্ব্বানন্দর ভয় কমিল না; তাই সে বাড়ী ফিরিয়া যাইতে চাহিল। কিন্তু কার্ত্তিক সে প্রস্তাবে কিছুতেই রাজী নয়। সে বলিল, "না, এখনও বেড়ানো হয় নি। আমি কিছুতেই তোমায় ফির্‌তে দেব না।" সর্ব্বানন্দ অগত্যা আরও খানিক বেড়াইতে বাধ্য হইল। কিন্তু বিপদ সেই খানেই শেষ হইল না। কিছুদূর যাইতে না যাইতে জমিদার মহাশয়ের সহিত তাহাদের সাক্ষাৎ ঘটিয়া গেল। কালিকাবাবু নিকটে আসিয়া বলিলেন, "কিরে কার্ত্তিক, তুই শৈলকে মেরেছিস্‌ কেন?"

কার্ত্তিক গম্ভীরভাবে বলিল, "ও তাহলে মিছে কথা বলেছে। আমি কেবল চড় উঁচিয়েছিলাম, কিন্তু এখন দেখ্‌ছি, মারাই উচিত ছিল।"

"কেন? মারা উচিত ছিল, কেন?"

কার্ত্তিক কহিল, "মানুষের এ রকম বিপদ ঘট্‌লে দাঁড়িয়ে যে হাস্‌তে পারে, তার উপযুক্ত ব্যবস্থা, আর কি আছে! তার ওপর আপনার কাছে মিথ্যে কথা বলেছে। আপনারই ওকে বিশেষ শাস্তি দেওয়া উচিত।"

কালিকাবাবু সমস্তই শুনিয়াছিলেন এবং কি কারণে যে তিনি কার্ত্তিকচন্দ্রের উপর কোনরূপ ক্রোধ প্রকাশ না করিয়া হাসিতে হাসিতে কথা

বলিতেছিলেন, তাঁহার অনুসরণকারী দরোয়ান ঘনবরণ সিং কিছুতেই তাহা বুঝিতে পারিতেছিল না। কিছুদিন পূর্ব্বে এই ধৃষ্ট বালকের নিকট যে চপেটাঘাত-লাভ তাহারও ভাগ্যে ঘটিয়াছিল, তাহার অনুভূতি এখনও তাহাকে পরিত্যাগ করে নাই। তাই অদ্যকার অপরাধের সংবাদ শুনিয়া প্রতিশোধের আশায় তাহার হস্তদ্বয় নিস্‌পিস্‌ করিতেছিল। কিন্তু ফলে যখন কিছুই হইল না, উপরন্তু বাবু মহারাজ যখন কার্ত্তিককে আদর করিয়া বলিলেন, "ছি বাবা, ছোট মেয়ের ওপর অত রাগ কর্‌তে নেই। ওর কতটুকু বুদ্ধি!" তখন সে তাহার গালপাট্টা চুমরাইতে চুমরাইতে ভাবিল, "মহারাজ বাওরা হো গয়ে হেঁ।"

কালিকাবাবু যখন চলিয়া গেলেন, তখন বিস্মিত সর্ব্বানন্দের দিকে চাহিয়া কার্ত্তিক বলিল, "দেখ্‌লে সর্ব্বদাদা, আমায় কেউ বক্‌তেই পারে না।"

কার্ত্তিকচন্দ্রের মাতা এই সংবাদ শুনিয়া বলিলেন, "ওর মামাও একদিন এক সাহেব মেরেছিল। কেমন লোকের ভাগ্নে!" কিন্তু তাহার পিতা গম্ভীরভাবে বলিলেন, "এ সব তোমার কি হচ্চে, কার্ত্তিক? পড়া শোনা করে কোথায় শান্ত প্রকৃতি হবে, তা না এ সব কি আবার? সেদিন ঘনবরণ সিংকে মেরেছ, আজ আবার একটি ছোট মেয়ের ওপর বীরত্ব ফলিয়েছ। এ সব ত ভাল নয়। এমন কর্‌লে আমায় এখানকার বাস উঠোতে হবে, দেখ্‌ছি।"

পরদিন হঠাৎ একজন পাইক আসিয়া যখন ন্যায়রত্ন মহাশয়কে সন্ধ্যার পর জমিদার মহাশয়ের নিকট যাইবার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়া গেল, তখন সকলেই বুঝিল, আজ একটা কিছু হইবে। কিন্তু বস্তুতঃ কিছুই ঘটিল না। কালিকাবাবু ন্যায়রত্ন মহাশয়কে পরম সমাদরে বসাইয়া নানাবিধ সদালাপ করিয়া সহসা একটা অদ্ভুত অনুরোধ করিলেন। বাবু

বলিলেন, "আপনার ছেলেটীর বিষয় যা দেখ্‌ছি শুন্‌ছি, তাতে সংস্কৃতর সঙ্গে সঙ্গে ওকে ইংরিজি শিখুলে ও পরে একজন মহাপণ্ডিত লোক হতে পারে। সে জন্য আমার অনুরোধ, আপনি ওকে আমাদের এণ্ট্রেন্‌স্ ইস্কুলে ভর্ত্তি করে দিন। আমি হেডমাষ্টার মশায়কে বিশেষ করে বলে দেব, যাতে ওর ওপর সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখা হয়।"

ন্যায়রত্ন মহাশয় আপ্যায়িত হইয়া বলিলেন, "কার্ত্তিকের গর্ভধারিণীরও অনেক দিন থেকে তাই ইচ্ছে, কিন্তু ইংরিজি শিখলে ছেলে ম্লেচ্ছ-ভাবাপন্ন হয়ে যাবে, হয়ত পিতৃপিতামহের সুনাম নষ্ট করে ফেল্‌বে! তা ছাড়া ভবিষ্যতে এই টোলের ভার ত ওকেই নিতে হবে, তা হলে আর ইংরিজি পড়ে ফল কি?"

কিন্তু কালিকাবাবু ছাড়িলেন না। তিনি নানাপ্রকারে বুঝাইলেন যে ইংরাজী পড়িলেই কেহ ম্লেচ্ছভাবাপন্ন হয় না; এবং বিদ্যা বা জ্ঞান জিনিষটার কোনরূপ জাতি-গোত্র নাই। যে কোন স্থান হইতেই বিদ্যা-লাভ করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

একে গ্রামের একচ্ছত্র সম্রাট, তাহাতে তাঁহার পুত্রের ভালর জন্যই যখন কালিকাবাবু এতখানি চেষ্টিত, তখন ন্যায়রত্ন মহাশয় আর বেশী আপত্তি করিতে পারিলেন না। কেবল এইটুকু বলিলেন, যে ছেলেটী তাঁহার কিঞ্চিৎ একগুঁয়ে ধরণের, উহাকে এ বিষয়ে মত করাইতে কিঞ্চিৎ সময় লাগিতে পারে। এ কথার উত্তরে কালিকাবাবু বলিলেন যে সে বিষয়ে তিনি স্বয়ংই ভার লইতে প্রস্তুত; তিনি স্বয়ং কার্ত্তিকচন্দ্রকে বুঝাইয়া সম্মত করিবেন।

কার্ত্তিকচন্দ্র কিন্তু এই সংবাদ শুনিয়া মাথা নাড়িয়া বলিল, সে ইংরাজী শিখিতে ইচ্ছুক নয়। তাহার মাতা মনোরমা ঠাকুরাণী সগর্ব্বে বলিলেন, "তোকে সবাই এত ভালবাসে, আর তুই সে ভালবাসার এই রকম প্রতি-

দান দিবি? আমি ওঁকে যে কাজে এতদিন ধরে রাজী করাতে পারি নি, আজ সেই তিনিও রাজী হয়েছেন, তবু তুই আমার কথা শুন্‌বি নে?"

কার্ত্তিক কহিল, "বাবা রাজী হয়েছেন, তুমি কেমন করে জান্‌লে? তুমি ছিনে জোঁকের মত লেগে তাঁর মত করিয়েছ, তার ওপর তিনি জমিদার মহাশয়ের ভয়ে রাজী হয়েছেন। আমি যে কারও ভয়ে কোন কাজ কর্‌ব, এ হতেই পারে না। বাবু যে ভয় দেখিয়ে, আমার বাবার অপমান করে আমাকে দিয়ে এই কাজ করিয়ে নেবেন, তা আমি কিছুতেই সইব না। তুমি বাবাকে এ কথা সাফ বলে দাও।"

মনোরমা দেবী চোখ কপালে তুলিয়া চীৎকার করিয়া বলিলেন, "তুই ওঁর মান অপমান দেখ্‌ছিস্‌, আর আমি যে তাদের বলে পাঠিয়েছি, তুই নিশ্চয়ই পড়্‌বি,—তার কি হবে? এখন আমার কথাটা কোথায় দাঁড়াবে? আমার মান-অপমান কি কিছুই নয়?"

কার্ত্তিক কহিল, "তুমি নিজে বড় লোকের মেয়ে, টাকাকড়ি ধন-দৌলতের ওপর চিরদিনই তোমার লোভ। তোমার এ সব বিকারের রুগীর মত কাজ; তাই এ বিষয়ে তোমার কথা না রাখ্‌লেই তোমার মান বাড়ানো হবে।"

মনোরমা দেবী কাঁপিতে কাঁপিতে তাঁহার ক্রোধের সমস্ত তেজটুকু নিরীহ শিবচন্দ্রের উপর ব্যয়িত করিয়া বলিলেন, "এমন ছেলেতে আমার কাজ নেই, তোমার ছেলের যা হয় কর, আমি ওর হাতের জলগণ্ডুষ যদি নি—"

শিবচন্দ্র ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, "থাম, থাম, মিছি মিছি একমাত্র বংশ-ধরের ওপর এত বড় অভিশাপ দিও না। আমিই ওকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ঠিক করে নিচ্ছি!"

কার্ত্তিকচন্দ্রকে অবশেষে বুঝিতে হইল বটে, কিন্তু সেও একটা সর্ত্তে।

সর্ত্ত এই যে সর্ব্বানন্দকেও ইংরাজী পড়াইতে হইবে। কিন্তু সর্ব্বানন্দ অতি দরিদ্র ব্রাহ্মণ-সন্তান। তাহার পড়াশুনার খরচের ভার কে লইবে? কার্ত্তিকচন্দ্র গম্ভীরভাবে বলিল, "জমিদার মহাশয় কি আর ইচ্ছা করিলে একজন দরিদ্র ব্রাহ্মণের ছেলের এইটুকু উপকার করিতে পারেন না?" শিবচন্দ্র বলিলেন, "এ বিষয়ে কে তাঁহাকে অনুরোধ করিবে?" তখন কার্ত্তিকচন্দ্র নিজেই সে ভার গ্রহণ করিয়া বলিল, "আমার বদলে না হয় সর্ব্বদাদা পড়্‌বে, তা হলেই হবে।"

শিবচন্দ্র ক্ষুণ্ণ হইয়া বলিলেন, "তোমার পড়াশুনার খরচ ত আর তিনি দিচ্ছেন না। তিনি কেবল ব্যবস্থা করে দেবেন মাত্র। খরচ-পত্র সবই আমার। সর্ব্বানন্দকে যদি পড়াতেই হয়, তাহলে সে খরচ আমাকেই বহন কর্‌তে হবে। তুমি সব বুঝ্‌ছ, আর এটুকু বুঝ্‌ছ না কেন? আর সর্ব্বানন্দই বা ইংরিজি পড়্‌তে স্বীকার কর্‌বে কেন? তুমি ছেলেমানুষী করো না, আমি যা বল্‌ছি, তাই কর।"

কার্ত্তিকচন্দ্র পিতার কথায় সম্মতি জ্ঞাপন করিল বটে কিন্তু মনে মনে একটা ফন্দি আঁটিয়া সে বাহির হইয়া গেল। ইহার দুই-একদিন পরে সকলেই সবিস্ময়ে শুনিল, বাবু সর্ব্বানন্দর পড়ার সমস্ত ব্যয়-ভার গ্রহণ করিয়াছেন।

৫

শিবরামপুরের দুর্দ্ধর্ষ দেওয়ান দুর্গাশঙ্কর চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বয়স যদিও পঞ্চাশের ঊর্দ্ধে উঠিয়াছে, তথাপি তাঁহার মতি-গতি এ পর্য্যন্ত বন-গমনের দিকে ঢলিয়া পড়িবার কোন লক্ষণ প্রকাশ করে নাই। ইহার মুখ্য গৌণ সমবায় প্রভৃতি নানাবিধ কারণের মধ্যে একটি বিশেষ কারণ এই ছিল যে তাঁহার পুত্র মণিশঙ্কর এখনও অবধি প্রবেশিকা পরীক্ষার দ্বার

উত্তীর্ণ হইয়া কলেজ নামক বৃহৎ বিচরণ-স্থানে কিছুতেই প্রবেশাধিকার পাইল না। জমিদার মহাশয়ের দেওয়ানের পুত্র বলিয়া অবশ্য কোনবারই সে নির্ব্বাচনপরীক্ষায় "বারিত" হয় নাই, কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের মূর্খ পরীক্ষকগণ কেহই তাহার জ্ঞানের গভীরতা ও বিদ্যার বিস্তৃতি বা অভি-ব্যাপ্তি উপলব্ধি করিতে পারিল না। এই সমস্ত সমবায় কারণে মণিশঙ্কর এক বার সংস্কৃত বিদ্যার গহন বনে প্রবেশের কল্পনাও করিয়াছিল। কিন্তু "সহর্ণের্ঘঃ" প্রভৃতির রেফাদি-কণ্টকে প্রথমেই তাহার মনের রেশমী চাদর-খানি আটকাইয়া যাওয়ায় বিরক্ত হইয়া সে-কল্পনা সে ত্যাগ করিয়াছে। তাহার পিতার দুর্দ্ধর্ষ পাইকগণের অতন্দ্রিত চেষ্টাতেও যখন বিদ্যা-পথের কণ্টক দূর হইল না, তখন সে অগত্যা একটা কন্‌সার্ট ও থিয়েটার পার্টি খুলিবার সঙ্কল্প করিল।

দেওয়ান মহাশয়ের ইচ্ছা ছিল, তাঁহার পুত্র বিদ্যালয়ের সব-কয়টা ডিগ্রি আদায় করিয়া শেষে আইনের মুকুট মাথায় চড়াইয়া কালিকাবাবুর বিস্তীর্ণ এষ্টেটের পরামর্শ-দাতা বা অন্য কোন প্রকার দণ্ড-মুণ্ডের কর্ত্তা হইয়া তাঁহার সমস্ত শক্তি উত্তরাধিকার-সূত্রে লাভ করে। কিন্তু মণিশঙ্কর কোন প্রকারেই প্রবেশিকার সিংহ-দ্বার পার হইতে পারিল না; উপরন্তু দেওয়ানজী দেখিলেন, দুইটী অখ্যাত অজ্ঞাতনামা মনুষ্য-শিশু তাঁহার পুত্রের ভবিষ্যৎ উন্নতির পথে দিব্য অন্তরায় হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহার পুত্রের ভবিষ্যৎ ভাগ্যাকাশে যুগপৎ এই যুগল ধূমকেতুর উদয় দেখিয়া দুর্গা-শঙ্কর পূর্ব্বাহ্লেই সতর্ক হইতে আরম্ভ করিয়াছেন।

পরগণে কমবখ্‌ৎপুর ও তরফ পয়জারডেঙ্গার নিকাশ সারিয়া হিসা-বানা ও নজরানার কয়েক শত টাকা সঙ্গে করিয়া দুর্গাশঙ্কর রাত্রি আটটার সময় গৃহে ফিরিলেন। তাঁহার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী নিস্তারিণী দেবী ইতিমধ্যে মহা উৎকণ্ঠায় কাল-যাপন করিতেছিলেন; কারণ, পুত্র

মণিশঙ্কর বৈকালে মাতার নিকট তাহার কনসার্ট-পার্টির জন্ত দুইটা বাঁশীর আব্দার লইয়া বিস্তর কান্নাকাটি করিয়া গিয়াছে। এমন কি, দুই এক-বার তাহার মূর্চ্ছার উপক্রমও দেখা গিয়াছিল। মণিশঙ্কর না কি বাল্য-কাল হইতে বুদ্ধিশক্তির প্রাচুর্য্যের জন্য ঐ রোগে ভুগিতেছিল; তাই তাহার মাতা যখন-তখন দেওয়ান মহাশয়কে উক্ত বিষয়ে সতর্ক করিয়া মণিশঙ্কর যাহাতে সর্ব্বদা প্রফুল্ল থাকে, তাহাই করিতে উপদেশ দিতেন;—অবশ্য উপদেশের সঙ্গে তাঁহার অন্যান্য শক্তি প্রয়োগ করিতেন কি না, সে বিষয়ে সঠিক সংবাদ কেহ বলিতে পারে না। তবে দুর্দ্ধর্ষ দেওয়ান দুর্গাশঙ্করকে কেহ সেই উপদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন না করিয়া চুপ করিয়া থাকিতে দেখে নাই। এমন কি, দুষ্ট লোকে এ কথাও বলে যে দেওয়ানজীর "স্বকৃত" তালুকগুলির মুনাফার টাকাও কিস্তি কিস্তি ইঁহারই সিন্দুকজাত হইয়া থাকে। নিস্তারিণী দেবী অনেক সময়েই স্বামী মহাশয়কে কৃপা করিয়া "স্বকৃত" বিষয়চিন্তার ভার হইতে নিস্তার দিয়া থাকেন,—অন্ততঃ ইহাই বাজার-গুজব। কিন্তু বাজারে যাহা রটে, তাহাতে বিশ্বাস স্থাপন করা ঠিক নয়।

দুর্গাশঙ্কর অন্দরে প্রবেশ করিয়া বলিলেন, "ওগো, কোথায় আছ?" নিস্তারিণী দেবী অবশ্য অতি নিকটেই ছিলেন, কিন্তু অন্তরের উৎকণ্ঠা পাছে মুখে প্রকাশ হইয়া পড়ে, তাই কক্ষ হইতেই একজন দাসীর উপর হুকুম-জারী হইল, "ওরে রাজু, জলচৌকি আর গাড়ুটা এগিয়ে দে—বাবু এসেছেন।"

দুর্গাশঙ্কর সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া টাকার তোড়াটা ধপাস্ করিয়া ফেলিয়া দিয়া বলিলেন, "উঃ বেটারা কম হায়রাণ করেছে। কোন বেটার যদি বুদ্ধি শুদ্ধি থাকে। শোন, ওগুলো লোহার সিন্দুকে তুলো না, আলমারিতেই রেখে দাও। কাল আমার টাকার বিশেষ দরকার।"

নিস্তারিণী দেবী আলমারি খুলিতে খুলিতে বলিলেন, "আমারও একশ' টাকার বিশেষ দরকার। কত টাকা আছে এ তোড়ায়?"

"সাত শ' বাইশ।"

"তুমি কাল কত নেবে?"

"দরকার ত প্রায় এগার শ' টাকা। ঐ সাত শ' আর চার শ' কাল জোগাড় করে আমায় সলিমপুরের খাজনা শোধ করে দিতে হবে, তারা তাগাদা লাগিয়েছে।"

"এক শ' টাকা আমায় কাল দিতেই হবে। বাদ-বাকি তুমি নিও।"

"হঠাৎ এত টাকা কি হবে?"

"মণির জন্যে দুটো বাঁশি কিনে দিতে হবে।"

"বাঁশি! বাঁশি কি হবে?"

"কি হবে, তা জানি নে। না পেলে আবার হয় ত সে মূর্চ্ছো যাবে। আজ অনেক কষ্টে তাকে সাম্‌লেছি।"

পুত্রের বিষয় কোন কথা বলিতে গেলে এখনই একটা বিপদ ঘটিতে পারে, সেই ভয়ে দুর্গাশঙ্কর তাড়াতাড়ি মুখাদি প্রক্ষালন করিতে বাহিরে গেলেন। এবং পরে জলযোগ সারিয়া গড়গড়ার নল মুখে দিয়া বাহিরে বৈঠকখানায় গিয়া বসিলেন। বাহিরে গ্রামস্থ দুই একজন উমেদার তলপিদার মোসাহেব তাঁহারই অপেক্ষায় বসিয়াছিল।

দেওয়ানজী আসন গ্রহণ করিতেই বৃদ্ধ পার্ব্বতীনাথ সরকার বলিলেন, "দেওয়ানজী, আপনি মণিশঙ্করের হারমোনিয়া বাজানো শুনেছেন? কি সুন্দরই সে বাজাচ্ছে! আমি আসতে আসতে পথে পোড়া বাঙ্‌লায় ওর বাজনা শুনে এলাম।"

রাজীব জোয়াদ্দার বাঁধানো হুঁকাটা আর একজনের হাতে চালান করিয়া ধোঁয়া ছাড়িতে ছাড়িতে বলিলেন, "এই ত' মোটে

মাসখানেক হ'ল হারমোনিয়াটা ও কিনেছে, এরই মধ্যে এত শিখ্‌লে কবে ?"

পার্ব্বতীনাথ কহিলেন, "পূর্ব্বজন্মের সংস্কার, ভায়া ! পূর্ব্বজন্মের সাধনা !"

পার্ব্বতীনাথের উপর সরকারি দুইটা ডিক্রি এখনও ঝুলিতেছিল। এবারে সেটার পরিশোধের কোন আশা ছিল না, তাই তিনি স্বীয় নাতিটীকে মণিশঙ্করের থিয়েটারে জুটাইয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু স্কুলের থার্ড মাষ্টারটী এ বিষয়ে তাহাকে নিবৃত্ত করিবার জন্য অনেক অনুরোধ করিয়া বিফল-মনোরথ হইয়া দেওয়ানজীকে ঐ বিষয়ে অনুরোধ করিতে বলিয়াছিলেন। দেওয়ানজী তাই গম্ভীর মুখে বলিলেন, "সরকার মশায়, আপনার নাতিটীকে এরই মধ্যে পড়াশুনা ছাড়িয়ে দিলেন ? থার্ড মাষ্টার ত খুব দুঃখ কর্‌ছিল। সে বল্‌ছিল, আপনার গিরিজানাথের বেশ ধার আছে, সে এন্‌ট্রন্‌শ্‌ পাশ কর্‌বেই। এরই মধ্যে ওকে পড়াশুনা ছাড়ানো ভাল হ'ল না।"

পার্ব্বতীনাথ মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বলিলেন, "আজ্ঞে দেওয়ানজী, মণিই যখন পাশ কর্‌তে পার্‌লে না, তখন গিরিজার আর কতটুকু ধার ! তাই মনে কর্‌ছি, আমার যা কিছু আছে, তাই দেখ্‌বে-শুন্‌বে আর মণির সঙ্গে থেকে যদি—"

রাজীব জোয়ার্দ্দারের উচ্চ হাস্যে সরকার মহাশয়ের বাকি কথাটুকু শুনিতে পাওয়া গেল না। দেওয়ান মহাশয়ও সেই হাস্যে যোগ দিয়া বলিলেন, "না, না, সরকার মশায়, এরই মধ্যে তা কর্‌বেন না। মণির সঙ্গে জুট্‌লে ওর ইহকালও যাবে, পরকালও যাবে। মণিটাকে নিয়ে যে কি কর্‌ব, তা আমিই ঠিক কর্‌তে পার্‌ছি না। তার ওপর আপনারা পাঁচজনে লাগ্‌লে ওকে আর সামলানো যাবে না। দেখুন দেখি, ন্যায়রত্ন

মশায়ের ছেলেটীকে আর সর্ব্বানন্দকে! এরই মধ্যে ওরা কেমন এগিয়ে যাচ্ছে। আহা, ছেলে দুটীকে বুকে ধর্‌তে ইচ্ছা করে!"

উপস্থিত বন্ধুগণের মধ্যে, রাজীব জোয়াদ্দার ব্যতীত, সকলেই দেওয়ানজীর এই দেবোপম করুণায় গলিয়া গিয়া "আহা তা বটে!" "তাতে আর সন্দেহ কি?" ইত্যাদি বাক্যে তাঁহার কথার পোষকতা করিল। কিন্তু জোয়াদ্দার মহাশয়ের কোটরগত ভ্রূ-সমাচ্ছন্ন দুই চক্ষু হইতে একটা অদ্ভুত দৃষ্টি বাহির হইয়া দেওয়ানের অর্দ্ধ নিমীলিত চক্ষুর সহিত সঙ্গত হইল। এবং মুহূর্ত্তেই এই দুই বন্ধুর চোখে-চোখে একটা নীরব কথাবার্ত্তা হইয়া গেল। তাহার পর, দুই এক 'দান' দাবা খেলা ও তাম্রকূট ধ্বংসের পর সকলেই যখন উঠিয়া বাড়ী গেল, তখন জোয়াদ্দার মহাশয়কে একা পাইয়া দেওয়ানজী বলিলেন, "কি করি বল ত, রাজীব? মণির যে কি কর্‌ব, কিছু বুঝ্‌তে পার্‌ছি না।"

রাজীবলোচন তাঁহার শ্বেত-কৃষ্ণ মস্তকটী আন্দোলিত করিতে করিতে বলিলেন, "আমি তখনই বলেছিলাম তোমায় যে, এ ভাল হচ্ছে না, তুমি ন্যায়রত্নটাকে টোলশুদ্ধ গঙ্গাপার করে দিয়ে এস,—তুমি ত তা শুন্‌লে না। যেদিন কার্ত্তিক ছোঁড়াটা কাছারিতে বাবুর নাকের ওপর তোমায় অপমান কর্‌লে সেই দিনই বুঝেছিলাম, তোমার মণির ভাগ্যে কাঁচকলা!"

দেওয়ানজী কহিলেন, "এখন আর তা হয় না! বাবু ঐ দুটো চ্যাঙড়াকে কি নজরে যে দেখেছেন, তা বল্‌তে পারিনে। স্বয়ং হেডমাষ্টার ওদের মাষ্টার হয়ে শেখাচ্ছে। ন্যায়রত্ন এখন পরামর্শ-দাতা, হর্ত্তা-কর্ত্তা-বিধেতা। কি করি!"

দেওয়ানজী মুখের নলটা ছুড়িয়া ফেলিয়া বলিলেন, "হরে, তামাক দিয়ে যা না! বেটা এরই মধ্যে ঘুমুচ্ছে!"

ভৃত্য হরিদাস কলিকায় ফুঁ দিতে দিতে প্রবেশ করিয়া বলিল, "খাবার হয়েছে। মা ঠাকরুণ—"

"যা, যা, এখন গোল করিস্ নে।"

হরিদাস গড়গড়ায় কলিকা বসাইয়া দিল, বলিল, "ঠাকরুণ বল্লে খেতে এস।"

"যাচ্ছি, তুই যা না, কথাটা সেরে যাচ্ছি, বল্‌গে।"

হরিদাস নাছোড়বান্দা ; আপন-মনে বকিতে লাগিল, "রামে মার্‌লেও মারে, রাবণে মার্‌লেও মারে! এখন যাই কোথা? রাজীব বাবু, বাড়ী যান না, রাত হয়েছে। মা রেগেছে,—বাবু ওঠো—আমার যেমন কপাল খাট্‌তে খাট্‌তে প্রাণটা গেল—ওঠো বাবু—"

দেওয়ানজী বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "রাজীব, কাল দুপুর বেলা এস।"

রাজীবলোচন অগ্রেই উঠিয়া পড়িয়াছিলেন! কারণ মা-ঠাকুরাণীর রাগের অর্থ তিনি ভাল রকমই বুঝিতেন। তাই পরদিন আসিতে স্বীকৃত হইয়া তিনি প্রস্থান করিলে দেওয়ানজীও হরিদাসকে বকিতে বকিতে অন্তঃপুরে চলিলেন।

৬

মণিশঙ্কর লোকটী চিরদিনই কবি। সতেরো বৎসর বয়সের মধ্যেই তিনি বন্ধু ও গ্রামস্থ বহু বৃদ্ধের মহলে তাঁহার অপূর্ব্ব কবিত্বশক্তির জন্য বিখ্যাত হইয়াছিলেন ; এবং উনবিংশ বর্ষ গত হইতে না হইতেই তিনি "মকরাক্ষের মোক্ষ" নামক নাটক ও "গঙ্গার গোষ্পদ লাভ" নামক মহাকাব্যের তিন সর্গ লিখিয়া যশ-গৌরবে মণ্ডিত হইয়াছিলেন।

আজ কোন এক অপূর্ব্ব খণ্ড-কাব্যের 'উদ্দীপনা' তাঁহার মস্তিষ্কে জাগিয়া উঠায় তিনি দ্বিপ্রহরে তাঁহাদের বাগানের একটা আমগাছের তলায়

বসিয়া উন্মুক্ত প্রান্তরের দিকে চাহিয়াছিলেন। পার্শ্বে হেরল্ডের বাড়ীর ফ্লুটটি অনাদরে পড়িয়াছিল! কবিবর মণিশঙ্কর এক-মনে এক রাখালের গোচারণ-কালীন গীতি শুনিতেছিলেন এবং তাঁহার মস্তিষ্কে সেই সঙ্গে কাহার কমল চরণের রিণিকি ঝিনির মধুর রাগিণী ফিরিয়া ফিরিয়া বাজিয়া উঠিতেছিল, কে জানে!

রাখালের গানটিও অতি চমৎকার, অতি করুণ। বিশেষতঃ তাহার গলায় অশিক্ষিত পটুত্বের অপূর্ব্ব নিদর্শন দেখিয়া আমাদের কবিবর তাহাকে তাঁহার থিয়েটারে কোনও একটা পার্ট দিতে পারেন কি না, ঐ সঙ্গে তাহাও ভাবিতেছিলেন। রাখালের গানটিতে বেশ মধুর করুণ রসের সমাবেশ ছিল। রাখাল গাহিতেছিল,—

"ছোট মামু গো। ভেব্যা মনু গো!
দুনিয়া পোড়ালে আল্লা!
ম্যাঘ কইরে সদা পানী নাহি হয়,
মাটী 'ফাইটা' হল চ্যাল্লা চ্যাল্লা।
ঘাহুর বামুন যত হয়্যা ঘাতজ্ঞ্যান
'শিবির' মাথায় তাঁরা পানি ঢেইল্যা ঘান,
কাঁইদা ভ্যাকুল হইল য্যাত মোছলমান,
কোরাণ পইড়্যা মল চ্যারানে মোল্লা।"

কবি মণিশঙ্কর রাখাল-বালকটীকে নিকটে ডাকিয়া তাহার নিকট হইতে গানটী লিখিয়া লইলেন এবং তৎক্ষণাৎ একটী নবতর সুরের গুঞ্জন ধ্বনি তাঁহার মগজে জাগিয়া উঠায় তিনি রাখাল-বালকের সঙ্গে বাঁশীতে তান ধরিয়া দিলেন। সেই দিনই সন্ধ্যার সময় সুরটি তাঁহার বন্ধুর মহলে "শঙ্কর-সাহি" নাম ধারণপূর্ব্বক প্রচারিত হইয়া গেল।

কিন্তু এইরূপে আমাদের মণিশঙ্কর নব সুর, নবতর গান এবং নবতম

কাব্যের জন্ম দিয়াও মনে স্বস্তি পাইতেছিলেন না। কারণ তাঁহার মানস-প্রতিমার মূর্ত্তি তাঁহাকে শয়নে স্বপনে আকুল করিয়া তুলিয়াছিল। এই মানস-প্রতিমাটী হঠাৎ এক শীতের সন্ধ্যায় দশম বর্ষীয়া এক বালিকার রূপ ধরিয়া বহু জামা-জোড়া শ্রী-অঙ্গে ধারণ পূর্ব্বক সবুট পদক্ষেপে কবিবরের মানস-আম-দরবারে প্রবেশ করিয়া একেবারে রাণীর মহিমায় চিত্ত-সিংহাসনে উঠিয়া বসিয়াছিলেন। ইনি আর কেহই নন, আমাদের পরিচিতা শ্রীযুক্তা শৈলজাসুন্দরী। যদিও কবিবর ইঁহাকে বহুবার দেখিয়াছিলেন, তবুও কে জানে কেন, কোন্-এক অপূর্ব্ব সন্ধ্যালোকে অপরূপ লগ্নে টম্‌টমোপরি উপবিষ্টা ত্রিংশ সহস্র মুদ্রা আয়ের সম্পত্তি-শালিনী এই মহিমময়ী কুমারী এক-লম্ফে তাঁহার সান্ধ্য-ভ্রমণের টমটম হইতে একেবারে কবির চিত্ত-শতদলের উপর চড়িয়া বসিয়াছিলেন, তাই কবি মণিশঙ্কর উদ্‌ভ্রান্ত-চিত্ত, উৎক্ষিপ্তহস্ত হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে-ছিলেন। তাঁহার মাতা নিস্তারিণী দেবী বলেন যে তাহার পরিপাকের গোলমাল হইতেছে; বন্ধুরা বলেন, কবিতা দেবী ফুটিয়া বাহির হইবার চেষ্টা করিতেছেন এবং শত্রুরা বলে—না, সে কথায় আর কাজ নাই! শত্রুর কথায় কান দিতে গেলে জগতের কোন শক্তিমান্ পুরুষের সম্বন্ধেই কোন কথা বিশ্বাস করা অসম্ভব হইয়া পড়ে—গঞ্জিকা-সেবনে বা ধান্যেশ্বরীর সেবায় কবিতার উৎস খুলিয়াই যায়, হজমের গোল করে না, শত্রুরা যাহাই বলুক, মণিশঙ্করের "শঙ্কর-সাহি" সঙ্গীত গঞ্জিকার ধূমে অথবা সময়ান্তরে ধান্যেশ্বরীর চক্রে অধিকতর জমিয়া উঠে। শত্রুর কথায় কর্ণপাত নিষ্প্রয়োজন।

কিন্তু প্রকৃত কবির মনোভাব কখনই গোপন থাকিতে পারে না, তা সে কথা যত গোপনীয়ই হোক। যে কথা শুনিলে লোকে কর্ণে অঙ্গুলি দান করিবে, তাহাও যদি প্রকৃত কবির জীবনে ঘটিয়া থাকে, তবে

কবিতা দেবীর কৃপায় তাহাও জগৎ-সমক্ষে প্রচারিত হইবেই ; এবং 'নিরঙ্কুশা হি কবয়ঃ' মন্ত্রানুসারে তাহা প্রকৃত কবিত্ব-শক্তির অভিব্যক্তি বলিয়া লোকে হজম করিবেই। চিরদিনের এই নিয়মানুসারে কবি মণি-শঙ্করের গোপন কথাটি স্থান-কাল-পাত্র-বিশেষে প্রচারিত হইয়া পড়িল ; এবং ক্রমশঃ সেই কথা কবির "শঙ্কর-সাহি" যোগে কোন্ এক বিশেষ মুহূর্ত্তে মাতা নিস্তারিণী দেবীরও শ্রুতিগোচর হইল ; পরে সে স্থান হইতে যথারীতি পিতা দুর্গাশঙ্করের কর্ণেও সে কথা উঠিতে বাকী রহিল না। দুর্গাশঙ্কর তখন চোখ কপালে তুলিয়া বলিলেন, "এঁ্যা! হারামজাদা কোন্ দিন আমারও সর্ব্বনাশ করবে, দেখ্ছি! আরে চুপ, চুপ, কি বল, তার ঠিক নেই! আমার ছেলে শৈলর জন্য পাগল! মা দুর্গে, এ আমায় কি বিপদে ফেল্লে! তোমাদের জ্বালায় কি দেশ ছেড়ে পালাব না কি!"

নিস্তারিণী কহিল, "তা তুমি রাগই কর, আর যাই কর, এর একটা বিহিত করতে হবে। মণি আমার খায় দায় না—শৈলর নামে কি একটা গান বেঁধেছে, তাই গেয়ে বেড়ায়।"

দুর্গাশঙ্কর কহিলেন, "আরে, থাম, থাম, চাকর-বাকরে শুনতে পেলে সর্ব্বনাশ ঘট্বে। হতভাগাটার মাথা তুমি এমনি করে খাচ্চ? আপন ছেলের ইষ্ট বুঝ্ছ না? এ সব কি হচ্চে তোমার?"

নিস্তারিণী দেবী চটিয়া লাল হইয়া উঠিলেন, বলিলেন, "হবে আবার কি! তোমারই মাথা খারাপ হয়েছে, তাই নিজের ছেলের ভাল দেখ্তে পাচ্ছ না। বাবু ত ঘরজামাই নেবার চেষ্টায় আছেন। আমার মণি কি তাঁর ঐ রূপের ধোচন মেয়ের অযুগ্যি? কেন, তুমি চেষ্টা কর না! চেষ্টা করে দেখ্লে এত দিন কোন্ কালে দেখ্তে, আমার মণি তোমার মনিব হয়ে তোমার ওপর হুকুম চালাচ্ছে।"

পত্নীর পতিভক্তির এই সুমধুর পরিচয় পাইয়াও দুর্গাশঙ্করের ক্রোধ কমিল না। তিনি ক্রুদ্ধ স্বরে বলিলেন, "বাবু ঘরজামাই নেবেন বলে কি হাত-পা বেঁধে মেয়েটাকে জলে ফেলে দেবেন! কে তোমার ঐ মাতাল গেঁজেল ছেলেকে মেয়ে দেবে?"

নিস্তারিণী দেবীর আর সহ্য হইল না, তিনি মাটীতে পড়িয়া "ওগো, এমন স্বামীর হাতেও পড়েছিলুম গো, ওগো—" ইত্যাদি নানাবিধ সকরুণ উক্তির সহিত বহুবিধ রাগ-রাগিণী-সংযোগে আপনার মর্ম্মবেদনা জগৎ-সমক্ষে প্রচারিত করিতে লাগিলেন। দুর্গাশঙ্কর তখন বে-গতিক দেখিয়া বহু অনুনয়-বিনয়ে এবং নিস্তারিণী দেবীর কথামত কার্য্য করিতে প্রতিশ্রুত হইয়া সে যাত্রা নিস্তার লাভ করিলেন।

৭

দুই-তিন বৎসর ধরিয়া হেডমাষ্টার মহাশয়ের গৃহে যাতায়াত করিয়া সর্ব্বানন্দ ও কার্ত্তিকচন্দ্র যখন এন্‌ট্রান্‌স্ স্কুলের তৃতীয় শ্রেণীতে প্রবেশের অনুমতি পাইল, তখন শিক্ষক পূর্ণচন্দ্র দাস একেবারে অপমানে প্রজ্বলিত হুতাশনবৎ প্রধান শিক্ষকের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "দুই এক বৎসরের মধ্যে কেহই তৃতীয় শ্রেণীর যোগ্য ইংরাজী ও অঙ্কে ব্যুৎপত্তি লাভ করিতে পারে না; ছাত্র দুইটীকে আরও নিম্ন শ্রেণীতে ভর্ত্তি করা হউক।" প্রধান শিক্ষক রামরতন হাজরা হাসিয়া বলিলেন, "আপনি পরীক্ষা করে দেখুন, যদি অনুপযুক্ত বোধ করেন, নামিয়ে দেবেন।"

তৃতীয় শিক্ষক মহাশয়ের স্পষ্ট-বক্তৃত্ব নামক একটী সর্ব্বজন-বিদিত গুণ ছিল। তিনি যখন তখন সেই গুণানুযায়ী কার্য্য করিয়া যশ অর্জ্জন করিতে ছাড়িতেন না। সেই কারণেই এমন উপযুক্ত অবসরকে তিনি ছাড়িয়া দিলেন না,—তাঁহার টেরা চক্ষুর একটী অন্য একজন শিক্ষকের

উপর এবং অপরটী গবাক্ষের গরাদের উপর ন্যস্ত করিয়া তিনি বলিলেন, "আপনি নিজে পড়িয়েছেন বলেই যে ওরা উপযুক্ত হবে, তার কোন অর্থ নেই। আমি নিজে পরীক্ষা করে নেব, আর অখিলবাবুও (অঙ্ক-শিক্ষক) পরীক্ষা কর্‌বেন।" অখিলবাবু সেই স্থানেই উপস্থিত ছিলেন। তিনি তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলেন, "আজ্ঞে, আমার পরীক্ষার প্রয়োজন নেই। আপনিই পরীক্ষা করুন।"

তৃতীয় শিক্ষক মহাশয় তাহার দিকে তাঁহার টেরা চক্ষুর এমন একটা দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন, যাহার অর্থ বিচক্ষণ চক্ষুতত্ত্ববিদ্ ডাক্তার সাহেব তিন হাজার বৎসরের সুগভীর আণুবীক্ষণিক পরীক্ষা দ্বারাও উদ্ধার করিতে পারিতেন না। তবে উক্ত শিক্ষক মহাশয় সেই দৃষ্টি যে অতি ঘৃণার দৃষ্টি অর্থেই গ্রহণ করিয়াছিলেন, ইহা সুনিশ্চিত; কারণ তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁর হ্রস্ব ও ঋজু পদের উপর ভর দিয়া স্বাভাবিক পদটা কিঞ্চিৎ দূরে ফেলিয়া ঘুরিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

উক্ত মহানুভব শিক্ষক তাঁহার রাজাসনে আসীন হইয়া যখন সর্ব্বানন্দকে বলিলেন, "ওহে ছোকরা, কি নাম তোমার? এ দিকে এস" তখন ঐ শ্রেণীর সমস্ত তরুণ হৃদয়গুলি আতঙ্কে কাঁপিয়া উঠিল। কারণ, শিক্ষক মহাশয়ের স্বরের বহুবিধ ভঙ্গীর অর্থ তাহারা অস্থি-মজ্জায় অনুভব করিতে শিখিয়াছিল। সর্ব্বানন্দ যখন সলজ্জভাবে তাঁহার সিংহাসনের নিকটে গিয়া দাঁড়াইল, তখন তিনি গুরু-গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "ওহে, এত ধেড়ে বয়সে এতটুকু-টুকু ছেলের সঙ্গে পড়্‌তে তোমার লজ্জা কর্‌বে না?" সর্ব্বানন্দ অধিকতর লজ্জিত হইয়া অবনত মস্তকে চটী জুতা দিয়া প্লাটফর্ম্মের পায়ায় আঘাত করিতে লাগিল। শিক্ষক মহাশয় উক্ত কার্য্যকে "ধেড়ে ছেলের" ধৃষ্টতা মনে করিয়া গর্জ্জন করিয়া বলিলেন, "চুপ করে রইলে কেন? বল না!" সর্ব্বানন্দ তখন অতি মৃদুস্বরে বলিল, "লজ্জা করিবে।"

শিক্ষক বলিলেন, "কিন্তু সাবধান, যা জিজ্ঞাসা করি, যদি তার ঠিক জবাব দিতে না পার, তা'হলে তোমায় এদের চাইতেও ছোট ছেলেদের সঙ্গে পড়্‌তে হবে।"

সর্ব্বানন্দর হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। শিক্ষক তাহাকে রয়েল রিডার নম্বর ফাইভ নামক অতি অপূর্ব্ব ও গুরুগম্ভীর পুস্তক হইতে একটী গুরুতম স্থান বাহির করিয়া বলিলেন, "পড়।" সর্ব্বানন্দ কম্পিত হৃদয়ে উহা পাঠ করিল, কিন্তু ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের সন্তান বলিয়াই হউক বা অন্য যে কোন কারণেই হউক, তাহার উচ্চারণ তেমন সুবিধাজনক হইল না, তবে কোন স্থানে আটকাইল না। পূর্ণবাবু তাঁহার চক্ষু দুইটিতে একটা অবজ্ঞার হাসি ফুটাইয়া তুলিতে চেষ্টা করিলেন, ফুটিল কি না সে সংবাদ কেহ রাখে না, তবে তাঁহার দন্তপংক্তি সহসা বিকশিত কুন্দবৎ সমস্ত মৌন ও ভীত হৃদয়গুলির ভয়ের অন্ধকার কথঞ্চিৎ দূরীভূত করিল। তিনি তাঁহার দংষ্ট্রময়ূখ প্রীতির পাত্র কোন এক বালকের উপর পুঞ্জীভূত করিয়া বলিলেন, "কেমন রে নিধে, পড়া ঠিক হয়েছে?" নিধে ওরফে নিধিরাম এক লম্ফে দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল, "ও কিছু হয় নি।" শিক্ষক তাহাকে আদেশ করিলেন, "একবার শুনিয়ে দে ত, হেড মাষ্টারের ছাত্র হ'লেই রিডিং পড়া শেখা যায় না।" নিধিরাম পরম পুলকিত চিত্তে অপূর্ব্ব ভঙ্গিমায় উক্ত শিক্ষক মহাশয় যে ভাবে যে স্থানে মাথা নাড়িতেন, থামিতেন, বা সুর টানিয়া ছোট-বড় করিতেন, অবিকল তাহার অনুকরণ করিয়া ঠিক সেই ভাবে পাঠ করিল।

তাহার পাঠ-ক্রিয়া শেষ হইলে শিক্ষক মহাশয় বলিলেন, "That's all right. শুন্‌লে হে ছোকরা, দু'বছরে এ রকম রিডিং পড়া শেখা যায় না।"

পরে তিনি সর্ব্বানন্দকে ঐ স্থানের অর্থ করিতে আদেশ দিলেন।

সর্ব্বানন্দ ভয়ে ও লজ্জায় দুই-এক স্থানের অর্থ বলিতে ভুল করায় আবার তাহার উপর শ্রেণীস্থ সমস্ত বালকবৃন্দের বিদ্রূপাত্মক কলরব ও সর্ব্বোপরি তৃতীয় শিক্ষক মহাশয়ের বিরাট হাস্যের তীব্র বিষ বর্ষিত হইল।

এদিকে কার্ত্তিকচন্দ্র সর্ব্বানন্দর অবস্থা দেখিয়া ক্রোধে গুমরাইতেছিল। হঠাৎ শিক্ষক মহাশয়ের দৃষ্টি তাহার উপর পড়িবামাত্র তিনি হাসিয়া বলিলেন, "কি হে, অমন করে তাকাচ্ছ কেন? এদিকে এস ত দেখি, তোমারই বা কতদূর দৌড়!"

কার্ত্তিকচন্দ্র ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে একবার সমবেত বালকমণ্ডলীকে দেখিয়া লইয়া একলম্ফে সম্মুখস্থ একটা ডেস্ক ডিঙ্গাইয়া একেবারে শিক্ষক মহাশয়ের নিকটে গিয়া দাঁড়াইল। শিক্ষক মহাশয় তাহার প্রচণ্ড মুখভঙ্গীতে কিঞ্চিৎ থতমত খাইয়া বলিলেন, "ও কি! অমনভাবে লাফিয়ে এলে যে? কেবল লাফালাফি শিখেছ, বুঝি?"

কার্ত্তিকচন্দ্র গম্ভীরভাবে বলিল, "যেখানে যেমন রীতি, সেখানে তেমনি কর্‌তে হয়।"

শিক্ষক মহাশয় অবাক্ হইয়া তাহার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "ইস্কুলে কি বাঁদরলাফ শিখ্‌তে আসে না কি?"

কার্ত্তিক কহিল, "এখানে ত তাই শেখানো হয় দেখ্‌ছি। থাক, কি জিজ্ঞাসা কর্‌বেন, করুন।"

শিক্ষক কহিলেন, "কি! হুকুম চালাচ্ছ যে! আমি ভোজপুরী ছাতুখোর দরোয়ান নই যে আমায় ভয় দেখিয়ে সার্‌বে! যা জিজ্ঞাসা কর্‌ব, তা বল্‌তে না পার্‌লে বিতিয়ে লাল করে দেব।"

কার্ত্তিক কৃত্রিম বিনয়ে হাত জোড় করিয়া বলিল, "যে আজ্ঞে! এখন জিজ্ঞাসা করুন।"

শিক্ষক মহাশয় বজ্র-নিনাদে বলিলেন, "Rascal! bloody fool!"

কার্ত্তিকচন্দ্র টেবিল চাপড়াইয়া বলিল, "এদের অর্থ চান? এদের অর্থ —a squint-eyed lame man. বাঙলা মানে, টেরা-চোখো, দেড়-ঠেঙ্গো মানুষ।"

স্যর রবার্ট বল বলেন যে ক্রাকাটোভা নামক আগ্নেয়-গিরির বিকট গর্জ্জন না কি বহুশত ক্রোশ দূরস্থিত মালয় উপদ্বীপেও শুনা গিয়াছিল এবং তাহা হইতে উৎক্ষিপ্ত ভস্মরাশি সুদূর ইংলণ্ডের সান্ধ্য আকাশকেও রঞ্জিত করিয়াছিল। কার্ত্তিকচন্দ্রের ভীষণ বিদ্রূপে তৃতীয় শিক্ষক মহাশয় যে প্রচণ্ড শব্দে আপনাকে উর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত করিয়াছিলেন, তাহা সুদূর লাইব্রেরী ও দরোয়ানের টীনের ছাদেও প্রতিধ্বনিত হইয়াছিল। সেই ভীষণ শব্দের নানা কারণের মধ্যে মাধ্যাকর্ষণ নামক দুর্বিনীত শক্তির যোগ থাকায় ব্যাপারটা আরও গুরুতর হইয়াছিল বলিয়া অন্যান্য শিক্ষক-গণের অনুমান। প্রত্যক্ষ যাহারা দেখিয়াছিল, তাহারাও বলে যে, তৃতীয় শিক্ষক মহাশয় তাড়াতাড়ি উঠিতে গিয়া তাঁহার চেয়ারখানি চৌকি হইতে তাঁহাকে লইয়াই পতিত হইয়াছিল। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা তীব্রতর বেদনার কারণ হইয়াছিল, কার্ত্তিকচন্দ্রের বিদ্রূপাত্মক হাস্যপরিপূর্ণ বাক্য!—উক্ত শিক্ষক মহাশয় যখন ধূলি ঝাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া শুনি-লেন, কার্ত্তিকচন্দ্র পরিষ্কার কণ্ঠে উক্ত বচনটী উদ্ধৃত করিতেছে, তখন তিনি ক্রোধে দুঃখে অপমানে কাঁদিয়া ফেলিলেন; এবং ব্ল্যাক বোর্ডের বেঞ্চের উপর আহত পাখানি তুলিয়া সতৃষ্ণ দৃষ্টিতে দেখিতে লাগিলেন।

ইত্যবসরে অন্যান্য শিক্ষকগণ সেই কক্ষে সমবেত হইলেন এবং প্রধান শিক্ষক সমস্ত ব্যাপার অবগত হইয়া কার্ত্তিকচন্দ্রকে নিকটে ডাকিয়া বলি-লেন, "কার্ত্তিক, তুমি এঁর অপমান করেছ?"

কার্ত্তিকচন্দ্রের ক্রোধ অনুশোচনায় পরিণত হইয়াছিল। সে বিনীত স্বরে বলিল, "উনি মিছামিছি সর্ব্ব-দাদাকে সকলের সামনে অপদস্থ করে-

ছিলেন, তাই আমি সে অপমানের শোধ নিয়েছি। তবে আমি ক্ষমা চাচ্ছি।" কার্ত্তিকচন্দ্র জোড়-করে তৃতীয় শিক্ষক মহাশয়ের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিল। কিন্তু শিক্ষক মহাশয়ের আঘাতের জ্বালা তখনও কমে নাই; তাই তিনি মুখ বিকৃত করিয়া বলিলেন, "আগে ও কান মলুক, নাক-খৎ দিক, তবে ক্ষমা কর্‌ব।" কার্ত্তিকচন্দ্র বিনা বাক্যব্যয়ে উক্ত কার্য্য সম্পাদন করিল। তথাপি উক্ত শিক্ষক মহাশয় মুখ বক্র করিয়া রহিলেন দেখিয়া হেডমাষ্টার মহাশয় বলিলেন, "ওর আর কি শাস্তির ব্যবস্থা কর্‌বেন করুন। ও প্রস্তুত আছে।" পূর্ণবাবু আজ্ঞা দিলেন, উহাকে সাতদিন বেঞ্চের উপর দাঁড়াইতে হইবে। হেডমাষ্টার মহাশয় বুঝিলেন যে, ইহা অত্যন্ত বাড়াবাড়ি হইতেছে; তথাপি তিনি কার্ত্তিক-চন্দ্রের উপর সেই আজ্ঞা প্রচার করিলেন। কার্ত্তিকও বিনা বাক্যব্যয়ে তাহার নিজস্থানে গিয়া বেঞ্চের উপর দণ্ডায়মান হইল। কিন্তু কোন বালকই সাহস করিয়া তাহার দিকে চাহিতে পারিল না।

হেডমাষ্টার মহাশয় তখন তৃতীয় মাষ্টার মহাশয়কে ডাকিয়া বাহিরে লইয়া গিয়া বলিলেন, "আপনি কার্ত্তিকের পিছনে বেশী লাগ্‌বেন না। কারণ এর মধ্যেই ও আমার ফাষ্ট ক্লাশের সেরা ছাত্রের চাইতেও অনেক শিখে ফেলেছে। এত বড় মেধাবী ছাত্র আমার হাতে কখনও পড়ে নি, ওকে ফাষ্ট ক্লাশেই একেবারে নিতে চেয়েছিলাম, কিন্তু ও কিছুতেই সর্ব্বা-নন্দর সঙ্গ ছাড়্‌তে রাজী নয়, তাই ওকেও আপনার ক্লাশে দিয়েছি। আর মনে থাকে যেন, কালিকা বাবুর দৃষ্টি ঐ ছেলেটীর উপর সর্ব্বদা পড়ে আছে। ওকে বেশী ঘাঁটালে কারও রক্ষা থাক্‌বে না। আর, এই বয়সে এত মাইনের এমন চাকরী যে আপনার অন্য কোথাও জুটবে, তারও বড় ভরসা দেখি না। সাবধান!"

৮

একাদশ বর্ষ অতিক্রম করিয়া শৈলজা যখন দেখিল, তাহার বয়ো-কনিষ্ঠা বা সমবয়স্কা সরলা, কমলা প্রভৃতি বহু আত্মীয়া অনাত্মীয়া বালিকার বিবাহ হইয়া গেল, তাহার হইল না, তখন সে আশ্চর্য্য হইয়া তাহার ঠাকুরমার উপর আবদার আরম্ভ করিয়া দিল। ঠাকুরমা হাসিয়া বলিলেন, "তুই কি রকম বর নিবি?" শৈলজা সগর্ব্বে বলিল, "কেন, মণিদার মত।" মণিশঙ্কর ইতিমধ্যে মাতৃ-উপদেশে জমিদার-গৃহে যাতায়াত আরম্ভ করিয়াছিল এবং তাহার "মানস-প্রতিমাকে" ভুলাইবার জন্য বহুবিধ জাল বিস্তার করিতেও সে কোন ত্রুটি রাখে নাই।

ঠাকুরমা চমকিত হইয়া বলিলেন, "সে কি রে, ঐ হতভাগাটার মত?"

শৈলজা ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, "গাল দিচ্ছ? আমি ওকে বলে দেব।"

"তা দিস্, কিন্তু ওকে তোর পছন্দ হ'ল কেন?"

"ও কেমন থিয়েটারে রাজা সাজে, গান করে, আবার আমায় সেদিন কেমন খরগোস দিয়েছে, তুমি দেখনি?"

"দেখেছি, কিন্তু রাজা সাজলে, খরগোস দিলেই কি বিয়ে হয়!"

"ও আমায় কত আদর করে! বাঃ, আমার জন্মে সেদিন কেমন মস্ত একটা ফুলের তোড়া এনেছিল, আমি মণিদাকেই বিয়ে কর্‌ব, ঠাকুমা, তুমি বিয়ে দাও।"

ঠাকুরমা হাসিয়া বলিলেন, "আচ্ছা, দাঁড়া, তোর বাবাকে বলে বিয়ের বন্দোবস্ত কর্‌ছি। কিন্তু মণির সঙ্গে নয়।"

"তবে কার সঙ্গে ?"

"কার্ত্তিকের সঙ্গে।"

"হ্যাঁ, আমি ওকে বিয়ে কর্‌লে ত। ও যে দুষ্টু!"

"দুষ্টু! সে কি রে, কি দুষ্টুমি কর্‌লে ?"

"ও সব্বাইকে মারে। আমায় ত একবার মার্‌তে গিয়েছিল, মনে নেই ?"

"সে কিরে! সে কথা এখনও তোর মনে আছে ?"

"মনে নেই আবার! তা ছাড়া মণিদা তার কত নিন্দে করে, বলে, ইস্কুলে ছেলেদের সঙ্গে ও ভারী মারামারি করে, মাষ্টারদের সঙ্গে ঝগড়া করে। না ঠাকুমা, তার চেয়ে সর্ব্ব-দা ভাল, না হয়, ওরই সঙ্গে বিয়ে দাও। কার্ত্তিকদাকে বিয়ে কর্‌ব না,—ও তাহলে কোন্‌দিন আমায় মেরে ফেল্‌বে।"

ঠাকুরমা উচ্চ হাস্য করিয়া তাঁহার বধূমাতাকে ডাকিয়া বলিলেন, "ও বৌমা, তোমার মেয়ের কথা শোনো।"

শৈলজার মাতা নিকটে আসিয়া বলিলেন, "কি বল্‌ছিস্, শৈল ?"

শৈল কহিল, "ঠাকুমা আমায় কার্ত্তিকদাকে বিয়ে কর্‌তে বলছে। আমি বল্‌ছি, অত দুষ্টুকে আমি বিয়ে কর্‌ব না।"

মাতা হাসিয়া বলিলেন, "তা না করিস্, না করবি! এখন যা, তোকে সরলা ডাক্‌ছে, তার শ্বশুরবাড়ী থেকে কত খেলনা এসেছে, দেখ্‌ গিয়ে।" শৈলজা ছুটিয়া চলিয়া গেল।

শৈলজার মাতা তখন শ্বশ্রূঠাকুরাণীকে বলিলেন, "মা, ও সব কথা শৈলকে না বলাই ভাল। উনি ওতে রাগ করেন, বারণ করেন।"

শ্বশ্রূঠাকুরাণী হাসিয়া বলিলেন, "তা জানি, মা। কিন্তু তোমার মেয়েই

যে এদিকে পাকা বুড়ী হয়ে উঠেছে, তার খবর ত' রাখ না। ওই বল্লে সরলার বিয়ে হ'ল, কমলার বিয়ে হ'ল, আর আমার বিয়ে হবে কবে? আমি তাই জিজ্ঞেস কর্‌ছিলুম, কেমন বর নিবি? তাতে কি বল্লে, জান? বল্লে, মণিদাকে বিয়ে কর্‌ব। এমনি তোমার মেয়ের পছন্দ!"

শৈলজার মাতাও চমকিত হইয়া বলিলেন, "সে কি মা, মণিশঙ্কর! দেওয়ানজীর ছেলে!"

"হাঁা, ওই বাউণ্ডুলে ছোঁড়াটা। ছোঁড়াটা না কি ওকে কি কি দিয়েছে।"

"আর ওকে এখানে আস্‌তে দেওয়া নয়। ও ভারি বদ ছেলে।"

"তা কি আর আমি জানিনে?"

শৈলজার মাতা চিন্তিত মনে প্রস্থান করিলেন এবং সময়মত সমস্ত কথা কালিকা বাবুর নিকট খুলিয়া বলিলেন। কালিকা বাবু হাসিয়া বলিলেন, "এতেই এত ভাবনা! আমি বলি, মেয়ের বুঝি সর্দ্দি লেগেছে! তা নয়, সে মণিটাকে বিয়ে কর্‌তে চেয়েছে! তাই বল। ডাক ত' শৈলকে।" শৈলজাকে ডাকিতে আদেশ দিয়া গৃহিণী বলিলেন, "তুমি হেসে উড়িয়ে দিয়ো না। ও বয়সে মেয়েমানুষের যখন বিয়ে হয়ে যায়, তখন শৈলর কথা হেসে ওড়ানো চলে না।"

কালিকা বাবু কহিলেন, "যাদের চলে না, তারা অমন করে বল্‌তে পারে না যে, 'আমার বিয়ে দাও'। তা আবার কার সঙ্গে, না, যে দুটো খরগোস দিয়েছে, কি দুখানা ছবি দিয়েছে, তারই সঙ্গে! আমার শৈল চিরদিন খুকীই থাক্‌বে, তোমার ভয় নেই, ইন্দিরা। তবে তোমাদের একটা অনুরোধ, ডেঁপো মেয়েদের সঙ্গে ওকে মিশ্‌তে দিয়ো না, এইটুকু করো, তা হলেই দেখ্‌বে, সব ঠিক থাক্‌বে।"

গৃহিণী কহিলেন, "কিন্তু মা যে ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন, আর

কতদিন অপেক্ষা করবে? কার্ত্তিককেই যদি তোমার এত পছন্দ হয়ে থাকে, তা হলে আর দেরী করছ কেন? ওর বাপকে বলে সব ঠিক করে ফেল না। কিন্তু আমার মত যদি নাও, তা হলে সমান ঘরে বিয়ে দাও, অমন গরীবের ছেলে এনে শেষে ও বেচারার এ কুল ও কূল দুই মজাবে!"

কালিকা বাবু কহিলেন, "তুমি কার্ত্তিককে এখনও চিন্‌তে পার নি, তাই ঐ ভয় করছ। ঘর-জামাই হলেই যা হবার সম্ভাবনা, আমি তাই দূর করবার জন্য কার্ত্তিককে যথাসাধ্য শিক্ষিত করে নিতে চাই। ও যাতে মনে করতে পারে যে, ইচ্ছা করলেই ও স্বাধীন, এই রকম বিদ্যা-সাধ্য ওর করিয়ে দিয়ে তবে ওকে মেয়ে দেব। তাই এত যত্ন করে পড়াচ্ছি!"

গৃহিণী ইন্দিরা দেবী কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন, "কিন্তু মেয়ের যদি ওকে পছন্দ না হয়?"

"তা হলে আজীবন কষ্ট পাবে। আমি কিন্তু আর কারও হাতে আমার মেয়ে তুলে দিতে পারব না। কার্ত্তিককে দেব, তারপর মেয়ে যদি নিজের বুদ্ধির দোষে সব নষ্ট করে, বুঝ্‌ব, মেয়ের কপালে সুখ নেই। নইলে কার্ত্তিককে যে জানে, সে ওকে ভাল না বেসে থাক্‌তে পারে, তা ত আমি কিছুতেই ভাব্‌তে পারি না।"

"তুমি যে কার্ত্তিককে কি চোখে দেখেছ, তা তুমিই জান। কিন্তু আমি ত ওর খুব বুদ্ধি-শুদ্ধি ছাড়া আর কোন গুণ দেখ্‌তে পাইনে।"

"পাও না! আশ্চর্য্য। ওর ঐ গম্ভীর মুখখানায় কি একটা প্রচণ্ড শক্তি! আপনাকে বিপদে ফেলেও পরকে ভালবাসবার ক্ষমতাও রাখে! তা ছাড়া আরও যা আছে, তা তোমায় কি বোঝাব? তার সুমুখে দাঁড়ালে হয় ত রাজা-মহারাজের মাথা নীচু হয়ে যায়।

সেটা হচ্চে, নির্ভীক তেজস্বিতা! দেখেছ কোন দিন, ওর তেজ? ওকে দেখ্‌লেই আমার মনে পড়ে, সেই পূর্ব্বকালের তপোবনের ঋষি-বালকদের কথা। ইন্দিরা, আমি যে কেন ওকে ভালবাসি একদিন ওকে তোমার কাছে বসিয়ে কথা কয়ে দেখো, তাহলেই সব বুঝ্‌তে পারবে।"

তাঁহাদের কথাবার্ত্তা চলিতেছে, এমন সময় শৈলজা সেখানে আসিয়া বলিল, "কি বাবা, ডাক্‌ছ কেন?"

পিতা তাহাকে খাটের নিকটে ডাকিয়া বলিলেন, "কি করছিলি?"

"কিছু না। একটা মজা দেখ্‌ছিলুম।"

"মজা দেখ্‌ছিলি? কোথায়, কি মজা?"

"কার্ত্তিকদা এসে তোমার আলমারি খুলে বই ঘাঁট্‌ছিল। যে বইখানা ও রোজ কেবলই-কেবলই ঘাঁটে, আমি সেখানা লুকিয়ে রেখেছি, ও তাই খুঁজ্‌ছে আর রামচরণকে বক্‌ছে। আমি লুকিয়ে তাই দেখ্‌ছিলুম, আর সরলাকে দেখাচ্ছিলুম।"

"তুই ত ভারি দুষ্টু! যা, গিয়ে বের করে দিয়ে আয়।"

"না, দেব না। কেন দেব? ও কেন রোজ রোজ আমাদের বই ঘাঁট্‌বে! ওর নিজের বই ঘাঁটুক না গিয়ে।"

"পাগলি, ও যে আমার বই নিয়ে পড়ে। ও বই না পেলে ওর পড়া হবে না, শেষে স্কুলে মার খাবে।"

"ও যেমন দুষ্টু ওর মার খাওয়াই উচিত। বাবা, তুমি ইস্কুলের মাষ্টারদের বলে দিয়ো যে, ওর নিজের বই নেই, পরের বই নিয়ে পড়ে, তাই ও পড়া বল্‌তে পারে।"

ইন্দিরা কহিলেন, "তুই যেমন ওকে দেখ্‌তে পারিস্ নে, আমরা যে তেমনি ওকে খুব ভালবাসি।"

শৈল কহিল, "তাইতেই ত ওর আস্কারা আরও বেড়ে গিয়েছে, নইলে যখন-তখন সবাইকে ও বকে কেন? আমি কিছু করলে ধমকায় কেন?"

ইন্দিরা কহিলেন, "তুই ওর পেছনে লাগতে যাস্ কেন?"

শৈল কহিল, "বেশ করব, লাগব। যে আমায় মারতে আসে, বকে, তাকে আদর করবে! বাবা, তুমি ওকে কেন এখানে আসতে দাও? রোজ রোজ কেন ও তোমার লাইব্রেরী ঘাঁটবে?"

কালিকাবাবু কহিলেন, "আচ্ছা, কাল থেকে ওকে এখানে আসতে মানা করে দেব। তা হলেই ত হবে? ও বেচারার তাহলে কিন্তু খুব কষ্ট হবে।"

শৈলজা কিছুক্ষণ বিছানার উপর মাথা রাখিয়া চিন্তা করিয়া বলিল, "খুব কষ্ট হয় ত এক-একদিন আসতে দিয়ো, কিন্তু রোজ নয়। তার চাইতে মণিদাকে বলে দেব, ও এসে রোজ রোজ তোমার বই পড়ে যাবে।"

ইন্দিরা দেবী গম্ভীর মুখে বলিলেন, "খবদ্দার শৈল, মণির সঙ্গে কথা বলিস্‌নে। ও ভারী পাজী। ফের যদি কোন দিন ওর কাছ থেকে কিছু তুমি নাও—"

গৃহিণীর কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই কালিকাবাবু বাধা দিয়া বলিলেন, "কি মিছি-মিছি যা-তা বকছ! না রে শৈল, মণির সঙ্গে কথা বলিস্। তবে তাকে সবাই মন্দ বলে, সেজন্য সে কিছু দিলে নিয়ো না। নিলে সবাই আমায় বকবে, তোমাকেও বকবে।"

শৈলজাসুন্দরী এইবার চটিয়া গেলেন। তিনি মহারাণী-অধিরাণীর মত তাঁর ক্ষুদ্র মস্তকটি উন্নত করিয়া বলিলেন, "আমি তোমাদের কারও কথা শুনব না। কেন, তোমরা মণিদাকে বকবে? কি করেছে সে?"

কালিকাবাবু কন্যার মুখের ভাব দেখিয়া হাসিয়া বলিলেন, "ওরে না,

া, সে আমাদের কিছু করে নি। কিন্তু তুই যদি তার কাছ থেকে কিছু নস্, তাহলে সবাই আমাদের বক্‌বে।" শৈলজার সে কথা বিশ্বাস হইল া, কারণ তাহার পিতাকে তিরস্কার করিতে পারে, এমন লোক সে চাখে দেখেই নাই, কল্পনাও করিতে পারে না! সেই কারণে সে াথা নাড়িয়া বলিল, "তোমাকে কেউ বক্‌বে না। তোমরা তাকে দথ্‌তে পার না বলে এই কথা বল্‌ছ।"

কালিকাবাবু কহিলেন, "যে জন্যই বলি, তুমি তার কাছ থেকে কিছু নেয়ো না। নিলে আমার খুব দুঃখ হবে, তোমার মার কষ্ট হবে।"

শৈলজা এইবার নরম হইয়া বলিল, "আচ্ছা, তোমরা কষ্ট পাও ত' নব না। কিন্তু মিছিমিছি তোমরা মণিদার উপর রাগ্‌তে পাবে না। মামি কিন্তু মণিদার খরগোস ফিরিয়ে দেব না।"

কালিকাবাবু অগত্যা সেই সর্ত্তে সম্মত হইয়া কন্যাকে বলিলেন, "যাও এখন খেলা কর্‌গে!" কন্যা অমনি বলিয়া উঠিল, "খেলা কর্‌ব কি? কার্ত্তিকদা কি কর্‌ছে, দেখে আসি। বই না পেয়ে নিশ্চয়ই সে এতক্ষণ াইব্রেরী মাথায় করেছে।"

কার্ত্তিকচন্দ্র ওদিকে তাহার ওয়েব্‌ষ্টার্ ডিক্স্‌নারীখানা খুঁজিয়া না াইয়া যৎপরোনাস্তি বিরক্ত হইয়াছিল এবং শেষে অগত্যা আর একখানা পুরাতন অভিধান খুঁজিয়া পাতিয়া বাহির করিয়া কাজ চালাইয়া লইতে- ছল। তাহার সম্মুখে বসিয়া সর্ব্বানন্দ একখানা খাতায় কতকগুলা ংরাজী idiom-এর বাংলা তর্জ্জমার চেষ্টায় বারবার মাথা চুলকাইয়া পন্‌সিল্ কামড়াইয়া ক্ষণে ক্ষণে কার্ত্তিকচন্দ্রের দিকে চাহিতেছিল— চ্ছা, সে একটু সাহায্য করে। কিন্তু কার্ত্তিকচন্দ্র ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া াপন মনে কাজ করিতেছিল, অন্যদিকে চাহিবার তাহার অবসরমাত্র ছল না!

এমন সময় দ্বারের নিকট একটা সুমধুর হাস্যধ্বনি শুনিয়া সর্ব্বানন্দ চমকিয়া ফিরিয়া দেখে, শৈলজা দুই হাতে সেই অভিধানের দুই অংশ লইয়া দ্বারে দাঁড়াইয়া হাসিতেছে। সর্ব্বানন্দ হাসিয়া বলিল, "কার্ত্তিক ঐ দেখ তোমার ওয়েব্‌ষ্টার্।"

কার্ত্তিকচন্দ্র তাহার পুস্তক হইতে মুখ তুলিয়া শৈলজার দিকে তীব্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবামাত্র, শৈলজা হাসিতে হাসিতে মাথা নাড়িয়া বলিল, "দেব না, কখ্‌খনো দেব না ত।" তখন কার্ত্তিকচন্দ্র গম্ভীর স্বরে বলিল, "দিয়ে যাও বল্‌ছি, শৈল, নইলে—"

শৈলজা কিন্তু কিছুমাত্র ভীত না হইয়া মাথা নাড়িয়া কেবলই বলিতে লাগিল, "দেব না—কখ্‌খনো দেব না।" তখন কার্ত্তিকচন্দ্র চেয়ার ছাড়িয়া তাহার দিকে সবেগে ছুটিতে গিয়া আর-একখানা চেয়ারে কাপড় আটকাইয়া পড়িয়া গেল; এবং একটা আলমারির কোণে লাগিয়া তাহার কপাল কাটিয়া রক্ত পড়িতে লাগিল। তবুও কার্ত্তিকের সে দিকে ভ্রূক্ষেপও নাই, সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া বাহিরে বারান্দায় শৈলজাকে ধরিতে গেল। শৈলজা কিন্তু কিছু দূরে ছুটিয়া গিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল, ইচ্ছা কার্ত্তিক যদি বাহিরে না আসে, তাহা হইলে আবার গিয়া তাহাকে ঐ বইদুখানা দেখাইবে। কার্ত্তিকচন্দ্র বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইতেই তাহার মুখের দিকে চাহিয়া শৈলজার সমস্ত দুষ্টামি মুহূর্ত্তে উড়িয়া গেল। সে তাড়াতাড়ি বই দুইখানা ফেলিয়া দিল এবং কার্ত্তিকের নিকট ছুটিয়া আসিয়া বলিল, "ও কার্ত্তিক-দা, রক্ত যে! তোমার কপাল কেটে গেছে। ও রামচরণ, জল আন্। ও সর্ব্ব-দা, শীগ্‌গির এস।"

কার্ত্তিকচন্দ্র প্রথমটা ঝোঁকের মাথায় বাহিরে আসিয়াছিল বটে, কিন্তু বাহিরে আসিয়াই আঘাতের গুরুত্ব অনুভব করিল। কারণ কপাল কাটিয়া রক্তের ধারায় তাহার মুখ ও বুক ভাসিয়া যাইতেছিল। সর্ব্বানন্দ

তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া দেখিল, শৈলজা কাঁদিতে কাঁদিতে লাইব্রেরীর বাহিরে যে এক-কলসী জল ছিল, তাহাই একটা প্রকাণ্ড মগে ঢালিবার চেষ্টা করিতেছে, আর কার্ত্তিক এক হাতে ক্ষত স্থান চাপিয়া ধরিয়া রেলিংয়ে ভর দিয়া দাঁড়াইয়া আছে।

লাইব্রেরীর খানসামা রামচরণ দ্বিপ্রাহরিক নিদ্রা দিতেছিল। শৈলজার চীৎকারে সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া আসিয়া তৎক্ষণাৎ জল ঢালিয়া কার্ত্তিকের কপালে জলপটী বাঁধিয়া ডাক্তারকে সংবাদ দিতে গেল। কার্ত্তিক ধীরে ধীরে উঠিয়া যখন লাইব্রেরীর একখানা চেয়ারে বসিল, তখন শৈল চোখ মুছিয়া ম্লান মুখে তাহার কাছে গিয়া বলিল, "কার্ত্তিক-দা, বাবাকে বলো না, আর আমি দুষ্টুমি করব না!"

কার্ত্তিক হাসিয়া বলিল, "তোমার দোষ কি! আমি ত আপনি পড়ে গিয়েছি।"

"না কার্ত্তিক-দা, আমারই দোষ। আমি মাপ চাচ্ছি। সর্ব্ব-দা, ঐ দেখ আরও রক্ত পড়্ছে! কি হবে?"

সর্ব্বানন্দ বলিল, "ভয় কি! ডাক্তারবাবু আস্ছেন। এখনই সেরে যাবে।"

"যদি রক্ত বন্ধ না হয়, আমার বড় ভয় কর্ছে, আমি বাবাকে ডেকে আনি।"

শৈলজা চলিয়া গেল। তারপর ডাক্তার বাবু আসিয়া বাঁধা-ছাঁদা করিয়া বলিলেন, "এখন নড়ো না, বিকেলে বাড়ী যেয়ো, এখন খবর্দার নড়ো-চড়ো না।"

৯

কবিবর মণিশঙ্করের হৃদয়ে দারুণ আঘাত লাগিয়াছে। তাঁহার 'মানস-প্রতিমা' হঠাৎ সান্ধ্যভ্রমণ ত্যাগ করিয়াছেন, এবং সেদিন তিনি স্পষ্ট

তাঁহাকে বলিয়াছেন যে আর তিনি তাঁহার সম্মুখে বাহির হইবেন না। মণিশঙ্করের কাতর দৃষ্টি, অভিমানভরা মধুর বচন, সমস্ত উপেক্ষা করিয়া তিনি বলিয়াছেন, "বাবা বলেন, তুমি মদ খাও, খারাপ লোকের সঙ্গে থাক, তোমার সঙ্গে কথা বল্‌তে নেই।" হায় নিষ্ঠুরে! তুমি ত' জান না, কেন সে মদ খায়! তোমার নিষ্ঠুরতা, তোমার উপেক্ষাই যে তাহার কারণ। তুমি যদি দয়া করিয়া তাহার পানে একবার চাহিয়া দেখ, তাহা হইলে যে সে রাজার রাজা হইতে পারে, যুধিষ্ঠিরের মত ধার্ম্মিক হইতে পারে, ভীষ্মের মত শরশয্যায় শয়ন করিতেও তাহার বাধে না! তুমি যদি বল, তাহা হইলে সে পিতা ত্যাগ করিতে পারে, এমন কি এমন যে হিতৈষিণী মাতা, তাঁহাকেও ত্যাগ করিয়া তোমার চরণে সে আপনাকে বলি দিতে পারে। হায়! তুমি তোমার ত্রিংশ সহস্র মুদ্রা আয়ের সম্পত্তির উপর উন্নত হইয়া বসিয়া রহিলে, আর সে রহিল কোথায়?

কবিবরের দুঃখ-সাগর মথিত হইয়া আজ-কাল যে সমস্ত উচ্ছ্বাস বাহির হইতেছিল, তাহাদের অমানুষিক বা আনুনাসিক রসাত্মকতায় অনেক নিশাচর সাহসী ব্যক্তিও আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিতেছিল। এমন কি তাঁহার "শঙ্করসাহি" কবিতাগুলি "পল্লী-সাহিত্যানুসন্ধান-সমিতির" সভ্যগণের কৃপায়, মণিশঙ্কর নামটিকে খৃষ্টীয় বিংশ শতাব্দী হইতে একেবারে ত্রয়োদশ কি চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে উপনীত করাইয়া পল্লী সাহিত্যের গতাসু মহাপুরুষগণের সঙ্গে তাঁহাকে একাসনে বসাইয়া দিতেছিল।

গৃহে তাঁহার সঘন মূর্চ্ছা, বন্ধু-মহলে তাঁহার উদ্‌ভ্রান্ত প্রাণোন্মাদকর শঙ্করসাহি গীত এবং পথে ঘাটে তাঁহার চপল মন্থর গতি গ্রামের চিত্তটিকে একেবারে দখল করিয়া বসিয়াছিল। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া তাঁহার মাতা ডাক্তার ডাকিলেন। ডাক্তার আসিয়া ব্যবস্থা করিলেন, দুই বেলা ক্ষুদ্র মৎস্যের ঝোল আর ভাত এবং দিবারাত্রি গৃহে আবদ্ধ থাকা। বন্ধুরা

ব্যবস্থা করিলেন, "পোড়া বাঙ্গলা" ছাড়িয়া তাঁহারই বৈঠকখানায় আসিয়া তাঁহাকে প্রফুল্ল রাখা। মণিশঙ্কর স্বয়ং ব্যবস্থা করিলেন, প্রতিদিন চারি বোতল করিয়া ধান্যেশ্বরীর সেবা। কিন্তু মূর্খ পিতা দুর্গাশঙ্কর ব্যবস্থা করিলেন, তাঁহার নিজ সলিমপুর মহালের নায়েবী—না হয়, জমিদার-মহাশয়কে বলিয়া-কহিয়া নিকটস্থ কোন এক তালুকের ম্যানেজারী।

পিতার এই ব্যবস্থা শুনিয়া পুত্রের উদ্ভাবনশীল মস্তিষ্কে এক অপূর্ব্ব ভাব গজাইয়া উঠিল। তিনি তাঁহার পিতাকে ধরিয়া বসিলেন যে শ্রীমতী শৈলজাসুন্দরীর নামে যে সুবর্ণ-গোলা নামক তালুক আছে, তাহার ম্যানেজারিটা তাঁহাকে দেওয়া হউক। উহার ম্যানেজার না কি এই সময় হিসাব দিবার জন্য সদর কাছারিতে আসিয়াছে; উহাকে এই সময় বরখাস্ত করিয়া পিতা তাঁহাকে ঐ পদটী প্রদান করুন, তাহা হইলেই কবিবরের সমস্ত রোগ সারিয়া যাইবে। পিতা সেই কথা শুনিয়া মনে মনে হাসিলেন, কিন্তু তাঁহার মস্তকেও ঐ সময়ে তড়িৎগতিতে একটা অভিসন্ধি জাগিয়া উঠিল; এবং দৈবের কোন্ অলঙ্ঘ্য নিয়মে তাঁহার মুখ দিয়া বাহির হইল, "ম্যানেজার বেটাকে হিসেব নিকেশে ফেল্‌তে হবে!"

দুর্গাশঙ্কর চলিয়া গেলে মণিশঙ্কর বন্ধুগণের নিকট উপস্থিত হইয়া এক অদ্ভুত প্রস্তাব করিলেন। শুনিয়া বন্ধুগণ একেবারে ভয়ে-বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়িল। কিন্তু কবিবরের তখন বাক্যের উৎস খুলিয়া গিয়াছে; তিনি জ্বলন্ত গদ্য-পদ্য বর্ষণ পূর্ব্বক বন্ধুগণকে উত্তেজিত করিতে লাগিলেন; দুই ঘণ্টার উদ্যোগে স্থির হইল, যেমন করিয়াই হউক সুবর্ণ গোলার ম্যানেজারের কাগজ-পত্র সরাইয়া ফেলিতে হইবে। ম্যানেজার রাত্রে ঠাকুরবাড়ী-সংলগ্ন একটা কুঠরীতে নিদ্রা যায়। রাত্রি বারোটা-একটার সময় কার্য্য সম্পন্ন করিতে হইবে! মহাশক্তির প্রভাবে সকলেই উৎসাহিত হইয়া উক্ত কার্য্যে যোগদান করিতে স্বীকৃত হইল।

কিন্তু কার্য্যকালে সমুৎপন্নে দেখা গেল, তিন-চারিজন ছাড়া আর কেহই মণিশঙ্করের সঙ্গে নাই। তথাপি কি ভয়, কি ভয়! তাহারা এক-একজনেই এক একশত। Forward! March! No fear!

সেনাপতি মণিশঙ্কর বলিলেন, "সাবধান! কোন শব্দ করো না। চুপি চুপি ওখানে ঢুকে যদি দেখি দরজা বন্ধ, তাহলে কাঠের জানলাটা এক টানে খুলে ফেলে ঘরে ঢুকে তার পর দেশলাই জ্বালা যাবে। পাপিষ্ঠ ম্যানেজার যদি বাধা দেয়, তাহলে—" মণিশঙ্কর কলোসিয়ম্-স্থিত রোমান সম্রাটের ন্যায় বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের দ্বারা দেখাইয়া দিলেন, কি করিতে হইবে।

মণিশঙ্কর নিঃশব্দতার আদেশ দিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার একজন প্রিয়তম শিষ্য যিনি শঙ্করসাহি সঙ্গীতে এবং ধান্যেশ্বরীর সেবায় গুরুকেও অতিক্রম করিয়াছিলেন, তিনি কিছুতেই তাঁহার হৃদয়স্থ শঙ্করসাহির সুরকে চাপিয়া রাখিতে পারিলেন না। তাই অন্যান্য সকলে যখন ম্যানেজারের কক্ষের নিকট উপস্থিত হইয়া জানলা-দরজা বন্ধ দেখিয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ের ন্যায় কর্ত্তব্যসম্বন্ধে পরামর্শ করিতেছিল, তখন তাঁহার শঙ্করসাহি হঠাৎ সংযমের বাঁধ ভাঙ্গিয়া বাহির হইল, "একবার বেরোও হে নরেশ!"

"আরে, চুপ চুপ।"

"আমরা তোমায় দেখে নেবো ;
বেরোও হে নরেশ! একবার বেরোও হে—এ।—"

"সর্ব্বনাশ করলে! আরে চুপ!"

কিন্তু কে শোনে? পুনরায় দ্বিগুণ জোরে বাহির হইল, "বেরোও হে—এ—এ—একবার।"

এমন সময় দ্বার খুলিয়া ম্যানেজার নরেশচন্দ্র মহালনবীশ বাহিরে আসিয়া বলিলেন, "কে হে তোমরা?"

আর পিছানো চলে না! মণিশঙ্করের সেই গায়ক শিষ্য গিয়া তাহাকে জাপটাইয়া ধরিয়া গাহিল, "আমরা তোমায় দেখে নেবো—হে!" নরেশবাবু ভীত হইয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "ডাকাত—ডাকাত—" এবং কোনরূপে আপনাকে মুক্ত করিয়া ঘরে প্রবেশ করিয়া দ্বার বন্ধ করিয়া দিলেন। তাঁহার চীৎকারে কিছুক্ষণের মধ্যেই টোলের কয়েকটী ছাত্র-সমেত সর্ব্বানন্দ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া দেখিল, মুখে কাপড়-বাঁধা কয়জন লোক দরজা ঠেলিয়া নরেশ বাবুর কক্ষে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিতেছে এবং তিনি কক্ষমধ্য হইতে প্রাণপণে চীৎকার করিতেছেন। তাহারা আসিয়া মণিশঙ্করকে সবলে ঘিরিয়া ফেলিল। মণিশঙ্কর বেগতিক দেখিয়া হুকুম দিলেন, "চালাও লাঠি।"

সর্ব্বানন্দ বলিল, "আর লাঠি চালিয়ে দরকার নেই। পালাও বল্‌ছি, নইলে সব-কটী মাতালকে ঐ কূয়োয় চোবাব।"

মণিশঙ্কর হুকুম দিলেন, "মারো শালা সর্ব্বাকে।" কিন্তু সর্ব্বানন্দ ও অন্যান্য ছাত্রগণ কিল, চড় ও দুই-চারি লাথিতে সকলকে ভূতলশায়ী করিল। পরে ঠাকুরবাড়ীর দরোয়ানগণ পৌঁছিলে বলিয়া দিল, "বাঁধো এদের।" দরোয়ানেরা সঙ্গে আনিয়াছিল। তাহারা আলোর সাহায্যে যখন চিনিল, কাহাকে বাঁধিতে হইবে, তখনই সকলে পিছাইয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "আরে ইনি মণিবাবু! ই কেয়া হুয়া? আপ্ কাহে ডাকু বন্ গিয়া?" মণিশঙ্কর তখন সাহস পাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "বাঁধো ঐ শালাকো।" কে কাহাকে বাঁধে?

ইত্যবসরে কার্ত্তিকচন্দ্র সংবাদ পাইয়া ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইল এবং সমস্ত ঘটনা শুনিয়া বলিল, "বটে! আরে সর্ব্ব-দা, করেছ কি! মণিবাবু এসেছেন, ওঁর অভ্যর্থনা করনি? ছি ছি, কি করছ, শীগ্‌গির কূয়ো থেকে একঘড়া জল তুলে এনে ওঁর মাথায় দাও।" সর্ব্বানন্দ ব্যস্ত হইয়া

বলিল, "এই সারলে! ওহে মণি, পালাও, কার্ত্তিক ক্ষেপেছে। আমার হাতে তবু রক্ষা আছে, ওর হাতে নেই।"

মণিশঙ্কর কার্ত্তিকচন্দ্রের মূর্ত্তি দেখিয়াই সসম্মানে পলায়নের পথ খোলসা কি না তাহাই দেখিতেছিল। ইত্যবসরে কার্ত্তিকচন্দ্র কূপ হইতে এক ঘড়া জল তুলিয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইল। মণিশঙ্করের অন্যান্য বন্ধুগণ পূর্ব্বেই পলাইয়াছিল, কিন্তু সে তখনও সাহসে ভর করিয়া দাঁড়াইয়াছিল। কার্ত্তিক আসিয়া যেমন তাহার গলায় হাত দিয়া এক ধাক্কায় তাহাকে মাটীতে ফেলিল, অমনি সে সর্ব্বানন্দকে ডাকিয়া কাতর কণ্ঠে বলিল, "সর্ব্ব ভাই, রক্ষে কর।" সর্ব্বানন্দ তখন কার্ত্তিককে টানিয়া বলিল, "আঃ, কি কর, কার্ত্তিক? দেখছ না, বেচারা মদের ঝোঁকে এ কাজ করে ফেলেছে। যাও মণি, পালাও।"

মণিশঙ্কর তখন একেবারে তাঁহার "আড্ডা" খোড়া বাঙ্গলায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেইস্থানে তাঁহার যে কয়টী সঙ্গী যুদ্ধক্ষেত্রে যাইতে সাহস করে নাই, তাহারা উপস্থিত ছিল। মণিশঙ্কর ফরাসের উপর গিয়া আছাড় খাইয়া বলিলেন, "ভাই দেবেন, ভাইরে, আমার বড় অপমান হয়েছে!"

"কি, কি, কি হ'ল?"

"উঃ, বড় অপমান! জ্বলে গেল, বুক জ্বলে গেল!"

একজন বন্ধু তাড়াতাড়ি এক গ্লাস স্টিমুলাণ্ট আনিয়া তাহার মুখের কাছে ধরিতেই, তৎক্ষণাৎ সে তাহা উদরসাৎ করিয়া বলিল, "উঃ, ভাইরে কি অপমান! আমার মূর্চ্ছা যাবার মত হচ্ছে!" তাহার অবস্থা দেখিয়া একজন তাড়াতাড়ি তাঁহার মাতার নিকট সংবাদ দিতে ছুটিয়া গেল, এবং অন্যান্য সঙ্গিগণ পাখা লইয়া তাহাকে বাতাস করিতে লাগিল।

দেবেন জিজ্ঞাসা করিল, "কি হয়েছে, একটু ঠাণ্ডা হয়ে বল দেখি?"

মণিশঙ্কর কহিল, "প্রিয়নাথ, বাপ! আর এক গ্লাস দাও, ভাই!"

প্রিয়নাথ তাহার আজ্ঞা পালন করিলে মণিশঙ্কর উঠিয়া বসিয়া বলিতে আরম্ভ করিল, "কি হয়েছে? বরং বল কি হয়নি? সেই পাপিষ্ঠ পরান্ন-ভোজী কুকুরগুলোর ভয়ে আমায় পালিয়ে আসতে হ'ল! সেই পাতচাটা হারামজাদা সর্ব্বা আর কার্ত্তিকে! সেই দুটো চাংড়া আমায় লাথি মারলে! এ প্রাণ আমি আর রাখ্‌ব না।"

দেবেন কহিল, "থাম, থাম, ও কি করছ? গলা টিপ্‌ছ কেন?"

মণি কহিল, "আমি মরব। সত্যি আমি মরব।"

দেবেন কহিল, "প্রিয়নাথ, তুই আরও মাটি করলি। এসময়ে আবার মদ দিতে গেলি কেন? এখন একটু তেঁতুল-গোলার জোগাড় দেখ্।"

দেবেন তাড়াতাড়ি এক গ্লাস জল লইয়া মণির মাথায় দিতে লাগিল। মণিশঙ্কর গর্জ্জন করিয়া বলিল, "কি ঠাণ্ডা করছিস, দেবেন? এ প্রাণ আর ঠাণ্ডা হবে না। যেদিন সর্ব্বার মুণ্ডু এই হাতে, আর কার্ত্তিকের মুণ্ডু এই হাতে ঝোলাতে পারব, সেদিন ঠাণ্ডা হব। নইলে বন্ধু, তোমরা বন্ধুহারা হবে!"

প্রিয়নাথ তেঁতুল-গোলা আনিবামাত্র দেবেন বলিল, "এই তেঁতুল-গোলাটুকু খাও।"

মণি কহিল, "কি এনেছ? তেঁতুল-গোলা! যদি এই বাটিতে করে ঐ পাপিষ্ঠদের গরম রক্ত আন্‌তে পারতে, তাহলে তাই খেয়ে আমি ঠাণ্ডা হতুম! কি মিছে তেঁতুল-গোলা খাওয়াচ্ছ? রক্ত চাই—রক্ত চাই—রক্ত—রক্ত!"

দেবেন কহিল, "আমি এখনি তাদের রক্ত এনে দিচ্ছি। তুমি ততক্ষণ এইটে খাও—"

"তাদের মুণ্ডু—দু-দুটো মুণ্ডু—"

বলিল, "এই সার্‌লে! ওহে মণি, পালাও, কার্ত্তিক ক্ষেপেছে। আমার হাতে তবু রক্ষা আছে, ওর হাতে নেই।"

মণিশঙ্কর কার্ত্তিকচন্দ্রের মূর্ত্তি দেখিয়াই সসম্মানে পলায়নের পথ খোলসা কি না তাহাই দেখিতেছিল। ইত্যবসরে কার্ত্তিকচন্দ্র কূপ হইতে একঘড়া জল তুলিয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইল। মণিশঙ্করের অন্যান্য বন্ধুগণ পূর্ব্বেই পলাইয়াছিল, কিন্তু সে তখনও সাহসে ভর করিয়া দাঁড়াইয়াছিল। কার্ত্তিক আসিয়া যেমন তাহার গলায় হাত দিয়া এক ধাক্কায় তাহাকে মাটীতে ফেলিল, অমনি সে সর্ব্বানন্দকে ডাকিয়া কাতর কণ্ঠে বলিল, "সর্ব্ব ভাই, রক্ষে কর।" সর্ব্বানন্দ তখন কার্ত্তিককে টানিয়া বলিল, "আঃ, কি কর, কার্ত্তিক? দেখ্‌ছ না, বেচারা মদের ঝোঁকে এ কাজ করে ফেলেছে। যাও মণি, পালাও।"

মণিশঙ্কর তখন একেবারে তাঁহার "আড্ডা" পোড়া বাঙ্গলায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেইস্থানে তাঁহার যে কয়টী সঙ্গী যুদ্ধাভিযানে যাইতে সাহস করে নাই, তাহারা উপস্থিত ছিল। মণিশঙ্কর ফরাশের উপর গিয়া আছাড় খাইয়া বলিলেন, "ভাই দেবেন, ভাইরে, আমার বড় অপমান হয়েছে!"

"কি, কি, কি হ'ল?"

"উঃ, বড় অপমান! জ্বলে গেল, বুক জ্বলে গেল!"

একজন বন্ধু তাড়াতাড়ি এক গ্লাস ষ্টিমুলাণ্ট্‌ আনিয়া তাহার মুখের কাছে ধরিতেই, তৎক্ষণাৎ সে তাহা উদরসাৎ করিয়া বলিল, "উঃ, ভাইরে কি অপমান! আমার মূর্চ্ছা যাবার ইচ্ছে হচ্চে!" তাহার অবস্থা দেখিয়া একজন তাড়াতাড়ি তাঁহার মাতার নিকট সংবাদ দিতে ছুটিয়া গেল, এবং অন্যান্য সঙ্গিগণ পাখা লইয়া তাহাকে বাতাস করিতে লাগিল।

দেবেন জিজ্ঞাসা করিল, "কি হয়েছে, একটু ঠাণ্ডা হয়ে বল দেখি?"

মণিশঙ্কর কহিল, "প্রিয়নাথ, বাপ! আর এক গ্লাস দাও, ভাই!"

প্রিয়নাথ তাহার আজ্ঞা পালন করিলে মণিশঙ্কর উঠিয়া বসিয়া বলিতে আরম্ভ করিল, "কি হয়েছে? বরং বল কি হয়নি? সেই পাপিষ্ঠ পরান্ন-ভোজী কুকুরগুলোর ভয়ে আমায় পালিয়ে আস্‌তে হ'ল! সেই পাতচাটা হারামজাদা সর্ব্বা আর কার্ত্তিকে! সেই দুটো চ্যাংড়া আমায় লাথি মার্‌লে! এ প্রাণ আমি আর রাখ্‌ব না।"

দেবেন কহিল, "থাম, থাম, ও কি কর্‌ছ? গলা টিপ্‌ছ কেন?"

মণি কহিল, "আমি মর্‌ব। সত্যি আমি মর্‌ব।"

দেবেন কহিল, "প্রিয়নাথ, তুই আরও মাটি কর্‌লি। এসময়ে আবার মদ দিতে গেলি কেন? এখন একটু তেঁতুল-গোলার জোগাড় দেখ্‌।"

দেবেন তাড়াতাড়ি এক গ্লাস জল লইয়া মণির মাথায় দিতে লাগিল। মণিশঙ্কর গর্জ্জন করিয়া বলিল, "কি ঠাণ্ডা কর্‌ছিস, দেবেন? এ প্রাণ আর ঠাণ্ডা হবে না। যেদিন সর্ব্বার মুণ্ডু এই হাতে, আর কার্ত্তিকের মুণ্ডু এই হাতে ঝোলাতে পার্‌ব, সেদিন ঠাণ্ডা হব। নইলে বন্ধু, তোমরা বন্ধুহারা হবে।"

প্রিয়নাথ তেঁতুল-গোলা আনিবামাত্র দেবেন বলিল, "এই তেঁতুল-গোলাটুকু খাও।"

মণি কহিল, "কি এনেছ? তেঁতুল-গোলা! যদি এই বাটিতে করে ঐ পাপিষ্ঠদের গরম রক্ত আন্‌তে পার্‌তে, তাহলে তাই খেয়ে আমি ঠাণ্ডা হতুম! কি মিছে তেঁতুল-গোলা খাওয়াচ্ছ? রক্ত চাই—রক্ত চাই—রক্ত—রক্ত!"

দেবেন কহিল, "আমি এখনি তাদের রক্ত এনে দিচ্ছি। তুমি ততক্ষণ এইটে খাও—"

"তাদের মুণ্ডু—দু-দুটো মুণ্ডু—"

দেবেন কহিল, "আমি এখনি কেটে এনে দিচ্ছি। তুমি এটুকু খেয়ে ফেল দেখি।"

তাহাদের এইরূপ কথাবার্ত্তা চলিতেছে, এমন সময় নিস্তারিণী দেবী "ওরে মণিরে, বাপ্‌রে" বলিয়া সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন। তখন মাতৃ-ভক্ত সন্তান টলিতে টলিতে উঠিয়া মাতাকে ধরিয়া বলিল, "মা—গর্ভ-ধারিণী—জগৎজননী—"

বাকীটুকু আর শুনা গেল না। কারণ পুত্রের নিবিড় আলিঙ্গনে মাতা সপুত্র ভূমিসাৎ হইলেন।

১০

দেওয়ান দুর্গাশঙ্করের গর্ব্বোচ্চ শির নত হইয়া যাওয়ায় তিনি একেবারে মরমে মরিয়া গেলেন। এমন কি যাহারা তাঁহার কৃপাদৃষ্টির জন্য সতত সতৃষ্ণ নয়নে জোড়করে তাঁহার মুখপানে চাহিয়া থাকিত, তাহারাও আজ কাল তাঁহাকে কৃপাদৃষ্টিতে দেখিতে আরম্ভ করিয়াছে। কাছারির আমলা ফয়লা হইতে আরম্ভ করিয়া উমেদার পাইক এমন কি ঝাড়ুদার পর্য্যন্ত তাঁহাকে দেখিয়া লুকাইয়া হাসে। দেখিয়া শুনিয়া তিনি অবরুদ্ধ কণ্ঠে একদিন জমিদার মহাশয়কে বলিলেন, "আমার বয়স হয়েছে, এখন আর আমি পারি না, আমার কাছ থেকে সব বুঝে সুঝে নিয়ে আমায় ছুটী দাও।"

কালিকাবাবু গম্ভীরভাবে বলিলেন, "ছেলের দোষে নিজেকে দোষী করা নিজের উপর অন্যায় অত্যাচার! আপনি কেন ব্যস্ত হচ্চেন? মণিশঙ্করের জন্য আপনি কেন শাস্তি ভোগ কর্‌তে যাবেন? আপনি আমার পৈতৃক দেওয়ান, আপনাকে আমি এত সহজে ত্যাগ কর্‌তে পারি না।"

দুর্গাশঙ্কর কহিলেন, "না বাপু, এ আমারই পাপের শাস্তি। যেখানে আমি মাথা উঁচু করে সবার ওপর হুকুম চালিয়েছি, সেখানে মাথা নীচু করে কাজ কর্‌তে পার্‌ব না। তোমার এষ্টেট্‌ হ'তে আমি যা কিছু করেছি, তাতেই আমার বাকি কটা দিন বেশ চলে যাবে। আর কেন আমায় ধ'রে রাখ্‌ছ ?"

কালিকাবাবু বহু অনুনয়-বিনয় করিয়া কিছুতেই দেওয়ানজীকে রাখিতে পারিলেন না ; তবে দুর্গাশঙ্কর আরও কয়েক মাস থাকিয়া সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া দিতে স্বীকৃত হইলেন।

দেওয়ান মহাশয়ের কর্ম্মত্যাগের সংবাদ চতুর্দ্দিকে রাষ্ট্র হইয়া গেল। কেহ দুঃখিত হইল, কেহ মনে মনে খুবই সন্তুষ্ট হইল। কিন্তু ন্যায়রত্ন মহাশয় এই সংবাদে যৎপরোনাস্তি দুঃখবোধ করিলেন। পুত্রের পাপে পিতার শাস্তি-ভোগ তাঁহার নিকট বড়ই দুঃসহ বোধ হইল, তাই তিনি কার্ত্তিককে ডাকিয়া বলিলেন, "তোমাদের জন্যই দেওয়ানজী এরকম ক্ষতিগ্রস্ত হলেন। তোমরা যদি মণিশঙ্করের সেদিনকার ব্যাপার চতুর্দ্দিকে রাষ্ট্র করে না দিতে, তাহলে কখনই এ ব্যাপার ঘট্‌ত না। সেদিন থেকে মণি কোথায় নিরুদ্দেশ হয়েছে, দেওয়ান মহাশয়ের স্ত্রীও শুন্‌লাম, সেদিন থেকে শরীরে আঘাত পেয়ে অসুস্থ হয়েছেন, তার ওপর উনি আবার কাজ ছেড়ে দিচ্চেন। তোমাদের উচিত, ওঁর পায়ে ধ'রে যাতে উনি আবার কাজ নেন, তাই করা।"

কার্ত্তিকচন্দ্র আর দ্বিরুক্তি না করিয়া সময়-মত দেওয়ানজীর সঙ্গে দেখা করিল। দেওয়ানজী বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "কেন তোমরা বাপু আবার আমার পিছনে লাগ্‌লে ? কাজ করা না করা আমার ইচ্ছে। এতে পরের এত মাথা-ব্যথা কেন ?"

কার্ত্তিক কহিল, "আমাদের জন্য যদি আপনার ক্ষতি হয়ে থাকে,

বলুন, যেমন করে হোক, সে ক্ষতি পূরণ কর্‌বার চেষ্টা কর্‌ব। রামকে তীর মার্‌লে সে তীর যদি শ্যামকে লাগে, তাহলে যে তীর ছুড়েছিল, সকলে তাকেই দোষ দেবে। কি হ'লে আপনি সন্তুষ্ট হবেন, বলুন, আমার সাধ্যাতীত না হ'লে আমি তাই কর্‌ব।"

দুর্গাশঙ্কর গড়গড়ায় ভীষণভাবে দুইটা টান দিয়া বলিলেন, "বিপদে কোথায় সহানুভূতি পাব, না, এই রকম একটা চ্যাংড়ার কাছে অপমান হ'তে হচ্চে! যারা আমার সামনে মুখ তুলে কথা বল্‌তে সাহস করত না, তারা এখন বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে বল্‌ছে, সাহায্য কর্‌ব। ওঃ, এর চাইতে মরণ ছিল ভাল!"

কার্ত্তিক কহিল, "আপনার পা ছুঁয়ে বল্‌ছি, আমার কোন রকম অসদভিপ্রায় নেই। যে শপথ করতে বলেন, তাই ক'রে বল্‌ছি, যদি আমার দ্বারা কোন উপকার হয়, আমি তা করতে রাজী আছি।"

দুর্গাশঙ্কর কহিল, "কি, এতদূর স্পর্দ্ধা! আচ্ছা, দেখি টোলের ভাত খেয়ে তোমার মনটা কতখানি বড় হয়েছে! বাবুকে ব'লে ক'য়ে মণিশঙ্করের সঙ্গে শৈলজার বিয়ে দিয়ে দিতে পার?"

কার্ত্তিকচন্দ্র বিস্মিত হইয়া বলিল, "সে কি! তা আমি কেমন ক'রে পারব? শৈলজার বিয়ের ওপর আমার কি হাত? বাবু আমার কথা শুন্‌বেন কেন? তবে আমায় যদি এ প্রস্তাব করতে বলেন, আমি আজই করব।"

"না, না, অতখানি দয়া তোমার করতে হবে না। তবে তুমি যদি ইচ্ছে কর, তা হ'লে তা হ'তে পারে।"

"কি ক'রে, বলুন। আমি তাই কর্‌ব।"

"তোমাদের এখানকার বাস তুল্‌তে হবে।"

কার্ত্তিক কিছুক্ষণ নীরবে চিন্তা করিয়া হাসিয়া বলিল, "আমরাই তা

হলে আপনার শত্রু! বেশ, তাহ'লে বাবাকে একথা বলছি যে, আমরাই আপনার পথের কাঁটা; কিন্তু বাবা এখান থেকে যাবেন কি না, সে কথা বল্‌তে পারিনে। যদি একা আমি গেলে হয়, বলুন, আমি এখনই সরে পড়্‌ছি। আর যখন ইংরিজিই পড়্‌ছি, তখন এ বিদ্যার শেষ না দেখে আমি ছাড়্‌ছি না। চার মাস পরেই আমাদের এণ্ট্রান্‌স্ একজামিন, তারপর হয় কলকাতায়, নয় অন্য কোন জায়গায় আমায় যেতেই হবে। তখন অনায়াসেই আমি আপনার পথ থেকে দূর হব। এই চার মাস অপেক্ষা করতে পার্‌বেন না? এখন যেতে হ'লে, হয়ত বাবু আমায় যে-রকম ভালবাসেন, তাতে আপনার সুবিধে না হয়ে অসুবিধেই হ'তে পারে।"

দুর্গাশঙ্করের ক্রোধ ক্রমশঃ বিস্ময়ে পরিণত হইল। এই অষ্টাদশ বর্ষীয় বালকের এতখানি বুদ্ধি! দুর্গাশঙ্করের মনে আবার আশা দেখা দিল। তিনি ভাবিলেন, ইহার বুদ্ধি যথেষ্ট বটে, কিন্তু বিষয়-বুদ্ধি কম, নহিলে নিজের ভবিষ্যৎকে কি কেহ এতখানি উপেক্ষা করিতে পারে?

তাঁহাকে চিন্তা করিতে দেখিয়া কার্ত্তিকচন্দ্র হাসিয়া বলিল, "আপনার ভয় হচ্ছে যে, এত বড় লোভ আমি কি করে সংবরণ করব? হয়ত পার্‌ব না? কিন্তু ঠিক জান্‌বেন যে আপনার কাছে যেটা খুব বড়, আমার কাছে হয়ত সেটা খুবই ছোট! আপনি টাকা-কড়ি, ধন-দৌলতকে বড় ক'রে দেখ্‌তে শিখেছেন, আর আমি গরীব ব্রাহ্মণের ছেলে, নিজের মানটাকেই বড় ক'রে দেখ্‌তে শিখেছি। বাবু হয়ত আমাকে শিখিয়ে-পড়িয়ে তাঁর বিষয়-সম্পত্তির সঙ্গে শৈলজাকে আমার হাতেই সঁপে দেবেন, মনস্থ করেছেন। কিন্তু আমি জানি, ভিখিরীর ছেলে রাজপদ পেলেও সেই ভিখিরীই থাকে। আপনার মণি এই এত বড় লাখ-দেড় লাখের সম্পত্তি পেলেও সেই মণিই থাকবে। আমি দূর থেকে তাই দেখে

হাস্‌ব। কিন্তু বাবু আমায় ভালবাসেন, ঠিক জান্‌বেন, সে ভালবাসার অপমান আমি কখনও কর্‌ব না। আমি বড়ই হব, ছোট হব না। বাবা যদি এতদিন পর্য্যন্ত আমার ভার বহন কর্‌তে পেরে থাকেন, আরও কিছুদিন তিনি তা পার্‌বেন বোধ হয়।”

দুর্গাশঙ্কর তাড়াতাড়ি নিকটে আসিয়া বলিলেন, “বাবা, তোমায় আশীর্ব্বাদ করি, চিরদিন তুমি ব্রাহ্মণের ছেলেই থেকো। তোমায় কিছু কর্‌তে হবে না। কপালে থাকে, মণি বড় হবে, ভাল হবে, কিন্তু আমি তোমার কাছ থেকে এ বিষয়ে কোন সাহায্য নেব না। তুমি নিশ্চিন্ত মনে পড়াশুনা করগে। আমি অধম, তাই তোমায় সন্দেহ করেছিলাম।”

কার্ত্তিক কহিল, “কিন্তু আমি যখন বলেছি যে আপনার পথে দাঁড়াব না, তখন নিশ্চয়ই সরে যাব, কেউ আমায় নিবারণ কর্‌তে পার্‌বে না। তবু এও ব’লে রাখ্‌ছি, আপনার মণিকে বাবু যদি মেয়ে না দেন, তাহলে আমি আবার আস্‌ব। তখন যদি তিনি আমাকেই সমস্ত দেন, ত আমায় নিতেই হবে, কারণ তিনি আমায় ভালবাসেন। তবে ভয় নেই, এখন যদি তিনি প্রস্তাব করেন যে তোমায় শৈলজাকে বিয়ে কর্‌তে হবে, তাহলে আমি কিছুতেই তা কর্‌ব না। আপনি আপনার মণির জন্য যথেচ্ছা চেষ্টা করুন।”

কার্ত্তিকচন্দ্র আর দাঁড়াইল না, দেওয়ানজীকে প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল। দুর্গাশঙ্কর নীরবে গড়গড়া টানিতে লাগিলেন; কিছুক্ষণ পরে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, “আমি যে বাপ, কি করি!”

১১

প্রবেশিকা পরীক্ষার ফল বাহির হওয়ার কিছুদিন পরে দেখা গেল, কার্ত্তিকচন্দ্র কুড়ি টাকার বৃত্তি পাইয়াছে। সর্ব্বানন্দ পাশ হইয়াছে মাত্র।

এই দুই সংবাদে সকলেই সন্তুষ্ট হইল বটে, কিন্তু কার্ত্তিকচন্দ্র অত্যন্ত দুঃখিত হইল। তাহার পিতা যখন প্রস্তাব করিলেন, সে ঐ স্কলারশিপের টাকায় কলিকাতা বা অন্য কোন স্থলে পড়িতে যাইতে পারে, তখন সে বলিল, "সর্ব্ব-দার কি হবে ?"

পিতা বলিলেন, "যিনি এতকাল ওর খরচ বহন করে আস্‌ছেন, তিনি যদি এখন অস্বীকৃত হন, তাহলে নিরুপায় !"

"তাঁর কাছে এখন এ প্রস্তাব করে কে ?"

"ইতিপূর্ব্বে যে করেছিল, সেই কর্‌বে।"

"কোন কারণবশতঃ আমি আর সে প্রস্তাব কর্‌তে পার্‌ব না।"

"কি কারণ ?"

কার্ত্তিকচন্দ্র কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিল, "আপনার কাছে গোপন করা উচিত নয়। দেওয়ানজীর সঙ্গে আমার পূর্ব্বে যে কথাবার্ত্তা হয়েছিল তা থেকে এখন স্পষ্ট বুঝ্‌তে পেরেছি, কেন বাবু আমায় এত স্নেহের চক্ষে দেখেন। বাবু তাঁর মেয়ের সঙ্গে আমার বিয়ে দেবার ইচ্ছা করেছেন। এখন সেকথা জেনে-শুনে তাঁর উপর জোর-জুলুম আর আমি কর্‌তে পারিনে। যদিও আপনিই এতদিন আমাদের খরচ-পত্র চালিয়েছেন, কিন্তু অন্য জায়গায় পড়্‌বার খরচ চালানো আপনার পক্ষে অসম্ভব। অতএব এ অবস্থায় আমি ত কোন উপায় দেখ্‌তে পাচ্ছি না। এখন জেনে-শুনেও যদি অজ্ঞের ভাব দেখিয়ে আমি তাঁকে গিয়ে বলি যে সর্ব্ব-দার খরচ আপনাকে দিতে হবে, তাহলে সেটা মিথ্যে কথা বলার মতই হবে। এক উপায়, যদি সর্ব্ব-দা গিয়ে বলে। কিন্তু—"

শিবচন্দ্র কহিলেন, "কালিকা বাবু কত লোকের ছেলে-পুলের খরচ-পত্র দিচ্ছেন, সর্ব্বানন্দর মত গরীব ব্রাহ্মণের ছেলের খরচ দিতেও কুণ্ঠিত হবেন না। কিন্তু তোমার সঙ্গে যে তিনি মেয়ের বিয়ে দেবেন, এ সংবাদ

ত আমিও জান্‌তাম না। আমি মনে কর্‌তাম, তিনি যেমন সকলকেই দয়া করেন, তোমাকেও তেমনি। তবে তোমায় যে অত্যন্ত স্নেহ করেন, এটা আমি খুবই জানি! কিন্তু এর মধ্যে যে ঐ রকম ভাব লুকানো ছিল, তা ত কৈ ঘুণাক্ষরেও টের পাইনি। ছি ছি, কি লজ্জা! এখন ত সকলেই মনে কর্‌বে যে, আমি টাকার লোভে ছেলে বিক্রী করেছি। কার্ত্তিক, আর তোমার ইংরিজি লেখাপড়ার প্রয়োজন নেই।"

"আমার লেখা-পড়ায় ত এতদিন কোনরকম আর্থিক সাহায্য বাবু করেন নি, আজও কর্‌তে হবে না, কারণ আমি যা স্কলার্‌শিপ্‌ পেয়েছি, তাতেই আমার চল্‌বে।"

"আর্থিক সাহায্য পাও নি, তাই বা কেমন ক'রে বল্‌ব! হেড মাষ্টার মশায় নিজে তোমায় পড়াতেন। তোমাদের যখন যে বইয়ের দরকার, বাবুর লাইব্রেরী থেকে তখনই তা পেয়েছ। স্কুল-পাঠ্য পুস্তক কিছু লাইব্রেরীতে থাকে না, তবু তোমরা দুজনেই তা পেয়েছ। এখন ত সবাই বুঝ্‌তে পার্‌বে যে, কেন ওখানে তোমার এত প্রতিপত্তি! না, না, কার্ত্তিক তুমি ইংরিজি পড়ার আশা ছেড়ে দাও।"

"আমি না হয় ছেড়ে দিলুম, কিন্তু সর্ব্ব দাদাকে তাহলে গাছে চড়িয়ে মৈ কেড়ে নেওয়া হবে!"

"তার উপায় আমি কি কর্‌ব? সর্ব্বানন্দকে বল, সে নিজে গিয়ে বাবুকে ব'লে-ক'য়ে যা হয় করুক। আমরা আর তার কোন সাহায্য কর্‌তে পার্‌ব না!"

"বাবা, আপনি ব্যস্ত হচ্চেন, কেন? আমাদের কার্য্যোদ্ধার নিয়ে কথা! আমি নিজে বিবাহ না কর্‌লে ত আর তাঁরা জোর ক'রে আমার বিয়ে দিতে পার্‌বেন না।"

"কি! তুমি আমায় এত নীচ মনে কর যে এতদিন এত উপকার

নিয়ে আজ ঐ রকম মিথ্যাচারের দ্বারা তাঁর প্রত্যুপকার কর্‌ব ? এতদিন অজ্ঞানে যা করেছি,—করেছি ; আর তা কিছুতেই পার্‌ব না। তুমি আর পড়্‌তে পাবে না, আমার পৈতৃক যা আছে, তাই নিয়ে তোমায় সন্তুষ্ট থাক্‌তে হবে।"

"বাবা, আপনি এ রকম ব্যস্ত হ'লে আপনার পৈতৃক সম্পত্তিই বা রাখ্‌বেন কি ক'রে ?"

"না পারি, ব্রাহ্মণের ছেলে, ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন কর্‌লে কেউ দোষ দিতে পার্‌বে না। তবু এ কথা ত কেউ বল্‌তে পার্‌বে না যে, হরচন্দ্র সার্ব্বভৌমের সন্তান পুত্র বিক্রয় করেছে।"

"আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, বাবা, আপনার যাতে কোনরকম অসম্মান হয়, তা কর্‌তে দেব না। কিন্তু বিপদকে আগে থেকে ডেকে আনা কোনরকমেই উচিত হবে না। একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, সর্ব্ব-দাদার যদি কোন উপকার কর্‌তে পারি, কর্‌ব কি ?"

"আমাদের উঁচু মাথা নীচু না ক'রে যদি পার, তাহলে কর। কিন্তু সাবধান, কালিকা বাবুর মত উদার-হৃদয় ব্যক্তির সঙ্গে কোনরকম চালাকি কর্‌তে পাবে না। সব কথা স্পষ্ট বলার পরও তিনি যদি তোমার আর সর্ব্বানন্দর উপকার কর্‌তে রাজি হন, তাহলে তা তুমি কর্‌তে পার।"

"বেশ, সেই কথাই স্থির।"

কার্ত্তিকচন্দ্র পিতার নিকট হইতে চলিয়া গিয়া সর্ব্বানন্দকে সকল কথা খুলিয়া বলিল। সর্ব্বানন্দ ম্লান মুখে বলিল, "কাজ কি ভাই, আমার ইংরিজি পড়ায় ? ইংরিজি পড়ে বড় জোর কেরাণী হব। গরিব ব্রাহ্মণের ছেলের ভাগ্যে সেই দাস্য বৃত্তি ছাড়া যখন আর কিছুই জুটবে না, তখন যা দু'দশ বিঘে জমি শিষ্যসেবক আছে, তাই নিয়ে দুঃখে-কষ্টে জীবন কাটানো মন্দ কি !"

কার্ত্তিক কহিল, "তুমি যদি এম্, এ, পাশ কর্‌তে পার, তাহলে প্রোফেসর হতে পার্‌বে, অন্য কোনরকম বড় কাজও মিল্‌তে পারে। সেই জন্যেই বল্‌ছি, তুমি এ সুবিধা ছেড়ো না। চল, গিয়ে বাবুকে সব কথা বলি।"

সর্ব্বানন্দ কহিল, "এতদিন তোমার স্কন্ধে ভর ক'রে চালিয়েছি, আর আমার তা ইচ্ছে নয়।"

কার্ত্তিক কহিল, "কেন ?"

সর্ব্বানন্দ কহিল, "আমি তোমায় সে কথা আর বল্‌তে পার্‌ব না, কার্ত্তিক ! আমায় ক্ষমা কর ভাই, আমায় ছেড়ে দাও। আমার ভাগ্যে যা আছে, তাই হোক।"

কার্ত্তিক কিছুক্ষণ সর্ব্বানন্দর মুখের পানে চাহিয়া রহিল। সর্ব্বানন্দ সহসা অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া বলিল, "কার্ত্তিক, মানুষকে বেশী ভালবাস্‌তে নেই, বেশী বিশ্বাসও কর্‌তে নেই। আমি তোমার কাছে একটা কথা এতদিন গোপন করেছি ব'লে লজ্জায় আমার মরে যেতে ইচ্ছে হচ্ছে। তুমি তোমার অকৃতজ্ঞ বন্ধুকে ত্যাগ কর।"

কার্ত্তিক কহিল, "তোমায় সব কথা খুলে বল্‌তেই হবে। কি হয়েছে বল,—হয়তো আমা হ'তে তোমার উপকার হ'তে পারে।"

"তা জানি, তুমি তা পার ব'লেই তোমায় তা বল্‌ব না। তোমার দ্বারা এ উপকার আমি নেব না।"

"নিতেই হবে, বল, নইলে জান আমাকে ?"

সর্ব্বানন্দ কাতর হইয়া বলিল, "কার্ত্তিক, ভাই, তোর পায়ে পড়ি, তুই আমায় এত ভালবাসিস্ নে, আমি তোর এতখানি ভালবাসার মোটেই উপযুক্ত নই।"

কার্ত্তিক কহিল, "তুমি ভালবাসার উপযুক্ত কি না, সে বিচার আমি

কর্‌ব। এখন তুমি যে আমায় ভালবাস, তার পরিচয় দাও। বল, কি হয়েছে ?”

সর্ব্বানন্দ ছল ছল নেত্রে বলিল, “আমায় যদি মেরে ফেল্‌তে পারিস্‌, তা হ’লে বল্‌তে পারি।”

কার্ত্তিক কহিল, “তাহলে বল্‌বে না ?”

“কিছুতেই না।”

কার্ত্তিক কহিল, “সর্ব্ব-দা, তাহ’লে ব’লে রাখ্‌ছি, আর তুমি আমায় দেখ্‌তে পাবে না। এ জন্মে এই পর্য্যন্ত।”

কার্ত্তিকচন্দ্র চলিয়া যায় দেখিয়া সর্ব্বানন্দ তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল, “কার্ত্তিক, আমায় দয়া কর। তুমি মুখ ফিরিও না। তুমি যদি মুখ ফেরাও, তা হ’লে ভগবান্‌ মুখ ফিরুবেন। দয়া কর, ভাই !”

কার্ত্তিক কহিল, “তুমি কৈ আমায় দয়া কর্‌লে ? তুমি যে দয়া আমায় কর্‌তে পার না, আমিও তোমায় সে দয়া কর্‌তে পারি না।”

সর্ব্বানন্দ সত্যসত্যই কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিল, “কার্ত্তিক, শোন, যদি তোমায় এ কথা বলি, তা হ’লে এই মুহূর্ত্তে তুমি সে কাজ কর্‌তে যাবে। অথচ তাতে ফল হবে এই যে তোমাদেরও ক্ষতি হবে—আর আমার ? ন্যাংটার আবার গাঁটকাটার ভয় ? আমি যে সর্ব্ব সেই সর্ব্বই থাক্‌ব।”

কার্ত্তিক কহিল, “তোমার কোন কথা শুন্‌তে চাইনে। হয় সব কথা খুলে আমায় বল, নয় আমার আশা ত্যাগ কর।”

সর্ব্বানন্দ তখন নিতান্তই নিরুপায় হইয়া কার্ত্তিককে বলিল, “ঐ দরজাটা তাহ’লে বন্ধ ক’রে দাও।” দরজা বন্ধ করিয়া দুই বন্ধুতে যে কথা হইল, তাহাতে কার্ত্তিকচন্দ্র অত্যন্ত বিষন্ন হইয়া গেল। কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া সে বলিল, “যাই হোক, আমিও যা তুমিও তাই। আমি গরীবের

ছেলে, তুমিও গরীবের ছেলে। কালিকাবাবু আমাকে যদি মেয়ে দিতে উদ্যত হ'য়ে থাকেন, তোমাকেই বা তিনি না দিতে পার্‌বেন কেন?"

"তোমাকে যে বাবু কতখানি ভালবাসেন, তা তুমি জান না, তাই এ কথা বল্‌ছ। তার উপর শৈল?"

"শৈল ছেলেমানুষ, ওর কথা ছেড়ে দাও। যার সঙ্গে বিয়ে হবে, তাকেই ওর ভালবাস্‌তে হবে। ওর কথা ধর্ত্তব্যই নয়।"

"কি ভয়ঙ্কর! যার বিয়ে হবে, তার কথাই ধর্ত্তব্য নয়! শৈল আর ছেলে মানুষটি নেই। এখন ওর মুখ-চোখ দিয়ে ওর মনের কথা প্রকাশ হ'য়ে পড়্‌ছে। তুমি অন্ধ, তাই কিছু দেখ্‌তে পাওনি। আমি আজ কতদিন লক্ষ্য ক'রে আসছি, তোমাকে দেখ্‌লে ওর সমস্ত মুখখানির ওপর দিয়ে—"

কার্ত্তিক বাধা দিয়া কহিল, 'থাম, থাম, তুমিও কি মণিশঙ্কর হ'য়ে উঠ্‌লে না কি? কি বল তার ঠিক নেই! আমার মত হোঁৎকারামকে যদি তুমি সাম্‌নে থাক্‌তেও শৈল পছন্দ ক'রে থাকে, তাহ'লে ওর ভাগ্যে অশেষ দুর্গতি আছে। যাক্, তোমার আমার মধ্যে মেঘ কেটে গেল! এই সামান্য কথা তুমি যখন আমায় বল্‌ছিলে না, তখন বুঝ্‌ছি তোমার যথেষ্ট পাপ সঞ্চয় হয়েছে। সেই পাপের শাস্তির জন্য তোমাকে আমার সঙ্গে কলকাতায়, কিম্বা যেখানেই যাই পড়্‌তে যেতে হবে। আর তোমার সঙ্গে যেমন ক'রে পারি, শৈলজার বিয়ে আমি দেওয়াব। এতে যত চালাকি খাটাতে হয়, খাটাব।"

সর্ব্বানন্দ ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, "কি! তুমি নিজের নাম ক'রে টাকা নিয়ে আমার পড়ার সাহায্য কর্‌বে? আর মনে করেছ, সেই টাকা আমি নেব?"

কার্ত্তিক কহিল, "আরে থাম না, তুমি বাবুকে একটুও চেন নি।

আমি না চাইলেও তিনি তোমায় সাহায্য কর্‌বেন। এখনও ত কোন কথা হয়নি। সবই যখন উড়ো-ভাসার ওপর চল্‌ছে, তখন তাই চলুক্ না!"

"না, আর তা হ'তে পারে না। তুমি না চাইলেও তোমারই জন্য তিনি আমায় সাহায্য কর্‌বেন।"

কার্ত্তিক কহিল, "দেখ সর্ব্ব-দা, বাবুর এতখানি অপমান করো না, বল্‌ছি, তাহলে তোমার পাপ হবে। বাবু এতদিন আমার জন্য তোমায় সাহায্য করেন নি, এ তোমায় ব'লে রাখ্‌ছি। তার প্রমাণ চাও, আজ আমার সঙ্গে যেয়ো, দেখ্‌তে পাবে।"

সর্ব্বানন্দ কহিল, "তা যদি প্রমাণ কর্‌তে পার, তা হ'লে তোমার সঙ্গে যেখানে যেতে বল, রাজি আছি।"

কার্ত্তিক কহিল, "যেতে রাজি না হ'লেই বা তোমায় ছাড়্‌ত কে? আমি যা মতলব করেছি, তার জন্য তোমায় সরিয়ে দিতুম্‌ই। আমি আজ পাঁচ মাস আগে দেওয়ানজীর কাছে প্রতিজ্ঞা ক'রে এসেছি, তাঁর মণির জন্য পথ খোলসা ক'রে দেব, সে কথা ত তোমার মনে আছে?"

সর্ব্বানন্দ কহিল, "ছি ছি, কার্ত্তিক, শৈলর সঙ্গে ঐ জানোয়ারটার নাম এক সঙ্গে কর্‌তে তোমার বাধে না?"

কার্ত্তিক কহিল, "আচ্ছা সর্ব্ব-দা, জিজ্ঞাসা করি, মানুষ ত মানুষই! আত্মায় ত সবাই এক! তাহ'লে একজনের নাম কর্‌লেই বা তোমাদের মুখে জল আসে কেন, আর একজনের নামেই বা খড়্গহস্ত হ'য়ে ওঠ কেন? মানুষ মানুষই, অবস্থা শিক্ষা ইত্যাদির গুণে নানা রকম হয়। কে জানে? কে জোর ক'রে বল্‌তে পারে যে আমরাই খুব উচু জীব, আর মণিশঙ্কর খুব নীচু। শ্রীমতী শৈলজাসুন্দরী তাঁর নিজের ত্রিশ হাজার আর তাঁর বাপের দেড় লাখ টাকার সম্পত্তির দরুণই বা এত প্রার্থনীয় বস্তু হ'য়ে

উঠ্‌লেন কেন? আর সর্ব্বানন্দ শর্ম্মার চল্লিশ বিঘে ব্রহ্মোত্তর মাত্র সম্বল হওয়াতে তিনিই বা এত হেয় হলেন কেন? সমস্ত জগতের উপর যদি কারও আধিপত্য থাকে ত সেই রাজরাজেশ্বরের অফুরন্ত ধন-দৌলতের কাছে তোমার মাসিক পাঁচ টাকাই বা কি, আর মহারাজাধিরাজের লাখ লাখ টাকাই বা কি! One divided by infinity'ও যা, আর one million divided by infinity'ও তাই।"

সর্ব্বানন্দ কার্ত্তিকের যুক্তি শুনিয়া হাস্য সংবরণ করিতে পারিল না। তাহাকে হাসিতে দেখিয়া কার্ত্তিক বলিল, "ঐ হাসিটেই হচ্ছে একমাত্র দামী জিনিষ। সংসারের দু'এক টুকরো মাটি, কাঠ, জল-বাতাসের জন্য কামড়া-কামড়ি দেখে যে হাস্‌তে পারে, সেই ঠিক বস্তু লাভ করেছে। অন্য সবাই গড্ডলিকা-প্রবাহের দলে প'ড়ে ভেসে যাক্, আর আমরা দুজনে কেবল হাসি এস।"

১২

সন্ধ্যার সময় লাইব্রেরীর সম্মুখস্থ উদ্যানে একটা বেদীর উপর বসিয়া কালিকাবাবু তাম্রকূট সেবন করিতেছিলেন। এমন সময় কার্ত্তিক ও সর্ব্বানন্দ আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইল। কালিকাবাবু হাসিয়া বলিলেন, "আমি আগেই সংবাদ পেয়েছি। কিন্তু দুপুর বেলায় তোমরা আসনি কেন?"

কার্ত্তিক কহিল, "বাবার সঙ্গে একটা পরামর্শে আমরা ব্যস্ত ছিলুম, তাই আস্‌তে পারি নি।"

কালিকাবাবু কহিলেন, "তাঁর সঙ্গে আমারও যে একটা কথা আছে—তিনি এখনও আস্‌ছেন না কেন? ওরে রামচরণ, বিষণকে ডাক্ ত।"

কার্ত্তিক কহিল, "বাবা আস্‌বার আগে আমাদের দুটো কথা আছে—"

কালিকাবাবু কহিলেন, "তাই না কি? বসো, বসো, ঐ বেঞ্চে বসো।"

কার্ত্তিক আসন গ্রহণ করিয়া বলিল, "আমার কথা এই যে আমার কলেজে পড়্‌তে যাওয়ায় একটু গোলমাল উপস্থিত হয়েছে। কি গোলমাল, বাবা তা নিজে বল্‌বেন। সেই গোলমালের দরুণ হয়তো আমার ইংরিজি পড়া আর নাও হ'তে পারে। কিন্তু—সর্ব্বদা তাহ'লে কি কর্‌বে?"

কালিকাবাবু বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "তুমি কুড়ি টাকা স্কলারশিপ্ পেয়েছ, তবু তোমার পড়ার গোলমাল হবে? আশ্চর্য্য! তোমার বাবাকে আবার নতুন ক'রে সেই সব পুরোনো কথা বোঝাতে হবে না কি?"

কার্ত্তিক কহিল, "কোন একটা নতুন কারণ ঘটায় তিনি আমাকে আর ইংরিজি পড়াতে অনিচ্ছুক। কি কারণ তিনিই তা বল্‌বেন। এখন সর্ব্ব-দা'র কি হবে, তাই জান্‌তে চাচ্ছি।"

কালিকাবাবু কহিলেন, "ওর যদি সে রকম কোন কারণ না ঘ'টে থাকে, তাহ'লে ওর পড়াশোনার কোন রকম বাধা ত দেখ্‌তে পাচ্ছি না। এতদিন ওর খরচ দিতে যদি এ এষ্টেটের না আট্‌কে থাকে, তাহ'লে এখনও আট্‌কাবে না। তোমার বাপ যদি তোমার মঙ্গল না চান, তা ব'লে সর্ব্বানন্দ কেন নিজের ভবিষ্যৎ নষ্ট কর্‌বে? সর্ব্বানন্দ, তুমি কি বল্‌তে চাও?"

সর্ব্বানন্দ কহিল, "আজ্ঞে, আমার আর কিছুই বক্তব্য নেই, তবে কার্ত্তিক জোর ক'রে আমায় ইংরিজি পড়া ধরিয়েছে। এখন ওই যদি ছেড়ে দেয়, তাহ'লে আমারই বা এত প্রয়োজন কি! আমি যে বরাবর সমস্ত একজামিনই পাশ কর্‌তে পার্‌ব, তারও কিছু ঠিক নেই।"

কালিকাবাবু কহিলেন, "তাই ব'লে কেউ চুপ ক'রে থাক্‌তে পারে না। যখন তোমার এতখানি সুবিধে ক'রে দিতে আমরা সম্মত হচ্চি, তখন তুমিই বা সে সুবিধে ছেড়ে দেবে কেন? হয় ত যদি ভাল ক'রে বরাবর পাশ ক'রে যেতে পার, তা হ'লে পরে গভর্ণমেণ্ট সার্ভিশে কোন ভাল পোষ্ট পাওয়াও তোমার পক্ষে কঠিন না হ'তে পারে।"

সর্ব্বানন্দ কহিল, "কিন্তু কার্ত্তিক যদি যেতে না চায়—"

কালিকাবাবু কহিলেন, "বাপু, অতখানি সেণ্টিমেণ্টাল্ হ'লে সংসার চলে না। আমি মান্‌লাম, তোমাদের দুটিতে খুব ভাব। তাই ব'লে একজন যদি নিজের ভাল-মন্দ না বোঝে, তাই ব'লে যে অপরকেও বিবেচনা-শক্তি ত্যাগ কর্‌তে হবে, এর কোন অর্থ নেই। তোমার যদি আর কোন আপত্তি না থাকে, তা হ'লে প্রস্তুত হওগে। তোমার যা কিছু খরচ-পত্র হবে, আমি তা বহন কর্‌ব। কার্ত্তিক, তোমার আর কিছু বল্‌বার আছে?"

কার্ত্তিক কহিল, "আর যা আছে, তা বাবাই বল্‌বেন। তবে আমার কিন্তু সর্ব্ব-দা'র সঙ্গ ছাড়্‌তে ইচ্ছে হচ্ছে না। আপনি বাবাকে বুঝিয়ে যদি রাজি করাতে পারেন, তা হ'লে আমিও যাব।"

কালিকাবাবু কহিলেন, "বাবা কার্ত্তিক, তোমার কিসে ভাল হবে, সে কি আমি বুঝিনে? তুমি জান না—"

কার্ত্তিক কহিল, "আপনার পায়ে পড়ি, আপনি আমার ওপর রাগ কর্ব্বেন না। আপনার দয়া যদি আমি এ জীবনে ভুলি, তাহ'লে আমার সমস্ত জীবনই একটা অভিশাপ ব'লে জ্ঞান কর্‌ব। যেন চিরদিন আপনার আশীর্ব্বাদের উপযুক্ত থাক্‌তে পারি, আমায় এই আশীর্ব্বাদ কর্‌বেন।"

কালিকাবাবু কহিলেন, "আমার ভালবাসাটা সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ নয়, পরে জান্‌তে পার্‌বে। এখন যাও, তোমার বাবাকে পাঠিয়ে দাওগে।"

কার্ত্তিক কহিল, "আমরা গিয়ে তাঁকে পাঠিয়ে দিচ্ছি।"

কার্ত্তিক ও সর্ব্বানন্দ তাঁহাকে প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল এবং কিছুক্ষণ পরে শিবচন্দ্র ন্যায়রত্ন আসিয়া তাহাদের স্থান অধিকার করিলেন। কালিকাবাবু জ্যোৎস্নাবিধৌত একটী কামিনী বৃক্ষের দিকে চাহিয়াছিলেন। তাঁহাকে অন্যমনস্ক দেখিয়া ন্যায়রত্ন মহাশয় বলিলেন, "আপনি আমায় ডেকেছিলেন?"

কালিকাবাবু চমকিত হইয়া বলিলেন, "এই যে আপনি এসেছেন। আজ এত দেরী হ'ল যে?"

শিবচন্দ্র কহিলেন, "কার্ত্তিক আমাকে বলেছিল, আজ একটু পরে যাবেন, আমার একটা কথা আছে, বাবুর সঙ্গে; তাই সে চ'লে গেলে, আস্‌ছি।"

কালিকাবাবু কহিলেন, "আপনি না কি কার্ত্তিককে আর পড়াশুনা কর্‌তে দেবেন না?"

শিবচন্দ্র কহিলেন, "পড়াশুনা কর্‌তে দেব না, এ কথা বলিনি; তবে অন্য কোথাও গিয়ে ওর পড়াশুনার আর প্রয়োজন নেই।"

কালিকাবাবু কহিলেন, "কেন এ-রকম ইচ্ছা হ'ল?"

শিবচন্দ্র কিছুক্ষণ নীরবে চিন্তা করিলেন; তারপর পদতলস্থ চটী জুতার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া বলিলেন, "আজ এমন একটা কথা শুনেছি, যাতে আপনার দয়ার ওপর নির্ভর ক'রে তাকে বিদেশে বিদ্যার্জ্জনের জন্য পাঠাতে আমার ইচ্ছা চ'লে গিয়েছে।"

কালিকাবাবু কহিলেন, "কি কথা আর কার কাছেই বা তা শুন্‌লেন, শুনি।"

শিবচন্দ্র কহিলেন, "কথাটা শুনেছি, কার্ত্তিকের কাছে, তবে সে কার কাছে শুনেছে, সে কথা বল্‌তে পার্‌ব না। কারণ তাতে সে ব্যক্তির

হয়ত অনিষ্ট হ'তে পারে। তবে কি কথা, তা যদি শুনতে চান ত বলতে পারি। কিন্তু পরের মুখে শোনা কথা, আপনাকে বলতে সঙ্কোচ বোধ হচ্ছে।"

কালিকাবাবু কহিলেন, "সঙ্কোচ বোধ হয় ত' ব'লে কাজ নেই, কিন্তু আমার বক্তব্য যা আছে, তা ব'লে নি। কার্ত্তিকের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আপনি যতখানি চিন্তিত, আমাকেও ততখানি জানবেন।"

শিবচন্দ্র কহিলেন, "আজ্ঞে, সে কথা অবিশ্বাস করবার তাহ'লে আর কিছুমাত্র কারণ নেই। আপনি যে কার্ত্তিককে নিজের সন্তানের মত দেখেন এ কথা আপনার অতি-বড় শত্রুতেও বলবে। কিন্তু যদি বুঝতে পারি যে একমাত্র স্নেহ হ'তেই আমি যে কথা শুনেছি, সেই কথা উঠেছে, তাহ'লে সমস্ত দ্বিধা ত্যাগ ক'রে কালই আমি কার্ত্তিককে কলেজে পড়তে পাঠিয়ে দেব।"

কালিকাবাবু ক্ষুব্ধভাবে বলিলেন, "আর যদি এই অতিস্নেহের অন্য কোন গূঢ় কারণ থাকে, তাহ'লে আপনি ওকে আমার কাছ থেকে কেড়ে নেবেন? আপনার ছেলেকে যদি কেউ একটু বেশী ভালবাসে, —তা সে ভালবাসা যে কারণেই হোক—সেটা আপনার কাছে মস্ত অপরাধ ব'লে গণ্য হবে?"

শিবচন্দ্র ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, "আপনি যদি এতখানি ক্ষুণ্ণ হন, তা হ'লে এ বিষয়ে আলোচনা ত্যাগ করতে বাধ্য হব, কারণ আপনার দয়ার উপর, স্নেহের উপর, নির্ভয় ক'রেই আমাদের এখানে বাস করা। আপনি দুঃখিত হ'লে আমাদের—"

কালিকাবাবু কহিলেন, "আপনি ব্যস্ত হবেন না। ক্ষুণ্ণই হই, আর রাগই করি, আমাদের পূর্ব্বপুরুষের কীর্ত্তি লোপ ক'রে আপনার মত ব্যক্তিকে পরিত্যাগ করব, এতখানি নীচ আমি নই। তবে কার্ত্তিককে

আমার বিশেষ প্রয়োজন আছে, ন্যায়রত্ন মশায়। বহুদিনের একটা আশা তিলে তিলে সঞ্চিত হ'য়ে এখন পর্ব্বতাকার ধারণ করেছে। এখন যদি আপনি নিষ্ঠুরের মত সে আশাকে ধূলিসাৎ করেন তাহ'লে সে দুঃখ রাখ্‌বার আমার আর স্থান থাক্‌বে না। ন্যায়রত্ন মশায়, এত দিন একথা প্রকাশ ক'রে বলিনি, তার কারণ, কি জানি, যদি এ সংবাদ শুনে কার্ত্তিকের কোন অনিষ্ট হয় বা আপনি প্রথমেই তাতে বাধা দেন। আপনার মধ্যে যে একটা ব্রাহ্মণোচিত গর্ব্বিত ভাব আছে, তার প্রমাণ আমি বহুদিন পূর্ব্বেই পেয়েছিলাম, সেইজন্যই সাহস ক'রে এ বিষয়ে কোন কথা বল্‌তে পারিনি। আমার চিরকালের ইচ্ছা যে যদি কার্ত্তিককে নাও পাই, তবুও তাকে বড় হ'তে মহৎ হ'তে আমি সাহায্য করব। কিন্তু সেই সঙ্গে আমার যে আশা ছিল, সেটাও তত বড় হ'য়ে উঠে এখন আমার সমস্ত কায়মনোবাক্যের একমাত্র চেষ্টা হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। আপনি যদি আমার সে বাসনা পূর্ণ না করেন, তাহ'লে—"

শিবচন্দ্র কহিলেন, "কি বাসনা, স্পষ্ট খুলে বলুন! কার্ত্তিককে আপনার কি প্রয়োজন!"

কালিকাবাবু কহিলেন, "এ জীবনের শেষ বাসনা পূর্ণ করব, আমার শৈলজাকে তার হাতে সমর্পণ ক'রে নিশ্চিন্ত হব। ন্যায়রত্ন মশায়, আমায় আপনি দয়া করুন, এ ইচ্ছায় বাধা দেবেন না। তবে আপনাকে প্রতিজ্ঞা ক'রে বল্‌ছি যে কার্ত্তিককে সর্ব্ব বিষয়ে স্বাধীন ক'রে দিয়ে, শৈলজা আর তার মধ্যে যেন কোন রকম অসাম্য না থাকে, তাই ক'রে দিয়ে তবে আমার কাজ শেষ হবে।"

শিবচন্দ্র কহিলেন, "বুঝ্‌তে পার্‌লাম না, শৈলজার যাই করুন, তবু সে আপনার কন্যাই থাক্‌বে, আর কার্ত্তিকের যাই করুন, তবু সে দরিদ্র ব্রাহ্মণের ছেলেই থাক্‌বে। তাকে যদি আপনার সমস্ত সম্পত্তির উপর

বসিয়ে দেন, তবু সে জান্‌বে যে সে সমস্তই তার পাওয়া জিনিষ, এবং সে পরের গচ্ছিত সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়ক মাত্র। যেমনই করুন, আপনার শৈলজার সঙ্গে আমার পুত্রের যে আন্তরিক প্রভেদ, চিরদিন তা থেকেই যাবে। এমন স্থলে বিবাহ দিলে বিবাহের যা ফল তা মিল্‌বে কি না সন্দেহ। সেই জন্যই জিজ্ঞাসা কর্‌ছি, আপনি কি সাহসে এক ভিখারীর সন্তানের সঙ্গে আপনার কন্যার বিবাহ দিতে সাহস কর্‌ছেন? আমার কি সাধ্য যে আপনার মত ধনী ব্যক্তির সঙ্গে সমানভাবে কুটুম্বিতা রক্ষা ক'রে চলি!"

কালিকাবাবু কহিলেন, "একমাত্র টাকাতেই যে মানুষ বড় হয়, এ কথা আপনার মুখে শুনে আশ্চর্য্য হচ্চি। আপনাকে যদি আমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ না মনে কর্‌ব, তাহ'লে আপনার সঙ্গে কুটুম্বিতা স্থাপনের জন্য এত ব্যস্ত হব কেন? আমার শৈলজার ত' সম্বন্ধের অভাব ছিল না, বড় বড় লোকের বাড়ী থেকেও সম্বন্ধ এসেছে, আর আমি ইচ্ছা কর্‌লে যে কোন দরিদ্র সৎকুলীনের সন্তানকে এনে ঘরজামাই ক'রে রাখ্‌তে পারি। ও দুটোর একটা ইচ্ছেও আমার নেই। আমি চাই ব্রাহ্মণের সন্তান, আমি চাই যার আত্মসম্মান-জ্ঞান আছে, সেইরকম মানুষ, পুরোপুরি মানুষ। কলের পুতুল বা খেঁকী কুকুরের যদি দরকার হ'ত তাহ'লে তা এত দুর্লভ হ'ত না। আপনার পুত্র ব'লেই কার্ত্তিক দুর্লভ, আপনার পুত্র ব'লেই কার্ত্তিকের মানুষ হবার আশা আছে, তাই ওকে এমন ক'রে আপনার কাছ থেকে চেয়ে নিতে হচ্চে।"

শিবচন্দ্র কহিলেন, "কিন্তু সকলেই ত' বল্‌বে যে আমি পুত্র বিক্রয় করেছি। যতই কেন আপনি করুন না, লোক-নিন্দার মুখ থেকে আমার নিস্তার নেই। এমন অবস্থায় কি ক'রে আমি সম্মতি দেব?"

কালিকাবাবু কহিলেন, "সামান্য একটু লোক-নিন্দার ভয়ে আপনি এক নিরীহ ব্রাহ্মণ-কন্যার সৎপাত্রলাভে বাধা দেবেন? ভুলে যান যে সে ধনীর সন্তান; মনে করুন, সে কেবল এক নির্দ্দোষ ব্রাহ্মণ-কন্যা। মনে করুন, তার বাপ আপনার হাত চেপে ধ'রে বল্ছে, "মশায়, আমার কুল রক্ষা করুন, আমার কন্যার বিনিময়ে আপনার পুত্রটীকে দান করুন।" তারপর বলুন, আপনি কি কর্বেন? এর পরও যদি আপনি চান যে আমি সকলের সম্মুখে দাঁড়িয়ে বলি, আপনার কাছ থেকে জোড়হাতে এই কার্ত্তিককে আমি ভিক্ষা ক'রে নিয়েছি, তাতেও আমি প্রস্তুত!"

শিবচন্দ্র ন্যায়রত্ন স্তব্ধ হইয়া গেলেন। এতখানি বিনয়ের সম্মুখে তাঁহার সমস্ত গর্ব্ব ধূলিসাৎ হইয়া গেল। তিনি অন্য কিছু করিতে না পারিয়া নত নেত্রে হস্তের তলদেশ খুঁটিতে লাগিলেন। কালিকাবাবু সহসা নিকটে আসিয়া তাঁহার হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন, "বন্ধু, আপনি আমার বয়োজ্যেষ্ঠ, বলুন, আমায় কি কর্তে হবে, কি কর্লে আপনার মন পাব?"

শিবচন্দ্রের মস্তক হইতে তর্ক-যুক্তি, ন্যায়, সাংখ্য, পাতঞ্জল, বেদান্তাদি সমস্তই এক নিমেষে উড়িয়া গেল। তাঁহার যত গর্ব্ব যত অহঙ্কার যত ব্রাহ্মণত্ব ছিল, সমস্তই 'বাসাংসি জীর্ণানি'র ন্যায় খসিয়া পড়িয়া গেল। তিনি দেখিলেন, কালিকাবাবুও মানুষ, তিনিও মানুষ—উভয়ের মধ্যে কোন ভেদ নাই। তিনি উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, "কালিকাবাবু, আপনারই জয়! আমি আর তর্ক কর্ব না। আপনাকে আর কিছু কর্তে হবে না। কিন্তু এ সংবাদ উভয়ের মধ্যেই আবদ্ধ থাক্। এখন কর্ণান্তর করার প্রয়োজন নেই।"

কালিকাবাবু কহিলেন, "বৈবাহিক, আপনাকে নমস্কার! এই সন্ধ্যার আকাশের নীচে বসে ঐ চন্দ্র আর তারাদের সাক্ষী রেখে আমাদের

কথাবার্ত্তা স্থির ক'রে নিলাম। আপনার কার্ত্তিককে যখন উপযুক্ত বিবেচনা করবেন, তখনই অনুমতি দেবেন, আমি বিবাহের উদ্যোগ করব। কিন্তু মনে থাকে যেন আমার কন্যা বাগ্‌দত্তা হ'য়ে রৈল, এর এখন অন্য পাত্রে সম্প্রদান অসম্ভব।"

শিবচন্দ্র কহিলেন, "ভয় নেই, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।"

শিবচন্দ্র গৃহে ফিরিয়া কার্ত্তিকচন্দ্রকে বলিলেন, "তোমার কলেজে পড়্‌তে যাওয়াই সাব্যস্ত হ'ল।"

কার্ত্তিকচন্দ্র মনে মনে হাসিল ; প্রকাশ্যে বলিল, "তাহ'লে একটা ভাল দিন দেখে দিন্, আমি গিয়ে মাকে খবর দি।"

যাত্রার দিন সর্ব্বানন্দকে কিন্তু অত্যন্ত বিষণ্ণ মুখে লুকাইয়া বেড়াইতে দেখিয়া কার্ত্তিকচন্দ্র হাসিয়া বলিল, "সে হচ্চে না, সর্ব্ব-দা, সিন্নি খেতে এগিয়ে এখন কোঁৎকা দেখে পেছুলে চল্‌বে না। আমি যা মনে করেছি, তা করবই।"

সর্ব্বানন্দ কহিল, "নিজের বুদ্ধিকে বা ইচ্ছাকে বাড়িয়ে দেখা তোমার ক্রমশঃ একটা রোগ হ'য়ে দাঁড়াচ্ছে। সাবধান, হয়ত এই কারণেই তোমার সমস্ত মহত্ত্ব ধূলিসাৎ হ'য়ে যাবে।"

কার্ত্তিক কহিল, "সে ভয় নেই, কারণ শেষ পর্য্যন্ত তুমি আছ। নিতান্তই যদি পড়ি, তুমি আমায় টেনে তুল্‌বে। কিন্তু তুমি যে মনে করেছ, আমার plan of operationএ বাধা দেবে, তা হচ্ছে না। আমি সমস্ত কাজের ভার নিজের উপর নিয়েছি, কারও মুখাপেক্ষী হ'য়ে কাজ করব, তেমন লোক আমি নই। এ বিয়ে আমি দেওয়াবই, তাতে যা হয় হবে। তুমি আমার ওপর নির্ভর কর।"

সর্ব্বানন্দ কহিল, "তোমার কাছেও যেমন "সর্ব্বমাত্মবশং সুখং", আর কারও কাছে যে তা নয়, তা তুমি কেন মনে করছ? আমিও প্রতিজ্ঞা

কর্‌ছি যে যদি বুঝি, শৈলজা আমায় চায় না, তাহলে স্বয়ং ভগবান্ এলেও এ বিয়েতে কেউ আমায় সম্মত করাতে পার্‌বে না।"

কার্ত্তিক কহিল, "আমি পার্‌ব।"

সর্ব্বানন্দ কহিল, "কেন?"

"কারণ! কারণ, আমি তোমায় ভালবাসি।"

সর্ব্বানন্দ কহিল, "মিথ্যে কথা! এর কারণ আমি বল্‌ব,—শুন্‌বে? এর কারণ, তুমি নিজেকে সব-চাইতে ভালবাস। তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কথার বিরুদ্ধে কিছু হবে, এ তোমার সহ্য হয় না! আমার সঙ্গে শৈলর বিয়ে দিতে যখন তোমার ইচ্ছে হয়েছে, তখন সে ইচ্ছের সুমুখে তুমি আর কারও ইচ্ছেকে দাঁড়াতে দিতে চাও না! তোমার সূক্ষ্ম অথচ প্রচণ্ড গর্ব্বই তোমার সব। সাবধান, কার্ত্তিক, পতনের এই হ'ল প্রথম সোপান।"

কার্ত্তিক কহিল, "এঃ, সমস্ত সৎকার্য্যই দেখ্‌ছি বিরোধের মধ্য দিয়েই ঘ'টে থাকে। আমার জীবনের প্রথম সৎকাজের দেখ্‌ছি প্রথম থেকে তুমিই বিরোধী হ'য়ে দাঁড়ালে। তা হওগে, কিন্তু এতদিন পর্য্যন্ত যখন আমায় কোন কাজেই হারাতে পারনি, তখন এ কাজেও পার্‌বে না—এ'ও ব'লে রাখ্‌লুম, দেখে নিয়ো।"

বৈকালে দুইখানি গো-শকট সজ্জিত হইয়া আসিল এবং সর্ব্বানন্দ ও কার্ত্তিক টোলের সকলের নিকট হইতে বিদায় লইয়া জমিদার-গৃহাভিমুখে চলিয়া গেল। সেখানে সকলের নিকট হইতে বিদায় লইয়া দুইজনে যেমন বাহিরে আসিবে, অমনি দেখিল, লাইব্রেরীর দ্বিতল কক্ষের গবাক্ষে শৈলজা দাঁড়াইয়া আছে। যুগপৎ উভয় বন্ধুর দৃষ্টিই শৈলজার উপর পতিত হওয়াতেই হউক বা যে কারণেই হউক শৈলজা গবাক্ষ হইতে সরিয়া গেল। কার্ত্তিকচন্দ্র তাড়াতাড়ি সর্ব্বানন্দর হাত ধরিয়া টানিয়া

বলিল, "সকলেরই সঙ্গে দেখা করলুম, শৈল কেন বাকি থাকে। ওর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আসি, চল।"

সর্ব্বানন্দ ক্রুদ্ধ স্বরে বলিল, "তুমি অতি পাষণ্ড!"

কার্ত্তিক বলিল, "যে আজ্ঞে, আপনি না যান্, আমার ত যেতে বাধা নেই! আমি চল্লুম।"

সর্ব্বানন্দ কোন কথা না বলিয়া গো-শকটে গিয়া উঠিল। কার্ত্তিক-চন্দ্র লম্ফে লম্ফে সোপান অতিক্রম করিয়া এক নিমেষে শৈলজার নিকটে গিয়া বলিল, "শৈল, আমরা যাচ্ছি। বোধ হয় দু'এক বছর আস্তে পারব না। সবাই কত উপদেশ দিলে, তুমি কিছু বল্বে না?"

শৈল ধীরে ধীরে তাহার পায়ের গোড়ায় একটা প্রণাম করিয়া একটু যেন ম্লান মুখে বলিল, "আমি আর কি বল্ব?"

কার্ত্তিক কহিল, "কিছু না? একটা কথাও বল্বার নেই? সর্ব্ব-দাও আস্তে পার্বে কি না, ঠিক নেই, ওকেও কিছু বল্বার নেই?"

শৈলজা লজ্জিত হইয়া বলিল, "ওঁকে আমার প্রণাম দিয়ো!"

কার্ত্তিক কহিল, "তুমি এই ক'বছরের মধ্যে বড্ড বুড়ো হ'য়ে পড়েছ, দেখ্ছি। এত দিনের জন্য আমরা যাচ্ছি, আর একটা কথাও আমাদের জন্য জুগিয়ে রাখনি? ছিঃ! যদি তোমার আপন ভাই এমনি ক'রে দূরদেশে চ'লে যেত, তাহ'লে কি তুমি তাকে একটা কথাও বল্তে না, শৈল?"

শৈল সহসা কাঁদিয়া ফেলিল এবং একবার ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে কার্ত্তিকের পানে চাহিয়া ছুটিয়া সে স্থান হইতে পলাইয়া গেল। কার্ত্তিকচন্দ্র সে দৃষ্টির কোনরূপ ব্যাখ্যা করিতে না পারিয়া অগত্যা হাসিতে হাসিতে আসিয়া সর্ব্বানন্দর অনুসরণ করিল।

দ্বিতীয় খণ্ড

১

"বৈরাগ্যমেবাভয়ং"—সনাতন ভারতবর্ষের এই সনাতন উক্তির সনাতন সার্থকতা দেখাইবার জন্য মণিশঙ্কর পশ্চিমে নানা স্থানে ঘুরিয়া অবশেষে যখন আবার তাহার জন্মভূমিতে ফিরিয়া আসিল, তখন সে একজন প্রবল প্রাণায়ামী পরিব্রাজক পরমহংস। যদিও পরিব্রাজক ধর্ম্মের প্রচলিত রীতি-অনুসারে দ্বাদশ বর্ষের শেষভাগে একবার জন্মভূমিতে দেখা দিতে হয়, তথাপি 'তেজীয়সাং ন দোষায়' শাস্ত্রের এই বচনানুসারে পরিব্রাজকাচার্য্য শঙ্করানন্দ স্বামীজি ওরফে মণিশঙ্কর তাঁহার অজ্ঞাত-বাসের দুই বৎসর অতীত হইতে না হইতেই শিবরামপুরে আপনার পূর্ব্ব পীঠস্থান পোড়া বাঙ্গলায় আসিয়া অধিষ্ঠিত হইলেন। তিনি সংসারাশ্রম ত্যাগ করিয়াছিলেন বলিয়া গৃহে প্রবেশ করিলেন না এবং সেই কারণেই তাঁহার পুণ্যনাম অচিরে দিকে দিকে প্রচারিত হইয়া পড়িল। গ্রামের বৃদ্ধগণ বলিলেন, "মানুষ কি আর চিরদিন এক-রকমই থাকে? সুবাতাস বহিলে সকলেরই পরিবর্ত্তন হয়। আহা, মণের আমাদের কি সুন্দর পরিবর্ত্তনই হইয়াছে! হইবে না কেন? সনাতন ধর্ম্ম!"

সনাতন ধর্ম্মের এই অপূর্ব্ব সন্তানটির কীর্ত্তি-কলাপের কথা ইতিমধ্যে সুপ্রচারিত হওয়ায় সে সংবাদ যথারীতি জমিদারী অন্তঃপুরেও প্রবেশ লাভ করিয়াছিল। গ্রামস্থ অন্যান্য ভদ্র পুরাঙ্গনাগণ যেমন সাধু দর্শনার্থ মাঝে মাঝে পোড়া বাঙ্গলায় যাতায়াত আরম্ভ করিয়াছিলেন, কালিকাবাবুর পুরমহিলাগণের মধ্যেও সেইরূপ করিবার একটা কথাবার্ত্তা জল্পনা-কল্পনা

চলিতেছিল। নবীন স্বামীজিটির যশের অন্যান্য নানাবিধ কারণের মধ্যে একটি কারণ ইহাই ছিল যে, তিনি নাকি শান্তি-স্বস্ত্যয়নাদিতে সিদ্ধহস্ত এবং নাস্তিপুরের রাজকন্যার দুই চারি বৎসরের মূর্চ্ছারোগ তিনি নাকি তিন দিনের স্বস্ত্যয়নে আরাম করিয়াছেন! সর্ব্বোপরি তিনি সামুদ্রিক বিদ্যায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া আসিয়াছেন।

যদি কোন হতভাগ্য ব্যক্তি সন্দেহ প্রকাশ করিয়া বলিত, দুই-এক বৎসরের মধ্যে মণিশঙ্কর এত শিখিল কি করিয়া? তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ সে স্বামীজির নবীন ভক্তগণের দ্বারা তিরস্কৃত হইত। কেহ বলিত, "দৈবশক্তির দ্বারা কি না হয়?" যাঁহারা অধিকতর বুদ্ধিমান্, তাঁহারা বলিতেন, "কেমন করিয়া হইল, সে প্রশ্নের কি প্রয়োজন? গণনার ফলই স্বামী শঙ্করানন্দের অমানুষিক ক্ষমতার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। স্বামীজির এমনি অদ্ভুত ক্ষমতা যে তিনি হাত দেখিয়া বলিয়া দিতে পারেন, কোন্ ব্যক্তির গৃহ কোন্ দুয়ারী এবং সেই গৃহের ঈশান কিম্বা নৈর্ঋৎ কোণে কোনও বৃক্ষাদি আছে কি না। এমন কি সদর রাস্তা সেই গৃহের কোন্ দিকে, তাহাও অধিকাংশ সময় মিলিয়া যায়। তবে যদি কখনও তাঁহার ভুল হয়, সে ভুল ব্যস্ততা-প্রযুক্তই ঘটিয়া থাকে, কারণ স্বামীজির নিকট লোক-সমাগমের বিরাম নাই।"

স্বামীজির গণনা-শক্তির একটা উদাহরণ দেওয়া যাক্। নিকটস্থ গ্রাম হইতে এক বৃদ্ধ গোপজাতীয় ব্যক্তি স্বামীজির নিকট আপনার ভাগ্য-গণনার জন্য উপস্থিত হইল, এবং সাড়ম্বরে একটি রজত মুদ্রা পরমহংসের পদতলে রাখিয়া প্রণাম করিল। পরিব্রাজকাচার্য্য তৎক্ষণাৎ বৃশ্চিক-দষ্ট ব্যক্তির ন্যায় উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, "কি ভয়ঙ্কর! এ লোকটি, দেখছি, ঘোর বিষয়ী! সন্ন্যাসী যোগীর কাছে এসেও টাকার কথা ভুল্‌তে পারেনি! টাকা-কড়ির চেষ্টায় আমার কাছে কেন, বাপু?" বৃদ্ধ

গোয়ালাটি বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "এ কি মানুষ! আমার মনের কথা আস্‌তে মাত্র ধরেছে! বাবাঠাকুর, আমি বড় গরীব, আমায় দয়া কর—হাতটি দেখ।"

মণিশঙ্কর কহিল, "হাত দেখাতে এসেছিস্ ত টাকা এনেছিস্ কেন?"

ভক্তগণের মধ্যে একজন তখন ব্যস্ত হইয়া বলিল, "ওহে বাপু, উনি কামিনী-কাঞ্চনত্যাগী; ওঁকে কি টাকার লোভ দেখাতে আছে? টাকাটা তুলে নাও, দেখ্‌ছ না, উনি টাকার জন্য বস্‌তে পাচ্ছেন না!"

বৃদ্ধ তাড়াতাড়ি টাকাটা উঠাইয়া লইয়া বলিল, "বাবাঠাকুর, আমি গরীব, আমার কপালে কি যে লিখেছে বিধেতা, তা জানিনে! আমার চার-চারটে গরু মরে গেল। দেখ দেখি বাবাঠাকুর, আর কতদিন এমনি চল্‌বে?"

শঙ্করানন্দ স্বামী আসন পরিগ্রহ করিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিলেন, তারপর হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন, "ওরে, তোদের গ্রামে চামার আছে?"

বৃদ্ধ সবিস্ময়ে বলিল, "আজ্ঞে, আছে বই কি!" স্বামীজি পুনরায় চক্ষু মুদ্রিত করিয়া বলিলেন, "তাদের মধ্যে বেঁটে মোটা কালো রংয়ের যে, সে-ই তোর শত্রু, সে-ই তোর গরুদের বিষ দিয়ে মার্‌ছে। তাকে বিশ্বাস করিস্‌নে।"

বৃদ্ধ চমকিত হইয়া বলিল, "এ্যাঁ, হারাণে! হারাণে বেটার এই কাজ! ভাগ্যে বাবাঠাকুর তোমার কাছে এয়েছিলুম! দাঁড়া বেটা, তোর চামারগিরি বা'র কর্‌ছি!"

বৃদ্ধ আরও দুই-চারিটী প্রশ্নের সঠিক উত্তর গ্রহণ করিয়া প্রস্থান করিল। তৎপরে এই সংবাদ নানা শাখা-প্রশাখায় বিস্তার লাভ করিয়া সারা গ্রামময় রাষ্ট হইতে বাকী রহিল না।

তবে যেমন সকল মহৎ ব্যক্তিরই শত্রু থাকে, তেমনি স্বামীজিরও

দুই-একজন শত্রু জুটিয়াছিল। গ্রাম্য বিদ্যালয়ের দুই-একটী ত্রিপণ্ড্র ছাত্র স্বামীজির বৈরাগ্যমেবাভয়ং এই সূত্রের অদ্ভুত ব্যাখ্যাও বাহির করিয়াছিল। তাহারা বলিত, শঙ্করানন্দ পরমহংস নন, পরম বক; এবং বৈরাগীর বেশ তাঁহার ভণ্ডামির আশ্রয়, তাই বৈরাগ্যই তাঁহার পক্ষে অভয়। অবশ্য এ ব্যাখ্যার জন্য তাহারা গুরুজনের নিকট যথারীতি শাস্তি পাইত বটে, তবুও তাহারা এ কথা বলিতে ছাড়িত না।

তাঁহার সম্বন্ধে এইরকম একটু-আধটু সন্দেহজনক জনরব প্রচারিত হইবার কারণও ছিল। স্বামীজি প্রতিরাত্রে পূজায় বসিয়া বীরাচার-মতে দুই-এক বোতল কারণ-সলিল বা সুধাপান করিতেন এবং ভক্তির আবেগে মধ্যরাত্রের স্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া রাসভনিন্দিত স্বরে যখন গান ধরিতেন,

"সুরাপান করিনে আমি সুধা খাই
জয় কালী ব'লে,
আমার মন-মাতালে মেতেছে আজ
যত মদ-মাতালে মাতাল বলে।"

তখন পথিকের চিত্তে ভক্তি-মোহের পরিবর্ত্তে ত্রাসেরই সঞ্চার হইত। কিন্তু অন্তরে অন্তরে "মহাকৌল" হইয়াও বাহ্যতঃ তিনি কখনও সে ভাব প্রকাশ করিতেন না; যদি কোন সংশয়ী শিষ্য তাঁহার এই অসমঞ্জস ভাবদ্বয়ের বিষয়ে কোন প্রশ্ন তুলিত, তাহা হইলে তিনি মৃদু হাসিয়া বলিতেন,

"অন্তঃ শাক্তঃ বহিঃ শৈবঃ সভায়াং বৈষ্ণবো মতঃ।"

অন্তরে শাক্ত রহিয়া বাহিরে শৈবের ন্যায় আচরণ করিবে এবং সভায় বৈষ্ণবের ন্যায় কথা কহিবে। ইহাই হইতেছে কুলধর্ম্ম, ইহাই শিববাক্য।

২

এ-হেন মহাপুরুষ যে তাঁহার লৌকিক পিতামাতার সহিত আপনার জ্ঞানগরিষ্ঠ চরিত্রোচিত ব্যবহার করিবেন, সে বিষয়ে সন্দেহ করাই অন্যায়। ন মাতা ন পিতা ন বন্ধু র্ন ভ্রাতা,—কেহই কিছু নয়, সকলেই মায়ার বিজৃম্ভণ মাত্র। অতএব এই "শিব-স্বরূপ" পুত্রের, এই চলন্ত শঙ্করের মাতা হইয়া নিস্তারিণী দেবী স্বভাবতই আপনাকে ধন্যা মনে করিতে-ছিলেন। কিন্তু পিতার সহিত এই মহাপুরুষ-সন্তানের প্রথম দর্শনেই চোখে চোখে যে কথা হইয়া গিয়াছিল, স্থূল শরীরে যে যে ভাবের আদান-প্রদান হইয়াছিল, সে কথা প্রাকৃত লোকের বুদ্ধির অগম্যই রহিয়া গিয়াছে।

সে যাহা হউক, প্রভুপাদ শঙ্করানন্দের পিতা-মাতা উভয়েই উপযুক্ত পুত্রের যশঃসৌরভ চতুর্দ্দিকে নানাভাবে বিস্তারিত করিতে ত্রুটি রাখেন নাই; এবং তাঁহাদের, বিশেষতঃ নিস্তারিণী দেবীর সহিত শিবচন্দ্র ন্যায়রত্নের পত্নী মনোরমা দেবীর বিশেষ সখিত্ব থাকায় শিবচন্দ্র ন্যায়রত্ন কোন-এক প্রভাতে শঙ্করানন্দের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন ও স্বামীজির সদালাপে মুগ্ধ হইয়া গৃহে গিয়া কেবলমাত্র এই কথাটী উচ্চারণ করিলেন, "কাকঃ কাকঃ।"

ন্যায়রত্ন মহাশয় উঠিয়া গেলে সহসা স্বামীজির চিত্তে ভাবান্তর উপস্থিত হইল। তিনি যেন সহসা একটা প্রকাণ্ড বিষাদের দ্বারা আক্রান্ত হইয়া বলিলেন, "অহো, এমন জ্ঞানী পিতার এমন কুসন্তান!" শিষ্যগণ প্রভুর মুখ হইতে এবম্বিধ বাক্য উচ্চারিত হইতে শুনিয়া বিস্মিত হইল। কিন্তু কেহই প্রভুর উক্ত প্রকার অদ্ভুত উক্তির কারণ জানিতে পারিল না। প্রভু কেবল গম্ভীরভাবে মাথা নাড়িয়া চক্ষু মুদ্রিত করিলেন।

ক্রমশঃ এই কথাটী অজ্ঞাত উপায়ে জমিদারী অন্তঃপুরেও প্রচারিত হইয়া গেল। কালিকাবাবুর মাতা পুত্রকে ধরিয়া বসিলেন যে অগু কালিকাবাবু স্বয়ং গিয়া এ-বিষয়ে সঠিক সংবাদ জানিয়া আসুন। কালিকাবাবু মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "মণিশঙ্করের কথায় যদি বিশ্বাস কর্‌তে হয়, তাহ'লে যে কোন মাতালের মাতলামিতেও বিশ্বাস কর্‌তে হবে।"

মাতা বলিলেন, "কিন্তু মণি আর যাই হোক্, ওর কথা যে শুন্‌ছি অনেক সময়ে ফ'লে যায়। ওর একটা-কিছু ক্ষমতা হয়েছে নিশ্চয়, নইলে এত লোক ওকে মান্‌বে কেন?"

কালিকাবাবু কহিলেন, "মা, সহজে বিশ্বাস করা সাধারণ লোকের একটা রোগ। বিশেষ যদি তার সঙ্গে দৈব শক্তি-টক্তির ভণ্ডামি থাকে, তাহ'লে ত আর কথাই নেই। আমায় যদি স্বয়ং ভগবান্ এসে বলেন যে মণিশঙ্কর সাধু হয়েছে, তাহ'লেও আমি সে কথা বিশ্বাস কর্‌ব না।"

মাতা কহিলেন, "এ তোমার অন্যায়! সাধু-সঙ্গে কি না হয়?"

"হ্যাঁ, সাধু-সঙ্গ হ'লে! কিন্তু ওর যে সাধু-সঙ্গ হয়েছিল, তা কে বল্লে? তা ছাড়া আমার বিশ্বাস, কয়লাকে হাজার ধুলেও তার কালো রং যায় না।"

"কিন্তু আগুনে লাগ্‌লে সে কালি যেতে পারে ত।"

"মা, তুমি কি দেখ্‌তে পাচ্ছ না যে, দেশের যত উঁছা ত্রিপণ্ড্র, মায়ে-তাড়ান বাপে-খ্যাদান ছোঁড়া ওর সঙ্গে গিয়ে জুটেছে? সাধুর প্রথম লক্ষণ এই যে তার কাছে গিয়ে বস্‌লেই মনটা ঠাণ্ডা হবে। সাধু-চরিত্র ঠিক চিনির গুদোমের মত, ঘরে ঢুক্‌লেই মুখটা মিষ্টি মিষ্টি হ'য়ে যাবে। যার একটুও ভাল-মন্দ বিচার কর্‌বার ক্ষমতা আছে, সে-ই ওর কাছ থেকে ফিরে এসে বল্‌ছে, ওর মধ্যে আঠারো আনাই ভণ্ডামি। বাস্তবিক, শান্ত প্রকৃতির সাধু-চরিত্রের লোক কি একটিও এ-পর্য্যন্ত ওর সঙ্গী হয়েছে?

ইংরিজিতে একটা চলিত কথা আছে, যার মানে হচ্চে, মানুষের সঙ্গী দেখেই তার চরিত্র ধরা যায়।"

মাতা কহিলেন, "তোমাদের ইংরিজি-পড়া লোকেদের ঐ কেমন এক ধরণ! কিছুই বিশ্বাস কর্‌তে চাও না! কিন্তু ডাকিনী যোগিনী সিদ্ধি এ সবও যে শুনি আজকাল বড় বড় ইংরিজি জানা লোকও মান্‌ছে। বিলেতে সাহেবেরাও না কি মান্‌ছে।"

"তা মানুক্‌গে, মা, আমি মান্‌তে পার্‌ব না।"

"যাই হোক্‌, তুমি কার্ত্তিকের বিষয় তাহ'লে খোঁজ নাও।"

"তার খোঁজ আমি রোজই পাই, মা, এই ত কালও মনোহর তার বিষয় লিখেছে। মনোহরের ছেলে শশীর সঙ্গে কার্ত্তিক আর সর্ব্বানন্দর খুব ভাব হয়েছে। তার কাছ থেকে মনোহর রোজই কার্ত্তিকের খবর পায়।"

"তোমার টৌর্ণি বাবুকেও চিঠি লেখে দাও। কি জানি, সহর বাজার স্থান—কার্ত্তিক হয়ত—"

"তুমি ভয় করো না। আমি কার্ত্তিকের উপর সর্ব্বদা দৃষ্টি রেখেছি, নইলে কি এতদিন ধ'রে আমার মেয়ের বিয়ে না হ'য়ে থাকে? কার্ত্তিক যদি সহজে নষ্ট হবার মত ছেলে হ'ত, তাহ'লে এমন ক'রে ওকে পাবার জন্য চেষ্টা করতুম না।"

তথাপি কালিকাবাবুর মাতা জগদম্বা দেবীর সন্দেহ দূর হইল না। তিনি নানা কৌশলে মণিশঙ্করের নিকট হইতে কার্ত্তিকের সম্বন্ধে সঠিক সংবাদ জানিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু স্বামীজির সেই এক কথা,—"আমি কখন্ কি যে বলি, সব কি আমার মনে থাকে? যখন যে ভাব যে কথা গুরুর কৃপায় আমার মনশ্চক্ষুর সম্মুখে ভেসে ওঠে, তখন তাই প্রকাশ করি। তবে যদি কারও কিছু জান্‌বার দরকার থাকে,

সে যেন একটা হরীতকী হাতে ক'রে জিজ্ঞাসুভাবে আমার কাছে আসে, তাহ'লে তার প্রশ্নের সদুত্তর আপনিই আমার মনে উদয় হবে এবং সেও জান্‌তে পার্‌বে।"

কালিকাবাবুর মাতা জগদম্বা দেবী ব্যস্ত হইয়া একদিন মণিশঙ্করের মাতা নিস্তারিণী দেবীকে ধরিয়া বসিলেন যে তাঁহাকে সঠিক সংবাদ আনিয়া দিতে হইবে। আর যদি নিস্তারিণী দেবী অক্ষম হন, তাহা হইলে জগদম্বা দেবী স্বয়ং একদিন তাহার কাছে যাইবেন। শৈলজার মাতা ইন্দিরা দেবী এ সংবাদে মনঃক্ষুণ্ণ হইয়া শ্বশ্রূ ঠাকুরাণীকে মৃদু অনুযোগ করিয়া বলিলেন, "মা, আপনি কেন এত ব্যস্ত হচ্চেন? উনি যখন নিশ্চিন্ত হ'য়ে আছেন, তখন আমাদের ভয় কি? আর আপনি এই রকম কাণ্ড কর্‌ছেন শুন্‌লে উনি দুঃখিত হবেন। সে দিন তিনু ঠাকুরঝি, ক্ষান্ত পিসি মণির সঙ্গে দেখা কর্‌তে গিয়েছিলেন ব'লে উনি কত রাগ কর্‌লেন! তার ওপর যদি আপনি যান, তাহ'লে উনি বড্ড দুঃখিত হবেন।"

জগদম্বা কহিলেন, "বৌমা, শৈল ত তোমাদের একার নয়! ওর কিসে ভাল মন্দ হবে, তা আমিও বুঝি। তুমি নিশ্চিন্ত থাক, আমি যা কর্‌ছি, তাতে কেউ দোষ দিতে পার্‌বে না।"

ইন্দিরা দেবী ক্ষুণ্ণ মনে প্রস্থান করিলেন। জগদম্বা দেবী শৈলজাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। শৈলজা আসিলে তিনি তাহাকে বলিলেন, "ওরে তোর মণি-দার সঙ্গে একদিন দেখা কর্‌তে যাবি? সে এখন মস্ত সাধু হ'য়ে এসেছে! চল্ না, একবার দেখে আসি।"

শৈল কহিল, "মণি-দা'র সঙ্গে দেখা কর্‌তে যাব? কেন?"

জগদম্বা কহিলেন, "শুনিস্‌নে, সে না কি ভারি গুণ্‌তে পারে! চল্, তোর হাতটা দেখিয়ে আনি।"

শৈল কহিল, "কেন, আমার হাত দেখিয়ে আবার কি হবে?"

জগদম্বা কহিলেন, "তোর কেমন বর হবে, সেটা জান্‌বি নে ?"

শৈলজা হাসিয়া বলিল, "সে তখন যেমন হয় হবে, তার জন্য আমি এখন থেকে ভাব্‌তে যাব কেন ?"

জগদম্বা কহিলেন, "তুই ভাব্‌বি না ত কে ভাব্‌বে ?"

শৈলজা কহিল, "যার দরকার হয়, সে ভাবুক্‌গে, আমি ভাব্‌ব না।"

জগদম্বা কহিলেন, "অর্থাৎ তোর ভাবা-টাবা সব ফুরিয়ে গিয়েছে, এখন কেবল হাতে পেলেই হয়, কেমন ?"

শৈল কহিল, "যাও, তুমি বড় দুষ্টু! আমি চল্লুম।"

জগদম্বা কহিলেন, "আহা, চল্‌ না! তোকে যে বিয়ে কর্‌বে, সে কেমন লোক হবে, এ কথা কি জান্‌তে ইচ্ছে করে না ?"

শৈল কহিল, "কে কেমন হবে, তা কি কেউ হাত দেখে ব'লে দিতে পারে না কি ?"

জগদম্বা কহিলেন, "যারা গুণ্‌তে জানে, তারা পারে।"

শৈল কহিল, "তা পারুক্‌, আমি সে সব গুণে-টুনে দেখ্‌তে চাইনে।"

জগদম্বা কহিলেন, "কেন, শুনি ?"

শৈল কহিল, "কেন আবার কি! আমি বারে বারে তোমার 'কেন'র উত্তর দিতে পার্‌ব না,—আমি কোথাও যাব না।"

জগদম্বা এইবার গম্ভীর হইয়া বলিলেন, "আমার কথা তবে রাখ্‌বিনে ? তোর বাবার ভয় কর্‌ছিস্‌? আমি নিয়ে গেলে সে কিচ্ছু বল্‌বে না।"

শৈল কহিল, "আর যদি আমিই না যাই ?"

জগদম্বা কহিলেন, "তাহ'লে আর আমি কি কর্‌ব!"

শৈল কহিল, "তবে সেই বেশ কথা! আমিই যাব না। কোথাকার একটা কে, মদো-মাতাল গাঁজাখোর লোক, তার কাছে হাত দেখাতে যেতে হবে! তোমার দিন দিন বুদ্ধি-শুদ্ধি যেন কি হ'য়ে যাচ্ছে!"

জগদম্বা কহিলেন, "কোথাকার কে কেন হ'তে যাবে? ও যে আমাদের মণি।"

শৈল কহিল, "হ'লই বা মণি! কে ওর মনের ভিতর ঢুকে দেখ্‌তে গিয়েছে, যে ওর মনে কি আছে? এই ত' বছর-দুই আগে ও একটা মস্ত মাতাল বওয়াটে ছিল। এরই মধ্যে দুবছর যেতে না যেতে একখানা গেরুয়া কাপড় প'রে এল, আর অমনি তোমরা দেশশুদ্ধ লোক ওর পেছনে ছুট্‌তে আরম্ভ করেছ! তোমার যেথানে ইচ্ছে যাও, মা যেখানে যেতে বারণ করেন, সেখানে আমি কিছুতেই যাব না।"

শৈলজা রাগ করিয়া চলিয়া গেল। জগদম্বা দেবী নানা প্রকারে বুঝাইয়াও কিছুতেই তাহাকে মণিশঙ্করের নিকট হাত দেখাইতে লইয়া যাইতে পারিলেন না। শেষে তিনি বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "হায় হায়, দেবতা-বামুনে ভক্তি আজকাল কোথায় চ'লে গেল? হায় রে সে কাল!"

৩

কলিকাতার কোন এক প্রসিদ্ধ কলেজের সেকেণ্ড-ইয়ার ক্লাশে সংস্কৃত অধ্যাপক প্রবেশ করিবামাত্র ছাত্রগণ নানারূপ গল্প-গুজবে প্রবৃত্ত হইল। অধ্যাপক মহাশয় 'রোল্‌' 'কল্‌' করিয়া রঘুবংশের কোন এক সর্গের শ্লোকের ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইবামাত্র কয়েকজন ছাত্র সর্ব্বানন্দকে ধরিয়া বলিল, "সর্ব্ব-দা, আজ পণ্ডিত মশায়ের সঙ্গে ব্যাকরণ-ঘটিত একটা তর্ক জুড়ে দাও, আমরা একটু মজা করি।"

সর্ব্বানন্দ হাসিয়া বলিল, "রোজ রোজ তোমাদের জন্য পণ্ডিত মশায়ের সঙ্গে ঝগড়া কর্‌তে পারিনে।"

যোগীন্দ্র নাছোড়-বন্দা। সে বলিল, "সে হবে না সর্ব্ব-দা, তোমার তর্ক কর্‌তেই হবে। ঐ দেখ, পণ্ডিত মশায় কেবল বাঁকা চোখে তোমার

দিকে চাচ্ছেন। তোমাকেই সব-চেয়ে সমজদার ছাত্র ব'লে জানেন। তুমি চুপ ক'রে থাক্‌লে আজকের ঘণ্টাটাই উনি ব্যর্থ মনে কর্‌বেন।"

সর্ব্বানন্দ কহিল, "তা করুন! আজ আমার নিশ্চুপের পালা। আজ কার্ত্তিককে গিয়ে ধর্‌ না।"

পিছন হইতে কালো কোলো মোটা-সোটা দেবনাথ তাহার অসম্পূর্ণোদ্গত গুম্ফে তা' দিতে দিতে বলিল, "ওখানে দাঁত ফুট্‌বে না, তার চেয়ে বাইরে চলুন, সর্ব্ববাবু, আপনার উদ্ভট শোনা যাক্‌ গিয়ে।"

গীতবাতিকগ্রস্ত কাব্য-কূপ সত্যজীবন তাহার স্বাভাবিক ব্যস্ততা দেখাইয়া অতি দ্রুতবেগে বলিল, "উদ্ভট কবিতা, উদ্ভট কবিতা! আমি—আমি—আমি সেদিন যে একটা চমৎকার কবিতা পেয়েছি, তার কাছে, তার কাছে, সব, বুঝেছ কি না, সব কবিতা meaningless trash ব'লে মনে হবে! কবিতাটা ঠিক যেন ইয়ের মত,—মন-প্রাণ একেবারে উঃ সে কি বল্‌ব, ভাই!"

দেবনাথ তাহার উচ্ছ্বাসে বাধা দিয়া বলিল, "তা আর ব'লে কাজ নেই।"

সত্যজীবন কহিল, "ওহে, না, না, সেদিন আমি যাঁর কাছ থেকে শুন্‌লুম—"

যোগীন্দ্র কহিল, "ওঃ বোঝা গেছে! যাঁর কাছ থেকে শুনেছ, তাঁরই কমনীয় কণ্ঠের যোগ থাকাতে সেটা এত সুমিষ্ট হ'য়ে উঠেছিল।"

বন্ধুদের দলে একটা চাপা হাসির স্রোত বহিয়া গেল। সত্যজীবনের মনের "চর্ম্ম"টা কিঞ্চিৎ স্থূল, তাই যোগীন্দ্রর বিদ্রূপে সে-ই বেশী হাসিল; কিন্তু পরক্ষণেই অতি প্রবলবেগে হাত-মুখ নাড়িয়া সে বলিল, "তোমরা যদি তাঁর গলা শুন্‌তে, তাহ'লে আর সে বিষয় নিয়ে ঠাট্টা কর্‌তে না! আঃ, সে কি সুন্দর! গলা ত নয়, যেন—"

দেবনাথ বাধা দিয়া কহিল, "মিছরির ছুরি! চোরের নাক কাটা চলে! খেতেও মিষ্টি!"

আবার চাপা হাস্যধ্বনি উত্থিত হইতেই সর্ব্বানন্দ বলিল, "ওহে, পণ্ডিত মশায় চশমার ওপর দিয়ে ঘন-ঘন এ ধারে তাকাচ্ছেন। তোমরা বাইরে যাও।"

সত্যজীবন তাহার "তিনি"র গল্প করিবার জন্য ছট্‌ফট্ করিতেছিল। সে তাড়াতাড়ি বলিল, "তাই চল, তাই চল।"

যোগীন্দ্র তাহার পার্শ্বস্থিত 'ঠাকুরদা' নামধারী প্রকাণ্ড-কালো-দাড়ী-সমন্বিত নিদ্রিত বন্ধুটীকে একটা খোঁচা মারিয়া জাগাইয়া দিল। এই ঠাকুরদা দশ-বারো বৎসর ধরিয়া এফ, এ, পরীক্ষায় ফেল্ হইয়া উক্ত উপাধিটী অর্জ্জন করিয়াছিল, এবং আপনার বহু দিনের অধিকারের ফলে যে-কোন ঘণ্টায় নিদ্রা যাইবার একটা অবাধ ও চিরস্থায়ী স্বত্ব প্রফেসর ও ছাত্রগণের নিকট হইতে আদায় করিয়া লইয়াছিল। খোঁচা খাইয়া 'ঠাকুরদা' তাহার রক্তবর্ণ চক্ষু দুইটী উন্মীলিত করিয়া একবার কক্ষের চতুর্দ্দিক দেখিয়া লইল, তারপর মৃদু স্বরে বলিল, "ওঃ, পণ্ডিত এসেছে! চল্ রে, তামাক খেয়ে আসি।"

যোগীন্দ্র ও সত্যজীবন সর্ব্বানন্দকে টানাটানি আরম্ভ করিতেই কিঞ্চিৎ দূরস্থিত কার্ত্তিকের দৃষ্টি তাহাদের উপর পড়িল। কার্ত্তিক তৎক্ষণাৎ চোখ ফিরাইয়া লইল বটে, কিন্তু সর্ব্বানন্দ আর উঠিতে পারিল না। যোগীন্দ্র তখন ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, "কার্ত্তিক কি তোমার অভিভাবক না কি যে, ওর মত না নিয়ে তুমি নড়্‌বে না?"

'ঠাকুরদা' হাই তুলিয়া বলিল, "কার্ত্তিকটাকেও ডেকে নাও না। ও'ই বা কি কর্‌ছে ব'সে?" যোগীন্দ্র কার্ত্তিকের নিকট গিয়া বলিল, "কার্ত্তিক, 'ঠাকুরদা' তোমায় ডাক্‌ছে, এস।"

কার্ত্তিক তাহাদের সঙ্গে বাহিরে আসিয়া বলিল, "সর্ব্ব-দা, দিন-দিন তোমার এ কি হচ্ছে? পণ্ডিতমশায় নিরীহ গোবেচারা ব'লে তাঁকে কেন তোমরা এমনভাবে রোজ রোজ অপমান্ কর? তোমাকে উনি সব-চাইতে বেশী ভালবাসেন, আর তুমিই ওঁকে সব-চাইতে বেশী অবহেলা দেখাচ্ছ!"

সর্ব্বানন্দ লজ্জিত হইয়া কি বলিতে যাইতেছিল, এমন সময় যোগীন্দ্র রাগিয়া বলিল, "এদিকে ত' দাদা বলা হয়, কিন্তু কথা শুনে মনে হয়, যেন তুমিই ওর দাদা!"

কার্ত্তিক কহিল, "অন্যায় দেখ্‌লে সকলকেই সাবধান করা যেতে পারে তাতে বড়-ছোট ব'লে কোন কথা মনে রাখ্‌বার দরকার নেই।"

সত্যজীবন বেগতিক দেখিয়া তাড়াতাড়ি যোগীন্দ্র আর কার্ত্তিকের মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "আরে যেতে দাও, যোগীন। কার্ত্তিকবাবু, রাগ কর্‌বেন না। আমিই একটা কথার জন্য সর্ব্ববাবুকে ডেকে এনেছি।"

কার্ত্তিক কহিল, "কি কথা?"

ঠাকুরদার নিদ্রার ঘোর সিগারেটের ধোঁয়ায় ক্রমশঃ কাটিয়া আসিতেছিল, তাই সে দাড়ীতে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল, "আরে, সে কথা কি তোর সঙ্গে হ'তে পারে রে বেরসিক? সতুর কথার মর্ম্ম যারা বুঝ্‌বে, তাদের কাছেই ও বল্‌বে। তুই আমার কাছে আয়, একটা কথা আছে। ও চ্যাংড়াদের ছেড়ে দে।"

বয়সে চৌদ্দ-পনেরো বৎসরের তফাৎ হইলেও এই ঠাকুর্দ্দা ওরফে শশিভূষণের সঙ্গে কার্ত্তিকচন্দ্রের এই কয় মাসের মধ্যে যথেষ্ট হৃদ্যতা জন্মিয়াছিল। শশিভূষণ মনোহর বসু মহাশয়ের একমাত্র পুত্র। মনোহরবাবু সীতাপুরের জমিদার এবং কালিকাবাবুর বিশিষ্ট বন্ধু। পুত্র শশিভূষণ যখন বারংবার চেষ্টা করিয়াও এফ, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ

হইতে পারিল না, তখন তিনি পুত্রকে লেখাপড়া ছাড়িয়া গ্রামে ফিরিয়া কাজকর্ম্ম দেখিবার জন্য লিখিয়া পাঠাইলেন। কিন্তু পুত্র শশিভূষণ পত্রোত্তরে লিখিল, সেকেণ্ড ইয়ারের বেঞ্চখানার মায়া সে কিছুতেই ত্যাগ করিতে পারিতেছে না। দ্বিপ্রহরে একবার কলেজে গিয়া ঐ বেঞ্চখানায় বসিয়া ঐ ডেস্কের উপর মাথা রাখিয়া না ঘুমাইলে তাহার সারারাত্রি নিদ্রা হইবে না। এমন কি রবিবার প্রভৃতি ছুটির দিনে অন্ততঃ এক মিনিটের জন্যও সে দরোয়ানদের দ্বারা দ্বার খোলাইয়া সেই বেঞ্চখানায় বসিয়া আসে। অতএব যতদিন না ঐ বেঞ্চখানা ভাঙ্গিবে, ততদিন আর শশীর নিস্তার নাই, তাহাকে কলেজে যাইতেই হইবে!

স্নেহ-দুর্ব্বল পিতা আর কোন উপায় নাই দেখিয়া মাসে মাসে যথারীতি টাকা পাঠাইতে লাগিলেন। পুত্রও এক পুরাতন পুস্তকের দোকান হইতে সের বা মণ-দরে কতকগুলি অতি পুরাতন পুস্তক কিনিয়া আনিয়া একটা আলমারি সাজাইয়া রাখিল এবং কলেজের নিয়মিত নিদ্রায় ও প্রতি সন্ধ্যার উদ্দেশ্যহীন ভ্রমণে পরম সুখে জীবন যাপন করিতে লাগিল।

কার্ত্তিক ঘাসের উপর বসিয়া পড়িয়া নিকটস্থ পুষ্পবৃক্ষ হইতে একটা ডাল ভাঙ্গিয়া লইল এবং সপত্র সেই ডালটাকে মাটির উপর আছাড় মারিতে মারিতে বলিল, "কি কথা ?"

শশিভূষণ দাঁত খুঁটিতে খুঁটিতে বলিল, "আমি এক মুস্কিলে পড়েছি। বুড়োবয়সে বাবা বল্ছেন, আবার বিয়ে কর। এখন এর উপায় কি ?"

কার্ত্তিক কহিল, "বিশ-পঁচিশ বছরে কেউ বুড়ো হয় না। তুমি যদি বুড়ো হও, আমরা তাহ'লে কি প্রৌঢ় না কি !"

শশিভূষণ কহিল, "তুমি আমার চেয়েও বুড়ো। বয়স নিয়ে কি হবে ? যাক্ ও কথা। এখন উপায় কি ?"

কার্ত্তিক কহিল, "উপায় আবার কি! তোমার বাবা যখন ধরেছেন, তখন হয় বিয়ে কর, নয় সাফ লিখে দাও, কর্‌ব না।"

"লিখে না হয় দিলুম, কিন্তু কারণ কি দেখাব?"

"কারণ আবার কি। বিয়ে করা না করা তোমার ইচ্ছে।"

"উঁহুঃ আমার ইচ্ছে অনিচ্ছে ত নয়,—"

"তবে কার?"

"সেই কথাই তোকে বল্‌ব। আজ আমার ওখানে সন্ধ্যার সময় যাস্, সর্ব্বাকেও নিয়ে যাস্। ওকেই আমার বিশেষ দরকার।"

ইতিমধ্যে দেবনাথ নিকটে আসিয়া বলিল, "ওহে ঠাকুরদা, সতুর কথা শোনো, ও বলে কি যে ওর সে ইতিমধ্যে ওকে এমন সব পত্র লিখে ফেলেছে, যা বঙ্গসাহিত্যে কাউপারের letterএর স্থান অধিকার কর্‌বে!"

সত্যজীবন উত্তেজিত হইয়া বলিল, "তোমরা আমার কথা বিশ্বাস কর্‌ছ না?"

শশিভূষণ কহিল, "ওরা বিশ্বাস না করুক, আমি করি। প্রেম-পত্রের ঠেলায় এই যে এত-বড় দাড়ী দেখ্‌ছ, এর প্রত্যেক গাছিতে পাক ধ'রে গেছে। সতু ভাই, মাভৈঃ, আমি তোকে বিশ্বাস করি।"

সত্যজীবন কহিল, "ঠাকুরদা, ঠাট্টা কর্‌ছ? কিন্তু সেগুলো যদি তোমায় দেখাতে পার্‌তুম, তা'লে—

শশিভূষণ কহিল, "অমন কাজটি করো না, ভাই। প্রেমপত্র আর সব সইতে পারে, পকেটের বাইরে আসা শুধু সইতে পারে না। প্রেমেরও যেমন আঁধারে স্বভাব, প্রেমপত্রেরও তেমনি সর্দ্দির ধাত,—ঠাণ্ডা লাগিয়েছ, কি সর্ব্বনাশ!"

ইতিমধ্যে সে ঘণ্টা শেষ হইয়া যাওয়ায় বন্ধুগণের সভাভঙ্গ হইল এবং তাহারা তাড়াতাড়ি ক্লাসে ফিরিয়া আসন গ্রহণ করিল।

কলেজের ছুটী হইলে সর্ব্বানন্দ ও কার্ত্তিক তাহাদের বেনেটোলা লেনের মেশের একটা কক্ষে যাইয়া বস্ত্রাদি পরিবর্ত্তন ও কিঞ্চিৎ জলযোগ সারিয়া চাঁপাতলায় শশিভূষণের বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইল। শশিভূষণ একটা ষ্টোভে চায়ের জল চড়াইয়া ভৃত্য রঘুনাথ উড়েকে তামাক কিনিয়া না রাথার জন্য বকিতেছিল; এবং মাঝে মাঝে তাহার সযত্ন-বর্দ্ধিত দাড়ীর উপর সিগারেটের ছাই পড়াতে তাহাই ঝাড়িতে ঝাড়িতে রেলিংয়ের উপর দিয়া মুখ বাড়াইয়া দেখিতেছিল, সর্ব্বানন্দ ও কার্ত্তিক আসিতেছে কি না।

কার্ত্তিক ও সর্ব্বানন্দ আসিয়া পৌছিলে সে বলিল, "তোরা চা-ও খাবিনে, তামাকও খাবিনে, কি দিয়ে তোদের অভ্যর্থনা করি ?"

সর্ব্বানন্দ বলিল, "মৃদু মধুর হাস্য দিয়ে।"

শশিভূষণ কহিল, "তাও ত ঐ দাড়ীর ফাঁকে মিলিয়ে যাবে।"

শশিভূষণ চা প্রস্তুত করিয়া পান করিতে লাগিল। ইত্যবসরে চাকর আসিয়া গড়গড়ায় তামাক সাজিয়া দিয়া গেল। একচুমুক করিয়া চা ও একটান করিয়া তামাক সেবন করিতে করিতে শশিভূষণ বলিল, "আজ তোদের কেন ডেকেছি, জানিস্ ?"

সর্ব্বানন্দ বলিল, "জানি বৈ কি! খুব বড়রকম একটা ভোজের আয়োজন কর্‌তে।"

শশিভূষণ কহিল, "হ্যাঁ, সে কথা ঠিক বটে! তবে কে যে তার খরচ জোগাবে, সেটা এখনও ঠিক হয় নি। যাক্, আজ আমার সঙ্গে এক জায়গায় তোদের যেতে হবে।"

কার্ত্তিক কহিল, "ভোজের জোগাড় কর্‌তে ত ? খুব রাজি আছি।"

শশিভূষণ কহিল, "এখন ত বল্‌ছিস্, খুব রাজি, কিন্তু কোঁৎকা দেখে তখন যেন পেছুস্ নে।"

সর্ব্বানন্দ কহিল, "সে আবার কি, ঠাকুরদা? কোঁৎকা-টোৎকার ভয় থাকে ত' আমি ভাই তাতে নেই। গরীব পুঁটী মাছের প্রাণ, আমায় দুটো-একটা সন্দেশ টন্দেশ দাও ত কষ্টে-সৃষ্টে খেতে পারি।"

শশিভূষণ কহিল, "আগে থাক্‌তে ভয় পেলে কোন শক্ত কাজই করা যায় না। যাক, ভণিতা ছেড়ে, চল্, একটা কাজ করি আগে।"

শশিভূষণ উঠিয়া পাশের ঘরের দরজা খুলিল। এই ঘরটা সর্ব্বদাই বন্ধ থাকিত, কেহ কখনও শশীকে ও ঘর খুলিতে দেখে নাই এবং এ বিষয়ে প্রশ্ন করিলেও সে কখনও কোন উত্তর দিত না। আর হঠাৎ ঐ কক্ষ উন্মুক্ত হইলে সর্ব্বানন্দ উঁকি মারিয়া দেখিয়া বলিল, "ব্যাপার কি, ঠাকুরদা, আজ কি তোমার যক্ষের ধনাগার আমাদের দেখাবে না কি? এত অনুগ্রহ কেন আজ!"

শশী কোন উত্তর দিল না, গম্ভীর ভাবে উক্ত কক্ষের জানালা দরজা-গুলি খুলিয়া দিয়া মৃদু স্বরে বলিল, "এস তোমরা!"

তাহারা কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিল, কক্ষটী বেশ প্রশস্ত। পূর্ব্ব ও দক্ষিণ দিকের উন্মুক্ত গবাক্ষ হইতে আলো ও বাতাস আসিবার দিব্য বন্দোবস্ত রহিয়াছে। বাসার অন্যান্য কক্ষ হইতে এটি সর্ব্বপ্রকারেই শ্রেষ্ঠ। কক্ষের চারিদিকেই আলমারি। একটা জানালার সম্মুখে একটা বড়-রকমের টেবিল, এবং তাহার পার্শ্বস্থিত একটা র‍্যাকে নানা প্রকারের কেমিকেলের শিশি ও নানাবিধ যন্ত্র-পাতি। আলমারি গুলির ভিতরে বিপুলকায় পুস্তকাবলী; এবং সর্ব্বাপেক্ষা অদ্ভুত ব্যাপার, উত্তরের দেওয়ালের গায়ে একটা প্রকাণ্ড তৈল-চিত্র। চিত্রে একটী রমণী বিস্ফারিত নেত্রে কোন এক গবাক্ষের পর্দ্দা সরাইয়া আলোকের অবাধ প্রবেশের পথ উন্মুক্ত করিয়া দিতেছে। চিত্র তেমন কোন অসাধারণ সুন্দরীর নয়, তথাপি ঐ বিস্ফারিত-নেত্রা রমণীর মুখের উপর এমন একটা ভাব চিত্রকরের অসামান্য নৈপুণ্যে

ফুটিয়া উঠিয়াছে, যাহা দেখিবামাত্র বুঝা যায়, রমণীটী অন্ধ। তথাপি আলোকের জন্য তাহার একটা আন্তরিক ব্যাকুলতা চিত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিবামাত্র ধরিতে পারা যায়! চিত্রাঙ্কিতা রমণীর প্রত্যেক অঙ্গ-ভঙ্গী, এমন কি তাহার গাত্র-বস্ত্রের প্রত্যেক ভাঁজটী অবধি যেন চীৎকার করিয়া বলিতেছে, "আলো, আলো, আলো দাও, আমি একবার দেখি।"

সর্ব্বানন্দ ও কার্ত্তিকের মুখ হইতে হাস্যোপহাসের রেখা মুহূর্ত্তে কোথায় মিলাইয়া গেল। তৎপরিবর্ত্তে একটা গূঢ় বেদনায় ব্যথিত হইয়া উভয়েই যুগপৎ শশিভূষণের দিকে ফিরিয়া চাহিল। চাহিয়া দেখিল, শশিভূষণ একটা গবাক্ষের কাছে দাঁড়াইয়া বাহিরের দিকে নির্ব্বাক্ নিস্পন্দভাবে চাহিয়া আছে। কার্ত্তিক অতি সন্তর্পণে তাহার নিকটে গিয়া মৃদু কণ্ঠে বলিল, "ছবিখানা কার?"

শশিভূষণ না ফিরিয়া উদাসভাবে মৃদু স্বরে বলিল, "মানুষের আত্মার।"

সর্ব্বানন্দ শুনিতে না পাইয়া পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, "কার?"

শশিভূষণ মুদিত নেত্রে আর্দ্র কণ্ঠে বলিল, "আমার স্বর্গগতা স্ত্রী আশাময়ীর।"

বহুক্ষণ তিনজনে আর কোন কথাবার্ত্তা হইল না। পরে শশিভূষণ নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া বলিল, "আমি এ ছবি আজ পর্য্যন্ত বাবা ছাড়া আর কাকেও দেখাইনি। আমার এ ঘরের যা-কিছু দেখ্ছ, সবই ঐ ওঁরই জন্য। বিবাহের চার-পাঁচ বছরের পর ওঁর বাতশ্লেষ্মা বিকার হয়, তারপর বছর-দুই ভুগে উনি মারা যান। ঐ রোগেই ওঁর প্রথমে দুই চোখ যায়, শেষে সেই অবস্থাতেই উনি প্রাণ পর্য্যন্ত হারান। কিন্তু সেই ব্যারামের সময় আলোর জন্য তাঁর যে ব্যাকুলতা দেখেছিলুম, তা এ জীবনে কখনো ভুল্ব না। সেই ভাবটি তাঁর একটা সুস্থ সময়ের ছবির উপর আঁকিয়ে

নিয়েছি। আর সেই সময়ে একটা প্রতিজ্ঞা করেছি যে সারা জীবনে আমার আর কোন কাজ রইল না। কেবল সংসারে যারা অন্ধ, তাদের দৃষ্টি দেবার চেষ্টা কর্‌ব। ভগবানের আলো থেকে যারা বঞ্চিত, তাদের চোখে আলো ফোটাবার চেষ্টা করব। যদি তা না পারি ত এমন কোন উপায় কর্‌ব, যাতে চোখের অভাবের কষ্ট যৎকিঞ্চিৎও দূর হয়। এই যে সব বই এই আলমারিতে দেখ্‌ছ, এ সমস্তই চক্ষুরোগ সম্বন্ধে। এ সব ওষুধ-পত্রও তারই জন্য। ঐ তিনটে আলমারি হলে অনেক খরচ করে বিলেত থেকে বাঙ্গলা আর ইংরিজি বই raised অক্ষরে আমি transcribe করিয়ে আনিয়েছি। আমি নিজেও অনেক কষ্টে ঐ রকম transcription শিখেছি। তোমাদের কেন এ সব বল্‌ছি, তা' বলি। আমি একা আর এ কাজ পার্‌ছি না। তোমরা যদি আমায় এ কাজে সাহায্য কর, তাহলে অবশ্য তোমাদের তাতে কোন লাভ হবে না, কিন্তু ভগবানের শ্রেষ্ঠ আশীর্ব্বাদ থেকে বঞ্চিত যে-সব হতভাগারা আছে, তাদের অন্তরের আশীর্ব্বাদের যদি কোন মূল্য থাকে, তা তোমরা পাবে।"

শশিভূষণ নীরব হইলে সর্ব্বানন্দ দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "ঠাকুরদা, আমায় সঙ্গে নাও, আমি তোমায় সাহায্য কর্‌ব। আমার আর কেউ নেই যে আমায় বাধা দেবে!"

শশিভূষণ কহিল, "কিন্তু তোমায় মিছিমিছি খাটাতে চাইনে, তোমার এমন অবস্থা নয় যে একটা wild goose chaseএ বাজে কাজে সারাজীবন কাটাবে। তাই যাতে তোমার দিনপাত হয়, অথচ আমার কাজটাও সফল হয়, তা কর্‌ব। সেজন্য চিন্তা করো না।"

কার্ত্তিক হঠাৎ বলিয়া উঠিল, "আর আমি! আমায় কেন এ সব কথা জানালে, যদি কোন কাজ না দেবে?"

শশিভূষণ কহিল, "তোমার জীবনের লক্ষ্য আর পরিণতি ঠিক হয়ে

গিয়েছে। আমি তোমাকে অন্য পথে নিয়ে যেতে পার্‌ব না। তা যদি করি, তাহলে কালিকা কাকার ক্ষতি করা হবে।”

কার্ত্তিক কহিল, “কালিকাবাবুর ক্ষতি হবে বলে আমার নিজের কোন স্বাধীনতা থাক্‌বে না? আমি নিজের ইচ্ছে অনুসারে নিজের জীবন গড়ে তুল্‌তে পাব না? আমি কি তাঁর ক্রীতদাস যে তিনি আমাকে দিয়ে যা-ইচ্ছে তাই করিয়ে নেবেন।”

শশিভূষণ কহিল, “তোমার মত তেজী একগুঁয়ে লোককে নিয়ে আমার চল্‌বে না। তোমার সঙ্গে আলাপ করে বুঝেছি, তোমাকে আমি ঠিক আমার হাতের তেলোর মধ্যে ধরে রাখ্‌তে পারি, এমন শক্তি আমার নেই। তুমি যে কাজে আছ, তাতেই লেগে থাক, তাতেই তুমি যথেষ্ট উন্নতি কর্‌তে পার্‌বে,—তাতেই তুমি সংসারের অনেক উপকার কর্‌বে।”

কার্ত্তিক কহিল, “তা হবে না, ঠাকুরদা আমায় এই অন্যায় পরাধীনতা থেকে মুক্তি পেতে দাও, আমায় তোমার সঙ্গী করে নাও। আমি কলের পুতুল নই, আমাকে কেউ আট্‌কে রাখ্‌তে পার্‌বে না। আমি স্বাধীন।”

শশিভূষণ কহিল, “কার্ত্তিক, তোর হাত ধরে বলছি, তুই স্বাধীনতার অহঙ্কার করিস্ নে। জগতে কেউ স্বাধীন নয়—স্বাধীনতা মানে স্বেচ্ছাচারিতা নয়। যে স্বেচ্ছাচারী, সে কখনই পরার্থপর হতে পারে না। আজ কতদিন হল যে চলে গিয়েছে, সেও যদি পর-জগৎ থেকে আমাদের ইচ্ছেকে, আমাদের কাজকে তার ইচ্ছে দিয়ে চালাতে পারে, তাহলে যারা বেঁচে আছে, তাদের ইচ্ছে অনুসারে কেন আমরা চল্‌ব না? নিজেকে বড় করে দেখ্‌তে শিখ্‌লে, নিজের ইচ্ছেটা নীতির বাঁধ্‌কে ডিঙ্গিয়ে গেলে, তখন নিজেকে ছাড়া জগতের আর কাউকে দেখ্‌তে পাওয়া যায় না। এই দেখ, বাবা আমার সব জানেন, সব জেনেশুনেও

তিনি আমায় আবার তাঁর সংসারের মধ্যে টেনে নেবার চেষ্টা কর্‌ছেন। তাঁর কষ্ট হচ্ছে বলে আমাকেও ফির্‌তে হবে। জানি না, হয়ত তাঁকে সুখী কর্‌বার জন্য বিয়েও বুঝি কর্‌তে হয়। বাবাকে বোঝাব, কিন্তু তিনি যদি না বোঝেন, আমার তখন আর কোন উপায় থাক্‌বে না। সেইজন্যই সর্ব্বাকে তাড়াতাড়ি এই কাজে ঢোকাতে চাচ্ছি।"

কার্ত্তিক কহিল, "কিন্তু সর্ব্বদাদাও ত স্বাধীন নয়।"

শশিভূষণ কহিল, "ও সম্পূর্ণ স্বাধীন নয় বটে, তবু কতকটা স্বাধীন। কারণ প্রথমতঃ ওর নিজের বল্‌তে কেউ তেমন নেই, যার মুখ চেয়ে ওকে থাক্‌তে হবে। আর কালিকা কাকা? তিনি ওর ভালবাসা আর সম্মান ছাড়া ওর উপর অন্য কিছুরই দাবী রাখেন না। এ সংবাদ আমি জানি, তাই ওকে আমার কাজে ডেকে নেবার চেষ্টা কর্‌ছি।"

কার্ত্তিক কহিল, "কালিকাবাবুরই অর্থ-সাহায্যে ওর সমস্ত হচ্চে, অথচ ও মুক্ত! আর আমার ওপর তাঁর লুব্ধ দৃষ্টি আছে বলে আমি বদ্ধ!"

শশিভূষণ কহিল, "লোভ! কালিকা কাকার এত বড় অপমান তুই কর্‌লি? তোর মুখ না দেখাই উচিত। যিনি তোকে এত ভালবাসেন যে তোর হাতে তাঁর সর্ব্বস্ব অর্পণ কর্‌তে এক মুহূর্ত্ত দ্বিধা কর্‌বেন না, তাঁকে বল্‌ছিস্, লোভী! এতখানি ভালবাসার এত-বড় অপমান কর্‌তে তোর সাহস হল! না কার্ত্তিক, আমি তোমায় চাই না।"

কার্ত্তিক মৌন হইয়া রহিল, কিন্তু তাহার সমস্ত দেহের মধ্যে একটা প্রচণ্ড অভিমান ও ক্রোধের উষ্ণ রক্তস্রোত বহিতে লাগিল। তাহার মুখের ভাব দেখিয়া সর্ব্বানন্দ তাহার হাত ধরিয়া বলিল, "কার্ত্তিক, ভাই, আমায় ক্ষমা কর!"

কার্ত্তিক কহিল, "ক্ষমা! ক্ষমা আমি আমাকেই কর্‌তে পার্‌ছি না

তা তোমাকে! আমি কাউকে ক্ষমা করব না। আমি তোমায় ছাড়্‌ব না, তোমাকে দিয়েই আমার স্বাধীনতা কিনে নেব।"

শশিভূষণ সহসা উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "কথায় কথায় বেলা গেল। চল, আজ যেখানে তোমাদের নিয়ে যাব বলেছিলুম, সেইখানে নিয়ে যাই। কার্ত্তিক, ভাই, সেখানে গিয়ে সব অবস্থা দেখেও যদি না তুমি আমাদের ক্ষমা কর্‌তে পার, যদি না কেমন করে নিজের ইচ্ছেকে দমন করে পরের জন্য নিজেকে উৎসর্গ কর্‌তে হয় শিখ্‌তে পার, তাহলে বুঝ্‌ব, তোমার আর কোন আশা নেই।"

৪

বাগবাজারে এক গলির মোড়ে এক দ্বিতল অট্টালিকার সম্মুখে শশিভূষণ ও তাহার বন্ধুদ্বয় আসিয়া দাঁড়াইল। তখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। বড় রাস্তা ও গলির সব আলোগুলাই জ্বলিয়া উঠিয়াছে এবং অনতিদূরস্থিতা গঙ্গার যে অংশ দেখা যাইতেছিল, তাহাতেও অসংখ্য সচল আলোক-বিন্দু ভাসিয়া বেড়াইতেছে।

শশিভূষণ কড়া ধরিয়া কোন এক কৌশলে টানিবামাত্র ভিতর হইতে দরজা খুলিয়া গেল। শশিভূষণ বন্ধুদের লইয়া ভিতরে ঢুকিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিল।

বন্ধুদ্বয় প্রবেশ করিয়া দেখিল, গৃহটি বাহির হইতে যেরূপ মনে হইয়াছিল, সেরূপ নয়। উঠানটি বেশ প্রশস্ত। উঠানের চারিদিকেই বারান্দা এবং সেই বারান্দা নানাজাতীয় পুষ্পিত ও অপুষ্পিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লতায় শোভিত। সমস্ত বাড়ীটি বৈদ্যুতিক আলোকে আলোকিত। দেখিলেই বুঝা যায়, যেন সমস্ত বাড়ী হইতে চেষ্টা করিয়া অন্ধকারকে দূর করা হইয়াছে। যেখানে আলোর কোন প্রয়োজন নাই, সেখানেও

হয়ত একটা বড় টবে বড় একঝাড় জুঁই ও তাহার উপর একটা আলোকাধার হইতে আলোক বিকীর্ণ হইয়া স্তবকে স্তবকে প্রস্ফুটিত শ্বেতপুষ্পের অমল শুভ্রতা আরও বাড়াইয়া তুলিয়াছে। উঠানটির মাঝখানে গোলাকার বেদী ; তাহার উপরও একটা প্রকাণ্ড চিনামাটির টবে একরাশ গন্ধরাজ ফুটিয়া রহিয়াছে!

বন্ধুদ্বয় অধিকক্ষণ ধরিয়া এই সমস্ত পর্য্যবেক্ষণ করিবার সময় পাইল না, কারণ দুইটী বালক ও একটী বালিকার সঙ্গে এক সুবেশা রমণী আসিয়া অপর দিকের বারান্দায় দাঁড়াইয়া বলিল, "শশিদা, মার জ্বর আজ বেড়েছে, তোমায় ডাক্‌ছেন।"

শশিভূষণ কহিল, "সরোজ, এদের নিয়ে গিয়ে আমার ঘরে বসাও। আমি যাচ্ছি।"

শশী তাড়াতাড়ি একটী সোপান অবলম্বনে উপরে চলিয়া গেল। রমণী, বন্ধুদ্বয়ের নিকটে আসিয়া বলিল, "আসুন আপনারা।"

কার্ত্তিক ও সর্ব্বানন্দ দেখিল, রমণী সুন্দরী, বয়স অনুমান সতেরো আঠারো বৎসর হইবে। সে যে-ভাবে তাহাদের নিকট আসিয়া দাঁড়াইল, তাহাতে যথেষ্ট লজ্জাহীনতা প্রকাশ পাইল বটে, কিন্তু তাহার মুখের দিকে চাহিয়া উভয় বন্ধুই নিমেষে বুঝিল, রমণী দৃষ্টি-শক্তি-হীনা। যদিও সুন্দর মুখখানির উপর দুইটী আয়ত নয়ন লজ্জা-সঙ্কোচহীন সৌন্দর্য্যে ফুটিয়া রহিয়াছে, তথাপি তাহাতে অন্ধজন-সুলভ উদ্দেশ্যহীনতা প্রকাশ পাওয়ায় উভয় বন্ধুরই সমস্ত সঙ্কোচ মুহূর্ত্তে কাটিয়া গেল। এক দুর্ভেদ্য অন্তরালে অবস্থিত নরনারীর মধ্যে যেমন কোন সঙ্কোচের প্রয়োজন থাকে না, তেমনই কার্ত্তিক ও সর্ব্বানন্দ তাহাদের সমস্ত দ্বিধা ত্যাগ করিয়া বলিল, "চলুন।"

রমণী, বালক-বালিকাদের নিকটস্থ হইয়া বালকদ্বয়কে বলিল,

"তোমরা সুকুকে নিয়ে রঘুকাকার কাছে গিয়ে গল্প শোনোগে—আমি এঁদের নিয়ে ওপরে যাচ্ছি। সুকু এদের সঙ্গে যাও।

বালকদ্বয়ের মধ্যে একটী বালক নিকটে আসিয়া কার্ত্তিককে স্পর্শ করিয়া বলিল, "আপনি কি সর্ব্বদাদা ?"

কার্ত্তিক বলিল, "না, আমি কার্ত্তিকদাদা ?"

তার পর উহার হাতখানি সর্ব্বানন্দর গায়ে ছোঁয়াইয়া বলিল, "উনিই তোমার সর্ব্বদাদা।"

সর্ব্বানন্দ বালকটিকে হস্ত দ্বারা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "চল, তোমরা আজ আমার কাছেই থাক্‌বে। তোমার নাম কি ভাই ?"

বালক বলিল, "আমার নাম শ্রীমনীশচন্দ্র ঘোষ, ওর নাম শ্রীজ্যোতি-প্রসাদ রায়। আর সুকুর নাম, শ্রীমতী সুকুমারী দেবী।"

কিশোরীটি হাসিয়া বলিল, "আর আমার নাম বল্‌লিনে ?"

মনীশ বলিল, "তোমার নাম কি তুমি এতক্ষণও বল নি ? আপনারা সরোদিদির নাম জানেন না ?"

সর্ব্বানন্দ কহিল, "এই ত জান্‌লুম। চল ওপরে যাই।"

কার্ত্তিক দেখিল, রমণী অন্ধ বটে কিন্তু অভ্যাসের জন্য এমনভাবে চলিতেছে যেন সে সমস্তই দেখিতে পাইতেছে। সোপান অতিক্রম করিয়া সে উপরে উঠিল, এবং পথে যে সমস্ত বস্তু ছিল, অনায়াসে তাহা-দের পাশ কাটাইয়া একটী কক্ষের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "ভিতরে চলুন।"

কার্ত্তিক ও সর্ব্বানন্দ কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিল, উহার সাজ-সজ্জা একটু অন্য ধরণের, এটি যেন পাঠ-কক্ষ। সমস্ত বাড়ীর প্রত্যেক গলি-ঘুঁজিও যেমন নানারূপ চিত্রাদিতে পরিশোভিত, এই কক্ষে তেমন কিছুই নাই। ইহাতে কেবল আলমারি, টেবিল ও পুস্তকের রাশি।

কক্ষের মধ্যস্থলে একটা বড়-রকমের ফুলের তোড়ার মত বৈদ্যুতিক আলোকের তোড়া কড়িকাঠ হইতে ঝুলানো রহিয়াছে।

কক্ষের মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া কার্ত্তিক সর্ব্বানন্দকে বলিল, "সর্ব্ব-দা, আজ যেন আমার প্রথম চোখ ফুটল। আগে জানতুম না, আলো এত সুন্দর!"

সর্ব্বানন্দর উত্তর দিবার পূর্ব্বেই মণীশ বলিয়া উঠিল, "আমি ছেলে-বেলায় আলো দেখেছি; কিন্তু জ্যোতি বলে, আলো কেমন, জানিনে। ও বলে, আলো নেই, ও-সব মিছে কথা।"

সর্ব্বানন্দ কহিল, "সুকু কি বলে?"

সুকুমারী আর জ্যোতিপ্রসাদ বাহিরেই দাঁড়াইয়াছিল। তাহাদের দিদি ঘরে প্রবেশ না করিলে তাহারা প্রবেশ করিবে না। এইভাবে তাহাদিগকে রমণীর অঞ্চল ধরিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া কার্ত্তিক বলিল, "আপনারা ভিতরে আসুন, আর আমাদের কাছে সঙ্কোচ করবার প্রয়োজন নেই, আমরা আপনাদের আত্মীয়।"

রমণী প্রবেশ করিয়া বলিল, "সঙ্কোচ করবার আর আমাদের উপায় কৈ? যার জন্য সঙ্কোচ, তাই আমাদের নেই।" সর্ব্বানন্দ সসঙ্কোচে বলিল, "আপনি জন্মাবধিই কি এই রকম?"

সরোজ কহিল, "কি রকম সে কথা বলতে সঙ্কোচ বোধ করছেন কেন? আপনাদের চোখ আছে, তাই এ বিষয়ে আপনাদের হার! আমাদের চোখ যেদিন থেকে গিয়েছে, সেইদিন থেকে ও বাধাটুকুও দূর হয়েছে। এখন আমাদের পক্ষে সবই সমান। আমি জন্মান্ধ নই, এখনও আমার চোখে সম্পূর্ণ অন্ধকার নেমে আসেনি—ঐ আলোর একটা অস্পষ্ট আভাস আমি পাচ্ছি—যেন একটা পুরু কাপড়ের মধ্য দিয়ে আলো আসছে। আমার যখন আট-ন' বছর বয়স, তখন থেকে আমার চোখের দোষ দেখা দেয়, তার পর ক্রমশঃ আমার এই অবস্থা দাঁড়িয়েছে।"

কার্ত্তিক কহিল, "আপনার আবার সেই পূর্ব্বাবস্থা পেতে ইচ্ছা করে না?"

কথাটা শুনিবামাত্র সর্ব্বানন্দ লজ্জিত হইয়া ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে কার্ত্তিকের পানে চাহিল। কিন্তু নির্লজ্জ কার্ত্তিক নির্ব্বিকার চিত্তে সরোজিনীর দিকে উত্তরের প্রতীক্ষায় চাহিয়া রহিল। সরোজিনী তাহার দৃষ্টি-শক্তি-হীন বিশাল চক্ষু কার্ত্তিকের মুখের উপর স্থাপিত করিয়া বলিল, "হারানো জিনিস কে না ফিরে চায়?"

কার্ত্তিক কহিল, "আর যার কিছু হারায়নি? যে জন্মান্ধ?"

সরোজ কহিল, "তার কি হয়, তা এই সুকুকে জিজ্ঞাসা করুন। কেমন সুকু, তুই আলো দেখ্‌তে চাস্?"

সুকুমারী মাথা নাড়িল। সরোজ তাহার পিঠে হাত দিয়া বলিল, "তা লজ্জা কি, বল্ না?"

সুকুমারী মৃদু স্বরে বলিল, "আলো যে কি, তাই আমি বুঝিনে।"

সর্ব্বানন্দ বলিল, "আমি তোমায় বুঝিয়ে দেব সুকু, তুমি আমার কাছে এস।"

সরোজিনী তখন হাসিয়া বলিল, "আপনারা তাহলে এদের সঙ্গে আলাপ করুন, আমি আপনাদের জলখাবারের জোগাড় করে আনি।"

সে বাহির হইয়া গেলে সর্ব্বানন্দ কার্ত্তিককে বলিল, "কার্ত্তিক, তোর একটুও বুদ্ধিশুদ্ধি নেই! কি করে ও কথা ওঁকে জিজ্ঞাসা কর্‌লি?"

কার্ত্তিক কহিল, "অন্ধের কাছে লজ্জা বা সঙ্কোচ দেখানো আর একটা অন্ধতা।"

সর্ব্বানন্দ কহিল, "উনি অন্ধ হলেও স্ত্রীলোক ত!"

কার্ত্তিক কহিল, "ওটাও একটা অন্ধতা! তুমি দেখ্‌তে পাচ্ছ বলে ওঁকে বল্‌ছ, স্ত্রীলোক! যদি না দেখ্‌তে পেতে, তাহলে উনি স্ত্রীলোক

কি পুরুষ, তা-নিয়ে কোন প্রশ্নই উঠ্‌ত না। এ স্ত্রীলোক, ও পুরুষ, এ সমস্তই চক্ষুষ্মানের অন্ধতার ফল। আমি তোমার মত অন্ধ নই, তাই ওঁকে কেবল মানুষ বলেই দেখ্‌ছি।"

সর্ব্বানন্দ আর কোন উত্তর না দিয়া বালক-বালিকাদের সহিত আলাপ আরম্ভ করিয়া দিল। কিছুক্ষণ পরে শশিভূষণ সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া বলিল, "দেরী হয়ে গেল—কি কর্‌ব? আমার শাশুড়ীর জ্বর বেড়েছে। আজ বোধ হয় তোমাদের সঙ্গে ফির্‌তে পার্‌ব না। সরোজ কৈ? তোমাদের জল-টল দেয় নি যে এখনও!"

কার্ত্তিক কহিল, "তিনি তোমার চেয়ে কম বুদ্ধিমতী নন। আমরা যে দুর্ভিক্ষপীড়িত অতিথি, সে কথা তিনি আগেই বুঝ্‌তে পেরেছেন, আর তারই জোগাড়ে গেছেন।"

শশিভূষণ কহিল, "এই অন্ধের বাথানে পড়ে তোমাদের কষ্ট হয়নি ত?"

কার্ত্তিক কহিল, "এত কষ্ট হয়েছে যে ইচ্ছে কর্‌ছে, আমিও অন্ধ হয়ে গিয়ে এই রকম করে তোমাদের সেবা নি। যোদ্ধা, তোমার শ্বশুর-মশায় সুন্দর বাড়ী, লোক-জন, সব ফেলে মলেন কি করে, আমি তাই ভাবৃছি —আর আশ্চর্য্য হচ্ছি!"

শশিভূষণ কহিল, "তিনি ডাক্তার ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁর মনটির মধ্যে বোধ হয় কবিতা দেবী সর্ব্বদাই উঁকি-ঝুঁকি মার্‌তেন।"

সর্ব্বানন্দ কহিল, "ভাই অমন লঘুভাবে তাঁর বিষয় নিয়ে কথা বলো না। ঠাকুরদা, এই সরোজ তোমার কে হয়?"

শশিভূষণ কহিল, "সরোজের পরিচয় এখনও পাওনি? এতক্ষণ পর্য্যন্ত যে তার থলি খালি হয়নি, এইটেই আশ্চর্য্য! ওর পরিচয় তবে দি। ও আমার শাশুড়ীর গুরুদেবের নাতনী। অন্ধ হবার পর থেকে ওর

চিকিৎসার জন্য শ্বশুর-মশায় ওকে এখানে নিয়ে আসেন। সেই থেকে ও এই হতভাগার জোগাড়-করা সম্পত্তি। শাশুড়ীর কন্যাটী মারা যাবার পর থেকে, কি জানি কেন হঠাৎ তাঁর খেয়াল ওঠে যে, গরীব-দুঃখীর অন্ধ ছেলে-মেয়েদের চোখের চিকিৎসায় তাঁর স্বামীর ত্যক্ত সমস্ত সম্পত্তি তিনি ব্যয় করবেন। এমন সময় আমি জুটে পড়ে তাঁকে আমার খেয়ালে যোগ দিতে অনুরোধ করি। তার পর থেকে এই যা দেখ্‌ছ। এরা ছাড়া আরও দু-চারটি ছেলে-মেয়ে এখানে আসে, কিন্তু তারা দিনে আসে দিনেই চলে যায়। সরোজের উপরই এদের সব ভার। সেই প্রোফেসর, আমি প্রিন্সিপাল মাত্র, যখন খুসী আসি, যখন খুসী চলে যাই।"

তাহাদের কথাবার্ত্তা চলিতেছে, এমন সময় সরোজিনী একজন দাসীর সাহায্যে তিনখানি রেকাবিতে মিষ্টান্নাদি লইয়া কক্ষে প্রবেশ করিল। শশিভূষণ হাসিয়া বলিল, "সরোজ, এই রকম করে কি তুমি অতিথি-সেবা কর না কি? অতিথিরা ত তৃষ্ণায় ছাতি ফেটে মরবার মত হয়েছিল,—আগে থেকে জোগাড় করে রাখনি কেন?"

সরোজ কহিল, "তুমি যে আজই এঁদের আন্‌বে, তা ত বলে যাওনি। আপনারা ত্রুটি মার্জ্জনা করে মিষ্টিমুখ করুন।"

কার্ত্তিক কহিল, "ঠিক! আপনার যথেষ্ট বুদ্ধি আছে বটে, ঘুষ দিয়ে আগে মুখ বন্ধ করে দিন, তার পর আর আমাদের কিছুই বল্‌বার থাক্‌বে না।"

শশিভূষণ কহিল, "তোমার মত জ্যাঠা মশায়ের মুখে ঘুসি মার্‌লেও মুখ বন্ধ হবে না, তা ঘুষ! যাক্‌ লেগে পড়ি, এস। সরোজ, আমার চা কৈ?"

সরোজ কহিল, "সে আর বল্‌তে হবে না। লোকজন বেশী দেখে রঘুদা বামুন ঠাক্‌রুণের হাঁড়ি নামিয়ে বড় কেট্‌লিতে জল চাপাবার

চেষ্টায় ছিল, আমি বারণ করে দিয়ে ষ্টোভে চড়িয়েছি। আগে জল খেয়ে ঠাণ্ডা হও, তার পর চা খেয়ে গরম হয়ো। বিন্দি, তুই দেখ্‌গে, জল হ'ল কি না।”

বিন্দি দাসী চলিয়া গেলে শশী রাগিয়া বলিল, “এই যে দেখ্‌ছ ব্রাহ্মণীটিকে, ইনি চোখের মাথা খেয়ে অবধি লজ্জার মাথাও খেয়েছেন! ওগো, দুটো অপরিচিত মানুষ এখানে আছে, দেখ্‌তে পাচ্ছ না?”

সরোজ তাহার অন্ধ স্বভাবের বহির্ভূত ভাবে একটু জোরে হাসিয়া বলিল, “কি করে দেখ্‌তে পাব? আশাদিদি গিয়ে পর্য্যন্ত তুমি এমনই অন্ধকার হয়ে দাঁড়িয়েছ যে, আমাদের অন্ধকারও তোমার আগমনে তিন গুণ বেশী হয়ে দাঁড়ায়, তা দেখ্‌ব কি?”

শশিভূষণ কার্ত্তিকের পানে ফিরিয়া বলিল, “এঁর আক্কেলটা ত শুন্‌লে তোমরা! নিজের চক্ষুদুটো খেয়েও তৃপ্তি নেই! আবার আমার দুটীর উপরও টাঁক কর্‌ছ?”

সরোজ তেমনি হাসিতে হাসিতেই উত্তর দিল, “ধৃতরাষ্ট্রের চোখ ছিল এমন অপবাদ ত অতি বড় শত্রুতেও দিতে পারেনি। তাইতেই ত আমার আশাদিদি গান্ধারীর মত চোখ ঢাকেন। তোমার চোখ ছিল কবে যে, তা খাব?”

শশিভূষণ হতাশভাবে মাথায় হাত দিয়া বসিয়া কার্ত্তিক ও সর্ব্বানন্দর পানে চাহিতে লাগিল। কার্ত্তিক অত্যন্ত হাসিতে হাসিতে বলিল, “আঃ ঠাকুরদা, তোমার এমন হার—এ আমাদের পক্ষে যে কি উপভোগের জিনিস, তা আর কি বল্‌ব?”

সর্ব্বানন্দ এই সকল হাস্য-পরিহাসে যোগ দিতে না পারিয়া মণীশের হাতে একটা রসগোল্লা দিয়া বলিল, “এটা কি বল ত?” মণীশ নির্ব্বিবাদে সেটা উদরসাৎ করিয়া বলিল, “রসগোল্লা।”

কার্ত্তিক তাহার হাতে সর্ব্বানন্দর রেকাবিটা উঠাইয়া দিয়া বলিল, "বোকা কোথাকার! বল্‌তে হয়, আরও দু-চারটে না পেলে বুঝ্‌ব কি করে?"

বালক রেকাবি নামাইয়া দিয়া বলিল, "আমরা জল খেয়েছি সর্ব্বদাদা, আপনি খান।" জ্যোতিপ্রসাদের বোধ হয় প্রসাদ পাইবার ইচ্ছা হইয়াছিল, তাই সে একটু নড়িয়া-চড়িয়া বসিল। কার্ত্তিক তাহার ও সুকুমারীর হাতে সন্দেশ দিতে উদ্যত হইলে শশী বলিল, "ওরে শূয়ার, মেশে পৌঁছুতে রাত দশটা বেজে যাবে। বোকামি করিস্‌ নে, খেয়ে ফেল।"

ইতিমধ্যে বিন্দি দাসী তিন পেয়ালা চা লইয়া উপস্থিত হইল। সর্ব্বানন্দ জিজ্ঞাসা করিল, "তিন পেয়ালা কেন? আমরা ত চা খাই না।"

শশিভূষণ কহিল, "সরোজ আজ তোমাদের জাত মারবে ঠিক করেছে। ওর হাতে যখন পড়্‌তে যাচ্ছ, আর আমার সাকরেদী যখন নিতে চলেছ—"

সরোজ কহিল, "তখন আপনাদের চক্ষু দুটীও যাবে, বুদ্ধিও খোঁড়াবে! আরও যে কি সব বিপদ ঘট্‌বে, তা মনেই আন্‌তে পার্‌ছি নে।"

কার্ত্তিক কহিল, "তার আর আশ্চর্য্য কি! এ বাড়ীর সমস্ত স্থানই বোধ হয় চক্ষু রোগের বীজাণুতে পরিপূর্ণ। আর কথায় বলে, সংসর্গজা দোষগুণা ভবন্তি।"

শশিভূষণ কহিল, "এই রে সর্ব্বনাশ করলে! সংস্কৃত আউড়েছ কি মরেছ! ঐ যে দেখ্‌ছ ব্রাহ্মণীটিকে, উনি এই আমার মত বর্ব্বরকে দিয়েও দু'খানা সংস্কৃত বই transcribe করিয়ে নিয়েছেন। অতএব চেপে যা, কার্ত্তিক, যদি ও টের পায় যে তুই ভাল সংস্কৃত জানিস্, তাহলে

তোকে এমন চৌচাপটে ধরে বস্‌বে যে, আর তোকে উদ্ধার করা যাবে না। তখন রোজ এসে একখানা করে বই শুনিয়ে যেতে হবে। বাইরের দুটি চক্ষুর মাথা খেলে কি হয়—ভিতরের আর একটি চোখকে দেবী খুব উজ্জ্বলভাবেই জগতের উপর স্থির রেখেছেন। ওঁর সেই তৃতীয় নয়নের দৃষ্টিলাভটি যার কপালে ঘটে, তার আর সহজে নিস্তার নেই! তাছাড়া—"

শশী কি বলিতে গিয়া থামিয়া গেল, কারণ সরোজ এবার সত্যই লজ্জিত হইয়াছিল। কার্ত্তিক কিন্তু থামিবার পাত্র নহে। এই অন্ধ নারীর সঙ্কোচহীন আলাপে তাহার মাথার মধ্যে এক অপূর্ব্ব খেয়াল জাগিয়া উঠিয়াছে। সরোজের অন্ধ-নয়নের অন্ধকারের ব্যবধান দুই হাতে সরাইয়া তাহার মনের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিবার একটা উদ্দাম চেষ্টা তাহাকে পাইয়া বসিল। সে বলিল, "আমি রাজী আছি।" শশী এইবার শঙ্কিত হইয়া বলিল, "তা হয় না, কার্ত্তিক! আমিই এ ক্ষেত্রে ওঁর একমাত্র কর্ণধার হয়ে থাক্‌বার দাবী রাখি। সে দাবীর স্বত্ব আর কাউকে বিলিয়ে দিতে পার্‌ব না।"

সরোজ ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, "বটে! আমরা যাই পৃথিবীতে আছি, তাই তোমার মত অকেজো লোকের দিনপাত হয়! তা স্বীকার না করে উল্টে কর্ণধারের খবর! আমরাই বরং এ কথা বল্‌তে পারি, তা জান!"

শশিভূষণ কৃতাঞ্জলি-পুটে নিজের কান সরোজের হাতের দিকে অগ্রসর করাইয়া দিয়া বলিল, "দেবি, ভৃত্যের অবিনয় ক্ষমা করে তার কর্ণটি করপল্লবে ধারণ করে এই দেবী যে জগতে মাত্র একা এরই, এটি সর্ব্ব-সমক্ষে প্রমাণিত করে দাসকে কৃতার্থ কর।"

সরোজ সে কথা কানে না তুলিয়া নিজ-মনে বলিল, "দয়ার দাবী জগতের প্রত্যেকেরই আছে। এ কারও স্বত্বের বস্তু নয়, কার্ত্তিক বাবু, আপনার ইচ্ছা হলেই স্বচ্ছন্দে আপনি আস্‌বেন।"

কার্ত্তিক এতক্ষণে রুদ্ধ নিশ্বাসকে মুক্ত করিয়া দিয়া বলিল, "বাঁচ্‌লুম্‌! আপনাদের রাজায়-রাজায়-যুদ্ধে উলু খড়ের প্রাণ যাবার যোগাড় হয়েছিল, আর কি! আপনার অভয়-বাণীই আমার পক্ষে যথেষ্ট।"

শশিভূষণ তাহার আশঙ্কাকে যথাসাধ্য দমন করিয়া কৃত্রিম কোপে চক্ষু রাঙ্গাইয়া বলিল, "তবে রে অকৃতজ্ঞ! একেবারে ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস্‌ খাওয়া! তুই কি ভেবেছিস, ঢুকে পড়্‌লেই হ'ল! এ সভার যোগ্য সভ্যকেজো হওয়ার যোগ্যতা তোর হাড়ের দিক্‌ দিয়েও যে নেই। তখন পালাবার পথ পাবি না, তাই বল্‌ছি, এইবেলা সাবধান হ।"

কার্ত্তিক অকুণ্ঠিত মুখে হাসিতে হাসিতে বলিল, "যোগ্যতা কি এক-দিনেই পাওয়া যায়? কতদিনের সাধনায় ক'বছর এফ-এ ফেল্‌ করে এমন যোগ্য হয়ে দাঁড়িয়েছ, বল দেখি? তেমনি—"

সর্ব্বানন্দ এতক্ষণে বাধা দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "চল কার্ত্তিক, আর না! ঠাকুরদা, আজ আমরা আসি।" কার্ত্তিককে একটু অনিচ্ছুক বুঝিয়া সে আবার বলিল, "মেশের ঠাকুর হয় ত এতক্ষণ চলে গেছে, আর দেরী নয়।" শশিভূষণ সাগ্রহে বলিল, "আজ না হয় এইখানেই সে কাজটা সারো! এই ব্রাহ্মণী দ্রৌপদীটির তত্ত্বাবধানে মেশের চেয়ে সে কাজটা এখানে একটু পরিপাটী রকমেই সম্পন্ন হবে।" সর্ব্বানন্দ রাজী হইল না, অগত্যা কার্ত্তিকও বাধ্য হইয়া তাহার অনুসরণ করিল।

৫

এ বৎসর ভীষণ বর্ষায় শিবরামপুর ও তন্নিকটস্থ বহু গ্রাম ডুবিয়া যাওয়ায় প্রজারা অত্যন্ত কষ্ট পাইতেছিল। জলের জন্য ধান্যাদির আবাদের ত যথেষ্টই ক্ষতি হইয়াছিল; তাহার উপর ম্যালেরিয়ার প্রকোপ অত্যন্ত বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং খাদ্যের অভাবে দলে দলে গবাদি পশুর মৃত্যু ঘটায়

জমিদার কালিকামোহন অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। তাঁহার নিজের আমলাদের মধ্যেও অনেকে জ্বরাক্রান্ত হইয়া খাজনা-আদায়াদি কার্য্যের অসুবিধা ঘটাইয়াছে। তাঁহার দুর্দ্ধর্ষ পাইক ও দরোয়ানদের মধ্যেও অনেকে শিবরামপুরের "ঘিউ-রোটীর" মায়া ত্যাগ করিয়া দেশে পলাইয়াছে। কেবল তাঁহার প্রধান শরীর-রক্ষী ঘনবরণ সিং দুই-তিনবার উল্টান্-পাল্টান্ খাইয়াও তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া যায় নাই। অন্তঃপুরেও অনেকে জ্বরাক্রান্ত হইয়াছে। শৈলজা স্বয়ং দুইবার শয্যাগ্রহণ করিয়া এখন তাহার মাতার সেবা করিতেছে। কালিকাবাবু একাকী সমস্ত গ্রামের তত্ত্বাবধান ও স্বীয় গৃহে ঔষধাদির ব্যবস্থা করিতে করিতে আজ দুইদিন হইতে ক্রমাগত কুইনিন সেবন করিয়া কোন প্রকারে হাঁটিয়া বেড়াইতেছেন। এমন সময় কোথা হইতে এক বেনামী পত্র আসিয়া তাঁহার কপালের চিন্তা-রেখাটিকে স্পষ্টতর করিয়া তুলিল। তিনি ব্যস্ত হইয়া ন্যায়রত্ন মহাশয়কে ডাকিয়া পাঠাইলেন। শিবচন্দ্র আসিলে তাঁহাকে সে পত্র দেখাইবামাত্র তিনি বলিলেন, এ কোন শত্রুর কাজ। কার্ত্তিক ও সর্ব্বানন্দর উন্নতিতে যারা হিংসান্বিত, তারাই এরূপ পত্র লিখ্‌তে পারে। মনোহরবাবুর ছেলেটি কি ইতিমধ্যে কোন পত্র দেয়নি?" কালিকাবাবু বলিলেন, "আজ কয়মাস হইতে তাহারও কোন পত্র পাওয়া যায় নাই।" শিবচন্দ্র বলিলেন, "শশিভূষণকে পত্র লিখিয়া না হয় এ বিষয়ে অনুসন্ধান করা হোক।" কালিকাবাবু মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "এ বিষয়ে তাহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে তাঁহার লজ্জা বোধ হইতেছে।" তাহাদের সম্বন্ধে এরূপ সন্দেহ করাও তাঁহার মতে অন্যায়। তথাপি অভিভাবকের কর্ত্তব্যানুসারে এ বিষয়ে অনুসন্ধান না করাও অন্যায়, এই জন্যই তিনি তাঁহার এটর্ণি শ্যামসুন্দরবাবুকে পত্র দিবেন স্থির করিয়াছেন। শিবচন্দ্র ন্যায়রত্নেরও তাহাই সমীচীন বলিয়া বোধ হইল।

ন্যায়রত্নের পত্নী মনোরমা দেবী কিন্তু বেনামী পত্রের কথা শুনিয়া ক্রোধে অধীর হইয়া বলিলেন, "কার্ত্তিককে যা'রা সন্দেহ করে বা তার বিরুদ্ধে যা'রা কুৎসা রটায়, হোক্ না কেন তারা যত বড় মারণ-উচাটন-বশীকরণ-পটু সাধু-সন্ন্যাসী, তবু তাদের মুখ খসে যাবে।" তাঁহার এই অভিমত কোন গূঢ় উপায়ে দেওয়ান-পত্নী নিস্তারিণী দেবীর শ্রুতিগোচর হইলে তিনিও গম্ভীরভাবে বলিলেন, "যদি সে পাপিষ্ঠা এই কথা বলিয়া থাকে, তাহা হইলে শঙ্করানন্দের ক্রোধানলে শীঘ্রই যেন সে ভস্মীভূতা হয়!"

কিন্তু কালিকাবাবু তাঁহার এটর্ণির নিকট হইতে যে পত্র পাইলেন, তাহা মোটেই আশাপ্রদ হইল না। তিনি লিখিয়াছেন, আজকাল সর্ব্বানন্দ ও কার্ত্তিকের পড়াশুনায় বিশেষ অমনোযোগ লক্ষিত হইতেছে এবং তাহারা প্রায় প্রতি সন্ধ্যায় এবং ছুটির দিনে সমস্ত সময়টুকুই বাহিরে কাটায়। কোথায় যায় সে সংবাদ এখনও 'টোর্ণি' মহাশয় সংগ্রহ করিতে পারেন নাই, তবে শীঘ্রই সে সংবাদ তিনি সংগ্রহ করিবেন, এমন আশাও দিয়াছেন।

কালিকা বাবু এ পত্র পাইয়া মর্ম্মাহত হইলেন। সন্দেহ ক্রমশঃ বিশ্বাসে পরিণত হইতে চলিল, কারণ ইতিমধ্যে আরও একখানি বেনামী পত্রে কার্ত্তিক ও সর্ব্বানন্দর গতিবিধির বিষয়ে সঠিক সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। কার্ত্তিক ও সর্ব্বানন্দ বাগবাজারের কোন এক দ্বিতল গৃহে যাতায়াত আরম্ভ করিয়াছে এবং সেই গৃহের সমস্ত ব্যাপারই সন্দেহ-জনক।

কালিকাবাবু আর থাকিতে পারিলেন না, তিনি সেইদিনই দুইখানা পত্রে সমস্ত ব্যাপার খুলিয়া লিখিয়া কার্ত্তিক ও শশিভূষণের নামে তাহা পাঠাইয়া দিলেন। দুই-তিন দিনের মধ্যে উত্তর আসিল।

কার্ত্তিক লিখিয়াছে—'সংবাদ সমস্তই সত্য, কিন্তু তাহাতে আশঙ্কা করিবার কিছুই নাই; সর্ব্বানন্দ ও কার্ত্তিক কোন এক পরোপকার-ব্রতে ব্রতী আছে। কিন্তু সে বিষয়ে কাহাকেও কোন কথা খুলিয়া বলিতে সে অনিচ্ছুক। তবে কালিকাবাবু বা পিতা যদি স্বয়ং আসিয়া এই বিষয় জানিয়া যাইতে চাহেন, তাহাতে কোন বাধা নাই। এ বিষয়ে কোন কথা কর্ণান্তর করিবার ইচ্ছা তাহার নাই; অপরের সন্দেহভঞ্জন করিবারও প্রবৃত্তি নাই। তবে পিতৃস্থানীয় কালিকাবাবুকে এবং পিতাঠাকুর মহাশয়ের কাছে তাহার গোপনীয় কিছুই নাই।"

কালিকাবাবুর উৎকণ্ঠা দূর হইল; এবং সেই কারণে তাঁহার যে জ্বরভাব দেখা গিয়াছিল, তাহারও শান্তি হইল। তিনি তৎক্ষণাৎ স্বহস্তে লিখিয়া দিলেন যে, এ-বিষয়ে আর তিনি কিছুই জানিতে চাহেন না। তবে পড়াশুনার পক্ষে ক্ষতিকর অত্যধিক পরোপকারের কার্য্য এখন একটু কমাইয়া অধ্যয়নাদিতে মনোনিবেশ করাই তাহাদের উচিত। কারণ পরোপকারের সময় বিদ্যার্জ্জনের কালের পরে আসাই যুক্তিসঙ্গত। বিশেষতঃ ছাত্রদের বিদ্যার্জ্জনই একপ্রকার তপস্যা।

কিন্তু কার্ত্তিককে পত্র পাঠাইয়া দেওয়ার একদিন পরেই শশিভূষণের পত্র পাইয়া কালিকাবাবু আবার ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। শশিভূষণ লিখিয়াছে, কার্ত্তিককে কলিকাতা হইতে স্থানান্তরিত করিয়া মফঃস্বলের যে কোন কলেজে ভর্ত্তি করিয়া দেওয়ার প্রয়োজন হইয়াছে, তাহা না হইলে সে কিছুতেই এবার পাশ করিতে পারিবে না। যদিও তাহার বর্ত্তমান কার্য্যে নৈতিক অবনতির কোন সম্ভাবনা নাই, কারণ সে যাহা করিতেছে, তাহা সকল উচ্চমনা ব্যক্তিরই কর্ত্তব্য; তথাপি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়াটাই যখন তাহার পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয়, তখন তাহাকে বর্ত্তমান পরোপকার-ব্রত হইতে নিবৃত্ত করাই আবশ্যক।

তবে সর্ব্বানন্দর কথা স্বতন্ত্র। সে পিতৃ-মাতৃহীন ব্রাহ্মণ-সন্তান। তাহাকে যে কার্য্যে শশিভূষণ নিয়োজিত করিয়াছে, তাহাতে সর্ব্বানন্দর আর্থিক ও মানসিক সর্ব্ববিধ উন্নতিই সম্ভবপর। অতএব তাহার বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকিয়া যাহাতে একমাত্র কার্ত্তিককে সরানো যায়, সেই ব্যবস্থা করার বিশেষ প্রয়োজন ঘটিয়াছে।

কালিকাবাবু মহা সমস্তায় পড়িয়া কি করিবেন স্থির করিতে পারিলেন না। আবার শিবচন্দ্রের ডাক পড়িল এবং বহু জল্পনা-কল্পনার পর স্থির হইল যে পরীক্ষার ফল দেখিয়া কর্ত্তব্য স্থির করা যাইবে, তবে ইতিমধ্যে বড়দিনের ছুটীতে অথবা লেক্‌চার্ শেষ করিয়া পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইবার সময় কার্ত্তিক যেন শিবরামপুরে চলিয়া আসে এই মর্ম্মে তাহাকে পত্র দেওয়া হোক।

কালিকাবাবুর মাতা ইতিমধ্যে মহা গোলযোগ বাধাইয়া দিলেন। তিনি বলিলেন, অরক্ষণীয়া কন্যা যে গৃহে এতদিন পর্য্যন্ত অবিবাহিতা থাকে, সে গৃহের অন্ন-জল তিনি গ্রহণ করিতে অক্ষম; অতএব শীঘ্র যদি শৈলজার বিবাহ না হয় তাহা হইলে তাঁহাকে অগত্যা বাধ্য হইয়া ৺কাশীধাম যাইতে হইবে। না হয় তিনি স্বয়ং যে কোন উপায়ে শৈলজার বিবাহ দিয়া শিবরামপুরের জমীদার বংশের সম্মান রক্ষা করিবেন। পুত্র কালিকামোহনের বুদ্ধি লোপ পাইয়াছে, নহিলে সমস্ত আত্মীয়-বন্ধুর অনুনয়, বিনয় ও ভয়-প্রদর্শনেও সে কেন অবিচলিত রহিয়াছে? সেদিন কালিকামোহনের মাতুল-পুত্র ত স্পষ্টই বলিয়া গেল যে ইহার পর আসিয়া শৈলজাকে যদি সে অবিবাহিতা দেখে, তাহা হইলে সে আর কালিকামোহনের গৃহে জলগ্রহণ করিবে না। ইহাতেও যদি কালিকাবাবুর চেতনা না হয়, তাহা হইলে তাঁহার মাতা আর অমন পুত্রের মুখদর্শন করিবেন না।

কালিকাবাবু বহু প্রকারে ভ্রাতাকে বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন তিনি বলিলেন, সমস্তই যখন ঠিক হইয়া আছে, তখন এত ব্যস্ত হইবার প্রয়োজন কি! বাগ্‌দত্তা হওয়াও যা, ব্রাহ্মণ-কন্যার পক্ষে বিবাহ হওয়াও তাই। এখন কার্ত্তিকের বিদ্যালাভ করিয়া ফিরিয়া আসারই কেবল অপেক্ষা! জগদম্বা দেবী কিন্তু বুঝিতে চাহিলেন না কালিকাবাবু তখন বাধ্য হইয়া শিবচন্দ্রকে ডাকিয়া পাঠাইয়া বলিলেন "এখন এর উপায় কি?"

শিবচন্দ্র কহিলেন, "উপায় আর কি! তাহ'লে এই অগ্রাণেই বিয়ের সমস্ত ঠিকঠাক করুন, আর আমিও কার্ত্তিককে সমস্ত কথা বুঝিয়ে পত্র দি।"

কালিকাবাবু কহিলেন, "কিন্তু কার্ত্তিক যদি অমত করে? সে বলে গিয়েছে, এফ-এ পরীক্ষায় পাশ না হয়ে সে আমাদের সঙ্গে দেখা করবে না। সে যে-রকম একগুঁয়ে তাতে আমার ভয় হয়, পাছে, কি করতে কি হয়!"

শিবচন্দ্র কহিলেন, "যদি তাই হয়, এমন কুসন্তানই সে হয়, যে, বাপমায়ের কথা বা আপনার মত হিতৈষীর কথা ঠেলে নিজের জেদ বজায় রাখে, তাহলে কোন্ সাহসে তার হাতে আপনার মেয়েকে আপনি তুলে দিতে চাচ্ছেন? আমার কথা যদি সে না শোনে, তাহ'লে আমি তার মুখ দর্শন করব না।"

কালিকাবাবু কহিলেন, "কি জানেন ন্যায়রত্ন মশায়, আপনার কার্ত্তিকটি আমায় যেন পেয়ে বসেছে! সদাই ভয় হয়, যদি তাকে না পাই! তার আশা ত্যাগ করতে হবে মনে হলে আমার সমস্তই যেন তিক্ত বোধ হয়। সেই ভয়ে আমি এতদিন পর্য্যন্ত চুপ করেই আছি। ও যখন আমার স্নেহটার অর্থ সম্পূর্ণ বুঝতে পারবে, তখন

আমার ধারণা আছে যে ও নিজেই এসে আমাকে আত্ম-সমর্পণ করবে। আমি সেই আশায় বসে আছি।"

শিবচন্দ্র হাসিয়া বলিলেন, "বৈবাহিক, আপনি নির্ভয়ে থাকুন। আমি স্বয়ং কার্ত্তিককে আপনার পায়ে এনে ফেলে দেব।"

৬

অনেক সাধ্য-সাধনা করিয়াও যখন নিদ্রা আসিল না, তখন বিরক্ত হইয়া কার্ত্তিক শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া ভিন্ন শয্যায় পাঠরত সর্ব্বানন্দকে বলিল, "সর্ব্ব-দা, আমি ছাতে চল্‌লুম, তোমার পড়া হয়ে গেলে ডেকো।" সর্ব্বানন্দ পুস্তক হইতে মুখ না তুলিয়া বলিল, "আচ্ছা।" কার্ত্তিক উপরে চলিয়া গেল।

কলিকাতার অবিশ্রাম কর্ম্মকোলাহল ক্রমশঃ থামিয়া আসিতেছে। কৃষ্ণাষ্টমীর গাঢ়-অন্ধকার আকাশ প্রকাণ্ড একটা বাটির মতই মাথার উপর চাপিয়া বসিয়া আছে। কার্ত্তিক ছাদের আলিসার উপর হস্তদ্বয় রাখিয়া আপনার নিদ্রাহীন ক্লান্ত ললাট তদুপরি স্থাপন করিল।

অন্ধকার! অন্তহীন রহস্যময় অন্ধকার! এই অন্তহীন অন্ধকার ভেদ করিয়া উহার অন্তরের লুকানো রহস্যকে জানিতে হইবে। কিন্তু কি উপায়ে? আলোক-প্রবেশে অন্ধকারের রহস্য কোথায় মিশাইয়া যায়! তাহার অন্ধকারত্ব, রহস্যময়তা বজায় রাখিয়া তাহার ভিতর প্রবেশ করিতে হইবে। কিন্তু কেমন করিয়া? আলোক চঞ্চল, গতিশীল। অন্ধকার স্থির, অবিচল; অথচ আলোকের সমস্তই স্পষ্ট, অন্ধকারের সমস্তই অজ্ঞাত। আলোক আপনাকে উন্মুক্ত করিয়া জানাইতে চাহে, অন্ধকার আপনার গোপন রহস্য লুকাইয়া

রাখে। যাহা চঞ্চল, যাহা অস্থির, তাহাই হইল জ্ঞানের কারণ তাহাই হইল প্রকাশের উপায়, আর যাহা স্থির, যাহা অচঞ্চল, তাহা মৌন, তাহাই নির্ব্বাক্! এ কি অপরূপ রহস্য!

আলোক সূচির মত বিঁধিয়া তরবারির ন্যায় চিরিয়া, সকল বস্তুর অণু-পরমাণুকে ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া যাহা-কিছু অজ্ঞাত, যাহা-কিছু মৌন তাহাকে কথা কহাইয়া, স্পষ্টতার কোলাহলে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলে। আর অন্ধকার নীরবে অতি সন্তর্পণে আপনার হৃদয়ের গোপন কথাটুকু জ্ঞানের বাহিরে লইয়া গিয়া সযত্নে রক্ষা করে। সে কাহাকেও ব্যস্ত করে না, কাহাকেও কিছু বলিতে চাহে না অথচ আলোক চলিয়া গেলেই ধীরপদে আসিয়া সে নির্ব্বাক্ ধ্যানে বসিয়া যায়।

কিন্তু যদি কান পাতিয়া থাকি, তাহা হইলে শুনিতে পাই, অন্ধকারের গোপনতম প্রদেশ হইতে একটা মৃদু গুঞ্জন-ধ্বনি উত্থিত হইতেছে। কে যেন আপনাকে জানাইতে চাহিতেছে, অথচ তাহার বাহিরে আসিবার জো নাই, যেন তাহার স্পষ্টতর স্ফুটতর হইবার উপায় নাই! কে তুমি? কি তুমি? কে তুমি আপনাকে জানাইতে চাও,—অথচ আলোর মধ্যে নয়, স্পষ্টতার মধ্যে নয়, কোলাহলের মধ্যে নয়, কেবল তোমার গভীর অতল অন্ধকারময় রহস্যের মধ্যে, তোমার সীমাহারা দিশাহারা অন্তহীনতার মধ্যে, তোমার নির্ব্বাক্ স্থির অবিচল শান্তির মধ্যে? তোমাকে কেমন করিয়া জানিব? আমি আলোকের জীব, স্পষ্টতার প্রাণী, তোমার অন্ধকারের মধ্যে প্রবেশ করিতে গেলেই যে তোমার রহস্যের অন্তরালটুকু নিষ্ঠুর হস্তে ছিঁড়িয়া ফেলি! কেমন করিয়া তোমার কাছে পৌঁছিব? আমি তোমার নিকটে যাইলেই আমার সঙ্গী রহস্যহীনতা, স্পষ্টতা, আলোক-

পূর্ণতা তোমার রহস্যকে দূরে ঠেলিয়া দেয়। হে অজ্ঞেয়, হে অন্ধকারের গোপনতা, হে অনির্ব্বচনীয়ের অপ্রকাশ, তোমায়-আমায় মিলন কেমন করিয়া সাধিত হইবে?

কার্ত্তিক নিশ্বাস ফেলিয়া মাথা তুলিয়া পূর্ব্বাকাশের দিকে চাহিল। তখনও চন্দ্রোদয় হয় নাই; তথাপি তাহার পূর্ব্বাভাস পূর্ব্বদিক-চক্রবালস্থ ভাসমান মেঘখণ্ডের উপর প্রতিফলিত হইয়া জ্যোতির্ম্ময় চন্দ্রের উত্থানের পথে সোপানশ্রেণী রচনা করিতেছে। হঠাৎ কার্ত্তিকের মনে হইল, যদি তাহার শক্তি থাকিত, তাহা হইলে সে হাত দিয়া চাঁদকে ঠেলিয়া নামাইয়া দিত। তাহার কেবলই ইচ্ছা হইতে লাগিল, সে চীৎকার করিয়া বলে, আলো চাই না, অন্ধকার—অন্ধকার—অন্ধকার দাও। সব ডুবাইয়া, সব ভুলাইয়া, নেমে এস, হে অন্ধকার, হে চির-অজ্ঞাত, তুমি নেমে এস! আমার বাক্য থামাইয়া আমার সমস্ত চেষ্টাকে শান্ত করিয়া, আমার এই জন্ম-জন্মান্তের সঞ্চিত বিশালতাকে অভিব্যাপ্তিকে নিবিড় পেষণে ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতম করিয়া সূক্ষ্মতম করিয়া আমায় তোমার আপন করিয়া লও। আমায় তোমার মধ্যে হারাইয়া যাইতে দাও। আমি আর কিছু চাহি না, কেবল এক মুহূর্ত্তের জন্য এক নিমেষের জন্য তোমার রহস্যের মধ্যে ডুবিয়া যাইতে চাই, তোমার অন্ধকার গোপনতার মধ্যে আপনাকে সম্পূর্ণরূপে ভুলিতে চাই। ভুলাও, আমায় ভুলাও।

কার্ত্তিকের বিলম্ব দেখিয়া সর্ব্বানন্দ উপরে আসিয়া বলিল, "কার্ত্তিক, তুমি দিনেও পড়্‌বে না, রাতেও বই ছোঁবে না, শেষে যদি ফেল্ হও, তখন কি কৈফিয়ৎ দেবে?"

কার্ত্তিক আলিসার উপর মস্তক রক্ষা করিয়া বলিল, "একজামিন্ পাস্ করাই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য নয়। যা সহজেই জান্‌তে পারা

যায়, তাকে জেনে কি হবে? যাকে জান্তে কেউ পারে না, যাকে সহজে কেউ ধর্তে পারে না, আমি তাকেই ধর্তে চাই!"

সর্ব্বানন্দ কহিল, "অর্থাৎ কোন একটী স্ত্রীলোকের হৃদয়-রহস্য জানাই জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য! আর সব মিছে! কার্ত্তিক, তুমি আমার কথা শোনো, তোমার লেক্‌চার্ শেষ হয়েছে, তুমি বাড়ী গিয়ে এক্‌জামিনের জন্য তৈরী হওগে। এ-সব পাগ্‌লামি আর কতদিন চালাবে?"

পাগলামি! কার্ত্তিক ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "পাগল কে নয়? তুমি পাগল, ঠাকুরদা পাগল, বাবা পাগল, কালিকাবাবু পাগল, দুনিয়া পাগল! পাগল সকলেই! কেউ-বা এই জিনিষটার জন্য পাগল, কেউ-বা ঐ জিনিষটার জন্য পাগল। পাগলাগারদে বসে তুমি আমায় পাগল বল্‌ছ?"

সর্ব্বানন্দ কহিল, "মিছে তর্ক করে কি হবে? কিন্তু তোমায় বারবার সাবধান করে দিচ্ছি, কার্ত্তিক, কেবল আপন খেয়ালে চলো না। এতে যে তুমি কেবল আপনারই ক্ষতি কর্‌বে তা নয়, আরও দশজনকে জড়িয়ে নিয়ে তুমি অধঃপাতে যাবে। তোমার পতনে যদি আর কারও ক্ষতি না হ'ত, তাহলে কোন কথা কইতুম না! কিন্তু—"

কার্ত্তিক কহিল, "থাম একটু বুঝে বল দেখি, এই যে আর কারো কিছু-কিঞ্চিৎ খতির সম্ভাবনা রয়েছে, এতেই কি তুমি এত ব্যস্ত হয়ে ওঠো নি? তোমার আর কেউ যদি মিছিমিছি আমার সঙ্গে জড়িত হয়ে আমার জীবনটাকে দাসত্বের মধ্যে টেনে নিয়ে ফেল্‌বার চেষ্টায় না থাকৃতেন, তাহলে তুমি কথাটি কইতে না।"

সর্ব্বানন্দ কহিল, "কার্ত্তিক, তুমি ত আমায় ভালবাস্‌তে!"

কার্ত্তিক কহিল, "এখনও বাসি, যদি তুমি তার প্রমাণ চাও, বল, আমি এই মুহূর্ত্তে তা প্রমাণ কর্‌তে পারি।"

সর্ব্বানন্দ কহিল, "প্রমাণ কর।"

কার্ত্তিক কহিল, "আমি আজই বাবাকে চিঠির উত্তর দিয়েছি। তিনি লিখেছিলেন, এই অগ্রাণ মাসে শৈলজার সঙ্গে আমার বিয়ে দেবেন স্থির করেছেন। আমি লিখে দিয়েছি যে আমি শৈলজাকে বিবাহ কর্‌ব না, সর্ব্বদাদা প্রস্তুত আছে, তার সঙ্গে সম্বন্ধ স্থির করুন।"

সর্ব্বানন্দ কহিল, "তুমি খুড়োমশায়ের কথা ঠেলে এই কথা লিখেছ? কার্ত্তিক, তোমাকেও জিজ্ঞাসা করি, তুমিও ঠিক করে বুকে হাত দিয়ে বল দেখি, এই যে কাজটী করে বসেছ, তোমার জন্মদাতা, জ্ঞানদাতা, তোমার সর্ব্বশ্রেষ্ঠগুরুর এই যে অপমান করেছ, এ কি শুধু আমারই জন্য? ঐ দেখ, চাঁদ উঠ্‌ছে,—ঐ চাঁদকে সাক্ষী করে বল যে এই কাজটি আমার জন্য করেছ, না, একটা অন্ধ রমণীর অন্ধকার হৃদয়ের মধ্যে স্থান পাবার জন্য? কি দেখেছ ঐ রমণীর দৃষ্টিশক্তি-হীন চোখে, যে তার জন্য নিজেকে এতদূর অধঃপতিত করেছ? কি আছে, কি পেয়েছ সরোজের কাছে? সেও মানুষ, তার হৃদয় ত তোমারই মত বাসনা-কামনার আবাসভূমি। সেও তোমারই মত সুখে হাসে দুঃখে কাঁদে,—তবে কি হিসেবে সে এত লোভনীয় হ'ল?"

কার্ত্তিক উচ্চ হাস্য করিয়া বলিল, "এক দিন তোমাকেও আমি এই প্রশ্ন করেছিলুম, কিন্তু তুমি কি কোন উত্তর দিতে পেরেছিলে? এ ক্ষেত্রে আমিই বা পার্‌ব কি করে? তবু তোমায় একটা উত্তর অমি দেবো, কারণ, এই এতদিন ধরে আমি বৃথাই সরোজের কাছে যাই নি। তার মধ্যে এমন জিনিষের আভাষ আমি পেয়েছি, যার বর্ণনা সহজে করা যায় না। তবু সেটা কি, শুন্‌বে? সেটা হচ্চে ওর অবোধ্যতা। যা সহজ, যা হাতের তেলোর মত নিতান্তই আমার কাছে স্পষ্ট এবং পরিচিত, তা আমি অত্যন্ত তুচ্ছজ্ঞান করি। যা দুষ্প্রাপ্য, যা রহস্যময়, চিরদিন আমি

তাই চাই! যা পাব না, তাকেই আমি পেতে চাই। না পাই, নাই পেলুম! আর না পাওয়াই আমার দরকার, কারণ পেলে হয়তো তাকে আর আমি চাইব না। তাই যা পাব না, তাকেই পাবার ইচ্ছা কর্‌ব, তাকেই মন-প্রাণ দিয়ে চাইব। এই জন্য যা সহজলভ্য, তা আমি অনায়াসে তোমার ভাগে ফেলে দিয়ে যা আয়াসলভ্য, তার দিকে আমি ছুটে চলেছি। তোমার কি সাধ্য আমায় ফেরাবে? সরোজ যদি অন্ধ না হ'ত, সরোজ যদি আমার জন্য হা-পিত্যেশে বসে থাক্‌ত, তাহলে ওর ত্রিসীমা আমি মাড়াতুম না। কিন্তু যেদিন প্রথম ওকে দেখ্‌লুম, সে-দিনকার প্রথম সহজ ব্যবহারে, একেবারে আমাকে তুচ্ছ করে, সামান্যের মত, অতি-যৎসামান্য একটা লোকের মত ব্যবহার দেখিয়ে ও আমায় আকৃষ্ট ক'রেছে। বাহ্যতঃ ওর কিছুই গোপন নেই, লুকোন কথা নেই তাই ওকে পরম রহস্যময়:বলে আমি বুঝ্‌তে পেরেছি। ওর অন্ধকার চক্ষুর অন্তরালে কি যে লুকানো আছে, ওর অতি-সরল অতি-স্পষ্ট ব্যবহারের মধ্যে একটা গভীরতম অন্ধকারের মত কি যে লুকানো আছে, তাই আমি জান্‌তে চাই। তোমাদের স্বামী-স্ত্রী ভাবে প্রতিদিনকার ভাত-ডালের মত করে আমি কিছুই পেতে চাই না। জানিনা, হয়তো তুমি আমার কথা কিছুই বুঝ্‌ছ না, তবে ঠাকুরদাকে একদিন বুঝিয়েছিলুম। যদিও সে কেবল অবাক হয়ে আমার পানে চেয়েছিল, তবু বোধ হয়েছিল যেন, সে আমায় কিছু কিছু বুঝতে পেরেছে, তাই সে দিন থেকে সরোজের কাছ থেকে আমায় দূর করে দেবার চেষ্টাও সে ছেড়ে দিয়েছে। আজ তোমায় বল্‌লুম, এখন তোমার যা অভিরুচি, তাই কর।"

কার্ত্তিক ফিরিয়া দূর আকাশে একটা নক্ষত্রের দিকে চাহিয়া রহিল। সর্ব্বানন্দ কার্ত্তিকের স্কন্ধে হস্ত দিয়া বলিল, "তবুও তোমায় ফির্‌তে হবে।"

কার্ত্তিক না ফিরিয়া বলিল, "হয়তো হবে, তাই বলে বর্ত্তমানকে ত্যাগ করতে পারিনে।"

সর্ব্বানন্দ কহিল, "আমি তোমার সমস্ত কথা সরোজের কাছে প্রকাশ করে বলব। তারপর—"

কার্ত্তিক কহিল, "তোমার সেটুকু কষ্টও স্বীকার করবার দরকার নেই, আমি নিজেই বলব। আমায় তুমি কি মনে কর? আমি কি—"

সর্ব্বানন্দ কহিল, "আমি মনে করি, তুমি স্বেচ্ছাচারী, পিতৃদ্রোহী, মনুষ্যনামের অযোগ্য প্রাণী! কি বলব তোমায়—"

কার্ত্তিক কহিল, "কিছু বলার প্রয়োজন নেই সর্ব্ব-দা আমি যা তাই।"

সর্ব্বানন্দ কহিল, "আমি ঈশ্বরের নামে শপথ করে বলছি যে, তোমায় যদি না ফেরাতে পারি, তাহলে এ জীবন ত্যাগ করব।"

সর্ব্বানন্দ নামিয়া গেল। কার্ত্তিক কিছুক্ষণ ছাদের উপর পায়চারি করিয়া শেষে নামিয়া গিয়া বলিল, "সর্ব্ব-দা তোমার রাগ কাল সকালেই দেখো থাকবে না, সব ভুলে তুমি বই পড়তে লেগে যাবে।"

সর্ব্বানন্দ পাশ ফিরিয়া শয়ন করিল।

৭

পরমহংস শঙ্করানন্দ আজকাল পরম দয়ালু হইয়া উঠিয়াছেন। তাঁহার দয়ায় আজ কাল অনেক পাপী-তাপী উদ্ধার লাভ করিতেছে। তাঁহার এই জীবোদ্ধার-কার্য্যের জন্য আজ-কাল প্রতি সন্ধ্যায় একটি বৈঠক বসিয়া থাকে। এবং সেই সভায় শাস্ত্রীয় বহু গূঢ় তত্ত্বের আলোচনায় শিবরামপুরের বহু নর-নারী যোগদান করায় আজ-কাল পোড়া বাঙ্গলার অন্ধকার কোণ-গুলি আলোক-মালায় শোভিত ও উপদেশার্থীর কোলাহলে মুখরিত হইয়া উঠে। এমন কি এ কথাও রটিয়া গিয়াছে যে কমবখৎপুরের একজন

পাকা বিষয়ী লোক তাঁহার বিষয়-আশয় পুত্রকে দান করিয়া শঙ্করানন্দের উপদেশে সংসার ত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছেন,—তবে এখনও সমস্ত বিষয়ের সুবন্দোবস্ত হয় নাই বলিয়া তিনি এতাবৎকাল কাশীবাসী হইতে পারেন নাই, এবং কবে যে হইবেন, তাহারও স্থিরতা নাই।

এই সুনামের জন্য স্বামীজি কেবল মাত্র তাঁহার শিষ্যাবলীর নিকটই নহে, তাঁহার রত্নগর্ভা জগজ্জননীর অংশরূপিণী জননী নিস্তারিণী দেবীর নিকটও বিশেষভাবে ঋণী। তিনি নানা উপায়ে পুত্রের অদ্ভুত কীর্ত্তিকলাপ জগৎসমক্ষে বহু গূঢ়ার্থ-বোধক কথাবার্ত্তায় প্রচারিত করিয়াছিলেন; এবং তাঁহারই জন্য কালিকাবাবুর অতি-নিষ্ঠাবতী মাতাও ক্রমশঃ শঙ্করানন্দের দিকে আকৃষ্টা হইয়াছেন। এমন কি তিনিও মধ্যে মধ্যে জপমালা হস্তে লইয়া একজন দাসী বা অন্য কোন আশ্রিতাকে সঙ্গে লইয়া রাত্রির অন্ধকারে উপরোক্ত ভাগবত-কথা-বৈঠকে যোগদান করিতে আসিতেন।

অদ্যকার বৈঠকে স্ত্রীলোকের কিরূপ স্বামী হওয়া উচিত, বেদী হইতে সেই বিষয়েই অমৃতময়ী উপদেশাবলী বর্ষিত হইতেছিল। ব্যাসদেবের জন্য পরাশরের ন্যায় যোগীর প্রয়োজন, এই কথা কয়টি ঘুরাইয়া ফিরাইয়া নানা আকারে প্রচারিত হইতেছিল। যে স্বামী সংসারকে যোগবলে স্বর্গ করিয়া তুলিতে পারিবে, সমস্ত পাপকে যে সমাধি-নির্দ্ধৃত বুদ্ধিবলে পুণ্যে পরিণত করিতে পারিবে, যে সর্ব্ব দ্রব্য উপভোগ করিতে করিতে সতেজে বলিতে পারিবে, 'ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবির্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতং' একমাত্র সেই লোকই সৎপাত্র; তাহাকে কন্যাদান করাই প্রকৃত কন্যাদান। সেই সৎপাত্রের ঔরসে যে কুলপ্রদীপের জন্ম হইবে, সেই পুত্রই পিতৃকুল ও মাতৃকুলের ঊর্দ্ধতম চতুর্দ্দশ পুরুষ পর্য্যন্ত উদ্ধার করিতে সক্ষম। নহিলে সংসারে থাকিয়া আর উদ্ধারের কোন পন্থা নাই! নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে

অয়নায়—অয়নায় কি না, সংসারে চলিবার অর্থাৎ সংসার-ধর্ম্ম করিবার আর কোন পন্থা নাই—নাই!

জগদম্বা দেবী যখন গৃহে ফিরিলেন, তখন তাঁহার ভক্তিতে আপ্লুত হৃদয়ের মধ্যে কেবলি জাগিতে লাগিল, সংসার-ধর্ম্মের আর কোন দ্বিতীয় পন্থা নাই! সৎপাত্রে কন্যা দান না করিলে সংসারের উদ্ধার নাই। কিন্তু কোথায় পাই এমন সৎপাত্র? কেন, এই শঙ্করানন্দ কি সৎপাত্র নয়? সে ত অবিবাহিত, তাহার পিতামাতাকে ধরিয়া কি এই স্বামিজীর দ্বারা শিবরামপুরের জমিদার বংশের উর্দ্ধতম চতুর্দ্দশ পুরুষকে উদ্ধার করা যায় না? একবার চেষ্টা করিয়া দেখিতে দোষ কি!

জগদম্বা দেবীর যে চিন্তা, সেই কাজ। কিন্তু প্রভুপাদ শঙ্করানন্দ সে সংবাদ শুনিয়া কর্ণে অঙ্গুলি প্রদান করিয়া তাঁহার মাতাকে বলিলেন, "মা, যদি বিবাহই কর্‌ব তবে জীবোদ্ধার কর্‌ব কিরূপে? আমার যদি বিবাহ করাই প্রয়োজন হ'ত, তা হলে কোন্‌দিন তোমার কোলে মাথা রেখে আবার ঐ সংসারের মধ্যে ডুবে যেতুম। কিন্তু এ কথাও ঠিক যে শৈলজার মত "শক্তিই" আমার সহধর্ম্মিণী হবার উপযুক্ত। যা হোক, আমায় চিন্তা কর্‌বার অবসর দাও, ভগবানের প্রত্যাদেশ ছাড়া আমি কোন কাজেই হস্তক্ষেপ কর্‌তে পারি না। আরও কিছুদিন অপেক্ষা কর। তার পর যদি আমার প্রকৃত মাতা পরমা-প্রকৃতির আদেশ পাই, তা' হলে বিবাহ কর্‌লেও কর্‌তে পারি।"

জগদম্বা দেবী অন্তরাল হইতে এই আশা ও নিরাশাময়ী বাণী শুনিয়া অনেকটা আশ্বস্ত হইলেন। তিনি মনে মনে বুঝিলেন যে শঙ্করানন্দকে লাভ করা নিতান্ত সহজ ব্যাপার না হইলেও একেবারে দুরাশা নহে। তবে এখন কেবল তাঁহার পুত্রের মতের প্রয়োজন। তিনি সেই কার্য্যের ভার স্বয়ং গ্রহণ করিলেন; এবং অন্নজল-পরিত্যাগাদি

বহুবিধ সদুপায়ে পুত্রের মত আয়ত্ত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

শৈলজা তাহার পিতামহীর রকম-সকম দেখিয়া হাসিয়া অস্থির হইল। জগদম্বা দেবী ক্রুদ্ধা হইয়া বলিলেন, "অত হাসি কিসের?"

শৈলজা হাসিতে হাসিতে বলিল, "তুমি এই বুড়ো বয়সে না কি আবার বিয়ে কর্‌বে?"

জগদম্বা কহিলেন, "তা বর জুটলেই করি, কিন্তু আমার দিদি থাক্‌তে ত আর আগে আমার বিয়ে হতে পারে না, তাই তোর আগে একটা যুটিয়ে দি, তার পর আমার যা হয় হবে।"

শৈলজা কহিল, "ঠাক্‌মা তোমার পায়ে পড়ি, বল না, কেন, আবার তোমার বিয়ে কর্‌বার ইচ্ছে হ'ল? আচ্ছা, তা না হয় নাই বল্‌লে, কি করে বরের কাছে ঘোমটা দিয়ে বস্‌বে, তাই দেখাও না! আচ্ছা, তোমার বর যদি বলে, ছোলাভাজা খেতে হবে, তা হলেই বা তুমি কি কর্‌বে?"

জগদম্বা কহিল, "আ গেল যা বেহায়ী! তোর জন্যে আমি মর্‌ছি, আর তুই আমাকে গালাগাল সুরু কর্‌লি?"

শৈলজা কহিল, "গালাগাল কি রকম! তোমার আবার নূতন করে ছোলাভাজা মটরভাজা খাবার সখ হ'ল, আর আমি তা মুখে বল্‌তে পাব না!"

জগদম্বা কহিলেন, "দেখ্‌ শৈল, তোরা যতই পাগলামি কর না কেন, আমি কিন্তু কিছুতেই এই অগ্রাণ মাস পার হতে দেব না। কেন? কার্ত্তিক ছাড়া কি সংসারে সুপাত্র নেই? কার্ত্তিকের না হয়—"

শৈলজা কহিল, "ঐ নামের ঠাকুরের মত চেহারা, ঐ রকম গায়ে জোর, ঐ রকম তেজ, ঐ রকম দেব-সেনাপতি হবার মতই লোক চাই।"

জগদম্বা কহিলেন, "থাম্, থাম্, বেহায়া মেয়ে! এখনো যে তোর ওর সঙ্গে বিয়ে হয় নি লো! এর মধ্যেই এত!"

শৈলজা কহিল, "বামুনের মেয়ের বাক্‌দত্তা হওয়া যা, বিয়ে হওয়াও তাই। তোমায় যদি বলি, আবার বিয়ে কর্‌বে, তা হলে তুমি কি আর বিয়ে কর?"

জগদম্বা কহিলেন, "আমার সঙ্গে তোর তুলনা?"

শৈলজা কহিল, "কেন নয়? তুমিও মেয়ে মানুষ, আমিও তাই। তুমি যদি ঠাকুরদাদার উদ্দেশ করে এখনো বেঁচে থেকে ধর্ম্মকর্ম্ম কর্‌তে পার, আমিই কেন পার্‌ব না?"

জগদম্বা কহিলেন, "কুলীনের মেয়ের কথা দিলেই কিছু বিয়ে হয়ে যায় না। আমার খুড়িমার ছানলাতলা থেকে বিয়ে ফিরে গিয়েছিল।"

শৈলজা কহিল, "তোমার খুড়িমা! সে তো সত্যি যুগের কথা! কলিযুগে তা হয় না। তোমায় বলে রাখ্‌ছি, ঠাক্‌মা, যদি তুমি মণিশঙ্করের কাছে আর কোন দিন ভাগবত শুন্‌তে যাও, তাহলে তোমায় কাশী পাঠিয়ে দেব।"

জগদম্বা কহিলেন, "আমার মরণ হয় ত বাঁচি! এ বাড়ীর কেউ আমার কথা শুন্‌বে না! মা গঙ্গা কবে আমায় নেবেন?"

শৈলজা কহিল, "তোমার একশো তেরো বছর পরমায়ু হোক! তুমি হরিনাম কর্‌তে কর্‌তে সজ্ঞানে গঙ্গা লাভ কর। আর কেন এ সব ব্যাপারে যোগ দিতে আস্‌ছ? দু' দণ্ড তুলসী তলায় বসে হরিনাম করগে যে কাজ হবে।"

জগদম্বা কহিলেন, "হায়, হায়, তিন দিনের মেয়ে! গাল টিপিলে দুধ বেরোয়! সে আমায় উপদেশ দিতে এল! হায়রে, যার জন্যে চুরি করি, সেই বলে চোর!"

শৈলজা হাসিতে হাসিতে প্রস্থান করিল ; আর জগদম্বা দেবীও জপ ভুলিয়া মালা গাছটী লইয়া বারবার মাথায় ঠেকাইতে লাগিলেন।

৮

সকাল হইয়াছে। শশিভূষণের শ্বশ্রূঠাকুরাণী চিন্ময়ী দাসী শয্যায় শায়িতা। তিনি একটু নড়িয়া চড়িয়া উঠিবার চেষ্টা করিতেই বিন্দু দাসী তাড়াতাড়ি তাঁহার পিঠের দিকে আর একটা বালিস আগাইয়া দিল। তিনি পূর্ব্বদিকের জানালাটা খুলিয়া দিতে বলিলেন। দাসী জানালা খুলিলে হঠাৎ চিন্ময়ীর দৃষ্টি একটা ইজিচেয়ারে-শায়িত শশিভূষণের উপর পতিত হইল। শশিভূষণ সারারাত্রি জাগিয়া ভোরের দিকে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। তাহার নিদ্রিত মুখের উপর প্রভাতের আলো আসিয়া পড়িবামাত্র সে জাগিয়া উঠিয়া বসিল। প্রভাত হইয়াছে দেখিয়া সে তাড়াতাড়ি ঘড়ির দিকে চাহিয়া বলিল, "মা, আপনি কাপড় ছেড়ে জপটা সেরে নিন, ওষুধ খাবার সময় হয়েছে।"

চিন্ময়ী হাসিয়া বলিলেন, "রোগীর আবার জপ-তপ! নিজের শরীরের বিষয় ছাড়া এ সময়ে কি আর অন্য চিন্তা আসে, বাবা? বিন্দু, গঙ্গাজল আর কাপড়খানা আন্ ত মা।"

বিন্দু প্রার্থিত বস্তু অগ্রসর করিয়া দিলে শশিভূষণ মুখ ধুইবার জন্য বাহিরে আসিয়া ডাকিল, "সরোজ!" সরোজ তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া বলিল, "এ কি শশিদা, তুমি কৈ তিনটের সময় আমায় ডাকনি?" শশিভূষণ কলতলায় মুখ ধুইতে ধুইতে বলিল, "যাঁহা বাহান্ন তাঁহা পয়ষট্টি! তিনটে পর্য্যন্তই যদি জাগ্‌লুম, তাহলে পাঁচটাই বা কি দোষ কর্‌লে?"

সরোজ কহিল, "না শশি দা, এ তোমার ভারী অন্যায়!"

শশিভূষণ কহিল, কিছু অন্যায় হয়নি ভাই। সমস্ত দিনটা পড়ে

আছে, যত ইচ্ছা জেগে থেকো। আর কথাতেই বলে, অন্ধের কিবা রাত্রি কিবা দিন! ও তোমার পক্ষে দুই সমান। তুমি যার কাছে যাও। আমাকে বাসায় ফির্‌তে হবে, তারপর কলেজ আছে।”

শ্বশ্রূঠাকুরাণী-সম্বন্ধে বিন্দি দাসী ও সরোজকে সমস্ত উপদেশ দিয়া শশিভূষণ চলিয়া যাইতে উদ্যত হইলে সরোজ বলিল, ‘দাঁড়াও, তোমার চা’টা করে দি।” শশী বলিল, “চা খেতে গেলে দেরী হয়ে যাবে।” সরোজ ছাড়িল না, তাড়াতাড়ি তাহার জন্য চা চড়াইয়া দিয়া বলিল, “কার্ত্তিকবাবু বল্‌ছিলেন, তিনিও তোমার সঙ্গে এসে রাত জাগ্‌তে ইচ্ছুক।”

শশিভূষণ কহিল, “অর্থাৎ যেটুকু সময় তোমার কাছে কাটে! তোমার গন্ধটুকু শব্দটুকুও ওর কাছে এখন লোভনীয় কিনা!”

সরোজের মুখখানি শশীর এই বিদ্রূপে হঠাৎ এক মুহূর্ত্তের জন্য লজ্জারুণ রাগে রঞ্জিত হইয়া উঠিল এবং পরক্ষণেই একটা অতি করুণ বিষণ্ণতার ছায়াপাতে মনোহর শোভা ধারণ করিল। শশিভূষণ তাহা লক্ষ্য করিয়া বলিল, “সরোজ, সাবধান ভাই, আমার ভয় হচ্চে—”

সরোজ তাহাকে বাধা দিয়া বলিল, “কোন ভয় নেই শশিদা, অন্ধের রাতও নেই, দিনও নেই। দিন এলেও তার জন্য আসে না, রাত এলেও তার জন্য আসে না।”

শশিভূষণ হঠাৎ উঠিয়া আসিয়া সরোজের মাথার উপর হাত রাখিয়া বলিল, “সরোজ, সূর্য্য উঠ্‌লেই সরোজ প্রস্ফুটিত হয়, তা জানি, তবু যে আমার সরোজকে কেউ কৃপা করে দয়া দেখাবার জন্য ভালবাসবে, তোমার এ রকম অপমান আমি কিছুতেই সইব না! তুমি দয়ার পাত্রী নও, দয়ার ঢের ওপরে যা, সেই পূজাই তোমার প্রাপ্য! তাই তোমায় সাবধান কর্‌ছি।”

সরোজ চায়ের বাটি হাতে করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। কিন্তু তাহার

হাত কাঁপিয়া চা একটু পড়িয়া গেল। শশিভূষণ তাহার হাত হইতে চায়ের বাটিটা গ্রহণ করিয়া বলিল, "সরোজ, আমার কথায় রাগ কর্‌লে?"

সরোজ কহিল, "আমি অন্ধ! আমার আবার রাগ-দ্বেষ লজ্জা-ভয় কি শশি-দা?"

শশিভূষণ কহিল, "তোমার এ কথায় আমি সন্তুষ্ট হ'তে পার্‌লুম না।"

সরোজ কহিল, "কেমন করে হবে? মিছিমিছি কাউকে কষ্ট দিলে কি কারও সুখ হয়?"

শশিভূষণ কহিল, "আমায় ক্ষমা কর, বোন, আমি তোমার ভালর জন্যই বল্‌ছিলুম। কার্ত্তিককে আর অগ্রসর হ'তে দিয়ো না। সে বিবাহ-পণে বদ্ধ। সর্ব্বানন্দর কাছে যা শুনেছি, তাতে বুঝেছি যে কালিকা কাকার মেয়েটা তারই আশা-পথ চেয়ে বসে আছে। কালিকা কাকাও বহুদিন থেকে কার্ত্তিকের উপর আশা ভরসা—"

সরোজ কহিল, "থাম, তুমি, এবার সত্যিই আমি রাগ কর্‌ব। কেন তুমি এ সব কথা বল্‌ছ? ভগবান আমায় দৃষ্টি-হারা করে পথের এক পাশ দিয়ে চল্‌বার মাত্র অধিকার দিয়েছেন; আমি কি পথের সেই এক-ধার ছাড়া আর বেশী-কিছু চেয়েছি? তুমি আমায় দয়া করে হাত ধরে নিয়ে যাচ্ছ, তাই আমার চলা হচ্চে, নইলে কোথায় এক পাশে পড়ে থাক্‌তুম, কেউ আমার খোঁজও রাখ্‌ত না। তোমার উপদেশ ছাড়া, তোমার হাতের নির্দ্দেশ ছাড়া, অবলম্বন ছাড়া যদি এক পা চলি, সেই দিন তুমি আমায় ঠেলে ফেলে চলে যেয়ো।"

শশিভূষণ সন্তুষ্ট মনে চলিয়া গেল। কিন্তু সরোজের মনে সে যে ব্যথা দিয়া গেল তাহার অনুভব সেই দিনকার প্রভাতের সমস্ত আনন্দ টুকুকে তীব্র তিক্ত রসে পরিণত করিয়া তুলিল। সরোজ ধীরে ধীরে একটা গবাক্ষ উন্মুক্ত করিয়া তাহার অন্ধ নয়ন বিস্ফারিত করিয়া

দিল। তাহার সমস্ত দেহ থাকিয়া থাকিয়া কাঁপিয়া উঠিতে লাগিল। তাহার অন্তরাত্মা হইতে যেন একটা ক্রন্দন-ধ্বনি উত্থিত হইতে লাগিল—আলো—আলো! হে লোক-চক্ষু, হে সর্ব্ব-প্রকাশ, হে স্বপ্রকাশ, তুমি তাহার কাছে এক মুহূর্ত্তের জন্য প্রকাশিত হও। তাহার এই সমস্ত দেহ একটী চক্ষুতে পরিণত হইয়া সর্ব্বরূপের কারণ-স্বরূপ তোমার রূপকে এক মুহূর্ত্তের জন্য অন্তরে গ্রহণ করিয়া তারপর পদ্মের মত মুদিত হইয়া যাক্। একবার—একটী বার মাত্র তোমার কিরণের আঘাতে তাহার এই চিরান্ধকারময়ী রাত্রি এক মুহূর্ত্তের জন্য অস্তগমন করুক! তারপর আসুক রাত্রি, আসুক অন্ধকার, তাহার আর কোন ক্ষোভ থাকিবে না!

হে প্রভাত, জীবন-প্রভাতে ক্ষণেকের জন্য দেখা দিয়া মধ্যাহ্ন আসিবার পূর্ব্বে চিররাত্রে পরিণত হইলে! ক্ষণেকের জন্য আমার চক্ষে ফুটিয়াছিলে, তারপর—আদিহীন অন্তহীন অপার অন্ধকার সাগরের মাঝ-খানে দাঁড় করাইয়া দিয়া চলিয়া গেলে! যে পথে সহস্র যাত্রী চলিয়াছে, সেই পথেই চলিতে হইবে; অথচ তাহাদের পথের আলো পথকে উদ্ভাসিত করিয়া রাখিয়াছে, কিন্তু আমার নিকটে সেই পথই, তাহার দূরত্ব, তাহার বিস্তৃতি, তাহার অসংখ্য যাত্রীর সমাবেশ সমস্ত সঙ্গে লইয়া চির-অজ্ঞাতই থাকিয়া যাইবে! যাক্, অন্ধের কিবা রাত্রি, কিবা দিন—দুই সমান! অন্ধের চলাও যা না চলাও তাই। কেবল এইটুকু চাই, যেন পথের একধারে আমার একটু স্থান থাকে! হে অনন্তের যাত্রীর দল, অন্ধ বলিয়া আমায় ঠেলিয়া পদ-দলিত করিয়া যাইয়ো না। তোমরা যখন দেখিতে পাও, তখন এই অন্ধ যাত্রীকে এড়াইয়া পাশ কাটাইয়া চলিয়ো। আমায় পশ্চাতে ফেলিয়া চলিয়া যাও, কোন দুঃখ নাই, কিন্তু দয়া করিয়া আমায় ধূলায় লুটাইয়া দিয়া যাইয়ো না। আমি ধীরেই চলি আর দাঁড়াইয়াই

থাকি, আমি যেন দুই পায়ের উপর সোজা হইয়া থাকিতে পাই! হে আমার অন্ধকারের অন্ধ দেবতা, তোমার এই ক্ষুদ্র সেবিকাকে তোমার মৌন নীরবতার মধ্যে স্থির, নিশ্চল, উন্নত রাখিয়ো, ইহার অধিক আর কিছু চাহি না।

* * * * *

দ্বিপ্রহরে চিন্ময়ীকে ঔষধ পান করাইয়া সরোজ সুকুমারীকে ডাকিয়া লইয়া পাঠ-কক্ষে প্রবেশ করিল। সুকুমারী কিন্তু কিছুতেই পাঠে মন দিল না, কারণ সর্ব্বদাদা বলিয়াছিল, যতদিন না মার অসুখ সারে, তত-দিন তাহাদের ছুটী। সরোজ বিরক্ত হইয়া বলিল, "তা হবে না, সুকু, মা এখন চিররোগীর মত হয়ে পড়্‌লেন। তিনিই আমায় বক্‌ছিলেন। আর বিশেষ, একদিন অবহেলা কর্‌লে তারপর দিন আরও মুস্কিলে পড়্‌বে। যাদের চোখ নেই, তাদের যখন আঙুল দিয়ে পড়্‌তে হয়, তখন স্পর্শটীকে প্রতিদিন সজাগ রাখ্‌তে হবে, নইলে কিছুতেই এগুতে পারা যাবে না।"

সুকুমারী কহিল, "তার কি দরকার! আমি ত একবার ছুঁয়েই বুঝ্‌তে পারি যে এটা আমার কোন্ পুতুল, এটা আমার কি জিনিষ! তবে অক্ষরের বেলায় রোজ রোজ হাত বুলুতে হবে কেন?"

সরোজ কহিল, "পুতুলটার ওপর তুমি যতখানি মন দিতে পার, তত-খানি মন পড়ার ওপর দিতে পার না, তাই রোজ রোজ পড়ার দরকার।"

সুকুমারী অগত্যা একখানা মোটা কার্ড বোর্ড লইয়া তাহার তোলা অক্ষরে লিখিত বর্ণমালার উপর অঙ্গুলি বুলাইতে আরম্ভ করিল। সরোজ সুকুমারীর হাতের উপর আঙুল রাখিয়া তাহার হাতের গতি অনুসরণ এবং ভুল হইলে তাহা সংশোধন করিয়া দিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে বিরক্ত হইয়া সুকুমারী বলিল, "আচ্ছা সরোজ দিদি, যাদের চোখ আছে, তারা পড়ে কি করে?"

সরোজ কহিল, "চোখ দিয়ে।"

সুকুমারী কহিল, "আচ্ছা, তারা আঙুল দিয়ে কি করে? আমাদের মত পড়ে?"

সরোজ কহিল, "না, তারা আঙুল দিয়ে লেখে, তবে শুনেছি, পড়্তেও পারে। তারা হাতের অনুভব দিয়ে চোখের অনুভবকে পড়ে।"

সুকুমারী বুঝিতে পারিল না, জিজ্ঞাসা করিল, "হাতের অনুভব দিয়ে চোখের অনুভব কি করে পড়ে? চোখের অনুভব আবার কি রকম?"

সরোজ মহাবিপদে পড়িল; এ কথা কি করিয়া সে তাহাকে বুঝাইবে? সে বলিল, "তুমি বড় হও, তারপর বুঝিয়ে দেব, এখন তুমি বুঝ্তে পার্বে না। কিন্তু সে যে বলিয়াছে, 'চক্ষুষ্মানে হাতের অনুভব দিয়া হাতের অনুভব পড়ে না, হাতের অনুভব দিয়া চোখের অনুভব পড়ে' এই কথা কয়টী সে কতকটা আত্মগত ভাবেই বলিয়াছিল, বালিকাকে উদ্দেশ করিয়া নয়। সে আজ সমস্ত দিন ধরিয়া ঐ কথাই ভাবিয়াছে। তাহার ক্রমাগতই মনে হইয়াছে যে চক্ষুষ্মানে কখনই স্পর্শের যথার্থ অনুভব পায় না, তাহাদের সমস্ত অনুভবই দৃষ্টির ভাষায় ঘটিয়া থাকে। অন্ধের কি যে ভাষা, কি যে অনুভব, তাহা তাহারা কিরূপে জানিবে? তাহারা আপনার অনুসারেই পরকে দেখে, পরের কার্য্যের বিচার করে। হায়, অন্ধের অনুভব যে অন্ধ নয়, কিরূপে সে তাহা অনুভব করিবে? এমন কি কেহ নাই যে অন্ধকে অন্ধেরই মত অনুভব করিবে? চক্ষুর প্রকাশকে সম্পূর্ণরূপে ভুলিয়া কেবল অন্তরের প্রকাশকে অন্তরে অন্তরে অনুভব করিবে? এমন কে আছে যে, সমস্ত বহির্মুখী দৃষ্টিকে অন্তর্মুখী করিয়া তাহাদের অন্তরের মধ্যে অনুভবানন্দস্বরূপ আপনাকে প্রকাশিত করিবে? যদি এমন কেহ থাক, এস, সরোজ তাহারই অপেক্ষায় তাহার বহিঃপ্রকাশহীন অন্তঃসরোজ পাতিয়া বসিয়া আছে!

সরোজ সুকুমারীকে সাহায্য করিতে করিতে অনুভব করিল, কে যেন সোপান অতিক্রম করিয়া উপরে আসিল এবং ক্রমশঃ পাঠ-কক্ষের দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইল। সুকুমারী পাঠ ত্যাগ করিয়া বলিল, "কে?" সরোজের মুখ সহসা উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। কিন্তু তাহা ক্ষণেকের জন্য। পরক্ষণেই সে গম্ভীর মুখে বলিল, "কাত্তিক বাবু, ওখানে দাঁড়িয়ে রৈলেন কেন? ভিতরে আসুন।"

কার্ত্তিক প্রবেশ করিয়া একটা বেঞ্চে বসিয়া বলিল, "আমি কার্ত্তিক কেবল নামে, আমার যদি ময়ূর থাকৃত, তাহলে বোধ হয় আপনি আমার আগমন মোটেই টের পেতেন না। তা না হয়ে জুতোর ওপরই আমার আগমন-ঘোষণার দামামা বাঁধা রয়েছে। আজ আপনাকে আশ্চর্য্য করে দেবার জন্য এই দুপুরেই চলে এলুম।"

সুকুমারী কহিল, "কাত্তিক-দা, আমার পড়্তে ভাল লাগ্ছে না, তবু সরো-দি ছাড়্বে না।"

কার্ত্তিক কহিল, "যারা মাষ্টার হয়, তাদের ঐটে বড় দোষ। পড়্তে ভাল লাগ্ছে না তবু তারা পড়াবেই, বসে থাক্তে ভাল লাগ্ছে না তবু তারা বসিয়ে রাখ্বে, কাজ কর্তে ভাল লাগ্ছে না তবু তারা বল্বে, কাজ কর, কর্ত্তব্য কর, নইলে ক্ষতি হবে। সুকু, আমারও পড়্তে ভাল লাগ্ছিল না, তাই আমি পালিয়ে তোমাদের কাছে এসেছি। কিন্তু তুমি ছোট্ট কি না, তাই তোমার পালাবার জো নেই, এ অত্যাচার সইতে হচ্চে। কি কর্বে, বল, পরাধীন হওয়ার ঐটেই মস্ত দোষ।"

সরোজ কহিল, "নিজেকে বড় হয়েছি মনে করা, কর্ত্তব্যের চাইতে ওপরে উঠেছি মনে করা, স্বাধীন হয়েছি মনে করা একটা মস্ত অহঙ্কার। আর অহঙ্কারই পতনের পূর্ব্ব লক্ষণ!"

কার্ত্তিক কহিল, "তা হবে! যে চারি দিক দিয়ে বদ্ধ,—ঘরের কোণে

বদ্ধ, পরের সাহায্যের দ্বারা বদ্ধ, নিজের দৃষ্টিহীনতার দরুণ বদ্ধ, সে কেমন করে বুঝবে যে মাঝে মাঝে ছাড়া পেতে, সকল বাধা থেকে, দৃষ্টির বাধা, জ্ঞানের বাধা, কর্ত্তব্যের বাধা, সব রকম বন্ধন থেকে মুক্তি পেতে ইচ্ছে হয়। মাঝে মাঝে ইচ্ছে হয়, যা বুঝিনে, যা জান্‌বার কোন উপায় নেই, যা একেবারে দৃষ্টির পূর্ব্বের অন্ধকারের মত সম্পূর্ণ অবোধ্য, অপ্রজ্ঞাত, সেই নিতান্তই অজানার মধ্যে আপনাকে হারাতে ইচ্ছে করে। যার বহির্দৃষ্টি নেই—"

সরোজ বাধা দিয়া কহিল, "তার অন্তর্দৃষ্টি থাকতে পারে না, সে বাইরে ভেতরে উভয় দিকেই অন্ধ, কেমন? কার্ত্তিকবাবু, হেঁয়ালিতে কথা বলতে কবে থেকে শিখ্‌লেন? আর দীন দুঃখী অন্ধদের অন্ধতা নিয়ে নিষ্ঠুরের মত বিদ্রূপ করতেই বা কে আপনাকে অধিকার দিলে? দুপুর বেলায়, সমস্ত কর্ত্তব্য ফেলে রেখে অন্ধদের নিয়ে খেলা করতেই বা কে আপনাকে বলেছিল? আপনি মনে করছেন যে, আমি কিছুই বুঝতে পারব না? কিন্তু নিজের বিষয় অতখানি অহঙ্কার রাখবেন না, কার্ত্তিকবাবু। আমরা অন্ধ বলে এতখানি অন্ধ নই! আমি অন্ধ বলে যে একেবারে দেখতে পাইনে তাও নয়! আমার বাইরে চোখ নেই বটে, কিন্তু যিনি সবারই পক্ষে চক্ষু-স্বরূপ, তিনি সর্ব্বদাই আমার অন্তরের মধ্যে চক্ষু হয়ে বসে আছেন। আপনি যা মনে করে এখানে একজন অসহায় অন্ধ নারীর কাছে আসেন, সে ভাবটা আমার অন্তরের চক্ষু স্পষ্ট দেখতে পায়। বাহিরের চোখে যা ধরা পড়েনা, ভেতরের চোখের কাছে তা খুব স্পষ্ট।"

কার্ত্তিক স্তম্ভিত হইয়া গেল। তাহার সমস্ত অভিমান, সমস্ত দর্প এক নিমেষে মন্ত্রমুগ্ধ বিষদন্তভগ্ন সর্পের মত মাটিতে লুটাইয়া পড়িল। কার্ত্তিক আর কোন কথা বলিতে পারিল না। এমন কি, সেই বিস্ফারিত

অন্ধ নয়নের দিকে ভাল করিয়া চাহিতেও পারিল না ;—তাহার বোধ হইল, যেন ঐ অন্ধ নয়ন হইতে এক অপূর্ব্ব জ্যোতি বাহির হইয়া তাহাকে দগ্ধ করিতেছে। কিন্তু কি তাহার অপরাধ ? কি অপরাধে সে এই অন্ধ নারীর অন্তরস্থ তৃতীয় নয়নের বহ্নিতে এমনভাবে দগ্ধ হইতে লাগিল ?

সুকুমারী তাহাদের কথাবার্ত্তার অর্থগ্রহণ করিতে না পারিয়া বলিল, "কি হ'ল সরো-দি, তুমি কাঁপছ কেন ?"

সরোজ উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "কিছু না সুকু, চল, আমরা মার কাছে যাই, মাকে ওষুধ খাওয়াতে হবে।"

কার্ত্তিকও উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "কি পাপে আমায় এত বড় দণ্ড দিলে ?"

সরোজ কহিল, "কি পাপে ? আপনি এত বড় অন্ধ যে, নিজেকে ছাড়া আর কিছুই দেখতে পান না, অথচ ঐ দুটো চোখের এতখানি গর্ব্ব করেন ! নিজের দিকে চেয়ে চেয়ে আপনি এতখানি অন্ধ হয়ে গিয়েছেন যে, আপনার সমস্তই যে অন্যে টের পেতে পারে, এটুকু পর্য্যন্ত আপনি বুঝতে পারেন না ! আমি কি একটা খেলার পুতুল যে দুদণ্ড খেলা করবার জন্য আমার কাছে আপনি ছুটে আসবেন, আর আমি তাই সহ্য করব ?"

কার্ত্তিক কহিল, "খেলা ! আমি তোমায় নিয়ে খেলা করতে আসি ! তোমার কাছে আসি বলে আমার ইহকাল পরকাল দুইই যেতে বসেছে ! আমার দেবতার মত পিতা—তিনি আমায় ত্যাগ করতে উদ্যত, আমার পরম-হিতৈষী পিতৃতুল্য কালিকাবাবু আমার জন্য কাঁদছেন, আর হয়ত শৈলজাও আমার জন্য পথ চেয়ে বসে আছে। তোমার ঐ অবাধ্য অন্ধ নয়ন দিয়ে তুমি আমায়—"

সরোজ আগুনের মত জ্বলিয়া উঠিয়া বলিল, "এতেও বুঝতে পারছেন

না, আপনি কতখানি অন্ধ। আপনার উদ্দাম স্বেচ্ছাচারিতা যে আমার চাইতেও আপনাকে অন্ধ করেছে। যে নিজের জন্য সকল হিতৈষী বন্ধু আত্মীয়ের ভালবাসাকে তুচ্ছ করতে পারে, সে মানুষ নয়। আপনার নিজের অন্তরের দিকে ভাল করে না চেয়ে এই মন নিয়ে কি করে রোজ আমার কাছে আসতেন—আর আমিই বা কি করে সব বুঝে সব জেনেও আপনাকে সহ্য করেছি, এইটেই আমার ভারী আশ্চর্য্য মনে হচ্ছে। কিন্তু আর না, আর আমি আপনাকে কাছে আসতে দেব না। যে নিজের বাপ-মার নয়, বন্ধুর নয়, আত্মীয়ের নয়, এমন কি প্রাণ-দিয়ে ভালবাসারও নয়, সে কোন্ সাহসে অসহায় পরনির্ভরশীল অন্ধের কাছে আসে?"

কার্ত্তিক অবরুদ্ধ কণ্ঠে বলিল, "সরোজ, ক্ষমা কর। আর আমি এখানে আসব না। কিন্তু ঠিক জেনো যে তুমি আমার পক্ষে যত দুর্ল্লভ হয়ে উঠছ, ততই আমায় নির্দ্দয় ভাবে আকর্ষণ করছ। তুমি না চাইতে আমি আপনাকে দিয়েছি, এই আমার অপরাধ। তুমি লভ্য নও, তুমি নিতান্তই অন্ধকারের মত অবোধ্য, তাই তোমার এতখানি শক্তি! তোমায় বুঝতে পারি না তাই আসি। বুঝতে পারলে হয়তো আসতুম না। তুমি আমায় চাও না, তাই তুমি আমায় টানছ। যাক্, আবার কি বলতে কি বলব! আমি চলে যাচ্ছি, তোমরা তোমাদের কর্ত্তব্য কর। কর্ত্তব্যই তোমাদের কাছে যখন বড়, তখন আমার মত কর্ত্তব্যহীন বন্ধনহীন সংসার-থেকে-সম্পূর্ণ-বিচ্ছিন্ন জীব তোমার নিয়মে-বাঁধা জগতের মধ্যে বিপ্লব বাধাতে আর আসবে না।"

কার্ত্তিক চলিয়া গেল। সুকুমারী সরোজের হাত ধরিয়া টানিল। কিন্তু সরোজ বেঞ্চ খানার উপর অবসন্ন দেহে বসিয়া পড়িয়া দুই হাতের মধ্যে মুখ লুকাইল। সুকুমারী বলিল, "এস সরো-দি, মার ওষুধ খাবার সময় হয়েছে যে।"

সরোজ ভাবিল, ঠিক্, ওষুধ খাবার সময় হয়েছে! ওষুধ তেতোই হয়! প্রকাশ্যে বলিল, "বিন্দুকে ডেকে দাও, ওষুধ খাওয়াক্। আমি একটু পরে ওঁর খাবার তৈরি করে নিয়ে যাচ্ছি। তুমি যাও সুকু, খেলা করগে।"

সুকুমারী চলিয়া গেল, কিন্তু সরোজ উঠিল না। তাহার অন্তরের অন্ধকার ঘনতর হইয়া আসিয়াছে। যে আলো আসিতে চাহিতেছিল, সবলে সেই আলোর প্রবেশ-দ্বার সে আজ বন্ধ করিয়া দিয়াছে। সে চির-অন্ধকারের জীব, কাজ কি তার ক্ষণিকের আলোয়? কিন্তু মন যে কিছুতেই থামিতে চায় না! ঐ যে পদ-শব্দ ক্রমেই দূরে মিলাইয়া গেল, তাহার অশ্রুত ধ্বনির পিছনে অ-বদ্ধ মনটা কেবলই যে ছুটিতে চাহিতেছে! আর একবার মাত্র—একটীবার ঐ অতি-পরিচিত পদধ্বনি শুনিবার জন্য যে তাহার অন্তরের নির্ব্বাক অন্ধকার গুমরিয়া কাঁদিয়া উঠিতেছে! কেহ ত অন্ধের পানে আর অমন করিয়া চাহিয়া হৃদয়ের আলো লইয়া অন্ধকার হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করিতে চাহিবে না! জগতে তাহাকে অমন প্রাণ দিয়া চাহিবে, এত বড় হতভাগা ত আর একটাও এ সংসারে পাওয়া যাইবে না! তবে সে ঐ একটী মাত্র হতভাগ্যকে কেন এমন করিয়া দূরে ঠেলিয়া দিল?

আলো আসিতে আসিতে অর্দ্ধ পথে তাহারই ফুৎকারে নিবিয়া গেল! হায় আলো,—হায় অন্ধকারের চির-প্রার্থিত বস্তু, হায় আঁধার ঘরের কুড়াইয়া-পাওয়া মাণিক, তোমায় চাহি না,—এইটাই তুমি বুঝিয়া গেলে? হায় অন্ধতা, তুমি কি এমনি অন্ধকার যে, তোমার কিছুই কেহ কখনও বুঝিতে পারিবে না? তুমি কি চিরদিনই মৌন নির্ব্বাক থাকিয়া যাইবে?

৯

শিবচন্দ্র ন্যায়রত্ন পুত্রের পত্রের উত্তর পাঠাইয়া মনোরমা দেবীকে বলিয়া দিলেন, সে দিন হইতে কার্ত্তিকের নাম যেন তাঁহার গৃহে আর না লওয়া হয়। মনোরমা দেবীর মনে হইল সংসারের যত-কিছু কাজ-কর্ম্ম ছিল, সমস্তই শেষ হইয়া গিয়াছে—এখন একটা মস্ত ছুটির দিন আসিয়াছে। আর কাহারও জন্য কিছু করিতে হইবে না, কাহারও আশায় বসিয়া থাকিতে হইবে না, আশা-আশঙ্কা-উদ্বেগাদির দায় হইতে পরিত্রাণ লাভ করিয়া সুদীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া তিনি গৃহ-দেবতার সম্মুখে বসিয়া পড়িলেন। বাড়ীর সর্ব্বকর্ম্মের দাসী—লক্ষ্মীর মা বারংবার ঠাকুর-ঘরের দ্বার হইতে ফিরিয়া গিয়াছে। ঠাকুর বাড়ীর ব্রাহ্মণ দরোয়ান মা ঠাকুরাণীর রন্ধনের জন্য জল তুলিয়া দিয়া গিয়াছে, এমন কি দেওয়ান-গৃহিণী নিস্তারিণী দেবীর দাসী ক্ষেমিও নানা অছিলায় আসিয়া বারংবার শুনাইয়া দিয়া গিয়াছে, এ সমস্তই শঙ্করানন্দের অভিশাপের ফল,—তবুও মনোরমা দেবী উঠিলেন না। সমস্ত সংসার ব্যাপিয়া একটা বিরাট জড়তা, গুরুভার আলস্য চাপিয়া বসিয়াছে। পত্নীর অবস্থা দেখিয়া ন্যায়রত্ন মহাশয় গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "এমন করলে ত চলবে না, মনোরমা। আমরা আহারাদি ত্যাগ করতে পারি, কিন্তু ছাত্রেরা কি দোষ করেছে? তাদের দুবেলা দু মুঠো যদি না দিতে পার তা হলে তাদের বিদায় দিতে হয়। তুমি কি আমায় পৈতৃক বৃত্তি লোপ করাতে চাও?"

মনোরমা দেবী না উঠিয়া বলিলেন, "আর কার জন্য ও-সব? সব উঠিয়ে দাও।"

শিবচন্দ্র কহিলেন, "কি! পুত্রের অপরাধে পিতৃ-পিতামহের নাম লোপ করব? তার পূর্ব্বে বরং তোমাকেও ত্যাগ করতে পারি!"

মনোরমা দেবী কহিলেন, "যে স্ত্রী এত বড় পিতৃদ্রোহী সন্তানের জননী, তাকে যে স্ত্রী বলে এতদিন স্বীকার করেছ, এই তার পক্ষে যথেষ্ট, এখন তাকে বিদায় দাও, কিম্বা সংসারের পেট-ভাতায় দাসী করে রাখ, দুই সমান।"

শিবচন্দ্র কিছুক্ষণ নীরবে পত্নীর দিকে চাহিয়া রহিলেন। কত বড় আত্মধিক্কারে যে মনোরমা দেবী ঐ কথাগুলি উচ্চারণ করিলেন, তাহা প্রাণে প্রাণে অনুভব করিয়া তিনি তাঁহার মাথায় হাত রাখিয়া বলিলেন, "চন্দ্র-সূর্য্য সাক্ষ্য করে আমি যে প্রতিজ্ঞা করেছি, সে প্রতিজ্ঞা রাখতে পারলাম না, মনোরমা। যে সন্তান তার পিতার এত বড় অপমান করলে, যে সন্তান তার বাপের এত বড় ধর্ম্মচ্যুতির কারণ-স্বরূপ হ'ল, তার জন্য দুঃখ করাই দুঃখের অপমান! তুমি ওঠো, তুমি এমনভাবে অন্নজল ত্যাগ করে থাকলে গৃহদেবতা ক্রুদ্ধ হবেন। সংসারে থাকতে হলে অনেক রকম দুঃখ সইতে হয়, তা বলে ধর্ম্ম-ত্যাগ কর্ত্তব্য-ত্যাগ করবার অধিকার কারও নেই। ওঠো মনোরমা।"

স্বামীর কাতর অনুনয়ে মনোরমা দেবী আজ তিন দিনের পর কাঁদিয়া ফেলিলেন। আজ তিন দিন হইতে যে অশ্রু অবরুদ্ধ হইয়া অন্তর্লীন অগ্নির মত তাঁহাকে দগ্ধ করিতেছিল, সেই অশ্রু প্রবাহিত হইয়া বুক ভাসাইয়া দিল। অপমানিত মাতৃহৃদয় যে অশ্রুকে ঘৃণায় চাপিয়া রাখিয়াছিল, আজ আর তাহা বাঁধন মানিল না। মনোরমা দেবী দেবতার সম্মুখে লুটাইয়া পড়িয়া বলিলেন, "আমায় নাও, দেবতা।"

ন্যায়রত্নের গৃহের সমস্ত সংবাদ অবগত হইয়া কালিকামোহন তাঁহার কন্যাকে মনোরমা দেবীর নিকট পাঠাইয়া দিলেন। শৈলজা আসিয়া মনোরমার পদতলে প্রণাম করিবামাত্র তিনি তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিলেন। শৈলজাও তাঁহাকে সান্ত্বনা দিবার মত

একটী কথাও খুঁজিয়া না পাইয়া কেবল মনোরমা দেবীর অশ্রুতে অশ্রু মিশাইয়া বসিয়া রহিল। এইরূপে কিছুক্ষণ বসিয়া থাকিয়া পরে অশ্রু মুছিয়া সে বলিল, "মা, আপনি ব্যস্ত হবেন না, বাবা বলেছেন, সমস্তই আবার ঠিক হয়ে যাবে।"

মনোরমা দেবী তাহার শিরশ্চুম্বন করিয়া বলিলেন, "যে অন্ধ তার হাতের কাছে এত বড় মাণিক থাক্‌তে আলেয়ার পেছনে ছোটে, তার জন্য আশা করাও আশার অপমান! যাও মা, আমাদের আশা আর করো না। তোমার বাবাকে বলো, সেই মহাপাপিষ্ঠের আশা তিনি আর না করেন। অযোগ্য পাত্রের জন্ত এমন কন্তাকে অবিবাহিতা রাখা অন্তায়। আমাদের পাপে তোমরা কেন কষ্ট ভোগ কর?"

শৈলজা অবনত মস্তকে ধীরে ধীরে বলিল, "তা হয় না মা, বাবা বলেন বামুনের মেয়ের বাগ্‌দত্তা হওয়া যা, বিয়ে হওয়াও তাই।"

মনোরমা দেবী কহিলেন, "শাস্ত্রে কি আছে জানিনে, কিন্তু তাই বলে মেয়েকে জলে ফেলে দিতে বল্‌তে পারিনে ত। এর পরও যদি তোমার বাবা সেই লক্ষ্মীছাড়াটার সঙ্গে তোমার বিয়ে দেন, তাহলে যে তোমায় জীবনে অনেক কষ্ট ভোগ কর্‌তে হবে। যার এমন বাপ কেউ নয়, সর্ব্বানন্দের মত বন্ধু কেউ নয়, তোমার বাবার মত এত বড় হিতৈষীও কেউ নয়, সে কি জীবনে কখনও কারও হবে? তাকে আপন করা কারও সাধ্য নয়।"

শৈলজা ব্যস্ত হইয়া বলিল, "তবু তিনি আপনাদেরই সন্তান, সেটা ত মিথ্যা নয়। একবার যদি ক্ষণিকের মোহে তাঁর একটা ভুল হয়ে থাকে, তাই বলে কি তাঁকে আপনারা একেবারেই ত্যাগ কর্‌বেন? আপনারা ত্যাগ কর্‌লে তাঁর যে আর কোন উপায় থাক্‌বে না।"

মনোরমা শৈলজার মুখখানি তুলিয়া ধরিয়া কিছুক্ষণ পরম স্নেহে চাহিয়া

রহিলেন, পরে তাহার ললাট চুম্বন করিয়া কতকটা আত্মগতভ
বলিলেন, "আশা আছে—আশা আছে—এই তুমিই আমার একম
আশা!" শৈলজা লজ্জিত হইয়া বলিল, "এখন তাহলে আসি, মা এ
আছেন।"

শৈলজা প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল।

* * * * *

এদিকে নিস্তারিণী দেবী দেওয়ান দুর্গাশঙ্করকে ধরিয়া বসিলেন, ‹
সময়ে মণিশঙ্করের সহিত শৈলজার বিবাহের চেষ্টা কর। দুর্গাশং
বলিলেন, "কেন, শৈলজার অপরাধ? কার্ত্তিকের উপর তার বাপ র
করেছে বলে কি শৈলজার আর সৎপাত্র যুটবে না?"

এই উত্তরের ফলে দুর্গাশঙ্করবাবুকে সে দিনটি যেরূপ অশান্তিে
কাটাইতে হইয়াছিল, তাহার বর্ণনা নিষ্প্রয়োজন; এবং পরে যে তাঁহাে
পরাজয় স্বীকার করিয়া নিস্তারিণী দেবীর কথানুযায়ী কার্য্য করিে
হইয়াছিল, সে কথা বলা বাহুল্য।

সন্ধ্যার পর তিনি টোলে গিয়া ন্যায়রত্ন মহাশয়ের নিকট অি
লজ্জিতভাবে উপবেশন করিলেন। তাঁহাকে তদবস্থ দেখিয়া ন্যায়র
বলিলেন, "দেওয়ানজী, আপনি অমন ক'রে এসে বস্‌লেন যে! আমা
সান্ত্বনা দিতে এসেছেন?" দেওয়ান লজ্জিত হইয়া বলিলেন, "আজ্ঞে ত
নয়, আমিই কোন প্রার্থনা নিয়ে আপনার কাছে এসেছি।"

শিবচন্দ্র কহিলেন, "প্রার্থনা! আমার কাছে? কি প্রার্থনা, বলুন।

দেওয়ানজী কহিলেন, "কিন্তু বল্‌তে ভয় হচ্চে, পাছে আপি
রাগ করেন!"

শিবচন্দ্র কহিলেন, "রাগ ক'র্‌ব! এমন কি প্রার্থনা? বলুন
সাধ্যাতীত না হ'লে নিশ্চয় তা পূরণ কর্‌বার চেষ্টা ক'র্‌ব।"

দেওয়ানজী কহিলেন, "আপনি ব্রাহ্মণ, আপনার এইটুকু কথাই যথেষ্ট। আমি প্রার্থনা ক'রছি যে আমার মণির সঙ্গে শৈলজার বিবাহের সম্বন্ধ ক'রে দিন।"

শিবচন্দ্র কহিলেন, "আপনার মণির সঙ্গে? কি ভয়ঙ্কর! শৈলজার কোষ্ঠীতে কি সৎপাত্র যোট্বার মোটেই আশা নেই! আপনিই বলুন, মণির মত পাত্রের সঙ্গে—আপনার যদি কোন কন্যা থাকৃত—তার বিয়ে দিতে পার্তেন?"

দেওয়ানজী কহিলেন, "কিন্তু আমি পিতা!"

শিবচন্দ্র কহিলেন, "তেমনি শৈলজাও কোন পিতার সন্তান। আমি বল্লেও তিনি জেনে-শুনে কেমন ক'রে এমন অসৎপাত্রে মেয়ে দেবেন?"

দেওয়ানজী কহিলেন, "সৎপাত্রও যেমন পিতৃদ্রোহী কুসন্তান হ'তে পারে, অসৎপাত্রও তেমনি সঙ্গ, সময় ও অবসরের গুণে সৎপাত্র হ'তে পারে।"

শিবচন্দ্র আহত হইয়া বলিলেন, "দেওয়ানজী, এ আঘাত আমার প্রাপ্য বটে; আপনি ঠিকই করেছেন। আমার যেমন অহঙ্কার তেমনি তার উপযুক্ত প্রতিফল দিয়েছেন। আচ্ছা, বেশ আমি চেষ্টা কর্ব, যথাসাধ্য চেষ্টা কর্ব, যাতে মণির সঙ্গে শৈলজার বিয়ে হয়। কিন্তু—"

দেওয়ানজী কহিলেন, "কিন্তুর বিষয় আপনাকে চিন্তা ক'র্তে হবে না, ন্যায়রত্ন মশায়, কিন্তুর বিষয় আমার সমস্তই জানা আছে। আমি পিতা বলে এত বড় অন্ধ নই যে আমার ঐ বর্ব্বর সন্তানের কোন্ জায়গায় 'কিন্তু' আছে, তা দেখ্তে পাইনে। কিন্তু তবু আমি ওর জন্মদাতা, ওর পাপের ভাগ আমাকেও কতক বইতে হচ্চে এবং হবেও। তবু ওকে ত্যাগ ক'র্তে পারিনে। আপনার মত ন্যায়ের তুলা-দণ্ড ধরে কোন পিতাই বসে থাকৃতে পারে না। বাপ যখন পুত্রের জন্ম দিয়েছে, তখন

পুত্রকে ধূলোমাটী-শুদ্ধ প্রাণপণে কোলের মধ্যে ধরে' পরের আঘাত থে
তাকে বাঁচাতে সে বাধ্য! ভগবান যেমন ন্যায়-অন্যায় বস্তু-অবস্তুর বিচ
কর্‌বার ক্ষমতা মানুষকে দিয়েছেন, তেমনি একটা অন্ধ প্রবৃত্তিও ত
সঙ্গে জুড়ে দিয়েছেন, সেটার নাম স্নেহ। ভগবান যেমন ধূলো দি
রাস্তার কঠোরতা বন্ধুরতা ঢেকেছেন, তেমনি স্নেহ দিয়ে সংসা
ধর্ম্মাধর্ম্ম কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের বন্ধুরতাও কতকটা দূর ক'রেছেন। ধূলোয় চে
অন্ধ ক'রে দেবে, পথ দেখ্‌তে দেবে না, তবু তাকে ছাড়্‌বার জো নে
ঝাড়্‌বার উপায়ও নেই। ঝাড়্‌লে সে ধূলো আরও নাকে-মুখে ঢুক্‌বে।'

দেওয়ানজী ন্যায়রত্নকে নমস্কার জানাইয়া চলিয়া গেলেন। শিবচন্দ্র প্রতি নমস্কার বিস্মৃত হইয়া শূন্য দৃষ্টিতে বাহিরের দিকে চাহিয়া রহিলেন। ঠিক ধূলা ঝাড়িতে গেলে আরও নাক-মুখ দিয়া সে প্রবেশ করে! তা করে বটে শিবচন্দ্র প্রাণে-প্রাণে তাহা অনুভব করিতেছেল। হায় ধূলা, হায় প ভুলানো, সব-ভুলানো অন্ধ-করা ধূলা, তোর হাত হইতে কিছুতে পরিত্রাণ নাই!

১০

বন্ধন! চারিদিকেই বন্ধন! কর্ত্তব্যের বন্ধন, উচ্চ আশার বন্ধন ধর্ম্মের বন্ধন, ক্ষুধা-তৃষ্ণার বন্ধন, এমন কি স্নেহেরও বন্ধন! স্বাধীনতা নাম-গন্ধ এ জগতে নাই! এক পা এদিক-ওদিক ফেলিবার জো নাই ফেলিলেই চারিদিক হইতে চীৎকার, ক্রুদ্ধ অভিশাপ, অথবা কাত ক্রন্দন! যিনি গুরু, তিনি বলিতেছেন, ইহাই কর, আর কিছু করিতে পারিবে না; যিনি ধর্ম্মোপদেষ্টা, তিনি বলিতেছেন, ইহাই কর্ত্তব্য, অ কিছু করিলে পাপ হইবে; যিনি ভালবাসেন, তিনি বলিতেছেন, ইহা কর; আর কিছু করিলে আমার কষ্ট হইবে, আমি কাঁদিব। অথ

কেহই একবার ভাবিয়া দেখিবেন না, আমার কি প্রয়োজন, আমি কি চাই। আমার ক্ষুধিত হৃদয় যাহার জন্য কাঁদিতেছে, তাহার দিকে চাহিবারও আমার অধিকার নাই, চাহিলেই হয় রক্ত চক্ষুর অগ্নিবর্ষণ, নয় কর্ত্তব্যের সিংহনাদ,—অথবা স্নেহের করুণ আর্ত্তস্বর! কার্ত্তিক অতিষ্ঠ হইয়া ভাবিল, এই বন্ধনের মূলোচ্ছেদ করিতেই হইবে!

বাহির হইতে টানাটানি করিলে সমস্ত বন্ধনগুলি একজোটে তাহাকে চাপিয়া ধরিয়া রাখিবে। কিন্তু একে একে প্রত্যেক বন্ধনের মূলদেশ তীক্ষ্ণধার অস্ত্রের দ্বারা আক্রমণ করিতে পারিলে হয়তো সে মুক্তিলাভ করিতে পারে। অতএব এখন হইতে তাহার একমাত্র কর্ত্তব্য হইল, সেই তীক্ষ্ণধার অস্ত্র সংগ্রহ করা এবং সর্ব্বপ্রযত্নে তাহা প্রয়োগ করা।

কার্ত্তিক তাহার পিতার পত্রের অতি বিনীত উত্তর লিখিয়া সর্ব্বানন্দ ও শশিভূষণের সম্মুখে ফেলিয়া দিল। শশিভূষণ তাহা পাঠ করিয়া চুপ করিয়া রহিল, কিন্তু সর্ব্বানন্দ কিছুক্ষণ কার্ত্তিকের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া অবশেষে গম্ভীরভাবে গীতার একটা শ্লোক আবৃত্তি করিল—

"সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে।
ক্রোধাৎ ভবতি সংমোহঃ সংমোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাৎ বুদ্ধিনাশঃ বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি॥"

কার্ত্তিক বলিল, "অর্থাৎ আমি নাশের দিকে যাচ্ছি! তোমাদের মনোবাঞ্ছাই পূর্ণ হ'য়েছে, তবু কেন নাশের দিকে যাব?"

শশিভূষণ কহিল, "অর্থাৎ এত বড় মিথ্যা চিঠি যখন তুমি লিখ্‌তে পেরেছ, তখন তোমার বুদ্ধিনাশ না হোক সম্মোহ পর্য্যন্ত হয়েছে। সম্মোহের পর যে যে অবস্থা শাস্ত্রে লেখা আছে, তাই দেখ্‌বার জন্য আমরা প্রস্তুত রইলুম। এখন যাও যেদিকে খুসি, আমরা আমাদের কাজ করি। আর তুমি বিরক্ত কর্‌তে এস না।"

কার্ত্তিক কহিল, "অর্থাৎ তোমরা আমায় ত্যাগ কর্‌লে।"

শশিভূষণ কহিল, "কিরে সর্ব্বা? তোর সে শ্লোকটা কি, সেই 'বোরগক্কতা'— ?"

কার্ত্তিক কহিল, "আমার অপরাধটা কি যে তোমরা এত বড় শাস্তি দিচ্ছ? সংসারে যে যা চায় সে তা পায় না, তাই বলে কি মানুষ কিছু চাইবেও না? এতবড় পরাধীনতা কি নিষ্ঠুরতা নয়? তোমাদের এতবড় নির্দ্দয়তার কি কোন শাস্তি কেউ দেবে না? এমন কি কেউ নেই—"

সর্ব্বানন্দ কহিল, "কৈ আর আছে! থাক্‌লে আর তোমার মত স্বার্থসেবী আত্মপরায়ণ জীবের কোন শাস্তি হয় না?"

কার্ত্তিক কহিল, "আরও শাস্তি চাই! আচ্ছা, প্রতিজ্ঞা করছি, জগতে সব-চাইতে বড় যা শাস্তি আমি তাই নেব। আমি বুঝেছি, সবাই যা চায়, আমি তা চাই না, এই আমার অপরাধ, সবাই যা করে আমি তা করিনে, এই আমার অপরাধ। আর সব চেয়ে অমার্জ্জনীয় অপরাধ এই যে আমি কারও পাকা ধানে মৈ দিই নি, আপনার সামান্য একটু কামনা নিয়ে জগতের একপাশে সরে থাক্‌তে চেয়েছিলুম। কিন্তু তা হ'তে পেল না, কারণ আমি পরাধীন!"

সর্ব্বানন্দ কহিল, "না, সব-চাইতে যা বড় অপরাধ, সেইটেই তুমি বল্‌লে না, তোমার সর্ব্বাধম অপরাধ এই যে তুমি স্বেচ্ছাচারী। নিয়মের সংসারে থেকে যে নিজেকে অনিয়মের অধীন করে তোলে, তাকে সংসার কখনই মার্জ্জনা কর্‌বে না।"

শশিভূষণ কহিল, "সংসারে একটা অদ্ভুত ব্যাপার দেখে আমি অবাক্ হয়ে গিয়েছি যে, জগতে যে বস্তু সব-চেয়ে ভাল, তাই যদি আবার কোন কারণে খারাপ হয় তাহলে তার মত খারাপ আর কিছু হ'তে পারে না;

ভাল বস্তু নষ্ট হলে তার দুর্গন্ধে অতিষ্ঠ হ'তে হয়। কার্ত্তিক, তোমার বাবাকে যখন তুমি ঠকাবার চেষ্টা ক'রেছ, তখনই বুঝেছি যে তোমার আর আশা নেই। বাপকে যদি ঠকাও তাহলে আর কোন্ পাপের ভয় তোমায় ঠেকিয়ে রাখ্‌বে ?"

কার্ত্তিক কহিল, "এই চিঠিতে বাবার চোখে যে ধূলো দেবার চেষ্টা করেছি, তাই বা তুমি কেমন করে জান্‌লে ? আর যদিই বা কারও চোখে ধূলো দি, তিনি ত ইচ্ছা ক'র্‌লে চোখ ঢাক্‌তেও পারেন ! তোমরা ত রয়েছ, তাঁদের সাবধান করে দাও না কেন ! লিখে পাঠাও যে কার্ত্তিক আর আপনাদের স্নেহের উপযুক্ত নেই। এখন তার চরিত্র, তার সুবুদ্ধি সমস্তই এমনি পচে উঠেছে যে তার দুর্গন্ধে তোমরাই ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠেছ ?"

শশিভূষণ কহিল, "স্নেহ জিনিসটা চিরদিনই নিম্নগামী। যে যত নীচ, যার চরিত্র যত অধঃপতিত, স্নেহপরায়ণ মানুষের, সাধু লোকের স্নেহ ততই তার দিকে ছুটে চ'ল্‌তে থাকে। তুমি যত নেমে যাবে, তোমার বাপ মা আর কালিকাবাবুর স্নেহ ততই তোমার দিকে ছুটে চ'ল্‌বে। প্রমাণ চাও, এই চিঠিখানা পাঠিয়ে দু'দিন অপেক্ষা কর, দেখ্‌বে, তাঁরা তোমার সব দোষ ক্ষমা করে আবার তোমায় তেমনি ভালবাস্‌ছেন। কিন্তু যদি তুমি মানুষ হও তাহলে তোমার সব কথা খুলে লেখা উচিত। তুমি কি হয়েছ সব কথা প্রকাশ ক'রে বল, তারপরও যদি তাঁরা তোমায় গ্রহণ করেন তাহলে আত্মসমর্পণ ক'র্‌বে।"

কার্ত্তিক কহিল, "আমি কি হয়েছি,—কি দোষ তোমরা দেখ্‌তে পেয়েছ, স্পষ্ট করে বল, তারপর আমি সেই কথা সত্য হোক আর মিথ্যা হোক কালিকাবাবুকে লিখে দেব।"

সর্ব্বানন্দ কহিল, "লিখে দাও যে তুমি মনে মনে ভয়ঙ্কর এক মতলব

এঁটে বসে আছ। অকারণে কতকগুলি নির্দ্দোষের উপর প্রতিশোধ নেবার মতলব ক'রেছ।"

কার্ত্তিক ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "প্রতিশোধ আমি নেবই, তবে তাতে কার যে বেশী অপকার হবে, আমার, কি অন্যের, তা ব'লতে পারি নে। যাক্, তোমাদের কথাই রাখ্‌লুম! এই আমি এখনি চিঠি লিখে দিচ্ছি—ঐ সব কথাই লিখ্‌ব।"

কার্ত্তিক আর একখানা পত্রে সর্ব্বানন্দ ও শশিভূষণ যে সব কথা বলিল, সমস্তই লিখিয়া ডাকে পাঠাইয়া দিল। শশিভূষণ আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, "এ রকম সয়তান আর একটীও দেখিনি। আগেকার কালে শুনেছি ডাকাতের দল খবর পাঠিয়ে ডাকাতি ক'র্‌ত, এখনকার কালেও যে তা হ'তে পারে তা জান্‌তুম না। কালিকাবাবুর হয়েছে এগুলেও নির্ব্বংশ, পেছুলেও নির্ব্বংশ! এমন চিঠি পেয়ে তিনি ত এখনি তেড়ে এসে ব'ল্‌বেন, বাবা কার্ত্তিক, তুমি যা-ই হও, তোমায় আমি ছাড়্‌তে পার্‌ব না।"

কার্ত্তিক সত্যই এইবার হাসিয়া ফেলিল; হাসিয়া বলিল, "তাহ'লে আমিই বা কি করি! আমারও যে আগে গেলে বাঘে খায়, পিছে গেলে ভূতে পায়! তোমরা যা ব'ল্‌ছ, তাই ক'র্‌ছি, তবু মন পাচ্ছিনে!"

শশিভূষণ কহিল, "আমাদের বিরুদ্ধেও কোন মতলব-টৎলব আছে না কি?"

কার্ত্তিক কহিল, "তা আমি যখন মতলব নিয়েই ঘুরে বেড়াচ্ছি, তখন তোমাদের বিরুদ্ধেও কিছু আছে বৈ কি! আর যদিই বা না থাকে, তবু ত আর তোমরা আমায় বিশ্বাস ক'র্‌বে না। যাই হোক, তুমি আমার একটা উপকার কর—আমার বিষয় যা-যা ধারণা তোমাদের হ'য়েছে, সমস্ত খোলসা করে কালিকাবাবুকে লিখে দাও। তারপর যা থাকে আমার ভাগ্যে, তাই হবে।"

কার্ত্তিক চলিয়া গেলে শশিভূষণ সর্ব্বানন্দকে বলিল, "সর্ব্ব, কার্ত্তিক যা ব'ল্‌ছে, তাই ক'র্‌ব ?"

সর্ব্বানন্দ কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিল, "না ঠাকুরদা, আমি কোন্ প্রাণে তা ক'র্‌তে ব'ল্‌ব ? কার্ত্তিক যা-ই হোক্ আমার ভাই। মার পেটের ভাইয়ের চেয়েও ঢের বেশী। ও যে আমায় কত ভালবাসে, তা তুমি কি ক'রে জান্‌বে, ঠাকুরদা ? কত দিন কত মাস কত বৎসর এক সঙ্গে শোয়া বসা—এক চিন্তা, এক ধ্যান, এক জ্ঞান! রোগেও আমার সেবক, ভালবাসায়ও আমার সব-চেয়ে প্রিয়তম বন্ধু, হিতেচ্ছায়ও আমায় মার পেটের ভাইয়ের চেয়েও বড়। ওকে কি আমি ত্যাগ ক'র্‌তে পারি ? মরি যদি ত একসঙ্গে ম'র্‌ব, পড়ি যদি ত এক সঙ্গে পড়্‌ব ; তবু ওকে ছাড়্‌তে পার্‌ব না। আমার জীবনে সব চেয়ে বড় কর্ত্তব্য ওকে ভালবাসা। ছেলেবেলা থেকে ও আমার যা, তা আমিই জানি, আর ভগবান জানেন !"

শশিভূষণ কহিল, "কিন্তু তবু কালিকা কাকার মেয়ে যদি ওকে বিবাহ ক'রে শেষ অসুখী হয় ? কার্ত্তিকের ভাব দেখে বোধ হ'চ্চে যে মনে মনে ও কি একটা ভয়ঙ্কর প্রতিজ্ঞা করেছে। ওর চরিত্র যতদূর বুঝেছি তাতে এই ব'ল্‌তে পারি যে, ও যদি একবার মন্দর দিকে বেঁকে, তাহলে অধঃপাতের চরম সীমায় না পৌঁছে থাম্‌বে না। সেইজন্য মনে হ'চ্চে, আমাদের কর্ত্তব্য এ বিবাহে বাধা দেওয়া।"

সর্ব্বানন্দ কহিল, "তাই যদি কর্ত্তব্য ব'লে তোমার বোধ হয়ে থাকে, তাহ'লে ও যখন সরোজকে এমন করে প্রাণ দিয়ে চাচ্ছে, তখন সরোজের কাছে যাবার পথই বা ওর পক্ষে বন্ধ ক'রে দাও না কেন ?"

শশিভূষণ কহিল, "কি জান ভাই, উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খলতাকে আমি কিছুতেই ভালবাসা বলে স্বীকার ক'র্‌তে চাইনে। কার্ত্তিকের মত

অতখানি শক্তি অতখানি তেজ কি সামান্য একটা অন্ধ নারীর ভালবাসায় আবদ্ধ থাক্‌তে পারে? যদি কার্ত্তিক সরোজকে পেত, তাহ'লে ফলে এই হ'ত যে সরোজের জীবনও বিফল হ'য়ে যেত, আর কার্ত্তিকও শীঘ্র অবসন্ন হয়ে নূতনতর উত্তেজনার জন্য ছুটে বেরিয়ে পড়্‌ত।"

সর্ব্বানন্দ কহিল, "তোমার সঙ্গে এ বিষয়ে একমত হ'তে পারলুম না। তুমি হয়তো মিছি-মিছি দুটো জীবনকে বিফল ক'রে দিলে! তারপর যদি কার্ত্তিকের সঙ্গে শৈলজার বিবাহ ভেঙ্গে দেবার চেষ্টা কর, তাহলে হয়তো আরও একটা জীবন বিফল করে দেবে। আমার মতে তুমি আর এ বিষয়ে কিছু ক'রো না, ভগবানের যা ইচ্ছে তাই হোক্।"

শশিভূষণ এ কথার আর কোন প্রতিবাদ করিল না।

১১

পুত্রের কাতর প্রার্থনাপূর্ণ পত্র পাইয়া শিবচন্দ্রের অন্তর-ব [illegible] গেভীর বেদনায় কম্পিত হইয়া উঠিল। কার্ত্তিক তাহার সমস্ত [illegible] বর্ণনা করিয়া তাহার অন্তরের সমস্ত গোপন কথা প্রকাশ করিয়া পা[illegible]য়াছে, "আমার মনের এইরূপ অবস্থা জানিয়া-শুনিয়াও যদি বাবু [illegible] হাতে তাঁহার কন্যাদান করিতে উদ্যত হন, তাহা হইলে অগত্যা বিবাহ করিতে আমি বাধ্য। ইহা ছাড়া আপনার সঙ্গে কলিকাতায় আসিবার পূর্ব্বে যে কথা হয়, তাহাতে বুঝিয়াছিলাম, শৈলজার সঙ্গে আমার বিবাহ আপনার তত অভিপ্রেত নয়। তখন যদি বুঝিতাম যে, আপনিও বাবুর মতেই মত দিয়াছেন, এমন-কি চন্দ্র-সূর্য্য সাক্ষ্য করিয়া বাবুর কন্যাকে পুত্রবধূরূপে গ্রহণ করিতে স্বীকার করিয়াছেন, তাহা হইলে আমি এতদূর নীচ প্রকৃতির নই যে আপনি বাক্যদান করিয়াছেন জানিয়াও শৈলজাকে বিবাহ করিতে অস্বীকৃত হইব। যাহাই হউক, এখন আপনিই আমার বিচারক। আমি

আপনার অধম পুত্র; এ-রকম অবস্থাতেও যদি আপনি শৈলজাকে পুত্রবধূরূপে গ্রহণ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া থাকেন, লিখিবেন, আমি ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া আপনার সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিব। আমারও একটা সঙ্কল্প ছিল, যে সর্ব্বদাদার সঙ্গে শৈলজার বিবাহ দিব, কারণ সে শৈলজাকে অত্যন্ত স্নেহের চক্ষে দেখে; এমন-কি আমি এইরূপ হওয়ার দরুণ ক্রুদ্ধ হইয়া সেও আমায় ত্যাগ করিতে বসিয়াছে। চারিদিক হইতে এমনভাবে পরিত্যক্ত হইয়া আমি বাঁচিব কিরূপে? আপনি আমায় ত্যাগ করিয়াছেন, মার কোলেও আমার স্থান নাই, সর্ব্বদাদাও আমার সঙ্গ ত্যাগ করিল। আমি ভগবানের নিকট নিশ্চয়ই গুরুতর অপরাধী;—কিন্তু কি যে আমার অপরাধ, তাহা জানিতে পারিতেছি না, ইহাই আমার ক্ষোভ। তথাপি আমার অপরাধ থাকুক্ আর নাই থাকুক্, আমি আপনারই। পুত্র যত দোষী হোক, পিতা তাহাকে কিছুতেই পরিত্যাগ করিতে পারেন না। আপনি যদি আমায় ত্যাগ করেন, তাহা হইলে আমার আর দাঁড়াইবার স্থান কোথায়?”

শিবচন্দ্র পত্র পড়িয়া মস্তক কণ্ডূয়ন করিতে লাগিলেন এবং অজ্ঞাতে তাঁহার চক্ষু জলপূর্ণ হইয়া আসিল। পুত্র দোষী হোক্ আর নির্দ্দোষ হোক, এমনভাবে আত্মসমর্পণ করিলে তাহাকে কোলে না তুলিয়া লইয়া কি থাকা যায়? শিবচন্দ্র ব্যস্ত হইয়া পত্র-হস্তে কালিকাবাবুর নিকট উপস্থিত হইলেন।

কালিকাবাবুর কয়দিন হইতে ক্রমাগত জ্বর হইতেছিল। নানা চিন্তায় ইদানীং তাঁহার শরীর ভাঙ্গিয়া আসিয়াছে। তথাপি অক্লান্তকর্ম্মী কালিকাবাবু তাঁহার বিপুল জমিদারী ও বৈষয়িক কার্য্য সমস্তই প্রত্যহ নিয়মিতরূপে পরিদর্শন করিতেছিলেন।

জমিদারী কাছারির কাজ দেখিতে দেখিতে কার্ত্তিকের পত্র পাইয়া

তিনি হাতে লইয়া অন্যমনস্কভাবে ভাবিতেছিলেন, এখন খুলিবেন কি না। কি জানি, কেন, এ পত্র খুলিতে আজ কিছুতেই তাঁহার সাহস হইতেছিল না। দুই চারিবার নাড়িয়া চাড়িয়া তিনি উহা ডেস্কের মধ্যে রাখিয়া অন্য কার্য্যে মন দিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। এমন সময় পত্র-হস্তে ন্যায়রত্ন মহাশয় সেই স্থানে উপস্থিত হইলে তিনি কাছারি ছাড়িয়া পাশের ঘরে গিয়া একটা চেয়ারে বসিলেন। শিবচন্দ্রও তাঁহার অনুসরণ করিলেন।

শিবচন্দ্র তাঁহার পত্রখানা কালিকাবাবুর হস্তে দিলেন। কালিকাবাবু আদ্যন্ত পাঠ করিয়া বলিলেন, "এমন ছেলেকেও আপনি ক্রুদ্ধ হয়ে মর্ম্ম-পীড়িত করেছিলেন? ছিঃ! দাঁড়ান, আমাকেও সে আজ পত্র দিয়েছে, দেখি, তাতেই বা সে কি লিখেছে।" তিনি তখন স্বয়ং তাঁহার সেই পত্র-খানা আনিয়া পাঠ করিলেন, সেখানি পূর্ব্ব পত্রেরই অনুরূপ। উপরন্তু কার্ত্তিকের সম্বন্ধে সর্ব্বানন্দ ও শশিভূষণ যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছিল, তাহাও স্পষ্ট লেখা আছে। কার্ত্তিক কোন কথা গোপন করে নাই।

কালিকাবাবু পত্র পড়িয়া বলিলেন, "এখন আপনার মত কি?"

শিবচন্দ্র কহিলেন, "এমন অবস্থায় কি ক'রে বল্‌তে পারি যে, আপনি এই কার্ত্তিককে আপনার কন্যাদান করুন। সে ত স্পষ্টই ব'লেছে যে, সে অন্য-গত-চিত্ত; এ অবস্থায় আমি ত কোন রকমেই বল্‌তে পার্‌ছি না যে, এই অনুপযুক্ত পাত্রে আপনি আপনার কন্যা সমর্পণ করুন।"

কালিকাবু কহিলেন, "অনুপযুক্ত! কি বল্‌ছেন আপনি? এতখানি সরলতার কি কোন মাহাত্ম্য নেই? কার্ত্তিক ত কোন কথা গোপন করেনি, এমন কি এই দেখুন, আমায় যে পত্র দিয়েছে, তাতে সে লিখেছে, সর্ব্বানন্দ আর শশিভূষণের মতে কার্ত্তিক বদমতলবি, স্বেচ্ছাচারী, আত্ম-সুখপরায়ণ! এমন কি এই পত্রে সে যে সরলতা দেখিয়েছে তাও তাদের

মতে ভাণ মাত্র! ওর সমস্তই মিথ্যা এই কথা তারা ব'ল্‌তে চায়। যে সাহস করে এ-সবও লিখ্‌তে পারে, তাকে সন্দেহ কর্‌বার কারণ আমি ত খুঁজে পাই না।"

শিবচন্দ্র কহিলেন, "ওর যখন প্রয়োজন যে আপনি ওকে ত্যাগ করুন, তখন ও কেন, মিথ্যে হোক্ সত্যি হোক্, নিজেকে দোষী করে পত্র লিখ্‌বে না? ওর ত এই প্রয়োজন যে আপনি ওকে এই বিবাহের দায় থেকে মুক্তি দেন।"

কালিকাবাবু কহিলেন, "কৈ ও ত মুক্তি চায় নি! ও ত স্পষ্ট ব'লেছে যে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ পুত্রকন্যা জগতে পাওয়া যায় না, তাই বলে বাপ-মা তাকে ত্যাগ ক'র্‌লে সে ত নষ্টের দিকে যাবেই। সবাই ত্যাগ ক'রেছে বলে বাপ-মার তাকে ত্যাগ করা উচিত নয়, এমন কি যাতে আবার সে ঠিক পথে চল্‌তে পারে, তাই তাঁদের করা উচিত।"

শিবচন্দ্র কহিলেন, "তবে কেন সে লিখ্‌লে যে তার কি দোষ, সে তা জানে না? তার মতে সে কোন দোষই করেনি। আমি তাকে যেমন চিনি, এমন বোধ হয় কেউ চেনে না। আমি জানি, যদি সে ঠিক বুঝে থাকে যে তার অন্যায় হ'য়েছে, তাহলে সে এখনি ছুটে এসে আমাদের কাছে মাপ চাইবে। এমন করে দূরে থেকে পত্রের দ্বারা কাজ সার্‌বার চেষ্টা ক'র্‌ত না। এ পত্র যে ভাণ মাত্র যদিও সে কথা বিশ্বাস ক'র্‌তে আমার মন চাইছে না, তবুও পুত্র-স্নেহে অন্ধ হয়ে আমি কেমন ক'রে বলি যে, আপনি সমস্ত বিষয় বিচার না করেই এই পুত্রকে কন্যা সম্প্রদান করুন?"

কালিকাবাবু কহিলেন, "ন্যায়রত্ন মশায় আপনার মত ন্যায়পরায়ণ লোকের কি এতবড় খল-স্বভাব পুত্র হ'তে পারে? না, আমি ব'ল্‌ছি, এ পত্র ভাণ নয়। সে আমার কবল থেকে মুক্তি চাইতে পারে, কিন্তু

এ পত্র ভাণ নয়। সে স্পষ্টই তার নিজের বিষয়ে পরের যা ধারণা তাও লিখেছে। এখনো সে বালক মাত্র, তবে মনের এখন যে গতি, দু'দিন পরে তা থাক্‌বে না, এই আমার ধ্রুব বিশ্বাস। তাহলেও ব্যাপার যখন এই রকম দাঁড়িয়েছে, তখন শৈলজার গর্ভধারিণীর কি মত হবে, সেটা এখন জানা প্রয়োজন। আর শৈলজার মনের কথাও যখন জানি, তখন তার মত নেওয়াও প্রয়োজন। তাকে যখন এতদিন পর্য্যন্ত অবিবাহিতা রেখেছি, এবং সেও যখন ভাল-মন্দ বুঝ্‌তে শিখেছে, তখন তার মতটাও ফেল্‌বার নয়।"

শিবচন্দ্র কহিলেন, "এই অবকাশে আমিও আমার একটা কর্ত্তব্য সেরে নি। আমি দেওয়ানজীর কাছে প্রতিশ্রুত হয়েছি যে, তাঁর পুত্রের সঙ্গে আপনার কন্যার বিবাহের সম্বন্ধ ক'র্‌ব। সেই জন্য বল্‌ছি যে, যদিও আপনার কন্যা বাগ্‌দত্তা হয়ে রয়েছেন, তথাপি ঐ অন্য-পূর্ব্বা কন্যাকেও তিনি পুত্রবধূরূপে গ্রহণ কর্‌তে রাজী আছেন। আর যদি বলেন যে মণিশঙ্করের মত পাত্রে কি করে কন্যাদান কর্‌বেন, তাতে আমি এই বল্‌তে চাই যে, যদি ভাল পাত্র মন্দ হয়ে যেতে পারে, তাহলে মন্দই বা ভাল না হতে পার্‌বে কেন? আজ মণিশঙ্কর অপাত্র, হয়তো বিবাহের পর তার মতি গতি বদ্‌লাতে পারে।"

কালিকাবাবু হাসিয়া বলিলেন, "আপনার কর্ত্তব্য আপনি করেছেন। এখন তাঁকে বল্‌বেন যে তাঁর এই অনুগ্রহের জন্য চিরবাধিত হলুম। কিন্তু তাঁর পুত্রকে আমি কন্যা দিতে পার্‌ব না। হয়তো ন্যায়ের তর্কে তাঁর পুত্র পাত্র হ'তে পারে, কিন্তু ধর্ম্মের নামে যে অধর্ম্মের কাজ কর্‌ছে, তাকে কন্যাদান চিরদিনই অধর্ম্ম। অবশ্য এ কথাও তাঁকে ব'ল্‌বেন যে তাঁর এই অনুপযুক্ত প্রস্তাবের জন্য আমি তাঁর উপর কিছুমাত্র শ্রদ্ধাহীন হইনি। কারণ পিতা মাত্রেই পুত্রের মঙ্গল কামনা ক'রে থাকে।

বিশেষতঃ দেওয়ানজী আমার চির-হিতৈষী। তাঁর উপর চিরদিনই আমার যথেষ্ট শ্রদ্ধা আছে। তবে মণিকে কন্যাদান ক'র্‌তে পার্‌ব না।"

শিবচন্দ্র কহিলেন, "আমরা হয়তো মণিশঙ্করকে চিরদিনই ভুল বুঝে আস্‌ছি। কে জানে, ওর মধ্যেও হয়তো অনেক ভাল জিনিষ আছে, সময় আর অবসরের গুণে সেগুলি প্রকাশ পেলেও পেতে পারে। যাই হোক্‌, আপনি এ বিষয় চিন্তা ক'রে দেখ্‌বেন। কার্ত্তিকের প্রতি স্নেহাধিক্যে অন্যের প্রতি অযথা অন্যায় ক'র্‌বেন না। আর আপনি আমার কাছে যে বিষয়ে প্রতিশ্রুত হয়েছিলেন, তা থেকে আপনাকে আমি সম্পূর্ণ মুক্তি দিলুম!"

কালিকাবাবু কহিলেন, "কিন্তু আমি দিলুম না, এটা স্মরণ রাখ্‌বেন! আমি দেবদ্বিজের সাক্ষাতে যে প্রতিজ্ঞা ক'রেছি, তা থেকে সহজে চ্যুত হব না। তবে সবই যখন ভগবানের ইচ্ছায় ঘটে, তখন আমার আর অহঙ্কার ক'রে বল্‌বার কিছু নেই।"

শিবচন্দ্র চলিয়া গেলে কালিকাবাবু সেই দিনের জমিদারী সংক্রান্ত সমস্ত কার্য্য শেষ করিয়া অন্তঃপুরে চলিয়া গেলেন; এবং মধ্যাহ্নকৃত্য-সমাপনান্তে শয়নকক্ষে পত্নী ইন্দিরা দেবীকে ডাকিয়া আনিয়া কার্ত্তিকের পত্রদ্বয় পাঠ করিতে দিলেন। ইন্দিরা দেবী পত্র পড়িয়া বলিলেন, "এখন উপায়?"

কালিকাবাবু বলিলেন, "এখন তোমার মত কি? শৈলজা আমার একার নয়, তোমারও। শৈলজার ভাল-মন্দ কেবল আমার উপর নয়, তোমার উপরও সমানভাবে নির্ভর ক'র্‌ছে। তুমি বুঝে বল যে, বাগ্‌দত্তা কন্যাকে অন্য কোন পাত্রে এ অবস্থায় আমার দেওয়া উচিত কি না। একদিকে আমার দেব-সাক্ষাতে শপথ, আর একদিকে মেয়ের ভবিষ্যৎ মঙ্গল। কার্ত্তিকের মনের অবস্থা জেনেও যদি তাকে অসৎপাত্র জ্ঞান না

কর, অনুপযুক্ত না মনে কর, তা হলে কোন কথাই নেই, কার্ত্তিকের সঙ্গেই বিবাহ হবে। কিন্তু যদি তাকে অসৎপাত্র বলে সাব্যস্ত কর, তা হলে আমার ধর্ম্মচ্যুতিকে গণনার মধ্যেও এনো না।"

ইন্দিরা কহিলেন, "এ চিঠি পড়ে কেমন করে কার্ত্তিককে অসৎপাত্র ব'ল্‌ব? সে তো কিছুই গোপন করে নি। তবে মেয়ের ভবিষ্যৎ সুখ-দুঃখ! সে যদি সতীর কন্যা হয়, যদি কায়মনোবাক্যে আমি তোমায় ভক্তি ক'রে থাকি, তা হলে শৈলজা কখনই অসুখী হবে না। যে সুখী হব মনে করে, তাকে জগতের কোন দুঃখই বিচলিত কর্‌তে পারে না। সব রকম ক্ষতিই সে হাসিমুখে সইতে পারে।"

কালিকাবাবু কহিলেন, "বাঁচ্‌লুম ইন্দু, তোমার আশ্বাস পেয়ে আমি বাঁচ্‌লুম! না, আর আমার কোন দ্বিধা নেই। তবে একবার শৈলর মতটা জানা দরকার! কারণ সে এখন বড় হ'য়েছে, তাকে এই পত্র দেখিয়ে তার মত জেনে এসে আমায় বল।"

ইন্দিরা দেবী হাসিয়া বলিলেন, "তুমি ক্ষেপেছ! সে আবার কি ব'ল্‌বে? সে জানে যে তার বিয়ে হ'য়েছে, এখন একটা লোকাচার রক্ষার জন্য অনুষ্ঠানের প্রয়োজন শুধু বাকী। তবু তার মত জান্‌ছি।"

ইন্দিরা দেবী পত্র দুইখানি লইয়া চলিয়া গেলেন।

কালিকাবাবু বিমূঢ়ভাবে প্রতীক্ষার পর স্ত্রীকে ফিরিয়া আসিতে দেখিয়া ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, "কি বল্‌লে সে?"

"বল্‌বে আবার কি। যা তোমায় বলে গেলুম, তাই। মেয়ে অভিমানে কেঁদে ফুঁপিয়ে অস্থির যে তোমরাও কিনা আমার নিজের একটা আলাদা মতের প্রতীক্ষা কর! আমি কি তোমাদের মেয়ে নই? আমি কি পরের পেটের মেয়ে?"

কালিকাবাবু চিন্তিত মুখে বলিলেন, "এ যে আরও ভাবনার কথা!

যোগ্য সন্তানও যদি এমন করে বাপ-মার উপর নির্ভর রাখে, তাহলে মা-বাপের দায়িত্ব যে ঢের বেড়ে যায়। তাই বল্‌ছি, একটু স্পষ্ট ভাবে যদি—"

"ওগো না গো, না, কেন মিছে ও-সব ভাব্‌ছ? নিজের মেয়েকে কি জন্ম থেকে জানি না? আমাদের ইচ্ছাই যে চিরদিন ওর মনে ঢুকে ওর ইচ্ছার আকারে বেরিয়ে এসেছে। এর চেয়ে আর স্পষ্ট করে সে কি বল্‌বে? আমি যখন বল্‌ছি, তখন স্বচ্ছন্দে তুমি এ কথায় নির্ভর ক'র্‌তে পার। আমি যে নিজের মনেই বুঝ্‌ছি, কার্ত্তিক ছাড়া আর কাউকে সে বিয়ে করার কথা মনে ভাব্‌তেই পার্‌বে না।"

কালিকাবাবু একটা নিশ্চিন্ততার নিঃশ্বাস ফেলিয়া শয়ন করিলেন।

১২

প্রভাতে উঠিয়া সরোজ তাহার অতি প্রিয় ফুলগাছগুলির ফুলের উপর হাত বুলাইতেছিল। শীতের প্রভাতে বেলী যুঁই ইত্যাদি অন্তর্হিত হইয়াছিল বটে, তবু গাঁদা একাই সমস্ত ফুলের অভাব পূর্ণ করিয়া অপূর্ব্ব শোভায় সমস্ত বারান্দা আলো করিয়া প্রস্ফুটিত হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত স্থানে স্থানে নানাজাতীয় গোলাপ শোভায়-গন্ধে বর্ষাভব সমস্ত পুষ্পের স্থান অধিকার করিয়া বিরাজ করিতেছিল। সমস্তই গন্ধময়, সমস্তই কোমল স্পর্শময়, সর্ব্বোপরি সমস্তই শোভাময়! কিন্তু অন্ধের পক্ষে এই পুষ্পরাশির যাহা পরিপূর্ণ প্রকাশ—সৌন্দর্য্যের প্রকাশ, তাহাই অস্তিত্বহীন! সরোজ স্পর্শ করিতে করিতে পুষ্পের সেই বহুপূর্ব্বদৃষ্ট শোভাময় প্রকাশকে স্মরণ করিবার চেষ্টা করিতেছিল। কিন্তু তাহার অন্তর এখন স্পর্শময়, স্পর্শই এখন তাহার কাছে একমাত্র প্রকাশ! মৌন্ ফুলগুলি কেবল স্পর্শের ভাষায় কথা কহিতেছে। দর্শনের অভাব-

জনিত দুঃখ স্পর্শের সুখে মিলাইয়া যাইতেছে। সরোজ একবার টব হইতে একটি, ও টব হইতে একটি এমনি করিয়া অনেকগুলি ফু আপনার অঞ্চল ভরিয়া ফেলিয়া উপরে যাইবার উদ্যোগ করিতে এমন সময় বাহিরের দরজায় পরিচিত শব্দ শুনিয়া সে ফিরিয়া দাঁড়াইল।

শশিভূষণ ভিতরে প্রবেশ করিয়া দ্বারসংলগ্ন চিঠির বাক্সের তা খুলিয়া কয়েক খানা পত্র বাহির করিয়া পড়িতে আরম্ভ করিল। সরো অগ্রসর হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কার কার চিঠি পেলে!"

শশী অন্যমনস্কভাবে বলিল, "যাক্, বাঁচা গেল।"

সরোজ কহিল, "কার চিঠি পেয়ে ও কথা ব'লছ?"

শশিভূষণ কহিল, "তোমার শনির। শনিরাজকে রোহিণী ভেদ ক'রে যেতে দিই নি, চিরকালের জন্য ওঁর গতি সরিয়ে দিয়েছি, এর জন্য এই দশরথকে ধন্যবাদ দাও। এঃ, আজ যে অনেক ফুল তুলে ফেলেছ! যাক্, ভালই হ'য়েছে, শনির পূজো পাঠিয়ে দাও,—গ্রহরাজ কাঁচা-খেকো দেবতা!"

সরোজ হঠাৎ মুখ ফিরাইয়া বলিল, "কার কথা ব'লছ, খুলে না ব'ললে আমি কি করে বুঝব?"

শশী কহিল, "ঠিকই বুঝেছ, সরোজ। প্রকাশ করে বলা বাহুল্য মাত্র।"

সরোজ আর একটা গাঁদা তুলিয়া বলিল, "কি লিখেছেন তিনি?"

শশিভূষণ আর একখানা চিঠি খুলিতে খুলিতে বিরক্তভাবে বলিল, "লিখবে আর কি! লিখেছে, 'কাল আমার বিয়ে হয়ে গেছে, তোমাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়েছে। এখন এই দম্পতীকে আশীর্ব্বাদ করে যেয়ো। ১৮ই বৌভাতে তোমায় সবান্ধবে নিমন্ত্রণ ক'রলুম।' সবান্ধবটার মানে বুঝেছ? এত বড় নিষ্ঠুর! আমার ইচ্ছে ক'রছে, এই চিঠিখানা ছিঁড়ে

ওর মুখের ওপর ফেলে দিতে পারতুম, তাহ'লে রাগ কতক যেত। তার ওপর ভঙ্গী দেখেছ? আমার বাসার ঠিকানায় চিঠি দেয়নি, এই বাড়ীর ঠিকানায় দিয়েছে, অর্থাৎ যাতে এ চিঠির মর্ম্ম তোমার কানেও পৌছোয়। কি কাপুরুষের মত নিষ্ঠুরতা!"

শশিভূষণ পত্রখানা টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া ছিঁড়িয়া একটা টবের উপর ফেলিয়া দিয়া উপরে চলিয়া গেল। আর সরোজ! অন্ধ, আলোক-বর্জ্জিতা, প্রকাশ-শক্তি-হীনা সরোজ একটা দেওয়াল ধরিয়া সেই চির-পরিচিত পথ দিয়া উপরে যাইবার পথ খুঁজিতে লাগিল। যে পথে সে দৃষ্টিবান্ লোকেরই মত অতি দ্রুত সর্ব্বদা চলা-ফেরা করিতেছে, সেই পথেই আজ সে পথ-হারা! সমস্ত স্পর্শশক্তি স্পর্শের স্মৃতি নিমেষ-মধ্যে তাহার অন্তর হইতে লুপ্ত হইয়া গেল।

এই কিছুক্ষণ পূর্ব্বে সে স্পর্শের সুখে স্পর্শের আতিশয্যে দৃষ্টির প্রকাশকেও অবজ্ঞা করিতেছিল; কিন্তু মুহূর্ত্তে তাহার অন্তর সেই স্পর্শের জন্যই হাহাকার করিয়া উঠিল। একবার ঐ পত্রাংশগুলি সে স্পর্শ করিবে না? জীবনে একটীবার মাত্র সেই হস্তলিখিত পত্রের এতটুকু অংশকে স্পর্শ করিয়া তাঁহারই স্পর্শ সে অনুভব করিবে না? সরোজ ত কিছুই চায় না। দর্শন তাহার পক্ষে নাই, শ্রবণ তাহার পক্ষে এখন দুরাশা, যে স্পর্শ তাহার একমাত্র সম্বল, সেই স্পর্শের যোগেও সেই বাঞ্ছিত স্পর্শকে সে কখনও অনুভব করিতে পায় নাই। কিন্তু ঐ যে অনাদরে অপমানিতভাবে পতিত পত্রাংশগুলি সেই বাঞ্ছিত স্পর্শ বহন করিয়া আনিয়াছে, তাহাকে শশিভূষণ না হয় ঘৃণায় ফেলিয়া দিল, কিন্তু চির-বুভুক্ষিত তাহার অঙ্গুলি-নির্দ্দেশগুলি কি বলিয়া উহাদের ফেলিয়া চলিয়া যাইবে? সরোজ আর অগ্রসর হইতে পারিল না—ফিরিয়া দাঁড়াইল! অমনি কোথা হইতে সমস্ত স্পর্শশক্তি ফিরিয়া তাহাকে আশ্বস্ত করিল।

পুনর্লব্ধ শক্তিতে যেখানে সেই পত্রখণ্ডগুলি পড়িয়াছিল, অনুমান করিয় লইয়া সে সেই স্থানে আসিয়া দাঁড়াইল। তারপর স্থিরভাবে কান পাতিয় শুনিবার চেষ্টা করিল, কেহ কাছাকাছি নড়িতেছে চড়িতেছে কি না। শে যখন মনে হইল, নিকটে কেহ নাই, তখন অতি সন্তর্পণে সে হাতড়াইতে আরম্ভ করিল! হায়, হায়, এক টুকরা কাগজও তাহার হস্ত স্পর্শ করিতেছে না। একখণ্ড, যত ক্ষুদ্রই হোক, কিছু তাহাতে লেখা থাকুক আর নাই থাকুক, সেই পত্রের এককণা পাইলেই সরোজ বর্ত্তাইয়া যায়! দাও ঠাকুর, দাও দেবতা, সেই পত্রের এক টুকরা তাহাকেও দাও!

পাইয়াছি! পাইয়াছি! ওরে মৌন মূক, তোরা চীৎকার করিস্‌নে কেন এতক্ষণ? কেন চেঁচাইয়া বলিস্‌নে, এই যে আমরা, তোমার হারানো ধন, এই যে আমরা! পাইয়াছি, ওরে পাইয়াছি। হোক ছোট, হোক তুচ্ছ, তবু পাইয়াছি। সেই স্পর্শের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশ আমার এই উষার জগতকে স্পর্শের রসে ভরাইয়া ফেলিয়াছে। পাইয়াছি! ওরে অন্ধকার হৃদয়, শান্ত হ, একেবারে হারায় নাই। আলো আসিয়াছে, যায় নাই, একেবারে চির-অতীতের মধ্যে অস্ত যায় নাই—পাইয়াছি! সরোজ সেই কাগজখণ্ডকে তাহার সমস্ত শরীর দিয়া স্পর্শ করিল; শেষে মাথায় ঠেকাইল; তার পর ধীরে ধীরে কানের কাছে লইয়া গেল।

কথা কও! আমার চক্ষু নাই! তুমি কি বলিয়াছ, কি বলিতেছ, আমি চক্ষু দিয়া বুঝিতে পারিতেছি না! আমার স্পর্শ আছে, কিন্তু তার কাছে তুমি আজ মূক; স্পর্শ দিয়া কিছুই শুনিতে পাই না যে! কথা কও! বল, কি বলিতেছ? আমি তোমায় দূরে সরাইয়া দিয়াছি? সেই অভিমানে কি আজ তুমি মূক হইয়া অন্ধের নিকট আসিয়াছ? অন্ধের উপর প্রতিশোধ লইতে তুমি আজ মূকের মূর্ত্তিতে আসিয়াছ! আমি ত শুনিতে পাই, তাই কি তুমি কথাও পরিত্যাগ করিলে? এত

বড় প্রতিশোধ! আমি অন্ধ! তুমি মৌন! আমি যে শুনিতে চাহিতেছি, কিন্তু তুমি কিছু বলিবে না? কথা কও, কথা কও, অন্ধের সমস্ত অন্ধকার জগৎ ভরিয়া উঠুক,—তুমি একটীবার মাত্র কথা কও!

সহসা কাহার পদ-শব্দ শুনিয়া সরোজ তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইল এবং সেই কাগজের টুকরাটুকুকে আবরণে ঢাকিয়া আপনার শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিল। কিন্তু সে এতই উদ্‌ভ্রান্ত-চিত্ত হইয়াছিল যে তাহার পশ্চাতে আর একজনও যে সন্তর্পণে সেই কক্ষে প্রবেশ করিল, সে শব্দ সে অনুভবও করিতে পারিল না। তাহার অন্তরে এই কয় মুহূর্তের জন্য যেন জগতের সমস্ত শব্দ স্তব্ধ হইয়া গিয়াছিল। একটীমাত্র পরিচিত শব্দের আশায় সে তাহার সমস্ত অন্তর্জগতকে সেই কয় মুহূর্তের জন্য শব্দহীন করিয়া ফেলিয়াছিল।

সরোজ অতি সন্তর্পণে সেই কাগজখানি তাহার মাথার শিয়রের একটা কুলুঙ্গীতে রাখিল, তার পর জোড়-করে তাহাকে প্রণাম করিয়া অঞ্চলস্থ সমস্ত ফুলগুলি তাহার উপর ঢালিয়া দিয়া দুই হাতের মধ্যে মুখ লুকাইয়া সেই স্থানে বসিয়া পড়িল।

শশিভূষণ তাহার নিকটে আসিয়া দাঁড়াইতেই সে তীর-বেগে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "শশি-দা, দয়া কর, আর এক মিনিট আমায় সময় দাও।"

শশী অবরুদ্ধ কণ্ঠে বলিল, "বোন্, এক মিনিট কেন, চির-জীবনের জন্যই ত ওকে দিতে পারতুম! হায়, হায়, এ আমি কি করলুম! আমি ত তোমায় বুঝতে পারি নি, সরোজ! সেই হতভাগা তোমায় এ কি করে গিয়েছে! সে যে আমার সরোজের সমস্ত দলগুলি ছিঁড়ে-খুঁড়ে দিয়ে গিয়েছে, তা ত' আমি জানতে পারিনি। হতভাগিনী, তাহলে তাকে অমন করে নিষ্ঠুরের মত তাড়িয়ে দিলে কেন? যে অন্ধ, সে কি নিজের প্রতিও অন্ধ!"

শশিভূষণ অতি যত্নে অতি ভক্তি-ভরে সেই ফুলগুলি সরাইয়া সে কাগজের টুকরাটুকু বাহির করিয়া কিছুক্ষণ সেই দিকে চাহিয়া রহিল পরে গভীর নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "হায়, অন্ধের পূজাও ঠিক জায়গা পৌঁছায় না! সরোজ, এ কি কাগজ তুমি এনেছ? এ ত কার্ত্তিকে সে চিঠি নয়, এ যে একখানা বাজে কাগজের টুকরো।"

সরোজ কাঁপিতে কাঁপিতে বসিয়া পড়িল। পূজা পৌঁছিল না! পূজ বৃথা হইল! অন্ধ আমি, তাই কি দেবতাও অন্ধ হইলেন! হতভাগিনী হাতখানি ধরিয়া কি এক মুহূর্ত্তের জন্যও তোমার পায়ের কাছে লইয় যাইতে পারিলে না? হায় অন্ধতা! হায় অন্ধকারের অন্ধ দেবতা!

তৃতীয় খণ্ড

১

বিবাহের পর পাঁচ বৎসরের মধ্যে শৈলজার জীবনে বহু পরিবর্ত্তন ঘটিয়া গেল। তাহার সাধ্বী মাতার মৃত্যুর ছয় মাসের মধ্যে পিতা কালিকামোহনও সজ্ঞানে ৺গঙ্গালাভ করিলেন। মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি কার্ত্তিককে বলিলেন, "বাবা কাত্তিক, আমার সমস্তই তোমার হাতে দিয়ে যাচ্ছি। আমার উইলে তোমাকেই আমার স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি সবই দিয়ে গেলুম। কেবল মার নামে স্বর্গীয় কর্ত্তা যে মহাল আর নগদ টাকা দিয়ে গেছেন, তার ব্যবস্থা তাঁর নিজের হাতেই রইল। তাঁর উপর তোমার কোন কর্তৃত্ব থাক্‌বে না। তা ছাড়া আর সমস্ত বিষয়ের উপরই তোমার পূর্ণ কর্তৃত্ব। তুমি আমার দেব-কীর্ত্তি পিতৃ-কীর্ত্তি বাজায় রেখে সমস্তই স্বেচ্ছানুযায়ী ব্যবহার করতে পারবে। তবে শৈলর নামে আগে থেকে যে সম্পত্তি আছে, তা তারই নামে থাক্‌ল। তুমি ছাড়া যখন তার আর কেউ রইল না, তখন সে বিষয়ে আর তোমায় কি উপদেশ দেব? সর্ব্বদা তোমার পিতৃদেরের পরামর্শ নিয়ে কাজ করো, তাহলে কোন বিপদ হবে না।"

শৈলজা কালিকাবাবুর পায়ে হাত বুলাইতেছিল। কালিকাবাবুর কথায় সে কাঁদিয়া ফেলিল। কালিকাবাবু বলিলেন, "কেঁদো না, মা। স্বধর্ম্মে থেকে সংসারে কর্ত্তব্য করে শেষে গঙ্গা-নারায়ণ-ব্রহ্ম বলতে বলতে হাসতে হাসতে যে যেতে পাচ্ছি, এ কি কম সুখের কথা! জীবনে যা প্রার্থনা করেছিলুম, তা সমস্তই পেয়েছি। ভগবান যাকে এতখানি দয়া

দেখিয়েছেন, তার জন্য দুঃখ করা অন্যায়। আশীর্ব্বাদ করি, তোমরাও যেন শেষে এমনি করে মা গঙ্গার চরণে আশ্রয় পাও! যেন শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত বলতে পার, 'ভগবান্, তোমার অপূর্ব্ব করুণা!' ভগবানের রুদ্র মূর্ত্তি যেন তোমাদের কখনও না দেখতে হয়! জীবনে কখনও স্বধর্ম্মচ্যুত হয়ো না; তাহলে যত দুঃখই পাও না কেন সবই তাঁর করুণা বলে মনে হবে, তা হলে তাঁর রক্ত চক্ষুর তলে তাঁর গভীর করুণাই স্পষ্ট অনুভব করবে।"

কালিকাবাবু বক্তব্য শেষ করিয়া নিমীলিত নেত্রে বলিলেন, "তারা শিবসুন্দরি!" কার্ত্তিক তাঁহার মুখের দিকে ক্ষণকাল চাহিয়া অন্যদিকে মুখ ফিরাইল। শৈলজা স্পষ্ট দেখিল, স্বামীর নয়ন ও অধরের কোণে একটা হাসির রেখা ফুটিয়াছে। দেখিয়া শৈলজা অন্তরে শিহরিয়া উঠিল।

আজ পাঁচ বৎসর ধরিয়াই সে অনুভব করিয়াছে, তাহার ও স্বামীর মধ্যে একটা অতি-সূক্ষ্ম অথচ দুর্ভেদ্য ব্যবধান রহিয়া গিয়াছে। বাহিরে সে ব্যবধান কাহারও বুঝিবার সাধ্য নাই, কারণ কর্ত্তিকের ব্যবহার অত্যন্ত সরল এবং অমায়িক। সকলেই তাহার নিরহঙ্কার অথচ গম্ভীর ব্যবহারে সন্তুষ্ট। শৈলজাও এমন কোন কথা বা কাজ স্মরণ করিয়া বলিতে পারে না, যাহাতে কার্ত্তিকের স্নেহহীনতা বা অন্য কোন অপ্রীতিকর ভাব এতটুকুও প্রকাশ পাইয়াছে। আজ দুই বৎসর তাহার এক পুত্র হইয়াছে। পুত্রটি যেমন হৃষ্টপুষ্ট, তেমনি সুন্দর! কার্ত্তিক যখন বিদেশে তাহার পাঠক্রিয়া-সমাধায় ব্যস্ত, তখন সে মাঝে মাঝে পুত্রের জন্য নানাবিধ খেলানা, এবং যেদিন পুত্র হওয়ার সংবাদ পায়, সে দিন প্রসূতির জন্য নানাবিধ সৌখীন দ্রব্য ক্রয় করিয়া আনিয়াছিল। তাহার ব্যবহারে কোথায় যে ত্রুটি, সেটুকু শৈলজা কখনও স্পষ্ট ধরিতে পারে নাই; তবু তাহার অন্তঃস্থল হইতে একটা গভীর বিচ্ছেদের দীর্ঘশ্বাস উঠিয়া নৈশ

আকাশে মিলাইয়া যাইত। কার্ত্তিক যে অন্য-গত-চিত্ত, এ কথা ফুলশয্যার রাত্রেই সে প্রকাশ করিয়া বলিয়াছিল; সেজন্য তাহার যে ত্রুটি হইবে, সে ত্রুটির জন্য ক্ষমাও সে চির-জীবনের জন্য লাভ করিয়াছিল। কার্ত্তিক যে আর-কাহাকেও মনে মনে ভালবাসে, এটা তত দুঃখের নয়, কারণ শৈলজা সে দুঃখকে গণনায় আনিয়া জীবনের মধ্যে জমা-খরচ মিলাইয়া একটা ঠিক দিয়া বসিয়াছিল! সে দুঃখের খরচ সুখের জমার চেয়ে অনেক কম,—তবে কিসের দুঃখ! কিসের ব্যবধান! কিসের বিচ্ছেদ! কার্ত্তিক ভালবাসিতে পারে, তাহার হৃদয়ে যে স্নেহের তরঙ্গ খেলে, ইহা জানিতে পারিলেও যে শৈলজা অত্যন্ত স্বস্তি অনুভব করে। শৈলজার মনে হয়, কার্ত্তিকের হৃদয় হইতে এই পরম পবিত্র মন্দাকিনী, স্নেহের সুরধুনী-ধারা শুকাইয়া গিয়াছে। সে যেন ভালবাসিতেই পারে না! যদি তাহার হৃদয়ে ভালবাসিবার শক্তি সজাগ থাকে, তাহা হইলে শৈলজার কোন ভয় নাই। কারণ তাহার আশা আছে যে, ভগীরথের মত সাধনার দ্বারা সে সেই স্নেহ-মন্দাকিনীকে তাহার সংসারের উপর নামাইয়া আনিতে পারিবে। যদি তাহা কোন বাধায় অবরুদ্ধ হইয়া থাকে, তাহা হইলে সে তাহার প্রাণ দিয়াও সে বাধা সরাইয়া দিবে। কিন্তু যদি তাহা শুকাইয়া গিয়া থাকে, তাহা হইলে সে কি করিবে? তাহার মনে হয়, কার্ত্তিকের চরিত্রে সবই আছে, তবে প্রাণের মধ্যে যাহা থাকিলে মানুষ সজীব থাকে, কেবল সেইটুকুরই যেন অভাব ঘটিয়াছে! কার্ত্তিকের যেন প্রাণ নাই, সে যেন সংসারের চোখে এখন মৃত!

* * * * *

মহাসমারোহে কালিকাবাবুর শ্রাদ্ধ সমাধা করিয়া, গভীর রাত্রে কার্ত্তিক তাহার শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিল, শৈলজা বসিয়া বসিয়া নীরবে অশ্রু বর্ষণ করিতেছে। শয্যায় দুই বৎসরের শিশু দেবীপ্রসাদ নিদ্রিত।

কার্ত্তিক ধীর-পদবিক্ষেপে শিশুর শিয়রে যাইয়া তাহাকে চুম্বন করিল, পরে শৈলজার নিকটে আসিয়া বলিল, "শৈল, তোমার মুখখানা তোল ত, আমি দেখতে পাচ্ছি না।" শৈলজা দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া ডুকরিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

কার্ত্তিক কিছুক্ষণ নীরবে চাহিয়া থাকিয়া হঠাৎ শৈলজার মুখ হইতে হাত সরাইয়া লইল এবং তাহাকে আলোর দিকে ফিরাইয়া ধরিয়া বলিল, "শৈল, তোমার মুখে এত আলো! আমি সইতে পার্ছি না। উঃ—" কার্ত্তিক দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া মেঝের উপর বসিয়া পড়িল। শৈলজা চোখ মুছিয়া ব্যস্ত হইয়া বলিল, "কি হ'ল? তুমি অমন কর্‌ছ কেন? শোও, আমি বাতাস কর্‌ছি।" কার্ত্তিক উঠিয়া দাঁড়াইল এবং সেই সঙ্গে এমন উচ্চ রবে হাসিয়া উঠিল যে, সে হাসির শব্দ কক্ষে কক্ষে প্রতিধ্বনিত হইয়া নিম্নতলে কর্ম্ম-রত আত্মীয়-স্বজন, দাস-দাসী সকলের কর্ণে পৌঁছিল। কি বিকট উন্মাদের ন্যায় হাস্য! শৈলজা পিতৃবিয়োগ-দুঃখ ভুলিয়া গেল এবং তাড়াতাড়ি একখানা পাখা লইয়া কার্ত্তিককে বাতাস করিতে আরম্ভ করিল। কার্ত্তিক নিমীলিত নেত্রে অন্ধের মত হাতড়াইতে হাতড়াইতে খাটের দিকে অগ্রসর হইল। তাহাকে তদবস্থ দেখিয়া শৈলজা ব্যস্ত হইয়া একজন দাসীকে ডাকিয়া বলিল, "শীগ্‌গির ডাক্তার বাবুকে ডেকে আন্, উনি কি রকম কচ্ছেন।"

শৈলজা কার্ত্তিকের শয্যায় বসিয়া তাহার মাথায় গোলাপজল দিয়া বাতাস করিতে লাগিল। কার্ত্তিক মুদিত নেত্রে বলিল, "গরিব বামুনের ছেলের এত ঐশ্বর্য্য সইবে কেন, শৈল! তাই বোধ হয় মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে, না?"

শৈলজা কাতর হইয়া বলিল, "কেন তুমি অমন কর্‌ছ? কি হয়েছে,—তোমার পায়ে পড়ি, আমায় বল।"

আকাশে মিলাইয়া যাইত। কার্ত্তিক যে অন্য-গত-চিত্ত, এ কথা ফুলশয্যার রাত্রেই সে প্রকাশ করিয়া বলিয়াছিল; সেজন্য তাহার যে ত্রুটি হইবে, সে ত্রুটির জন্য ক্ষমাও সে চির-জীবনের জন্য লাভ করিয়াছিল। কার্ত্তিক যে আর-কাহাকেও মনে মনে ভালবাসে, এটা তত দুঃখের নয়, কারণ শৈলজা সে দুঃখকে গণনায় আনিয়া জীবনের মধ্যে জমা-খরচ মিলাইয়া একটা ঠিক দিয়া বসিয়াছিল! সে দুঃখের খরচ সুখের জমার চেয়ে অনেক কম,—তবে কিসের দুঃখ! কিসের ব্যবধান! কিসের বিচ্ছেদ! কার্ত্তিক ভালবাসিতে পারে, তাহার হৃদয়ে যে স্নেহের তরঙ্গ খেলে, ইহা জানিতে পারিলেও যে শৈলজা অত্যন্ত স্বস্তি অনুভব করে। শৈলজার মনে হয়, কার্ত্তিকের হৃদয় হইতে এই পরম পবিত্র মন্দাকিনী, স্নেহের সুরধুনী-ধারা শুকাইয়া গিয়াছে। সে যেন্ ভালবাসিতেই পারে না! যদি তাহার হৃদয়ে ভালবাসিবার শক্তি সজাগ থাকে, তাহা হইলে শৈলজার কোন ভয় নাই। কারণ তাহার আশা আছে যে, ভগীরথের মত সাধনার দ্বারা সে সেই স্নেহ-মন্দাকিনীকে তাহার সংসারের উপর নামাইয়া আনিতে পারিবে। যদি তাহা কোন বাধায় অবরুদ্ধ হইয়া থাকে, তাহা হইলে সে তাহার প্রাণ দিয়াও সে বাধা সরাইয়া দিবে। কিন্তু যদি তাহা শুকাইয়া গিয়া থাকে, তাহা হইলে সে কি করিবে? তাহার মনে হয়, কার্ত্তিকের চরিত্রে সবই আছে, তবে প্রাণের মধ্যে যাহা থাকিলে মানুষ সজীব থাকে, কেবল সেইটুকুরই যেন অভাব ঘটিয়াছে! কার্ত্তিকের যেন প্রাণ নাই, সে যেন সংসারের চোখে এখন মৃত!

* * * * *

মহাসমারোহে কালিকাবাবুর শ্রাদ্ধ সমাধা করিয়া, গভীর রাত্রে কার্ত্তিক তাহার শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিল, শৈলজা বসিয়া বসিয়া নীরবে অশ্রু বর্ষণ করিতেছে। শয্যায় দুই বৎসরের শিশু দেবীপ্রসাদ নিদ্রিত।

কার্ত্তিক ধীর-পদবিক্ষেপে শিশুর শিয়রে যাইয়া তাহাকে চুম্বন করিল, পরে শৈলজার নিকটে আসিয়া বলিল, "শৈল, তোমার মুখখানা তোল ত, আমি দেখতে পাচ্ছি না।" শৈলজা দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া ডুকরিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

কার্ত্তিক কিছুক্ষণ নীরবে চাহিয়া থাকিয়া হঠাৎ শৈলজার মুখ হইতে হাত সরাইয়া লইল এবং তাহাকে আলোর দিকে ফিরাইয়া ধরিয়া বলিল, "শৈল, তোমার মুখে এত আলো! আমি সইতে পার্‌ছি না। উঃ—" কার্ত্তিক দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া মেঝের উপর বসিয়া পড়িল। শৈলজা চোখ মুছিয়া ব্যস্ত হইয়া বলিল, "কি হ'ল? তুমি অমন কর্‌ছ কেন? শোও, আমি বাতাস কর্‌ছি।" কার্ত্তিক উঠিয়া দাঁড়াইল এবং সেই সঙ্গে এমন উচ্চ রবে হাসিয়া উঠিল যে, সে হাসির শব্দ কক্ষে কক্ষে প্রতিধ্বনিত হইয়া নিম্নতলে কর্ম্ম-রত আত্মীয়-স্বজন, দাস-দাসী সকলের কর্ণে পৌঁছিল। কি বিকট উন্মাদের ন্যায় হাস্য! শৈলজা পিতৃবিয়োগ-দুঃখ ভুলিয়া গেল এবং তাড়াতাড়ি একখানা পাখা লইয়া কার্ত্তিককে বাতাস করিতে আরম্ভ করিল। কার্ত্তিক নিমীলিত নেত্রে অন্ধের মত হাতড়াইতে হাতড়াইতে খাটের দিকে অগ্রসর হইল। তাহাকে তদবস্থ দেখিয়া শৈলজা ব্যস্ত হইয়া একজন দাসীকে ডাকিয়া বলিল, "শীগ্‌গির ডাক্তার বাবুকে ডেকে আন্, উনি কি রকম কচ্ছেন।"

শৈলজা কার্ত্তিকের শয্যায় বসিয়া তাহার মাথায় গোলাপজল দিয়া বাতাস করিতে লাগিল। কার্ত্তিক মুদিত নেত্রে বলিল, "গরিব বামুনের ছেলের এত ঐশ্বর্য্য সইবে কেন, শৈল! তাই বোধ হয় মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে, না?"

শৈলজা কাতর হইয়া বলিল, "কেন তুমি অমন কর্‌ছ? কি হয়েছে,— তোমার পায়ে পড়ি, আমায় বল।"

কার্ত্তিক কহিল, "কি আবার হবে? আমি আলো সইতে পারছি না।"

শৈল কহিল, "আলোটা কমিয়ে দিচ্ছি, না হয় নিবিয়ে দিচ্ছি।"

কার্ত্তিক আবার হাসিল। তেমনি বিকট হাসি! শৈলজা ভয়ে কাঁদিয়া ফেলিল। শিশুও জাগ্রত হইয়া সে ক্রন্দনে সশব্দে যোগ দিল। শৈলজা সেদিকে ভ্রূক্ষেপ মাত্র না করিয়া কার্ত্তিকের মুখের নিকট মুখ লইয়া গিয়া বলিল, "আর ভয় দেখিয়ো না, আমি যদি কোন দোষ করে থাকি—"

কার্ত্তিক কহিল, "দোষ! তোমার সবচেয়ে দোষ যে তোমার মুখে একরাশ আলো জ্বেলে নিয়ে তুমি আমায় তাড়া করে বেড়াচ্ছ। আমায় কয়েদ করে, আমার পালাবার পথ না রেখে, সেই আলো নিয়ে তাড়া করে বেড়াচ্ছ। অন্ধকার—আমি অন্ধকারকে চাই। আন্‌তে পার জগৎ-যোড়া সব-ভুলান সব-ডুবান অন্ধকার! যদি না পার, তাহলে কি হবে মিছে ডাক্তার ডেকে? আমার এ রোগ সারবে না। আমি পাগল হইনি, শৈল, কোন ভয় নেই। বাতাস করে কি হবে? আমার ভেতরটা হাঁপিয়ে উঠ্‌ছে, বাইরের বাতাসে কি হবে?"

শৈলজা কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিল, "আমি জানি যে তুমি আমায় বিয়ে করে সুখী হওনি—"

কার্ত্তিক কহিল "সুখী হইনি? ভুল, শৈল, তোমার ভুল! কিন্তু এ সুখের আলো আমার সইছে না। সুখ আমি চাইনে—আমি চাই দুঃখের অন্ধকার! চাই রূপরস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দহীন মৃত্যুর মত অন্ধকার! তা ত তুমি আমায় দিতে পারবে না!"

শৈল কহিল, "আমি তোমায় বুঝ্‌তে পার্‌ছি না। তুমি ত আমায় বিয়ে করে অবধি কষ্ট পাচ্ছ!"

কার্ত্তিক কহিল, "না শৈল, না, আমি খুব সুখী, অত্যন্ত সুখী। প্রয়োজনের চেয়ে ঢের বেশী সুখ তুমি আমার হাতের মুঠোয় এনে দিয়েছ। কিন্তু আমি যে সুখ চাইনে, শৈল!"

বাহিরে পদশব্দ হইতেই কার্ত্তিক উঠিয়া বসিল। শৈলজা সরিয়া গেল এবং ডাক্তার বাবু সেই কক্ষে নানাবিধ ঔষধ-সমেত প্রবেশ করিলেন। কার্ত্তিক স্বাভাবিক ভাবে হাসিয়া বলিল, "ডাক্তার বাবু, আপনি পাগল! অত শিশি নিয়ে এলেন! ওতে ওষুধ পাত্র বাছ্‌তেই যে সময় যাবে, রোগী দেখবেন কখন?"

ডাক্তার কহিল, "তুমি শোও কার্ত্তিক, শুয়ে কি হয়েছে, বল।"

কার্ত্তিক কহিল, "কিচ্ছু হয়নি, আপনি ফিরে যান। সারাদিন খেটে-খুটে মাথাটা একটু ঘুরে উঠেছিল—শৈল পাগল, ব্যস্তবাগীশ, তাই আপনাকে আবার এত রাত্রে কষ্ট দিলে।"

বাড়ীর পুরাতন ডাক্তার বহুদিন হইতেই কার্ত্তিকের ধরণ-ধারণ জানিতেন। তিনি সহজে ছাড়িবার পাত্র নন্; কার্ত্তিকের নাড়ী টিপিয়া বলিলেন, "কিছু ত হয়নি বল্‌ছ, এদিকে নাড়ী এত জোর কেন?"

কার্ত্তিক কহিল, "Pure excitement, শুধু, আর কিছু নয়! ঘুমোলেই সব সেরে যাবে।"

শৈলজা ডাক্তারকে ডাকিয়া ফিস্ ফিস্ করিয়া বলিল, "আপনি ওঁর কথা শুনবেন না, ওষুধ দিন।" শৈলজা তাহার নিকট সমস্তই বর্ণনা করিয়া বলিল, কোন দিন ত এমন করেন না। ডাক্তার বাবু তাঁহার কাঁচা-পাকা মাথাটি চুলকাইতে চুলকাইতে বলিলেন, "তাইত, কিছু ত বুঝতে পারছি না। যাই হোক, তুমি এই ঘুমের ওষুধটা খাইয়ে দিয়ো, তাহলে ও ঘুমিয়ে পড়বে 'খন।"

শৈল কহিল, "আপনি খাইয়ে দিন, আমার কথা শুনবেন না।"

কার্ত্তিক আবার সহজ হাস্যে শৈলজাকে আশ্বস্ত করিয়া বলিল, "শুনব, শুনব। দিন ডাক্তার বাবু, কি ওষুধ দেবেন, দিন। আপনাদের জ্বালায় অস্থির হ'তে হ'ল।"

কার্ত্তিক ঔষধ পান করিলে ডাক্তার বাবু চলিয়া গেলেন। শৈলজা আসিয়া নিকটে বসিতেই কার্ত্তিক উঠিয়া বসিয়া শৈলজাকে জড়াইয়া ধরিয়া তাহাকে চুম্বন করিল; তারপর শয়ন করিয়া বলিল, "মহারাণি, খাজনা ত দিলুম, এখন নিশ্চিন্ত হয়ে শোওগে। আমার কিছু হয় নি, তোমার সঙ্গে চালাকি করছিলুম, ভাবলুম, দেখি, একটু থিয়েটারী রকম করলে তুমি ভয় পাও কি না।"

শৈলজা তবু উঠিল না। তাহার শিশু পুত্র কাঁদিয়া কাঁদিয়া আপনিই আবার ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। তবে ঘুমাইতে ঘুমাইতেও সে মাঝে মাঝে ফুঁপাইয়া উঠিতেছিল। কার্ত্তিক বলিল, "ছেলে ফোঁপাচ্ছে, তবু তুমি এখানে বসে থাকবে? তাহলে এস, আজ বিছানা অদল-বদল হোক। আমি দেবুর কাছে গিয়ে শুই, আর তুমি আমার জায়গা অধিকার করে শুয়ে থাকো।"

শৈলজা অবরুদ্ধ কণ্ঠে বলিল, "যদি এক মিনিটের জন্যও তুমি আমি হ'তে, তাহলে আমার দুঃখ বুঝতে পারতে। তোমায় সুখী করতে না পেরে—"

কার্ত্তিক কহিল, "আবার ঝগড়া সুরু করলে! এখনি ত' সোলেনামায় সই করে দিলুম।"

শৈল কহিল, "কি করলে তুমি সুখী হও?"

কার্ত্তিক কহিল, "আবার! তা হলে আবার পাগল হব, তখন টের পাবে। আমি সুখী নই? শৈল, তুমি কি কিছু বুঝতে পার না?

আমি বলছি, আমি খুব সুখী, খুব আনন্দে আছি। এখন যাও, নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমোওগে।"

শৈল কহিল, "আজ আমি তোমায় ছেড়ে থাকব না।"

কার্ত্তিক কহিল, "বেশ! সুধায় অরুচি কার?"

২

সমস্ত দিন অন্ধ বালক-বালিকাদের জন্য পরিশ্রম করিয়া সরোজ সন্ধ্যার পর সুকুমারীকে বলিল, "সুকু, আজও সমস্ত দিন সর্ব্ব-দা ত এলেন না, কি হয়েছে বলতে পার?" সুকুমারী ছাদের উপরকার তুলসীতলা হইতে বলিল, "না সরো দি, তিনি কৈ কিছু ত বলে যান নি।"

সরোজদের গৃহের ছাদটি যেন একটি ক্ষুদ্র উদ্যান। সারি সারি টবে নানা জাতীয় বৃক্ষে থরে থরে বেল যূঁই চামেলি গন্ধরাজ রজনীগন্ধা প্রভৃতি ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে। সদ্য বারিবিন্দু-লাভের আনন্দে অসংখ্য ফুল তাহাদের গন্ধ-সম্পত্তি চারিদিকে বিলাইতেছে। উপরে নবমীর চন্দ্র হাসিতেছে—নিম্নে পুষ্পগুলি শোভায় গন্ধে সমস্ত স্থানটুকু ভরাইয়া ফেলিয়াছে। আর ইহাদের মাঝে দাঁড়াইয়া এক দৃষ্টি-হীনা বালিকা, আর এক দৃষ্টি-হীনা রমণী—অন্ধ প্রকৃতির সম্মুখে দুই অন্ধ প্রাণী! প্রাণীদুটি শব্দ বা স্পর্শের দ্বারা প্রকৃতিকে জানাইতেছে যে তাহারা আছে, প্রকৃতিও গন্ধের দ্বারা তাহাদের অন্তরে প্রবেশ-লাভের চেষ্টা করিতেছে।

সরোজ হস্তদ্বারা গাছগুলি স্পর্শ করিতে করিতে দুই তিনবার সমস্ত ছাদটি প্রদক্ষিণ করিল; যেন সব গাছগুলির সঙ্গেই তাহার স্পর্শযোগ রাখার প্রয়োজন, যেন প্রতি ফুলটিই তাহার জন্য প্রতিদিন প্রস্ফুটিত হইয়া নূতন কোন গোপন সংবাদ দিবার জন্য তাহার স্পর্শের আশায় অপেক্ষা করে! কি জানি, যদি কাহারও নিকট হইতে কোন কথা শুনিতে ভুল

হইয়া যায়, এইজন্য সরোজ প্রতিদিন প্রভাতে, সন্ধ্যায় তাহাদের সঙ্গে স্পর্শের ভাষায় কথাবার্ত্তা কহিয়া লয়।

সুকুমারী কিন্তু একটী ক্ষুদ্র দীপ জ্বালিয়া ছাদের এক কোণে যে তুলসীমঞ্চ আছে, তাহারই নিকটে বসিয়াছিল। সরোজের মত সে প্রতি সন্ধ্যায় এই ছাদটীতে আসে বটে, কিন্তু বেড়াইবার জন্য নয়,—সে আসে ঐ মঞ্চের কুলুঙ্গীতে প্রদীপ দিয়া বসিয়া থাকিবার জন্য। সরোজের পক্ষে যেমন এই কৃত্রিম উদ্যানটির সমস্তটুকু আছে, তাহার পক্ষে তেমনি কেবল ঐ কোণটুকুই আছে। সুকুমারী ঐ কোণটুকু হইতে সমস্ত গাছপালা সরাইয়া দিয়া একটী মাত্র তুলসী বৃক্ষকে স্বহস্তের জল-নিষেকে যথেষ্ট বড় করিয়া তুলিয়াছে, এবং নানা উপায়ে ঐ স্থানটুকুতে অন্ধকার সঞ্চিত করিয়া তাহার মধ্যস্থলে একটী ক্ষুদ্র দীপ জ্বালিয়া দিয়া দৃষ্টিহীন চক্ষে চাহিয়া থাকে, তারপর ধীরে ধীরে প্রণাম করিয়া চলিয়া যায়।

শশিভূষণের শ্বশ্রূঠাকুরাণী চিন্ময়ী দেবী ছাদে আসিয়া ডাকিলেন, "সরোজ।"

অপর প্রান্ত হইতে সরোজ বলিল, "যাই, মা।"

চিন্ময়ী বলিলেন, "আবার তোমার শরীর ভাল থাকছে না, তুমি হিমে আর থেকো না, সুকু—"

সুকু তাড়াতাড়ি প্রণাম করিয়া নিকটে আসিয়া বলিল, "মা, সরো-দিকে অত মেহন্নৎ করতে বারণ করে দাও। ওর সব কাজ এখন আমিই ত পারি, তবুও আমায় ও করতে দেবে না!"

সরোজ নিকটে আসিলে চিন্ময়ী বলিলেন, "আমি মনে করছি, আবার তোমায় কোথাও পাঠিয়ে দি।"

সরোজ কহিল, "আমি কি অফিসের কেরাণী, মা, যে বৎসরান্তে আমায় ছুটি নিতেই হবে?"

চিন্ময়ী কহিলেন, "তুমি কেরাণীর চেয়েও বেশী কেরাণী, মা। তাদে পাঁচটার 'পর ছুটি, তোমার তাও নেই। শশী তোমায় এমনি করে মারছে যে বুঝ্‌তেও পার্‌ছে না, দিন দিন তুমি ক্ষয় হয়ে যাচ্ছ, অথচ তোমা বল্‌লেও ত তুমি শুনবে না!"

সরোজ অন্যমনস্কভাবে একটা গাছের পাতা ছিঁড়িতে গিয়া হঠাৎ হা সরাইয়া লইয়া বলিল, "আমি—আমি এ বাড়ী ছেড়ে থাকলে, এই স বন্ধুদের কাছ থেকে দূরে থাক্‌লে, ভাল থাকিনে মা।" সরোজ অতি য এক যূথিকার ঝাড়ের উপর ধীরে ধীরে হাত বুলাইতে লাগিল। চিন্ময় বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "তবে তুমি দিনকতক সব কাজ ছেড়ে দিয়ে চু করে বসে থাক।"

সরোজ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "তা হলে কি নিয়ে থাক্‌ব?"

তাহার স্বরে এমন একটা গভীর দুঃখ ধ্বনিত হইল যে চিন্ময়ী সম্মুখ হইতে সমস্ত শোভা, সমস্ত গন্ধ নিমেষে কোথায় অন্তর্হিত হই গেল। তিনিও নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "তবে আর আমি কি কর্‌ব?"

উভয়ে নীরব হইলে সুকুমারী বলিল, "চল, নীচে যাই।" তিন জ তখন দ্বিতলে নামিয়া গেল।

ঘন্টাখানেক পরে শশিভূষণ এবং তাহার দুইটি নিতান্ত অনুগত ছা মণীশ ও জ্যোতিপ্রসাদ কলরব করিতে করিতে উপরে উঠিয়া আসিল মণীশ ও জ্যোতি এখন সতেরো-আঠারো বৎসরের হইয়াছে, তাই এখ তাহারা যাহা লইয়া তর্ক করিতেছিল, তাহা ঠিক বালকোচিত কলরবমা নহে। এবং এই কারণে শশিভূষণও তাহাদের তর্কে যোগ দিয়া জ্যোতি প্রসাদের পক্ষ সমর্থন করিতেছিল।

তর্কটা চলিয়াছিল অঙ্কের অক্ষয়-শিক্ষার এক নূতন পদ্ধতি লইয়া মণীশ বলিল, "তা আপনারা যাই বলুন, আমি ঠিক বাঙ্‌লা আর ইংরিজ

অক্ষরের পক্ষপাতী। চেষ্টা করতে করতে আমাদের ক্ষমতা এতই বেড়ে যেতে পারে যে হয়তো পরে সাধারণ কালীর লেখাও আমরা ছুঁয়ে পড়্‌তে পার্‌ব। কিন্তু আপনার ঐ নতুন "বিন্দু-পদ্ধতি" চললে সমস্ত ভাষার অক্ষরের সঙ্গেই আমাদের যোগ হবার আশা চিরদিনের জন্য চলে যাবে।"

জ্যোতি কহিল, "তবু লেখবার আর transcribe করবার যে একটা মস্ত সুবিধা এতে পাওয়া যাচ্ছে। তা-ছাড়া, দশটা মাত্র বিন্দু নিয়ে তাদের কমিয়ে বাড়িয়ে নানারকমে সাজিয়ে যদি বর্ণমালার নতুন একটা আকৃতি সৃষ্টি করা যায়, তাতে সুবিধেই হবে। পুরোনো পদ্ধতিতে এক একটা অক্ষর এমন যে, পাঁচ আঙ্গুলের মধ্যেও পাওয়া যায় না, হাত নাড়তে নাড়তে কতকটা সময় যায়। এই বিন্দু-পদ্ধতিতে অক্ষরগুলোকে অন্ততঃ আঙ্গুলের ডগাটুকুর মধ্যে আবদ্ধ করে আনা যেতে পারবে। এতে বইগুলোও ছোট হয়ে আসবে, আর তা ছাড়া অক্ষর গুলো pointed হবার দরুণ অনুভবটাও শিক্ষার্থীর পক্ষে সহজ হবে। আমরা যে পদ্ধতিতে অভ্যস্ত হয়েছি, তাতে আমাদের যত দিন লেগেছে এতে বোধ হয় তার অর্দ্ধেক সময়ে সবাই তার চেয়ে ঢের বেশী শিখতে পারবে।"

শশী কহিল, "তা ছাড়া আর একটা জিনিষ তোরা দেখছিস্‌ না যে, এক transcription এর হায়রাণীটা এতে কতখানি কমবে। কেবল নিজের সুবিধাটুকু দেখলে ত চলবে না। Point systemএ অন্ধদের দ্বারাও নির্ভয়ে এবং নির্জ্জনে transcribe করিয়ে নিতে পারা যাবে।"

সরোজ কিছুক্ষণ তাঁহাদের তর্ক মন দিয়া শুনিয়া বলিল, "আমি কিন্তু মণীশের দিকে। যদি কোন কালে আমরা কালী দিয়ে লেখা অক্ষর পড়তে নাও পারি, তা হলেও সেই আশায় আমি চিরজীবন কাটাতে রাজি আছি। চক্ষু হারিয়ে সাধারণের সঙ্গে একটা মস্ত যোগ আমরা হারিয়েছি। যদি কোন দিন সাধারণ অক্ষরে লেখা কাগজ-পত্র পড়তে

পারি, তাহলে আর এক রকমে সেই যোগটুকু ফিরে পাই এবং সেই আশাতেই বেঁচে থাকব, নইলে আর কিসের আশা করব ?"

শশিভূষণ বসিয়া বলিল, "তোমাদের নতুন করে কিছু শেখাতে যাচ্ছি না। তোমরা যা শিখেছ, তাই নিয়ে নাড়াচাড়া কর। কিন্তু আমি যখন অন্ধ বিদ্যালয়ের প্রিন্‌সিপাল, তখন আমার ছাত্রদের মঙ্গল আমায় দেখতে হবে ত। তুমি এখন হাতের-চেয়ে-আম বড় হয়ে গিয়েছ, তোমার উপর আর আমার হাত কি !"

সরোজ কহিল, "তবে কি তুমি আমার চাক্‌রিটা খাবার চেষ্টায় আছ। তা হলে তোমার চাকরির স্থায়িত্ব বিষয়েও কথা উঠবে।"

শশী কহিল, "তোমার চাকরি কে খায়, বোন ? তোমার হ'ল ইম্পিরিয়াল সার্ভিশ। তবে সর্ব্বানন্দ এই Systemটা চালাবার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে—"

সরোজ কহিল, "তাই তাঁর টিকিটি পর্য্যন্ত দেখবার জো নেই।"

শশী কহিল, "জো থাকলেও যে তুমি তা চেপে ধরছ না, এইটেই বড় দুঃখ, নইলে—"

সরোজ শশীর কথায় বাধা দিয়া বলিল, "শশি-দা, তোমার যত বয়স বাড়ছে, ততই স্থান-কাল-পাত্রের জ্ঞান কমে আসছে। আমায় যদি এই রকম করে সকলের সামনে—"

শশিভূষণ উচ্চরবে হাসিয়া উঠিয়া বলিল, "স্থান ত আমাদের নিজে-দেরই বাড়ী, কাল, রাত্রি প্রায় ন'টা, পাত্র দেখছি তুমি। এ তিনটের একটাও ত বুঝতে ভুল করছিনে। আর যে বললে, সকলের সামনে—সকলের মধ্যে তুমি, আমি—আর এ দুটো চেংড়া ত ফাও মাত্র। তবে অন্যায়টা কোথায় হ'ল ?"

সরোজ কহিল, "একা রামে রক্ষা নেই, সুগ্রীব দোসর ! তুমি যে

একাই একশ'। তোমার সামনে কোন কথা হ'লে তাইত সারা জগৎকে বলা হয়। ঢাকে কাটী দেওয়া যা, আর তোমাকে কিছু বলাও তাই। যাক্ ও কথা, যে কথা হচ্ছিল, তাই হোক।"

শশী কহিল, "তুমি যে মাঝে পড়ে আমাদের তর্কের মুণ্ডুপাত করলে। মণীশ, কি বলছিলে, বল। আমি খেই হারিয়ে ফেলেছি।"

মণীশ কহিল, "আমিও—"

জ্যোতি কহিল, "আর আমি—"

শশী কহিল, "অতএব তাড়াতাড়ি পেটে কিছু না দিলে আর বুদ্ধির গোড়ায় ধূনো এবং চায়ের বাষ্প না দিলে কিছুই হবে না।"

মণীশ ও জ্যোতি তাহাদের নির্দ্দিষ্ট কক্ষে চলিয়া গেল। সরোজ সুকুমারীকে ডাকিয়া চা প্রস্তুত করিতে বলিয়া দিল; তারপর শশিভূষণকে জিজ্ঞাসা করিল, "আজ কদিন থেকে সর্ব্বদাদাকে দেখছি নে কেন?"

শশী কহিল, "তুমি ক্রমাগত তাকে দাদা বল বলে সে রেগে চাকরিতে জবাব দিয়ে চলে গিয়েছে। সত্যি বলছি, সরো, আর কেন? ঢের ত হ'ল, এইবার ঠাণ্ডা হয়ে আমার এতদিনকার চেষ্টাটা সফল করে দাও।"

সরোজ কাতর কণ্ঠে বলিল, "শশি-দা, দয়া কর, আমায় এ দায় থেকে মুক্তি দাও। সত্যি বলছি, তোমায় না সন্তুষ্ট করতে পেরে আমি অনুতাপে মরতে বসেছি। কিন্তু আমি পারছি না, আমি পারব না। সর্ব্বদাদাও তোমারই কথামত আমায় বিয়ে করে অভাগিনীর উপকার করতে চাচ্ছেন বটে, কিন্তু এ উপকার যে আমি চাইনে। তুমি এত বোঝো, এটুকু কেন বুঝছ না যে বিয়ে করবার হ'লে কোন্ দিন করে ফেলতুম। এই তেইশ-চব্বিশ বছর বয়স পর্য্যন্ত যখন কেটে গেল, তখন আর কেন? আর কিসের জন্য? আমার মনের অবস্থা তুমি বুঝতে পারবে না। তোমাদের চোখ আছে, তোমরা এক রকম করে সব জিনিষ দেখ, আর

আমাদের চোখ নেই, আমরা আর এক রকম করে দেখি। তবে এই বড় আশ্চর্য্য যে নিজে আজ পর্য্যন্ত অবিবাহিত থেকে মৃতা স্ত্রীর উদ্দেশে জীবন উৎসর্গ করে থাকতে পারে, সে কেন বুঝতে পারে না যে—"

সরোজ বলিতে বলিতে থামিয়া গেল, লজ্জায় তাহার সমস্ত মুখ রাঙা হইয়া উঠিল। শশিভূষণ গম্ভীর মুখে বলিল, "যার আশায় বসে আছ, সে এখন বিবাহিত। স্ত্রী-পুত্র নিয়ে সে এখন সংসার গুছিয়ে তুলছে। তুমি যদি অন্তরে অন্তরে তাকে এমন ভাবে আকর্ষণ করতে থাক, তাহলে সে ধর্ম্মে মতি রেখে কি করে সংসারে চলবে? না, সরোজ, এ তোমার অন্যায় হচ্চে—নিজের পক্ষে বটে, তার পক্ষেও বটে। সে যদি তোমায় ভুলতে চেষ্টা করে, প্রবৃত্তিকে দমন করে, স্নেহময়ী স্ত্রী নিয়ে সুখী হবার চেষ্টা করে, তাহলে তুমিই বা কেন একটা মোহে নিজেকে আবদ্ধ রাখবে? তুমি কেন—"

সরোজ কহিল, "না শশি-দা, এ মোহ নয়—মোহ নয়—আমি তা পারব না। আমি অন্ধকারের জীব, এক মুহূর্ত্তের জন্য যে আলো এসেছিল, সে আলোকে ভুলতে আমি পারব না, তাকে অনাদর করতে পারব না। তাকে অপমান করে হতাদর করে তাড়িয়ে দিয়েছি, সেই স্মৃতি আমায় চিরদিন শত শত বেত্রাঘাত করছে, তবু সেই স্মৃতিই আমার সম্বল। অন্ধকার জীবনের বিষয় আলোর জীব বুঝতে পারবে না। আমার যে কি নিয়ে দিন কাটে, তা তুমি কি করে বুঝবে—?"

সরোজ চলিয়া গেল। শশিভূষণ তাহার দাড়ির মধ্যে হাত চালাইতে চালাইতে মাথা নাড়িয়া আত্মগতভাবে বলিল, "সরোজ, বোন, আমিও বুঝি।"

সুকুমারী চা লইয়া আসিলে শশিভূষণ বলিল, "সুকু, মার আহ্নিক হয়েছে?"

সুকুমারী বলিল, "হয়েছে।"

শশিভূষণ তাহার শ্বশ্রূঠাকুরাণীর কক্ষে প্রবেশ করিয়া বলিল, "মা, আপনার বড় মেয়েটিকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করুন।"

চিন্ময়ী কহিলেন, "আমিও সেই কথা বলছিলুম, ওকে আজ। ওকে তুমি দুদিন ছুটী দাও।"

শশী কহিল, "দু'দিন কেন, চিরজীবনের জন্য ছুটী দিলুম। সর্ব্ব শিবরামপুর থেকে আসুক, আমি নতুন লোক দেখছি।"

চিন্ময়ী কহিলেন, "সে কি, সর্ব্বানন্দ এখানে নেই? তাই বাছা এ, ক'দিন এখানে আসেনি, বটে? আহা, কার্ত্তিক কেমন আছে, শশী?"

সরোজ নিকটেই ছিল। সে অন্যমনস্কের ভাণ করিয়া কি একটা কার্য্যে ব্যাপৃত হইল। কিন্তু শশী তাহার মুখের ভাব লক্ষ্য করিয়া বলিল, "সে সর্ব্বানন্দকে কি একটা চিঠি লিখেছে। তাই পেয়ে সে তখনই চলে গিয়েছে।"

চিন্ময়ী কহিলেন, "কি চিঠি তুমি দেখনি?"

শশী মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বলিল, "দেখেছি বটে, কিন্তু সে বিষয়ে কাওকে কিছু বলতে বারণ আছে।"

চিন্ময়ী কহিলেন, "কি এমন গোপন কথা, শশি? কার্ত্তিকের কোন অমঙ্গল ঘটে নি ত?"

শশী কহিল, "ঠিক অমঙ্গল নয়, তবে সে বাঁদর নিজের অমঙ্গল ঘটাবার চেষ্টায় আছে। তাই সর্ব্বানন্দ তাকে সাবধান করতে গেছে। তবে এখনও ব্যস্ত হবার কোন প্রয়োজন নেই, আমরা যখন সময়ে খবর পেয়েছি, তখন সহজে কিছু ঘটতে দেব না। কিন্তু সবই ঈশ্বরের হাত।"

চিন্ময়ী রামায়ণ পড়িতেছিলেন, সেখানি মাথায় ঠেকাইয়া বন্ধ করিয়া

বলিলেন, "যদি কোন বিশেষ প্রতিবন্ধক না থাকে, আমাকেও বল্‌তে পার, আমিও হয়তো কোন উপকার করতে পারি।"

শশী কহিল, "না, মা, এ সব সামান্য ব্যাপারে আপনাকে কেন ব্যস্ত হতে হবে? আমরাই সব ঠিক করে নেব। সরোজ, আমি চললুম, তুমি কাল থেকে ছুটী ভোগ করতে সুরু কর।"

শশিভূষণ চলিয়া গেল; এবং সেই সঙ্গে সরোজের মনে অনেকখানি অশান্তি ও উৎকণ্ঠা জাগাইয়া দিয়া গেল। অমঙ্গল! তাঁহার অমঙ্গল! হায়, সে অন্ধ! সে নিরুপায়! কাহারও কোন উপকার সে করিতে পারে না!

৩

দেওয়ান দুর্গাশঙ্কর যখন পুত্রের অত্যধিক ধার্ম্মিকতায় প্রীত হইয়া সমস্ত বিষয়-সম্পত্তি দেবোত্তর করিয়া কাশী পালাইয়া গেলেন, তখন সহসা মণিশঙ্কর পরমহংস একদিনেই আপনার অবস্থা আমূল পরিবর্ত্তিত করিয়া ফেলিল। সে তাহার গর্ভধারিণীর পরামর্শ-অনুসারে এবং মুহুর্মুহু যকৃত-ঘটিত ব্যাধির তাড়নে একদিন তাঁহার ভক্তসভায় বলিয়া বসিল, "জ্ঞানে ও কর্ম্মে মুক্তি নাই, ভক্তিতেই মুক্তি। সকলের মূল ভক্তি, মুক্তি তার দাসী।" ভক্তগণ সকলেই গুরুর এই আকস্মিক পরিবর্ত্তনে কিঞ্চিৎ মনঃক্ষুন্ন হইয়া একে একে সরিয়া পড়িতে লাগিল, কারণ ভক্তিমার্গে পঞ্চমকারের অভাবই বিশেষভাবে লক্ষিত হয়, অন্ততঃ নব-গোস্বামী প্রভু মণিশঙ্করের আজকাল সেই পথ-অবলম্বন ব্যতীত উপায়ান্তরও ছিল না! গলায় তুলসীর মালা, মস্তকে দীর্ঘ শিখা, এবং সর্ব্বোপরি চিতা-জাতীয় ব্যাঘ্রের ন্যায় অথবা ডেড্‌লেটার অফিসের চিঠির ন্যায় সর্ব্বাঙ্গে তিলকের ছাপ লাগাইয়া প্রভুপাদ গোস্বামী আজকাল তাহার স্বল্প-সংখ্যক অনুগত ভক্তগণের মধ্যে

বলিয়া যে সমস্ত ভক্তিতত্ত্বের ব্যাখ্যা করে, তাহাতে আমিষের কোনরূপ গন্ধ না থাকায় অবশিষ্ট ভক্তগণ যদিও দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বটে, তথাপি মালপুয়া, ক্ষীর, ছানা, চিনি প্রভৃতি "মধ্বভাবে গুড়ং" এর নিতান্ত অভাব এখনও ঘটে নাই বলিয়া তাহারা এখনও নব বাবাজীকে ত্যাগ করিতে পারে নাই।

কিন্তু মণিশঙ্কর তাহার পূর্ব্ব আশ্রমে যে অসাধারণ শাস্ত্রজ্ঞান ও ব্যাখ্যা-নৈপুণ্য প্রকাশ করিয়াছিল, বর্ত্তমান আশ্রমের তাহার সে শক্তি অটুট রহিয়াছে। সে পূর্ব্বাশ্রমে যেমন তন্ত্রাদির ব্যাখ্যায় নিজের অদ্ভুত উদ্ভাবনী-শক্তি দেখাইয়া সর্ব্বলোকনমস্য হইয়াছিল, বৈষ্ণব-শাস্ত্র-ব্যাখ্যাতেও তাহার সেই শক্তি প্রকাশিত হইতেছে। এমন কি সাধারণের নিকট যে সমস্ত কথা নিতান্তই বৈষয়িক, সে সব কথার মধ্যেও সে ভক্তির গন্ধ পাইত এবং অপূর্ব্ব কৌশলে সেই সব কথার ভক্তিপক্ষে ব্যাখ্যা করিত।

একদিন তাঁহার কোন শিষ্য গুরুর উক্ত শক্তির পরিচয় লইবার জন্য বলিল, "প্রভু, এই শ্লোকটীর কি ভক্তিপক্ষে কোন ব্যাখ্যা হতে পারে ?

'কুড়বা কুড়বা কুড়বা লিজ্জে।
কাঠায় কুড়বা কাঠায় লিজ্জে ॥
কাঠায় কাঠায় গণ্ডা জান।
গণ্ডায় গণ্ডায় ধূল পরিমাণ' ॥"

বাবাজী শ্লোক শুনিয়া অশ্রুপূর্ণ নেত্রে গদ্‌গদ বচনে বলিল, "আহা, এ যে মাথুর !" শিষ্য অবাক হইয়া বলিল, "প্রভু, ব্যাখ্যা করে আমার হৃদয়কে শীতল করুন।" প্রভু তৎক্ষণাৎ উক্ত শ্লোকের ব্যাখ্যা করিল :—

"কুড়বা কুড়বা অর্থাৎ ক্রূর অক্রূর কুড়বা লিজ্জে, অর্থাৎ সেই ক্রূর অক্রূর তিনি কুড়বাকে লইয়া যাইতেছেন। কুড়বা কি ? কু অর্থাৎ

বেদ (প্রমাণ, যথা অন্নদামঙ্গলে 'কু-কথায় পঞ্চমুখ') অথবা কুটিল-হৃদয় কৃষ্ণ ; ড় কি না লাঙ্গলী বলরাম ; (ড়লয়োরভেদত্বাৎ) বা কিনা বায়ু অর্থাৎ ব্রজের প্রাণ-বায়ু কুড়বাকে লইয়া যাইতেছেন অর্থে কৃষ্ণ-বলরামকে এবং সেই সঙ্গে ব্রজের প্রাণ-বায়ুকে হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছেন ; ইহাই সঙ্কেতের দ্বারা সূচিত হইতেছে। কাঠায় কুড়বা কাঠায় লিজ্জে অর্থাৎ কাঠের ন্যায় কঠিন-হৃদয় সেই অক্রূর কাঠায় কি না কাষ্ঠ-নির্ম্মিত রথে লিজ্জে লইতেছে। কাঠায় কাঠায় গণ্ডা জান অর্থাৎ সেই কাষ্ঠ-নির্ম্মিত রথে একগণ্ডা অর্থাৎ রাম, কৃষ্ণ, অক্রূর ও সারথি চারজন যাইতেছেন। আর গণ্ডায় গণ্ডায় ধূল পরিমাণ অর্থাৎ হতচেতনা কৃষ্ণগত-প্রাণা গোপিনী-গণ গণ্ডায় গণ্ডায় ধূলায় পড়িয়া গড়াগড়ি দিতেছেন।"

অর্থ শুনিয়া শিষ্যগণ কাঁদিয়া আকুল হইল। সাধু মণিশঙ্কর মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িতেছিল, এমন সময় নূতন জমিদার কার্ত্তিকচন্দ্র সেইস্থানে উপস্থিত হইয়া বলিল, "মণি, তোমার শাস্ত্র-ব্যাখ্যা এখন রাখ। তোমার বাপকে ত এই শাস্ত্রের অস্ত্রেই তাড়ালে। কিন্তু তিনি পালাতে পালাতেও যে এক কামড় দিয়ে গিয়েছেন, তারই জ্বালায় ভেক নিয়েছ। এখন যদি নিজের মঙ্গল চাও ত আবার সংসার-ধর্ম্মে মন দিয়ে ভালমানুষের মত বিয়ে-থা কর। আমি তোমার বাপের কাজে তোমাকেই বাহাল করব মনস্থ করেছি।"

সাধুজীর মূর্চ্ছিতপ্রায় অর্দ্ধ-নিমীলিত চক্ষু মুহূর্ত্তে বিস্ফারিত হইয়া উঠিল। আমতা-আমতা করিয়া সাধুজী বলিল, "আজ্ঞে—আমি ত বিষয় ত্যাগ করব, স্থির করেছি—কারণ—"

কার্ত্তিক কহিল, "কারণ তোমার সমস্ত বিষয়ই এখন তোমার পিতৃ-প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহের দেবোত্তর। বিষয়-বাসনা-ত্যাগের এর চাইতে গুরুতর কারণ থাকতেই পারে না, তুমি বুদ্ধিমানের মতই কাজ করেছ। কিন্তু

যখন শ্বশুর-মশায় তাঁর বিষয় "জামাত্রোত্তর" করেছেন, তখন তোমার মত নিষ্কাম দেবোত্তরজীবী অবিষয়ীকেই জামাইবাবুর বিশেষ প্রয়োজন। অতএব নির্ভয়ে 'ধনানি জীবিতঞ্চৈব পরার্থে প্রাজ্ঞ উৎসৃজেৎ' এই শাস্ত্র বাক্যানুসারে আমার দেওয়ানী খাসের প্রাজ্ঞ দেওয়ান মোহান্ত মহারাজ হতে পার। তোমার এতে মোহান্ত-গিরিরও অসুবিধা ঘটবে না, চাই-কি, জামাইবাবুও তোমার নিষ্কাম কর্ম্মের শিষ্যত্ব গ্রহণ করতে পারেন।"

মণি কহিল, "আজ্ঞে—"

কার্ত্তিক কহিল, "আজ্ঞে-টাজ্ঞে নয়—শোন, তোমার মা সেদিন আমাদের ওখানে গিয়ে অনেক কান্নাকাটি করছিলেন। তাঁর মতে তোমার পিতার দেওয়ানী কার্য্যে উত্তরাধিকার-সূত্রে তোমারই দখলি সত্ব জন্মেছে। তোমাকে উচ্ছেদ করা অসম্ভব। আমি তাঁর সঙ্গে আইনের তর্কে পরাস্ত হয়ে তোমার প্রাপ্য তোমায় ফিরিয়ে দিতে ইচ্ছুক। তবে যদি তুমি পরম-বকই থাকতে চাও, সাধারণ মানুষের মত না হও, তা হলে স্বতন্ত্র কথা। কিন্তু যদি দেওয়ানী গ্রহণে ইচ্ছা থাকে, তাহলে দার-পরিগ্রহাদি সাধারণ জীবের জীবনের নিয়মগুলোও মেনে নাও।"

মণিশঙ্কর কোন কথা বলিল না; মাথা চুলকাইতে লাগিল। তাহা দেখিয়া কার্ত্তিক আবার বলিল, "তা হলে তুমি এ বিষয়ে যা ভাল বোঝো, একটা স্থির করে আমায় বলো, আমি এখন চল্‌লুম।" কার্ত্তিক চলিয়া গেলে মণিশঙ্কর আপনার বহির্ব্বাসকৌপীনাদির দিকে চাহিয়া একটা নিশ্বাস ফেলিল।

কার্ত্তিক তাহার পিতার টোলে গিয়া দেখিল, সর্ব্বানন্দ বসিয়া শিবচন্দ্র ন্যায়রত্নের সহিত কথা কহিতেছে। কার্ত্তিক বলিল, "আমি তোমায় আসতে লিখলুম, আর তুমি আমার কাছে না উঠে বাবার কাছে এলে যে!"

সর্ব্বানন্দ বলিল, "তুমি আমায় আসতে দেখেও যখন কথা না ক'য়ে চ'লে গেলে, তখন আর কি ক'রে তোমার বাড়ীতে উঠি ?"

কার্ত্তিক কহিল, "আমি যে কাজে যাচ্ছিলুম তাতে তুমি বাধা দিতে, তাই তোমার সঙ্গে কথা বলবার আগেই তাড়াতাড়ি সে কাজ সেরে এলুম। তুমি যে চিঠি পেয়েই রওনা হবে, তা জান্‌তুম না, নইলে আগেই সে কাজ সেরে রাখ্‌তুম।"

ন্যায়রত্ন কহিলেন, "কি কাজ, কার্ত্তিক ?"

কার্ত্তিক কহিল, "আজ্ঞে, মণিশঙ্করকে তার বাপের কাজে বাহাল ক'র্‌লুম। সেও সে কাজ নিতে স্বীকার হয়েছে।"

ন্যায়রত্ন কহিলেন, "মণিকে ? কাজটা কিন্তু ভাল হ'ল না।"

কার্ত্তিক কহিল, "ভাল-মন্দ ভগবানের হাতে। তার বাপ ঐ কাজে তাঁর সারা জীবন কাটিয়ে গেছেন, সরকারের যথেষ্ট উপকারও তিনি করে গেছেন। এখন তাঁর ছেলেকে ঐ কাজে বাহাল ক'রে তাঁর উপকারের প্রত্যুপকার না ক'র্‌লে অকৃতজ্ঞের কাজ হবে।"

সর্ব্বানন্দ কহিল, "আমি তোমার এই যথেচ্ছাচারিত্বে বাধা দিতে এসেছি।"

ন্যায়রত্ন কহিলেন, "যথেচ্ছাচারিতা ? সে কি সর্ব্ব ?"

সর্ব্বানন্দ কহিল, "হাঁ, যথেচ্ছাচারিতাই বটে। ও আমায় বারবার চিঠি দিয়েছে যে হয় আমি এসে ওর সমস্ত জমিদারীর ভার নি, না হয়ত ও মণিশঙ্করকে এই কাজে লাগাবে। আমি আমার উপস্থিত কাজ ফেলে ওর অধীনে কাজ ক'র্‌তে রাজী হইনি, তাই ও আমার উপর রাগ ক'রে মণিকে বাহাল ক'র্‌তে চাইছে। কালকের চিঠিতে ও লিখেছে যে মণিকে বাহাল করাই সাব্যস্ত। কি যে ওর মনে আছে, তা জানিনে, তবু ওকে এ কাজ ক'র্‌তে নিষেধ করুন, না হ'লে—"

কার্ত্তিক কহিল, "নাহলে কি হবে, সর্ব্বদা? এ ত আমার পৈতৃক বিষয় নয়! যদি স্বর্গীয় শ্বশুর মশায়ের উপকারী ভৃত্যের প্রত্যুপকার করি, তাতে কি আমার খুবই অপরাধ হবে?"

সর্ব্বানন্দ কহিল, "প্রত্যুপকার কর্‌তে চাও, ত বসে বসে মাসিক কিছু বৃত্তি ওর জন্যে বরাদ্দ করে দাও। তোমার বিষয়ের ভার ওর হাতে তুমি দিতে পাবে না। যার বাপ দেবোত্তর করে তার হাত থেকে নিজের বিষয় রক্ষা করে গেছেন, সেই লোককে কি করে তুমি বিশ্বাস করে দেওয়ানী দেবে?"

কার্ত্তিক কহিল, "অবিশ্বাসের কারণ ত এখনো কিছু ঘটেনি। কাজ হাতে পড়্‌লে সকলেরই বুদ্ধি খুলে যায়। তার প্রমাণ এই দেখ, আমি। আমার ত কোন পুরুষে জমিদারী ছিল না, তবু বিষয় হাতে পেয়ে কেমন চালাচ্ছি। মণি পাকা বিষয়ীর সন্তান, ও ত বিষয়ী হয়েই জন্মেছে। ওর চেয়ে উপযুক্ত লোক পাব কোথায়?"

শিবচন্দ্র কহিলেন, "সর্ব্ব, আমি একটা কথা বুঝ্‌তে পার্‌ছি না। এই সামান্য ব্যাপার নিয়ে তুমি এত ব্যস্ত হয়ে কলকেতা থেকে চলে এলে কেন? আমাকে লিখ্‌লেও ত' আমি এ সব কথা কার্ত্তিককে বল্‌তে পার্‌তুম।"

সর্ব্বানন্দ কহিল, "সব কথা আপনার সুমুখে বলা যায় না, খুড়ো-মশায়।"

কার্ত্তিক কহিল, "কেন বলা যাবে না? আমিই বল্‌ছি, আমি সর্ব্বদাদাকে আমার কাছে পাবার জন্য ওকে আমার সমস্ত এষ্টেটের দেওয়ানী নিতে অনুরোধ করে চিঠি লিখি। আমি ওর বিষ দৃষ্টিতে পড়া অবধি কি উপায়ে ওকে আবার কাছে পাব, তাই ভাব্‌ছিলুম। দেওয়ানজী যখন চাকরী ছেড়ে দিয়ে কাশী গেলেন, তখন একটা সুবিধে হ'ল। কিন্তু

এমনি আমার কপাল যে যাতে আমার এতটুকু সুবিধে হয়, তা সর্ব্ব-দা কখনই করবে না। তাই এখন এই উপায় অবলম্বন করেছি। মণির হাতে সব কাজের ভার দিলে বিষয় আমার নষ্ট হবার দিকেই যাবে, তখন যদি দয়া করে ও আমায় রক্ষা করতে আসে;—এই আমার আশা।"

সর্ব্বানন্দ কহিল, "তোমার উপর আমার এতটুকু শ্রদ্ধা নেই। তোমার চাকরি নেব যেদিন, সেদিন বুঝব যে, আমার বুদ্ধি লোপ হয়েছে।"

কার্ত্তিক কহিল, "তা জানি সর্ব্ব-দাদা! বামুনের ছেলে কুকুরের বৃত্তি গ্রহণ করতে কখনই চাইবে না, বিশেষতঃ আমার মত জামাই বাবুর অধীনে। যে শ্বশুরের নামে বিকুচ্ছে সে যে নিজেই কুকুর, কুকুরের অধীনে চাকরি কোন ভদ্র লোকের ছেলেরই নেওয়া উচিত নয়, তুমি ত ব্রাহ্মণ-সন্তান। আমি আগেই এ সব কথা জানতুম, তাই মণিকে দেওয়ান ক'রবই ঠিক করেছিলুম। তোমায় ভয় দেখিয়ে যে একবার আনতে পেরেছি, এইটুকুই আমার লাভ। তুমি আমায় বাঁচাতে এসেছ, কিন্তু আমায় বাঁচাতে পারবে না। এখন কুকুরের অন্ন গ্রহণ করবার যদি ইচ্ছা থাকে ত এস। আর অতটা যদি দয়া করতে রাজী না হও, তবুও আমার জিত, কারণ তুমি আমাকে এখনও মন থেকে ঝেড়ে ফেলতে পারনি, এটুকু আমি জানতে পারলুম।"

কার্ত্তিক হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেল, কিন্তু শিবচন্দ্র পুত্রের মুখের ভাব লক্ষ্য করিয়া শিহরিয়া বলিলেন, "সর্ব্ব, কার্ত্তিক আমার এ কি হতে চলেছে? ওর মুখ দেখে ওর গর্ভধারিণী দিন দিন শুকিয়ে যাচ্ছেন। কালিকাবাবুর কথা রাখতে গিয়ে এ আমি কি করলুম?"

সর্ব্বানন্দ কহিল, "কিছু অন্যায় করেন নি, খুড়োমশায়। সন্তান যদি পিতা-মাতার সদভিপ্রায় বুঝতে না পেরে মিছি মিছি নিজেকে নষ্ট করে ত তার জন্য কোন দুঃখ করা উচিত নয়। কালিকাবাবুর মত শ্বশুর,

শৈলজার মত স্ত্রী লাভ ক'রেও যে মূর্খ আপনাকে অপমানিত জ্ঞান করে, তার মঙ্গল কখনও নেই।"

শিবচন্দ্র কহিলেন, "বৌমা যে আমার কতখানি গুণবতী, তা তুমি জান না, সর্ব্ব। এমন স্ত্রী লাভ ক'রেও কার্ত্তিক অসুখী হ'ল!"

সর্ব্বানন্দ কহিল, "সুখ-শান্তি যে চায় না, দুঃখ-অশান্তিই যে চায়, তার ভাল ক'রতে ভগবানও অক্ষম। যাক, খুড়োমশায়, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, আমার দেহে একবিন্দু রক্ত থাকতে কার্ত্তিককে সম্পূর্ণ নষ্ট হ'তে কখনই দেব না। তবে সবই ভগবানের হাত।"

শিবচন্দ্র দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া সর্ব্বানন্দর সঙ্গে গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন।

৪

সর্ব্বানন্দ কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলে শশিভূষণ তাহাকে নিভৃতে ডাকিয়া বলিল, "কি করে এলে?"

সর্ব্বানন্দ বলিল, "তোমার লোকটিকে টাকা-কড়ি দিয়ে একটা ঘর ঠিক করে ওখানে বসিয়ে রেখে এলুম। কিন্তু আমার মনে হয় না যে ঐ রকম বোকা লোক কার্ত্তিকের সমস্ত কাজ-কর্ম্মে নজর রাখতে পারবে।"

শশিভূষণ কহিল, "বোকো একবার ওর ক্ষমতা! তোমার চোখেও ধূলো দিয়েছে! তুমিও বুঝতে পারনি যে ও কেমন লোক। ঐ রকম লোকের দ্বারাই কার্য্যোদ্ধার হবে। কার্ত্তিক বুঝতেই পারবে না যে ওর উপর আমাদের দৃষ্টি আছে, অথচ কাজ বেশ হয়ে যাবে।"

সর্ব্বানন্দ কহিল, "কিন্তু আমার মনে হয়, কার্ত্তিক কিছুই গোপন করবে না, ওর সয়তানী খোলাখুলি রকমেরই হবে। বিষয় আশয় বোধ

হয় ও ওড়াবে না, কারণ এতটা নীচ-প্রবৃত্তি ওর নয় যে, যে বিষয়ের ও ধর্ম্মত ট্রাষ্টিমাত্র, তা উড়িয়ে পুড়িয়ে নীচের মত প্রতিশোধ নেবে। কিন্তু খুড়োমশায়ের উপরও যখন ওর আক্রোশ হয়েছে, তখন আবার ওর দ্বারা সবই সম্ভব, মনে হয়। কি আশ্চর্য্য, ঠাকুর্দ্দা, সাধারণ মানুষে যা পেলে নিজেকে ভাগ্যবান মনে করে, তা পেয়েও নিজেকে ও এতখানি অপমানিত জ্ঞান ক'র্‌ছে!"

শশিভূষণ কহিল, "ওর কাছে নিজের ইচ্ছেটাই সব-চাইতে বড়। নিজেকে ও এত বড় করে চিরদিন দেখ্‌ছে যে অনিচ্ছায় পৃথিবীর উপর প্রভুত্ব পেলেও ওর মনস্তুষ্টি হবে না। যাক্ ও কথা, শৈলর সঙ্গে দেখা হ'য়েছিল?"

সর্ব্বানন্দ কহিল, "কাল তার সঙ্গে দেখা হয়েছিল।"

শশিভূষণ কহিল, "কি রকম দেখ্‌লে?"

সর্ব্বানন্দ কহিল, "দেখ্‌লুম যা, তা আর বলে কি হবে?"

শশিভূষণ কহিল, "তুমি কি বল্‌লে?"

সর্ব্বানন্দ কহিল, "আমি জিজ্ঞাসা ক'র্‌লুম, 'কেমন আছ, শৈল?' সে হেসে ব'ল্‌লে, 'ভালই আছি!' কিন্তু সেই হাসিটুকু অশ্রুর চেয়েও বেদনায় ভরা। সেজন্য আমি স্পষ্টই ব'ল্‌লুম, 'শৈল, তুমি আমায় সব কথা খুলে বল, আমি তোমার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী।' প্রথমে সে ত কিছুই ব'ল্‌তে চায় না, শেষে অনেক সাধ্য-সাধনায় ব'ল্‌লে, 'আমার দুঃখ কাউকে বোঝানো যাবে না।' আমি ব'ল্‌লুম, 'কেন যাবে না? তুমি বল, আমি বুঝ্‌ব। কার্ত্তিক কি এতদূর অধঃপাতে গেছে যে তোমাকেও সে কষ্ট দেয়?' শৈল তখন কেঁদে ফেলে বল্লে, 'অমন কথা আপনি ব'ল্‌বেন না। উনি প্রাণপণে আমায় সুখী ক'র্‌বার চেষ্টা ক'র্‌ছেন। কখনও অনাদর করেন নি, বা একদিনের জন্যও আমায় একটা রুক্ষ কথা বলেন

নি। সে বিষয়ে ওঁর কোন ত্রুটি নেই! কিন্তু আমিই হতভাগিনী তাই এমন স্বামী পেয়েও সুখী হ'তে পারছি না।' এতেই বুঝতে পারছ ঠাকুরদা, যে কার্ত্তিকের সয়তানী কি রকম সূক্ষ্ম ধরণের। বাইরে থেকে তার কিছুই বোঝবার জো নেই।"

শশী কহিল, "আর এতেই বুঝতে পারছ যে ওর সঙ্গে কি রকম সাবধানে চলতে হবে! ও-সব কথা যাক্—এখন এধারে এক মুস্কিলে পড়া গেছে যে, তোমার Point systemএ শিখতে কেউ রাজী হয় না। ছেলেদের বাপ-মা-রাও সব বাধা দিচ্ছে, মাষ্টাররা বাধা দিচ্ছে, এমন কি সরোজ পর্য্যন্ত রেগে আগুন হয়ে গিয়েছে। এমন উপায় কি?"

সর্ব্বানন্দ কহিল, "কারুর উপর পরখ না ক'রলে ত কেউ ওটা নিতে চাইবে না। যেমন ক'রে হোক্ একজনকে দিয়েও দেখতে হবে। আচ্ছা, সুকু, কি বলে?"

শশী কহিল, "ওর বয়স একটু বেশী হয়ে গিয়েছে না?"

সর্ব্বানন্দ কহিল, "চোদ্দ-পনেরো বছর বয়স বেশী নয়, ও বয়সে নতুন করে আরম্ভ করা চলে। ও যদি রাজী হয় ত আমি বলি তুমি নিজেই লেগে পড়।"

শশী কহিল, "তোমার system ভাই আমি নিজেই তেমন আয়ত্ত ক'রতে পারি নি। যদি পরীক্ষা ক'রতে হয় ত তুমিই কর। আমি আর নতুন ক'রে আরম্ভ করতে পারিনে।"

সর্ব্বানন্দ কহিল, "বেশ কথা, আমিই ক'রব।"

সন্ধ্যার পর সরোজ ও সুকুমারীর নিকট এ প্রস্তাব উঠিলে, সরোজ ব্যস্ত হইয়া বলিল, "আহা, সুকু বেচারীর এ কূল ও কূল দু' কূল নষ্ট ক'রবে? একে ত বেচারী অতি-কষ্টে যা হোক কিছু শিখেছে, তার উপর নতুন ক'রে আর একটা পদ্ধতির ভার ওর ওপর চাপিয়ো না, দোহাই

তোমাদের—ও বেচারী কিছু ব'ল্‌তেও পারবে না, অথচ তোমরা ওর জীবনের সমস্ত চেষ্টাটুকু ব্যর্থ করে দেবে। কেন? আর কোন ছোট ছেলে-মেয়ে কি অত বড় ইস্কুলের মধ্যে মিল্‌ল না, যে আমার সুকুকেই তোমাদের বৈজ্ঞানিক অত্যাচার সইতে হবে?"

সর্ব্বানন্দ কহিল, "তুমিও যদি সাধারণ অবুঝ লোকের মত বাধা দাও সরোজ, তাহলে আর আমাদের আশা নেই। আমি ব'লছি, সুকুর কোন ক্ষতি হবে না। ও যা শিখেছে, তাও ওকে ভুল্‌তে দেব না, অথচ যদি ওর দ্বারা এই পদ্ধতিটা চালাতে পারি, তাতে সকলেরই উপকার হবে। আমি ব'ল্‌ছি যে যদি এর জন্য আমায় দিবা-রাত্রি পরিশ্রম ক'র্‌তে হয়, তা ক'র্‌তেও আমি প্রস্তুত আছি। এখন চাই কেবল তোমাদের সহকারিতা আর উৎসাহ। কিন্তু তোমরা যদি এমনভাবে বেঁকে দাঁড়াও তাহলে আমরা করি কি?"

সরোজ কহিল, "গতানুগতিকভাবে চলাই সাধারণের পক্ষে নিরাপদ, বিশেষ অন্ধের পক্ষে অচেনা পথ মাড়াতেই নেই। আমার এ বিষয়ে যা মত, তা তোমাদের জানিয়ে দিলুম, এখন তোমাদের যা ইচ্ছে হয় তাই কর।"

সর্ব্বানন্দ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "নিরুপায়!"

সে উঠিয়া দাঁড়াইতেই সুকুমারী তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল, "আমি আপনার নতুন পদ্ধতি শিখ্‌ব। সরো দিদি, তুমি আর বাধা দিয়ো না; যা হয় আমার ভাগ্যেই হবে।"

সর্ব্বানন্দ সকৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে সুকুমারীর অন্ধ নয়নের দিকে চাহিয়া বলিল, "সুকু, বাঁচালে তুমি। তোমায় যে কি বলে কৃতজ্ঞতা জানাব, তা ভেবে পাচ্ছি না। আমি বলছি, তুমি আমার উপর নির্ভর কর, এতে তোমার কোন ক্ষতি হবে না। আমি প্রাণপণ চেষ্টায় তোমায় এমন করে তুল্‌ব যে তুমি আমাদের ইস্কুলের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছাত্রী হবে।"

তুলবে যে সকলেই আশ্চর্য্য হয়ে যাবে। এর জন্য তোকে শশী কত আশীর্ব্বাদ করেছে।"

সরোজ কহিল, "শশিদা কখন এল?"

চিন্ময়ী কহিলেন, "আমার ঘরে অনেকক্ষণ থেকেই ও এসে বসে ছিল। তোর সঙ্গে তর্কের ভয়ে এখানে আসে নি। সব্ব যখন গিয়ে খবর দিলে, তখন সে লাফিয়ে উঠল। তারপর দুজনে ইংরিজিতে কি বলাবলি সুরু করে দিয়েছে। সব্ব আমায় বল্‌লে যে আজ তার এত আহ্লাদ হয়েছে, যে রাজ্য পেলেও এমন হ'ত না। সব্বর মত মানুষের কথা ঠেলে সরোজ তুই কি করে অমত করিছিলি?"

সরোজ কহিল, "আর আমার মতামতে কি যাবে-আসবে মা? সুকু যখন নির্বিচারে আপনাকে সর্ব্ব-দার হাতে সঁপে দিয়েছে, তখন আমি বাধা দিলুম, আর না দিলুম, তাতে সুকুর কি? সুকু এখন যতদিন ইচ্ছে যা-ইচ্ছে শিখুক না, এখন সুকুর ভার সর্ব্ব-দার উপর।"

চিন্ময়ী কহিলেন, "আহা, সব্বর মত মানুষের উপর নির্ভর করবে না ত কার উপর করবে? ভালই করেছিস্ সুকু, দেখিস্, তোর খুব ভাল হবে।"

চিন্ময়ী মহানন্দে চলিয়া গেলেন। সুকুমারী মৃদু স্বরে বলিল, "সরো-দি, তুমি ভাই বড় দুষ্টু।"

৫

"আকরে পদ্মরাগাণাং জন্ম কাচমণেঃ কুতঃ?" এই শাস্ত্র-বাক্য অক্ষরে অক্ষরে প্রমাণ করিয়া যখন মণিশঙ্করের পৈতৃক বিষয়-বুদ্ধি শিবরামপুরের বিস্তৃত জমিদারীর প্রত্যেক অংশে অনুভূত হইতে লাগিল, তখন শৈল ব্যস্ত হইয়া স্বামীকে ধরিয়া বসিল যে মণিশঙ্করকে

ছাড়াইয়া দেওয়া হোক। চারিদিক হইতে অত্যাচারের করুণ কাহিনী সে আর শুনিতে পারে না। কার্ত্তিক পুরাদস্তুর জমিদারী চালে উত্তর দিল, "জমিদারী রাখিতে হইলে, এরূপ না করিলে চলিবে কেন?" মণি যাহা করিতেছে, তাহা কার্ত্তিকের উপদেশানুসারেই করিতেছে, তাহাতে মণির কোন দোষ নাই।

শৈল কাঁদিয়া বলিল, "তা বলে কি গরীব বিধবার ব্রহ্মোত্তর বাজেয়াপ্ত কর্‌তে হবে, না, পূর্ব্বপুরুষরা যে-সব দেবোত্তর দিয়ে গিয়েছেন, পুকুর দিয়ে গিয়েছেন, সে-সব কেড়ে নিতে হবে?"

কার্ত্তিক কহিল, "দেবতা স্বয়ং কিছু ভোগ করেন না, মানুষই ভোগ করে। কতকগুলো বাজে লোক ভোগ কর্‌ছিল, না হয়, আমরাই সেগুলো ভোগ কর্‌লুম। দেবতার পক্ষে রামা যে শ্যামাও সে, কার্ত্তিক যে শৈলও সে। আর ব্রহ্মোত্তর? ব্রাহ্মণ আর গঙ্গা কলিতে লোপ পেয়েছে, অতএব ও সব দান অসিদ্ধ। কতকগুলো জোচ্চোরে ফাঁকি দিয়ে ভোগ কর্‌ছিল, আমি তাদের জব্দ করে দিয়েছি মাত্র।"

শৈল কহিল, "তা হ'লে কোন্ দিন তুমি বাবার ব্রহ্মোত্তরগুলোও কেড়ে নিয়ে ওঁকে টোল থেকে তাড়াবে বল?"

কার্ত্তিক হাসিয়া বলিল, "তা রামার পক্ষে যা কর্‌ব শ্যামার পক্ষেও তাই করা উচিত বৈ কি?"

শৈল স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া হঠাৎ হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, "জানিনা কি মতলবে তুমি আমার কাছে এ সব কথা বল! এ কি আমার পরীক্ষার জন্য—না—কিন্তু যাই হোক্—তুমি মণি-দাকে না তাড়াও, অন্ততঃ আমার জন্য যা-যা ও কেড়ে নিচ্ছে, তা ফিরিয়ে দাও। তুমি না দাও ত আমি দেব।"

কার্ত্তিক কহিল, "তা হ'লে সে খরচা তোমার নিজের এষ্টেট থেকে হবে, আমি দেব না।"

শৈল কহিল, "কেন?"

কার্ত্তিক কহিল, "আমি ত মণির কোন অন্যায়ই দেখ্‌তে পাচ্ছি না।"

শৈল কহিল, "অন্যায় দেখ্‌তে পাচ্ছ না! মণি যা কর্‌ছে, সবই ঠিক?"

কার্ত্তিক কহিল, "আমার ত তাই মনে হয়।"

শৈল কহিল, "তুমি এত দূর অন্ধ হয়ে গিয়েছ?"

কার্ত্তিক কহিল, "সে কথা কি আজ জান্‌লে, শৈল? আমার দুটী চক্ষুই গিয়েছে, এ দুটো যা দেখ্‌ছ, এ পাথরের।"

শৈলজা স্তম্ভিত হইয়া গেল। এ কি সেই কার্ত্তিক, চিরদিন যে অন্যায়ের বিরুদ্ধে সিংহের মত যুদ্ধ করিতে উদ্যত ছিল! এ কি সেই মানুষ!

গভীর দুঃখে শৈলজা কাঁদিয়া ফেলিল। কার্ত্তিক কিন্তু হাসিতে হাসিতে বলিল, "অন্ধকারের ঘুরঘুরে পোকাকে আলোয় ধরে রাখ্‌বার চেষ্টা কর্‌লে সে ত এম্‌নি করে চারিদিকে গর্ত্ত খোঁড়বার চেষ্টা কর্‌বেই। এর জন্য দুঃখ কেন কর্‌ছ, শৈল? আমি ত বলেছি, সুখ আমায় সয় না! তাই চারিদিকে দুঃখের হাহাকার জাগিয়ে তুলে তার মধ্যে চক্ষু মুদে বসে হাস্‌বার চেষ্টা কর্‌ছি।"

শৈল কহিল, "না, আমি তোমায় এত অধঃপাতে যেতে দেব না! যদি তোমায় রক্ষা কর্‌তে না পারি ত আমি কিসের তোমার স্ত্রী? কিসের আমার ভালবাসা?"

কর্ত্তিক কহিল, "ঠিক বলেছ শৈল, কিসের ভালবাসা? কিসের স্নেহ? সবই মোহ, সবই বন্ধন!"

শৈল কহিল, "তুমি মরণাধিক মরণের দিকে ছুটে চলেছ। কিন্তু কেন যে তোমার এ মতিচ্ছন্ন হয়েছে, তা বুঝ্‌তে পারছিনে।"

কার্ত্তিক কহিল, "আমিই বুঝ্‌তে পার্‌ছিনে, তা তুমি! কিসের মোহে, কিসের আকর্ষণে আমার সমস্ত বুদ্ধি সয়তানীর দিকে ছুটে চলেছে, তা যদি বুঝ্‌তুম, তা হলে কি আমিই এমন হতে চাইতুম! আমি জানি না, তবু না জেনেই ছুট্‌তে হচ্চে, এমনি আকর্ষণ পতনের, এমনি আকর্ষণ মৃত্যুর, এমনি আকর্ষণ অন্ধকারের!"

শৈল কহিল, "আমি প্রাণ দিয়েও তোমায় বাঁচাব।"

কার্ত্তিক কহিল, "প্রাণ দিয়েও তুমি রক্ষা করতে পার্‌বে না।"

শৈল কহিল, "তবে কি দিয়ে তোমায় রক্ষা কর্‌ব?"

কার্ত্তিক কহিল, "সেইটেই তোমায় আবিষ্কার ক'র্‌তে হবে। আমি সেই আশায় বসে আছি। যেদিন সেইটে তুমি ধর্‌তে পার্‌বে, সেদিন দেখ্‌বে, আবার আমার চোখ ফুটেছে।"

কার্ত্তিক চলিয়া গেল। আর শৈলজা আকাশ-পাতাল ভাবিয়াও স্থির করিতে পারিল না, কার্ত্তিক কি চায়! সে অনেকবার কার্ত্তিককে বলিয়াছে, যে যদি শৈলকে বিবাহ করিয়া সে অসুখী হইয়া থাকে, তাহা হইলে সে কেন শৈলকে ত্যাগ করিয়া যাহাকে পাইলে সুখী হয়, তাহাকেই বিবাহ করে না? কিন্তু কার্ত্তিক যে তাহাতে রাজী নয়। তবে কার্ত্তিক কি চায়? কি পাইলে কার্ত্তিক আবার সুস্থ হইবে, আবার পূর্ব্বভাব ফিরিয়া পাইবে? শৈলজা ভাবিয়া কিছুই ঠিক করিতে পারিল না।

ইতিমধ্যে আর-একটা এমন ঘটনা ঘটিয়া গেল, যাহাতে কার্ত্তিক শৈলর নিকট আরও দুর্ব্বোধ্য হইয়া উঠিল। ন্যায়রত্নের পত্নী মনোরমা দেবী বহু দিন হইতে রোগে ভুগিতে ছিলেন। শৈলজা নানা উপায়ে

তাঁহাকে সুস্থ করিবার চেষ্টা করিতেছিল। কিন্তু তিনি কিছুতেই সুস্থ হইলেন না, পুত্রের নিষ্ঠুর ব্যবহারে মার প্রাণ একেবারে ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। ক্রমশঃ তিনি শয্যাগ্রহণ করিলেন এবং পরিশেষে একদিন আর দেরী নাই বুঝিয়া স্বামীর পদধূলি গ্রহণ করিয়া শৈলকে বলিলেন, "বৌমা, আজ আমার শেষ দিন, আজ যদি একবার সে হতভাগাকে দেখ্‌তে পেতুম, তাহলে মনে আর কোন ক্ষোভ থাক্‌ত না।"

শৈলজা তাহার স্বামীকে বহু অনুনয়, বিনয় করিয়াও শ্বশ্রূঠাকুরাণীর নিকটে আনিতে পারে নাই। কিন্তু আজ সে দৃঢ় স্বরে বলিল, "মা, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, আজ তিনি আস্‌বেন।" শৈল কার্ত্তিকের নিকটে গিয়া সব কথা বর্ণনা করিয়া বলিল, "আজ তোমায় তাঁর এই শেষ মুহূর্ত্তে যেতেই হবে। সর্ব্ব-দাদা তাঁর সব কাজ ফেলে যখন আজ পাঁচ দিন থেকে মার কাছে এসে বসে আছেন, তখন তুমি তাঁর একমাত্র সন্তান হয়ে মার কাছে তাঁর এ শেষ মুহূর্ত্তেও যাবে না? না, তুমি এত নীচ নও।"

কার্ত্তিক কহিল, "আমি যে অন্ধ, আমি যে কাকেও আর দেখ্‌তে পাচ্ছিনে, মার কাছে কেমন করে যাব?"

শৈল কহিল, "এস, আমি তোমার হাত ধরে নিয়ে যাব। যদি তুমি অন্ধই হয়ে থাক, তবু আমার চক্ষুই তোমার চক্ষু হবে।"

কার্ত্তিক পরম স্নেহে আজ জীবনে এই প্রথম তাহার স্ত্রীর হাত ধরিয়া বলিল, "আমার হাত ধরে তুমি কেমন করে সকলের সুমুখে রাস্তা দিয়ে যাবে?"

শৈল কহিল, "যার স্বামী অন্ধ, তার আবার লজ্জা কি! এস, আমি তোমার হাত ধরে নিয়ে যাব।"

কার্ত্তিক সত্যই পত্নীর হস্ত অবলম্বন করিয়া নিমীলিত নেত্রে মাতৃ-

সন্নিধানে উপস্থিত হইল ; গিয়া বলিল, "মা, তোমার অন্ধ ছেলে এত দিন পথ দেখ্‌তে পায়নি বলে, কেউ তোমার কাছে আমায় পথ দেখিয়ে আনে নি বলে আস্‌তে পারে নি। আজ সে এসেছে। কি বল্‌তে চাও, বল।"

কার্ত্তিকের মুখের দিকে চাহিয়া মৃত্যুশয্যায় শায়িতা মা কাঁদিয়া উঠিলেন। কার্ত্তিক হাসিয়া বলিল, "কাঁদ্‌ছ কেন মা ? আমি ত সুস্থ সবল শরীরে বেঁচে রইলুম। ভয় কি, আমার ১০৮ বৎসর পরমায়ু কোষ্ঠীতে লেখা আছে।"

সর্ব্বানন্দ ক্রুদ্ধ স্বরে বলিল, "মার এমন অবস্থা দেখেও যে সন্তান তাঁর শেষ সময়েও উপহাস করতে আসে—"

কার্ত্তিক কহিল, "তার শাস্তি আজীবন অন্ধতামিস্র নরকে বাস। ভয় কি সর্ব্ব-দা, তাই ত আমার হচ্ছে। মা, তুমি কি অভিশাপ দেবে, দাও।"

মাতা ক্ষীণ অশ্রুরুদ্ধ স্বরে বলিলেন, "আমার কাছে আয়, কার্ত্তিক—"

কার্ত্তিক বলিল, "কোথায় তুমি—আমি যে দেখ্‌তে পাচ্ছি নে।" শৈলজা তাহার হাত ধরিয়া শাশুড়ীর কাছে বসাইয়া দিল। মাতা পুত্রের বুকে হাত দিয়া বলিলেন, "বাবা, এই শেষ সময় আশীর্ব্বাদ কর্‌তে চাচ্ছি, আমার আশীর্ব্বাদ নিবি নে ?"

কার্ত্তিক কহিল, "মা, আশীর্ব্বাদ কর, যেন এ চর্ম্ম চক্ষে আর না তোমায় দেখ্‌তে হয়।"

মনোরমা দেবী কহিলেন, "চোখ চেয়ে ফেল্ বাবা, তা হলেই দেখ্‌বি, সব পরিষ্কার হয়ে গেছে। নিজের চোখ নিজে বন্ধ করে রাখ্‌লে কে তোকে চোখ দেবে, বল্ ? আমি আশীর্ব্বাদ কর্‌ছি, আবার তুই সুস্থ হবি, আবার তুই আগেকার মত হবি।"

কার্ত্তিক হাসিয়া বলিল, "মা, তোমার কথা কবে সফল হবে!

কবে আবার আমি সংসারকে আমার সেই পুরোনো চোখে দেখ্‌তে পাব! কবে এই ভয়ঙ্কর বন্ধন, অন্ধকারের বন্ধন কেটে যাবে!"

মনোরমা কহিলেন, "যে দিন তুই নিজের জোরে সব ঘোর কাটিয়ে ফেল্‌বি।"

কার্ত্তিক কহিল, "তা পার্‌ব না মা, আমার হাত-পা বাঁধা। তোমরা যে বাঁধন বেঁধে দিয়েছ, তা যে বাপ-মায়ের বত্রিশ নাড়ীর বন্ধন, কে তাকে ছিঁড়্‌তে পার্‌বে?"

মনোরমা দেবী উত্তেজিত হইয়া বলিলেন, "কি, আমরা তোকে যে বাঁধনে বেঁধে দিয়েছি, তাতেই তোকে অন্ধ করেছি! ওরে সে বন্ধন যেন তোর অক্ষয় হয়! ওরে অন্ধ, যে দিন বুঝ্‌তে পার্‌বি যে কি আলো তোর চোখের সাম্‌নে ধরে দিয়েছি, সেই দিনই তোর সব ঘোর কেটে যাবে। তুই যদি নিজে চোখ বুজে থাকিস্, তাহলে কি করে সে আলো দেখ্‌তে পাবি?"

কার্ত্তিক কহিল, "মা, আমি আলো চাই নে, আমি যে অন্ধকারই চাই।"

মনোরমা কি বলিতে যাইতেছিলেন, এমন সময় শিবচন্দ্র সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া বলিলেন, "স্বকর্ম্মফলভুক্ পুমান্, মনোরমা, হরি নাম কর, কি যা-তা এ সময় বক্‌ছ? নারায়ণ বল, হরি বল!" মনোরমা চক্ষু মুদ্রিত করিয়া বলিলেন, "মা দুর্গা, কোলে নে মা। গঙ্গা-নারায়ণ-ব্রহ্ম।"

শ্রীভগবানের মধুর নাম শ্রবণ করিতে করিতে পতি-পুত্রের সম্মুখে মনোরমা দেবী দেহ ত্যাগ করিলেন। শ্মশানে তাঁহার দেহ ভস্ম হইয়া গেলে কার্ত্তিক বিকট স্বরে হাসিয়া বলিল, "মা, এইবার তুমি আমার অন্ধকারের দেশে গিয়েছ, এবার থেকে সর্ব্বক্ষণ তুমি আমায় দেখ্‌তে

পাবে। দেহ কিছুই না, ছাই যার অবশিষ্ট থাকে, তা নিয়ে কি হবে? তুমি ছাইয়ের দেহ ছেড়ে যে দেহ নিয়েছ, তাই তোমার যথার্থ দেহ।”

কার্ত্তিক পাগলের মত ছাই উড়াইয়া তাহারই এক অঞ্জলি এক-টুক্‌রা ছিন্ন বস্ত্রখণ্ডে বাঁধিয়া লইয়া গৃহে ফিরিয়া আসিল।

৬

শশিভূষণ হঠাৎ সর্ব্বানন্দর পত্র পাইয়া অভিভূত হইয়া পড়িল। সর্ব্বানন্দ লিখিয়াছে, “ঠাকুরদা, সর্ব্বনাশ হইয়াছে। কার্ত্তিক আমাদের বুঝি-বা অন্ধ হইয়া যায়! খুড়িমার মৃত্যুর দিন তাহার যে মূর্ত্তি দেখিলাম, তাহা জীবনে ভুলিব না। এখানে আসিয়া শুনিলাম, সে কিছু দিন হইতে দিনে একটা অন্ধকার ঘরের মধ্যে বসিয়া থাকে, রাত্রে বাহির হইয়া সংসারের কাজকর্ম্ম দেখে। বৈষয়িক কোন গোলমাল এখনও দেখা দেয় নাই বটে, কিন্তু যাহার বিষয়, সে এরূপ হইলে পরে যে কি ঘটিবে, তাহা কে বলিতে পারে? সে এতদিন পর্য্যন্ত তাহার মার সঙ্গে দেখাই করে নাই, কিন্তু খুড়িমার মৃত্যুকালে সে চক্ষু মুদিয়া শৈলর হাত ধরিয়া আসিয়া মার কাছে দাঁড়ায়। তখন-পর্য্যন্ত মনে করিতে-ছিলাম যে এ সমস্তই সয়তানী; কিন্তু খুড়িমার মুখাগ্নি করিয়া সে যখন বিকট হাস্য করিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল, তখন বুঝিলাম যে তাহার কিছুই কৃত্রিম নয়। সে যখন হাতড়াইতে হাতড়াইতে নদীতীর হইতে উপরে আসিয়া বসিল, তখন তাহার চোখের সমস্ত দীপ্তি নিবিয়া গিয়াছে। ইচ্ছা করিয়া কি মানুষ অন্ধ হইতে পারে? ভাই, তোমার ত এ বিষয়ে অনেক পড়াশুনা আছে, কোথাও কি পড়িয়াছ যে মানুষ কেবলমাত্র ইচ্ছা দ্বারা অন্ধতা আনয়ন করিতেছে—কোন ঔষধের দ্বারা নয়? কোন ঔষধের সাহায্যে যদি ইহা ঘটিয়া

থাকে, তাহা হইলে এই বেলা সাবধান হইতে হইবে। কিন্তু আমি সেদিন হইতে তাহার সমস্ত ঘর সমস্ত বাক্স-আলমারি-সিন্দুক পাতি-পাতি করিয়া খুঁজিয়াছি, যে লোকটী সর্ব্বদা তাহার নিকট থাকে, তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছি, কিন্তু কেহই বলিতে পারিল না যে, চুপ করিয়া বসিয়া থাকা ছাড়া সে অন্য কিছু করে। অথচ স্পষ্টই বুঝিতে পারা যাইতেছে যে কার্ত্তিক দিবসে ক্ষীণদৃষ্টি, কিন্তু রাত্রে তাহার অন্য ভাব। পূর্ণ তেজে সে সমস্ত কাজ তখন দেখা-শুনা করে, কৃত্রিম আলোয় তার দৃষ্টি সম্পূর্ণ স্বাভাবিক, সম্পূর্ণ সুস্থ। কিন্তু দিন আসিলেই সে যেন ভীত হইয়া একটা অন্ধকার ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া চুপচাপ বসিয়া থাকে। তাহাকে বাহিরে আনিবার চেষ্টা করিয়া দেখিয়াছি, সে বাহিরে আনিবার কথাতেই কাঁপিতে থাকে। নিতান্ত বাধ্য হইয়া বাহিরে আসিলে সে যেমন ত্রস্তভাবে হাত চাপিয়া ধরে, তাহাতে ভয় হয় যেন সে প্রতি পদক্ষেপেই পড়িয়া যাইবার ভয় করিতেছে। এ কি হইল, ভাই? সে এ কি করিয়া বসিল? আমি যে আর তাকে এক মুহূর্ত্তও ছাড়িয়া থাকিতে পারি না। ঠাকুরদা, কি করিব? কি উপায়ে কার্ত্তিকের চক্ষু দু'টী ফিরিয়া পাইব?"

শশিভূষণ পত্র পড়িয়া উত্তেজিতভাবে আপনার কক্ষমধ্যে পদচারণ করিতে লাগিল। সহসা পরক্ষণেই কি মনে করিয়া তাহার সেই গোপন কক্ষের দ্বার খুলিয়া মৃতা পত্নীর তৈলচিত্রের সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল। অন্ধকারে ঠিক তাহা দেখা যাইতেছিল না বলিয়া সে দরজা-জানালা খুলিয়া দিল। তবু দেখা যায় না! শশিভূষণ নেত্র মার্জ্জনা করিয়া চাহিয়া দেখিল, মূর্ত্তি যেন হাসিতেছে। সে মনে মনে বলিল, অন্ধতার এত আকর্ষণ! আজ কত বৎসর হল তুমি গিয়েছ, তবু তোমার ঐ অন্ধ নয়ন আমায় বেঁধে রেখেছে। কি দৃঢ় বন্ধন! কি ভীষণ আকর্ষণ!

চোখের আড়ালে গিয়েছ, তবু তোমার এত শক্তি! তোমায় এ জন্মে আর পাব না, তাই কি তোমার বন্ধন এত দৃঢ়? মৃত্যুর আড়ালে যে তোমার অশ্রুত বাণী, তোমার অলক্ষ্য দৃষ্টি আমায় মরণ-বন্ধনে বেঁধে রেখেছে। নড়বার-চড়বার শক্তি আর আমার নেই! হাতের গোড়ায় থাক্‌লে, বুকের অতি-কাছে থাক্‌লে হয়তো তোমায় এমন করে চাইতুম না, হয়তো তোমায় অবজ্ঞাই কর্‌তুম। কিন্তু এখন তুমি অপ্রাপ্য, এখন তুমি দুর্ল্লভ, তাই তোমার আশায় বসে আছি। পাব না, জানি, তবু পেতে চাই। এ এক অদ্ভুত প্রহেলিকা!

শশিভূষণ আবার সমস্ত দরজা-জানালা বন্ধ করিল; তারপর তাহার অন্ধ বিদ্যালয়ে চলিয়া গেল। কিন্তু সেখানেও আজ সে কোন আনন্দ পাইল না। তাহার কেবলি মনে হইতে লাগিল, জগতের সমস্ত আলো যেন নিবিয়া অন্ধকারে মিশিয়া যাইতে চাহিতেছে। আর সেই অন্ধকারের মধ্য হইতে একটী করুণ ধ্বনি কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিতেছে, "আলো, ওগো আলো!"

শশিভূষণ উদাস মনে সমস্ত দিন ঘুরিয়া ফিরিয়া সন্ধ্যার পর শ্বশ্রু-ঠাকুরাণীর গৃহের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। কিন্তু দ্বারের কড়া ধরিয়া টানিতে গিয়া তাহার হাত কাঁপিয়া উঠিল; একটা অজ্ঞাত আশঙ্কা তাহাকে আক্রমণ করিতেই সে সরিয়া গলির অপর পার্শ্বে গিয়া দাঁড়াইয়া শুনিবার চেষ্টা করিল, উপরে কোনরূপ শব্দ হয় কি না। না, কোন ভীতি-জনক শব্দ নাই, সমস্তই শান্ত, সমস্তই আগেকার মত। শশিভূষণ সবলে সকল দ্বিধা দূর করিয়া কড়া ধরিয়া টানিয়া দ্বার খুলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল।

সমস্তই সেইরূপ আছে! সেই আলো, সেই ফুল, সেই শোভা, সেই গন্ধ! তবু যেন কোথায় কে কাঁদিতেছে! শশিভূষণ দ্রুত পাদক্ষেপে

থাকে, তাহা হইলে এই বেলা সাবধান হইতে হইবে। কিন্তু আমি সেদিন হইতে তাহার সমস্ত ঘর সমস্ত বাক্স আলমারি-সিন্দুক পাতি-পাতি করিয়া খুঁজিয়াছি, যে লোকটী সর্ব্বদা তাহার নিকট থাকে, তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছি, কিন্তু কেহই বলিতে পারিল না যে, চুপ করিয়া বসিয়া থাকা ছাড়া সে অন্য কিছু করে। অথচ স্পষ্টই বুঝিতে পারা যাইতেছে যে কার্ত্তিক দিবসে ক্ষীণদৃষ্টি, কিন্তু রাত্রে তাহার অন্য ভাব। পূর্ণ তেজে সে সমস্ত কাজ তখন দেখা-শুনা করে, কৃত্রিম আলোয় তার দৃষ্টি সম্পূর্ণ স্বাভাবিক, সম্পূর্ণ সুস্থ। কিন্তু দিন আসিলেই সে যেন ভীত হইয়া একটা অন্ধকার ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া চুপচাপ বসিয়া থাকে। তাহাকে বাহিরে আনিবার চেষ্টা করিয়া দেখিয়াছি, সে বাহিরে আনিবার কথাতেই কাঁদিতে থাকে। নিতান্ত বাধ্য হইয়া বাহিরে আসিলে সে যেমন ত্রস্তভাবে হাত চাপিয়া ধরে, তাহাতে ভয় হয় যেন সে প্রতি পদক্ষেপেই পড়িয়া যাইবার ভয় করিতেছে। এ কি হইল, ভাই? সে এ কি করিয়া বসিল? আমি যে আর তাকে এক মুহূর্ত্তও ছাড়িয়া থাকিতে পারি না। ঠাকুরদা, কি করিব? কি উপায়ে কার্ত্তিকের চক্ষু দু'টী ফিরিয়া পাইব?"

শশিভূষণ পত্র পড়িয়া উত্তেজিতভাবে আপনার কক্ষমধ্যে পদচারণ করিতে লাগিল। সহসা পরক্ষণেই কি মনে করিয়া তাহার সেই গোপন কক্ষের দ্বার খুলিয়া মৃতা পত্নীর তৈলচিত্রের সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল। অন্ধকারে ঠিক তাহা দেখা যাইতেছিল না বলিয়া সে দরজা-জানালা খুলিয়া দিল। তবু দেখা যায় না! শশিভূষণ নেত্র মার্জ্জনা করিয়া চাহিয়া দেখিল, মূর্ত্তি যেন হাসিতেছে। সে মনে মনে বলিল, অন্ধতার এত আকর্ষণ! আজ কত বৎসর হল তুমি গিয়েছ, তবু তোমার ঐ অন্ধ নয়ন আমায় বেঁধে রেখেছে। কি দৃঢ় বন্ধন! কি ভীষণ আকর্ষণ!

চোখের আড়ালে গিয়েছ, তবু তোমার এত শক্তি! তোমায় এ জন্মে আর পাব না, তাই কি তোমার বন্ধন এত দৃঢ়? মৃত্যুর আড়ালে যে তোমার অশ্রুত বাণী, তোমার অলক্ষ্য দৃষ্টি আমায় মরণ-বন্ধনে বেঁধে রেখেছে। নড়বার-চড়বার শক্তি আর আমার নেই! হাতের গোড়ায় থাক্‌লে, বুকের অতি-কাছে থাক্‌লে হয়তো তোমায় এমন করে চাইতুম না, হয়তো তোমায় অবজ্ঞাই কর্‌তুম। কিন্তু এখন তুমি অপ্রাপ্য, এখন তুমি দুর্লভ, তাই তোমার আশায় বসে আছি। পাব না, জানি, তবু পেতে চাই। এ এক অদ্ভুত প্রহেলিকা!

শশিভূষণ আবার সমস্ত দরজা-জানালা বন্ধ করিল; তারপর তাহার অন্ধ বিদ্যালয়ে চলিয়া গেল। কিন্তু সেখানেও আজ সে কোন আনন্দ পাইল না। তাহার কেবলি মনে হইতে লাগিল, জগতের সমস্ত আলো যেন নিবিয়া অন্ধকারে মিশিয়া যাইতে চাহিতেছে। আর সেই অন্ধকারের মধ্য হইতে একটী করুণ ধ্বনি কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিতেছে, "আলো, ওগো আলো!"

শশিভূষণ উদাস মনে সমস্ত দিন ঘুরিয়া ফিরিয়া সন্ধ্যার পর শ্বশ্রু-ঠাকুরাণীর গৃহের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। কিন্তু দ্বারের কড়া ধরিয়া টানিতে গিয়া তাহার হাত কাঁপিয়া উঠিল; একটা অজ্ঞাত আশঙ্কা তাহাকে আক্রমণ করিতেই সে সরিয়া গলির অপর পার্শ্বে গিয়া দাঁড়াইয়া শুনিবার চেষ্টা করিল, উপরে কোনরূপ শব্দ হয় কি না। না, কোন ভীতি-জনক শব্দ নাই, সমস্তই শান্ত, সমস্তই আগেকার মত। শশিভূষণ সবলে সকল দ্বিধা দূর করিয়া কড়া ধরিয়া টানিয়া দ্বার খুলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল।

সমস্তই সেইরূপ আছে! সেই আলো, সেই ফুল, সেই শোভা, সেই গন্ধ! তবু যেন কোথায় কে কাঁদিতেছে! শশিভূষণ দ্রুত পাদক্ষেপে

উপরে গিয়া দেখিল, সব একইভাবে চলিতেছে। সুকুমারী তাহার সন্ধ্যার কর্ম্ম সারিয়া চিন্ময়ীর নিকটে বসিয়া গল্প করিতেছে; সরোজ সেই একইভাবে উপরের ছাদে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। শশিভূষণ উপরে সরোজের কাছে গিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "সরোজ, আজ তুমি ভাল আছ ত?"

সরোজ বিস্মিত হইয়া বলিল, "কেন শশীদা, ও কথা জিজ্ঞাসা কর্‌লে কেন? তোমার গলার আওয়াজ এত ভয়ের মত শোনাল কেন? কি হয়েছে, শশীদা? সর্ব্বদার চিঠি পেয়েছ ত? ওঁর খুড়িমা কেমন আছেন?"

শশী কোন উত্তর দিল না দেখিয়া সরোজ তাহার হস্ত স্পর্শ করিল, তারপর কাতরভাবে বলিল "তুমি অমন করে এসে দাঁড়ালে কেন? বল, তোমার পায়ে পড়ি, কি হয়েছে, বল?"

শশী কহিল, "কিছু হয়নি সরোজ, কেবল কার্ত্তিক—তুমি আজ ভাল ছিলে ত? তোমার—"

সরোজ উদ্বিগ্নভাবে বলিল, "তাঁর কি হয়েছে, বল। আমি ভালই আছি।"

শশী কহিল, "আঃ, বাঁচলুম। এ তাহলে তার নিজের দোষ। তুমি তাকে কিছু কর নি, তুমি মনে মনে তাকে আকর্ষণ করে, তার চিন্তা করে তোমার অন্ধতা তাকে দাওনি? আঃ বাঁচ্‌লুম, সরোজ, তোমার কোন দোষ নেই জেনে বাঁচ্‌লুম আমি।"

সরোজ কহিল, "আমি যে তোমার একটা কথাও বুঝ্‌তে পার্‌ছি না। কে অন্ধ হয়েছে? তুমি পাগলের মত কি বল্‌ছ?"

শশী বলিল, "আমি আজ পাগলের মত হয়ে গিয়েছি, সরোজ। আজ আমার সারাদিন মনে হয়েছে যে তুমি তার জন্য কেঁদে কেঁদে

তাকেও অন্ধ করে দিলে। কেন বল্‌তে পারিনে, আমার আজ কেবলি মনে হয়েছে যে তুমিই কার্ত্তিকের এই অন্ধতার কারণ, তুমিই—"

সরোজ বাধা দিয়া কহিল, "চুপ কর, তিনি অন্ধ হয়েছেন কি করে জান্‌লে ?"

শশী কহিল, "সর্ব্বর চিঠিতে জান্‌লুম।"

সরোজ কহিল, "কি লিখেছেন তিনি ?"

শশী পত্রের স্থূল মর্ম্ম তাহাকে জানাইল। সরোজ সমস্ত শুনিয়া বলিল, "শশিদা, আমায় নীচে নিয়ে চল।" শশিভূষণ সরোজের হাত ধরিয়া নিম্নতলে তাহার কক্ষে লইয়া গিয়া তাহাকে শয্যায় বসাইয়া দিল ; তারপর তাহার শ্বশ্রুঠাকুরাণীর কাছে চলিয়া গেল।

সরোজ কিন্তু কাঁদিল না, কাঠের মত শয্যার উপর বসিয়া রহিল। কিছুক্ষণ পরে সুকুমারী আসিয়া দ্বার হইতে বলিল, "মা তোমায় ডাক্‌ছেন, সরোদি।" সরোজ সে কথা শুনিতে পাইল না। তাহার নিকট হইতে কোন উত্তর না পাইয়া সুকুমারী ভাবিল, সরোজ সে ঘরে নাই। সে শশিভূষণের নিকটে গিয়া বলিল, "কৈ, সরোদি ত তার ঘরে নেই।" শশিভূষণ ব্যস্ত হইয়া সেই কক্ষে আসিয়া দেখিল, সরোজ সেই একই ভাবে বসিয়া আছে। শশী তাহার নিকটে গিয়া মৃদু স্বরে ডাকিল, "সরোজ।" সরোজ নির্ব্বাক, নিস্পন্দ। শশিভূষণ ব্যস্ত হইয়া তাহাকে নাড়া দিয়া বলিল, "সরোজ, বোন, অমন করে বসে রইলে যে!" সরোজ হঠাৎ চীৎকার করিয়া বলিল, "ছেড়ে দাও, এক মুহূর্ত্তের জন্য আমায় মুক্তি দাও।" শশিভূষণ সরোজের সংজ্ঞাহীন দেহ শয্যায় শোয়াইয়া দিল ; এবং তাহার চীৎকারে চিন্ময়ীও সুকুমারীর সঙ্গে সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া সরোজের শুশ্রূষায় নিযুক্ত হইলেন।

ডাক্তার আসিল, নানারূপ সেবাশুশ্রূষা চলিল, কিন্তু সমস্ত রাত্রি ধরিয়া সরোজের ভাল করিয়া সংজ্ঞা হইল না। মাঝে মাঝে চীৎকার করিয়া সে বলে, 'আলো দাও, দৃষ্টি দাও' তারপর আবার মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে। এইভাবে সারারাত্রি কাটাইয়া ভোরের দিকে সরোজ কতকটা সুস্থ হইল এবং দিনের আলোর সঙ্গে সঙ্গে তাহার সমস্ত রোগের উপশম হইল। তাহাকে সুস্থভাবে ঘুমাইতে দেখিয়া শশিভূষণ বাহিরে চলিয়া গেল।

দ্বিপ্রহরে সুকুমারী সরোজকে ধরিয়া বসিল, "কি হয়েছিল, বল্‌তেই হবে।"

সরোজ হাসিয়া বলিল, "কিচ্ছু হয়নি ভাই, শশীদা আমায় ভয় দেখিয়েছিল।"

সুকু বলিল, "ভয় দেখিয়েছিল! কিসের ভয়?"

সরোজ কহিল, "তা না হয় নাই শুন্‌লে।"

সুকু কহিল, "কেন, আমি শুন্‌লে কি কিছু হানি হবে?"

সরোজ কহিল, "আর কারও হোক না হোক, তোমার হতে পারে।"

সুকু কহিল, "আমার কি ক্ষতি হবে! তুমি বল, আমি শুন্‌ব।"

সরোজ কহিল, "না সুকু, তোমার শুনে কাজ নেই।"

সুকু কহিল, "তুমি যদি শুন্‌তে পার ত আমি শুন্‌তে পাব না কেন? তোমার পায়ে পড়ি, বল, তুমি কেন ভয় পেয়েছিলে?"

সরোজ কহিল, "শশীদা বল্‌ছিল, যে অন্ধ, সে যদি মনে-মনে কারও কথা বেশী চিন্তা করে, তা হ'লে সে লোকটিও না কি অন্ধ হয়ে যেতে পারে। অন্ধতাও না কি কতকটা ছোঁয়াচে। কিন্তু ও-সব মিছে কথা, আমি ডাক্তার বাবুকে বেশ করে জিজ্ঞেস করে নিয়েছি যে অন্ধতা ছোঁয়াচেও নয়, আর অন্ধ যদি কাউকে চিন্তা

করে, তাহলে সে লোকটিও যে অন্ধ হয়ে যাবে, তারও কোন মানে নেই। অন্ততঃ ডাক্তারি শাস্ত্রে এমন ঘটনার একটাও উদাহরণ নেই।"

সুকুমারী বলিল, "কিন্তু যা কখনও ঘটেনি, তাও ত ঘট্‌তে পারে। যদি শশীদার কথাই সত্য হয়, তাহলে—"

সরোজ কহিল, "তাহলে কি সুকু?"

সুকুমারী বলিল, "তাহলে শশীদাদের আর আমাদের কাছে আস্‌তে দেওয়া উচিত নয় ত!"

সরোজ কহিল, "সব রোগেই টিকে দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। শশীদা অনেক দিন থেকে অন্ধ মানুষ ঘাঁট্‌ছেন; অন্ধ-রোগের টিকে ওঁর হয়ে গিয়েছে। এতদিন যখন ওঁর কিছু হয় নি, তখন ওঁর বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকতে পার।"

সুকুমারী বলিল, "কিন্তু—আর যাঁরা অন্ধ ইস্কুলে কাজ কর্‌ছেন?"

সরোজ কহিল, "তাঁরা ভগবানের উপর নির্ভর করে অনাথ-অন্ধদের উপকার কর্‌ছেন। তাঁদের কিছুই হবে না, বিশেষতঃ তাঁরা দু-চার ঘণ্টা মাত্র অন্ধদের সঙ্গে থাকেন!"

সুকুমারী বলিল, "কিন্তু যিনি প্রায় সারাদিনই আমাদের কাছে থাকেন?"

সরোজ কহিল, "কোন ভয় নেই, সুকু, অন্ধতা ছোঁয়াচে নয়, আমি ডাক্তার বাবুকে জিজ্ঞাসা করেছি। শশীদাও বলেছে, সেও কোন বইয়ে এ-রকম কোন রোগের কথা পড়েনি।"

সুকুমারী বলিল, "তাহলে তুমি এত ভয় পেয়েছিলে কেন?"

সরোজ কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া শেষে সুকুমারীকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "তোমার যেমন এমন একটা কথা আছে, যে কথা সকলকে বল্‌তে পার না, সেই রকম আমারও একটা কথা আছে।"

সুকুমারী বলিল, "আমার ত কোন কথাই তোমার অজানা নেই; আর কারও কাছে গোপন থাক্‌লেও তোমার কাছে ত আমি কিছুই গোপন করি নি, সরোদি, তবে তুমি কেন আমায় তোমার কথা বল্‌বে না?"

সরোজ বলিল, "না সুকু, না, সে কথা শুনে কাজ নেই। তোমার কথার মধ্যে শুধু আনন্দ, শুধু সুখ, আমার কথার মধ্যে কেবলই দুঃখ।"

কিন্তু সুকুমারী ছাড়িল না; তখন সরোজ বাধ্য হইয়া সব কথা তাহাকে শুনাইল। সুকুমারী শুনিতে শুনিতে বলিল, "কার্ত্তিকদাকে আমার বেশ মনে আছে। কিন্তু তিনি ত দু'-তিন মাসের বেশী এখানে ছিলেন না, এরই মধ্যে এত বড় একটা ঘটনা ঘটে গিয়েছিল যে তার জের এখনও এমন ভাবে চল্‌ছে! আশ্চর্য্য! আর সে কথা আমরা কেউ ঘুণাক্ষরেও টের পাই নি! মাও বোধ হয় এর কিছু জানেন নি?

সরোজ কহিল, "মা একা কেন? এমন যে ঘট্‌তে পারে, তা আমিই নিজের কাছে স্বীকার কর্‌তুম না। কিন্তু সংসারে অঘটনও বিস্তর ঘটে। জানিনে, তিনি আমার মধ্যে কি পেয়েছিলেন যে, আজ এমন করে আমায় পাগল করে দেবার চেষ্টা কর্‌ছেন। আমি তাঁরই ভয়ে অন্তরে-বাইরে আপনাকে গোপন করে রেখেছি! তবু দূর থেকে তিনি এক ভয়ানক আকর্ষণে আমায় টান্‌ছেন! সুকু, তুমি বুঝ্‌তে পার্‌বে না যে আজ প্রায় ছ' বৎসর ধরে আমি অন্তরে অন্তরে কি আকর্ষণই অনুভব করেছি! তবু প্রাণপণে সেই নীরব আকর্ষণের বিরুদ্ধেই আমি যুদ্ধ ক'রে এসেছি। কেউ এ কথা বুঝ্‌তেই পার্‌বে না, কেউ এ কথা হয়ত বিশ্বাসও কর্‌বে না। যেদিন তিনি আমার কাছ থেকে চলে যান, সে দিন বলে গিয়েছিলেন যে 'তুমি আমার পক্ষে যতই দুর্লভ হয়ে গেলে, ততই তুমি আমায় বেঁধে

ফেল্লে।' সে কথার মধ্যে কতখানি সত্য ছিল, কাল আমি তা স্পষ্ট অনুভব করেছি। সেই লোকটির কতখানি শক্তি আছে, তা কাল এক নিমেষে বুঝেছি। তিনি কাল এক নিমেষে আমার সমস্ত অস্তিত্বটাকে এমন জোরে নাড়া দিয়ে গেছেন যে সমস্ত রাত কেবলি আমার মনে হয়েছে, তিনি আমার অন্তরের ঠিক মাঝখানটিতে বসে আমার প্রাণটাকে দু' হাতের মধ্যে চেপে ধরে পিষ্‌ছেন। এত দূরে থেকেও যিনি এতখানি শক্তি প্রয়োগ কর্‌তে পারেন,—জানি না, কাছে থাক্‌লে তিনি আমায় কি কর্‌তেন! তাঁকে এখন আমার এত ভয় হয়েছে যে যদি পৃথিবীর অপর প্রান্তে যাই, তবুও তিনি বোধ হয় মনে কর্‌লেই আমায় সেখান থেকে টেনে আন্‌তে পার্‌বেন! এখন আমার একমাত্র ভয়, কি ক'রে নিজেকে আমি তাঁর কাছ থেকে রক্ষা কর্‌ব, কি ক'রে তাঁর কাছ থেকে দূরে থাক্‌ব!"

সুকুমারী বলিল, "ওঃ, তাই বুঝি কাল তুমি মাঝে-মাঝে 'ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও' বলে চেঁচাচ্ছিলে। আমরা কেউ বুঝ্‌তেই পারিনি যে কেন ও কথা তুমি বল্‌ছিলে, আর কাকে উদ্দেশ করেই বা বল্‌ছিলে। আচ্ছা, তাহ্‌লে তুমি তাঁকে একদিনের জন্যও ভুল্‌তে পার্‌ছ না কেন? যদি তাঁর কাছ থেকে পালাতেই চাও, তবে এ তোমার কিসের আকর্ষণ? তুমি তাঁকে চাও না, তবু তাঁর অন্ধ হবার আশঙ্কায় একেবারে এমন হয়ে গেলে কেন?"

সরোজ কহিল, "সুকু, যে ভালবাসা মানুষকে এমন অশান্ত করে তোলে, সে ভালবাসাই নয়, রাক্ষসের ক্ষুধা। যে বাসনার তাড়নায়, কামনায়, উত্তেজনায় মানুষ নিজেকে এমন করে ছিঁড়ে-খুঁড়ে নষ্ট কর্‌তে চায়, সে যে মরণোন্মুখ রোগীর দুষ্ট ক্ষুধা! এ ত ভালবাসা নয়, এ যে ডাকাতের অত্যাচার!"

সুকুমারী বলিল, "না দিদি, এ তোমার অন্যায় সন্দেহ। তোমার পায়ে পড়ি, তুমি কার্ত্তিক দাদার অত অপমান করো না। তিনি ত তোমার কাছে আর একদিনও আসেন নি, তিনি ত তোমার কাছে 'দাও, দাও' বলে ভিক্ষে চাইতে আসেন নি। তিনি নিজেকে অমিতব্যয়ীর মত বিলিয়ে দিচ্ছেন, এই তাঁর অপরাধ। তুমি বাইরে যতই ঔদাসীন্য দেখাও, তোমার কালকের ব্যাপারে স্পষ্ট বুঝ্‌তে পেরেছি যে তোমার অন্তরাত্মা জানে, কার্ত্তিকদা তোমায় তাঁর প্রাণ দিয়ে চাচ্ছেন,—তাই তুমি কাল এত ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলে।"

সরোজ বলিল, "সুকু, তোর পায়ে পড়ি, তুই ও কথা বলিস্‌নে। তার চেয়ে বল্‌ যে তার সব মিথ্যে! সে আমায় চায় না, সে আমায় ডাক্‌ছে না, সে আমার জন্য জগৎ-সংসার অন্ধকারে ডুবিয়ে দিচ্ছে না। সে কেবল একটা দুর্ব্বৃত্ত ইচ্ছার বশে আমাকে তার পায়ের কাছে টেনে নিয়ে গিয়ে লুটিয়ে দেবার চেষ্টায় আছে। বল্‌ যে সমস্তই তার দুষ্টুমি, কেবল আমাকে হারাবার জন্য এই ভয়ঙ্কর মায়াজাল বিস্তার করেছে। বল্‌, ওর কিছুই সত্য নয়।"

সুকুমারী কাঁদিয়া বলিল, "না—কখনই না! এত ভালবাসা মিথ্যে নয়, মায়া নয়, মোহ নয়। এ জীবন্ত স্নেহ, এ স্নেহ এ আকর্ষণ যে উপেক্ষা করে, সে প্রেমময় হরিকেও উপেক্ষা করে। এ স্নেহ যদি উপেক্ষা কর, তাহলে বল্‌ব, তুমি ভিতরে-বাইরে অন্ধ হয়েছ, তোমার ভিতরে-বাইরে অন্ধকার। আমি তা পার্‌ব না, সরোদি, আমি স্নেহকে বিশ্বাস করে নিঃসন্দেহে তাকে বুকে ধরে রাখ্‌ব।"

৭

শিবরামপুর এষ্টেটের ম্যানেজার মিষ্টার চ্যাটার্জ্জি ওরফে মণিশঙ্কর অধুনা ম্যানেজার সাহেব সেক্রেটারিয়েট টেবিলের সম্মুখে বসিয়া চিঠিপত্র লিখিতেছিল। নিকটেই আন্‌লায় তাহার র‍্যাংকেনের বাড়ির কোটটি ঝুলিতেছিল। মণিশঙ্কর পেণ্টালুন, সার্ট এবং তদুপরি ওয়েষ্ট কোট-সমন্বিত অবস্থায় বসিয়া কাজ করিতেছিল। এমন সময় বেহারা আসিয়া সেলাম করিয়া বলিল, "হুজুর, ঘোড়া তৈয়ার।" হুজুর লেখা হইতে মুখ না তুলিয়াই বলিল, "রাইডিং কোট ও জুতি লেয়াও, আউর দেখো, সর্ব্ববাবু আয়েহেঁ কেয়া নেহি।" বেয়ারা ম্যানেজার সাহেবের ঘোড়ায় চড়ার প্রকাণ্ড জুতা, চাবুক ও কোট সেই কক্ষের পার্শ্বস্থিত একটা ক্ষুদ্র কক্ষ হইতে আনিয়া ইজি চেয়ারের উপর রাখিয়া দিয়া বাহিরে চলিয়া গেল; এবং পরক্ষণেই ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "হুজুর, বাবু সাহেব আয়ে হেঁ।"

সর্ব্বানন্দ সেই কক্ষে প্রবেশ করিতেই ম্যানেজার সাহেব উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "Oh, Sorba Babu, you are so late, আমায় এখুনি যেতে হচ্ছে।"

সর্ব্বানন্দ কহিল, "বাঃ, কাল রাত্রে কথা হল খাওয়া-দাওয়ার পর গেলেই বেশ হবে, এর মধ্যেই মত বদ্‌লালে?"

মণি বলিল, "সাহেব-সুবোর কাণ্ড কিছুই বোঝ্‌বার জো নেই। এই দেখ, এখুনি একটা চিঠি পেলুম যে ম্যাজিষ্ট্রেট না কি স্বয়ং কাকেও কিছু না জানিয়ে আজ বিকেলে চারটের সময় কমবকৎপুরে আস্‌বে। নায়েব লিখ্‌ছে যে আগে থেকে তৈরী না থাক্‌লে গোলে পড়্‌তে হবে।"

সর্ব্বানন্দ কহিল, "তা হলে আর আমার গিয়ে কি হবে? ম্যাজিষ্ট্রেট যদি নিজে মিটিয়ে দিতে আসে, তাহলে ত ভালই হবে। তুমি বল্‌ছ,

প্রজাদের উপর কোন অত্যাচার হচ্ছে না, অথচ তাহা মিছিমিছি খাজনা বন্ধ করেছে। তোমার কথা যদি সত্য হয়, তাহলে ওত ব্যস্ত হবার ত কোন দরকার নেই।”

মণি কহিল, “Oh, silly! তুমি বুঝ্‌তে পার্‌ছ না যে আমাদের পক্ষ থেকে সমস্ত বুঝিয়ে দেবার জন্য কেউ না থাক্‌লে they will make a mess of everything. আমাদের একজনকে উপস্থিত থাক্‌তেই হবে। প্রজাদের সঙ্গে কতকগুলা rogues যোগ দিয়েছে, আর তারাই চেষ্টা করে প্রজাদের সরকারের কাছ থেকে agricultural loan নিইয়ে দিয়েছে। সেই জোরেই ত বেটারা লড়্‌ছে, না হলে কোন্ দিন সব শাসিত হয়ে যেত।”

সর্ব্বানন্দ কহিল, “তাহলে আজ আর আমি যাচ্ছি নে। যদি ম্যাজিষ্ট্রেট এসে মেটাতে না পারে, তা হ’লে নয় আর একদিন যাওয়া যাবে।”

মণি বলিল, “তা বেশ, আমি তাহলে চল্‌লুম। তুমি বাবুকে আমার কথা জানিয়ে বলো যে আমি সব ঠিক করে দেব।”

সর্ব্বানন্দ কহিল, “কিন্তু সাহেব, কোন রকম under-hand practice চালিয়ো না।”

মণি কহিল, “Oh, everything is fair in love and war.”

সর্ব্বানন্দ হাসিতে হাসিতে বাহির হইয়া গেল। মণিশঙ্করও মুহূর্ত্ত-মধ্যে চাবুক হস্তে বাহির হইয়া অশ্বারোহণে প্রস্থান করিল।

সর্ব্বানন্দ কার্ত্তিকের নিকট যাইতেছিল, এমন সময়ে কার্ত্তিকের শিশু-পুত্র দেবীপ্রসাদ তাহাকে দেখিতে পাইয়া তাহার ভৃত্যের কোল হইতে হাত বাড়াইয়া “জ্যাতা বাব, জ্যাতা বাব” বলিয়া চীৎকার আরম্ভ করিল। জ্যাঠা মহাশয় তখন বাধ্য হইয়া তাহাকে ক্রোড়ে লইয়া

বলিলেন, "দেবু, তোর বাবাকে আজ যে টেনে বাইরে আনিস্ নি?" দেবু সজোরে তাহার ক্ষুদ্র মস্তক আন্দোলিত করিয়া বলিল, "বাবা যাব না, বেলাতে যাব।"

—"চল্ তোর বাবাকেও ধরে আনি।"

—"না, বাবা কাঁদ্‌বে, আছ্‌বে না।"

– "তুমি ডাক্‌লে আস্‌বে, লক্ষ্মী বাবা আমার, চল।"

সর্ব্বানন্দ কার্ত্তিককে তাহার অন্ধকার কোটর হইতে বাহির করিবার কোন উপায় না পাইয়া অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিল, এমন সময় সহসা একদিন দেবীপ্রসাদকে কোলে লইয়া কার্ত্তিকের অন্ধকার কক্ষে প্রবেশ করিবামাত্র কার্ত্তিক ব্যস্ত হইয়া বলিয়াছিল, "ও কি, ও কি, ওকে এ ঘরে কেন? সর্ব্ব-দা, তোমার পায়ে পড়ি, ওকে এ ঘরে এনো না। আর-সব অত্যাচার সইব, কিন্তু ওকে এ ঘরে আন্‌লে সইতে পার্‌ব না।" কার্ত্তিক তাহার গৃহের সকলকেই বিশেষ করিয়া বারণ করিয়া দিয়াছিল যেন ঐ ঘরে দেবুকে না প্রবেশ করিতে দেওয়া হয়। সর্ব্বানন্দ কার্ত্তিককে বাহিরে আনিবার এই এক উপায় খুঁজিয়া পাইয়া আজকাল প্রত্যহই দেবুকে লইয়া সকালে-বৈকালে কার্ত্তিকের ঘরে প্রবেশ করিয়া তাহাকে ব্যস্ত করিয়া তোলে। পুত্র তাহার ঘরে প্রবেশ করিলেই সে তাড়াতাড়ি ঘরের সমস্ত দরজা-জানালা খুলিয়া দিয়া একটা কৃষ্ণবর্ণ কাঁচের eye-preserver চক্ষে দিয়া বসে।

সর্ব্বানন্দ দেবুকে লইয়া কার্ত্তিকের নিকট উপস্থিত হইল। কার্ত্তিক তাড়াতাড়ি গবাক্ষাদি উন্মুক্ত করিয়া দিয়া বলিল, "সব্ব-দা, কেমন জব্দ, দেবু কেমন তোমায় বেঁধেছে!"

সর্ব্বানন্দ কহিল, "দেবু ত' বাঁধেনি ভাই, বেঁধেছ তুমি। আর কেন কার্ত্তিক? আমায় ছেড়ে দাও ভাই। তুমি যদি একটু মনের

জোর কর, তাহলেই তোমার এ মানসিক রোগ, স্বকৃত উপসর্গ ঝরে পড়ে যাবে। দেবু, তোর বাবার হাত ধরে টেনে বাইরে নিয়ে চল্ ত বাবা।"

দেবু বিনাবাক্যব্যয়ে পিতার হাত ধরিয়া টানিতে আরম্ভ করিল। কার্ত্তিকও কাঁচপোকায় ধরা তেলাপোকার মত কাঁপিতে কাঁপিতে বাহিরে চলিল। সর্ব্বানন্দ কার্ত্তিকের অন্য হাত ধরিয়া তৎক্ষণাৎ তাহা পরিত্যাগ করিয়া বলিল, "না, আজ তোমায় নিজের শক্তিতে চল্‌তেই হবে, ছেলেকেও রাস্তার কাঁটা-খোঁচা খানাডোবা থেকে বাঁচাতে হবে। আমি তোমায় আজ একটুও সাহায্য করব না।" কার্ত্তিক কাতরভাবে বলিল, "পড়ে যাব, সব্ব-দা, ধর। দেবু, বাবা আমার, একটু আস্তে চল।" সর্ব্বানন্দ স্বয়ং দেবুর হাত ধরিয়া বেগে অগ্রসর হইতে লাগিল। কার্ত্তিক তখন অগত্যা পুত্রের হাত ছাড়িয়া বসিয়া পড়িল এবং চোখের ঠুলি খুলিয়া দূরে নিক্ষেপ করিয়া দুই হাতে মুখ ঢাকিল। দেবু কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিল, "জ্যাতা, বাবা কাঁদ্‌ছে।"

সর্ব্বানন্দ গম্ভীরভাবে কিছুক্ষণ কার্ত্তিকের দিকে চাহিয়া শেষে বলিল, "চোখ চেয়ে ফ্যালো কার্ত্তিক, মোহ কেটে যাক, স্বপ্ন দূর হোক। এমন সুন্দর সকাল, আর তুমি ইচ্ছে করে অন্ধ হয়ে থাকবে?"

কার্ত্তিকের সমস্ত দেহ ক্ষণে ক্ষণে কাঁপিয়া উঠিতেছিল, সে কাতরভাবে দুই হাত বাড়াইয়া দিয়া বলিল, "বাবা দেবু, তোর হাত দুটো দে, নইলে—"

সর্ব্বানন্দ কহিল, "নইলে কি?"

কার্ত্তিক কহিল, "অন্ধকারে ডুবে মরি যে!"

সর্ব্বানন্দ কহিল, "বাঁচ্‌তে চাও? আলো চাও?"

কার্ত্তিক কহিল, "বাঁচতে চাইনে? আলোর জন্য আমি যে প্রাণ ফেটে মরে যাচ্ছি।"

সর্ব্বানন্দ কহিল, "তবে আলোকে ভয় কর কেন?"

কার্ত্তিক কহিল, "তা জানিনে সব্ব-দা। এতদিন প্রাণপণে আঁধারকে চেপেছিলুম কিন্তু যেই অন্ধকার আমার উপর নেমে আস্‌তে আরম্ভ করেছে, অমনি বুঝতে পেরেছি কি অমূল্য বস্তু আমি হারাতে বসেছি। কিন্তু এখন আর উপায় নেই। অন্ধকারের আত্মা, দুর্লভের শক্তি আমায় অভিভূত করে ফেলেছে ; এখন যতই তার কাছ থেকে মুক্ত হবার চেষ্টা কর্‌ছি, ততই সে আমায় চেপে ধর্‌ছে। যা কখনও পাওয়া যায় না, যে মূর্খ তাকেই দুঃসাহসিকের মত প্রাণপণে চায়, তারই বোধ হয় এই দুর্দ্দশা হয়। যা অপ্রাপ্য, তাকেই চাইতুম, তাই সে অপ্রাপ্য নিজে না ধরা দিয়ে তার সঙ্গী চির-অন্ধকারকে আজ প্রেতের মত আমার উপর চাপিয়ে দিয়েছে। এখন আর উপায় নেই।"

সর্ব্বানন্দ কহিল, "কি যে অপ্রাপ্য, তা ত বুঝ্‌তে পার্‌ছিনে। সেই বহুদিন পূর্ব্বে যে অন্ধ-রমণীর অন্ধ নয়নের আঘাতে মূর্খ তুমি অভিভূত হয়েছিলে, সে আজও তোমার জন্য তেমনিভাবে বসে আছে। সে তোমায় বুঝতে না পেরে প্রত্যাখ্যান করেছিল, আজও সেই অনুতাপে দগ্ধ হচ্ছে। কাল ঠাকুরদার চিঠি পেয়েছি যে তোমার এই অবস্থার কথা শুনে সে মূর্চ্ছাপন্ন হয়েছিল। তবে সংসারে অপ্রাপ্য কি? সুখ বল, শান্তি বল, স্নেহ বল, ভালবাসা বল, ধর্ম্ম বল, সব ত ইচ্ছে করলেই পাওয়া যায়। ভগবান সমস্তই সুলভ করে রেখেছেন, কেবল একটু চেষ্টা করে তা নিতে হবে। তবে যদি কেউ ইচ্ছে করে কিছু না নিতে চায়, ইচ্ছে করে দরিদ্র হয়ে ভিখারী হয়ে থাক্‌তে চায়, তার দেহি-দেহি রব চিরকালই থাক্‌বে। ওঠো কার্ত্তিক, উঠে তুমি সবলে বল, আমি রাজরাজেশ্বরী মায়ের সন্তান, আমি ভিখারী নই, তাহলেই দেখ্‌বে, তোমার কিছুই অপ্রাপ্য নেই, সবই পূর্ণ ভাবে তোমার ভাণ্ডারে বিরাজ কর্‌ছে। ওঠো ভাই ওঠো, কথা শোনো।

কার্ত্তিক সর্ব্বানন্দর হাত ধরিয়া উঠিয়া চলিতে চলিতে বলিল, "জগতে কিছুই অপ্রাপ্য নয়, বল্‌ছ, কিন্তু এই দেখ, তোমায় এত কাছে পেয়েও কৈ, পাচ্ছি না ত! তোমার-আমার মধ্যে কোথা থেকে একটা মৃত্যুর মত অন্ধকারের ব্যবধান এসে দাঁড়িয়েছে। আমি তোমায় হারিয়ে দিয়ে, তোমায় টেনে এনেছি, তবু তোমায় পাচ্ছি না। যদি কোন দিন সেই অপ্রাপ্যকে এমনি করে টেনে আন্‌তে পারি, সেইদিনই বোধ হয় এই মায়ার ঘোর কেটে যাবে। যে দিন দেখ্‌ব যে সেই আকাঙ্ক্ষার ধন, না-পাওয়ার-বস্তু আমার দুয়ারে ভিখারী হয়ে এসে দাঁড়িয়েছে, সেই-দিন বোধ হয় আবার সুস্থ হব। নইলে আর আমার উপায় নেই।"

সর্ব্বানন্দ কহিল, "কিন্তু তুমি যে বিবাহিত! এখন কোন্ সাহসে আবার তাকে তোমার কাছে টেনে আন্‌তে চাইছ?"

কার্ত্তিক কহিল, "যে রোগী, যে canine appetiteএ ভুগ্‌ছে, তার খাদ্যাখাদ্য-বিচার থাকে কখনো?

সর্ব্বানন্দ কহিল, "তুমি ঠিক বল্‌ছ যে যদি সে তোমায় এসে বলে যে, তোমায় সে চায়, তাহলেই তোমার এ রোগ সেরে যাবে?"

—"ঠিক কি করে বলি? এখন ত' আর আমি আমার অধীন নই; এখন আমায় ভূতে পেয়েছে। তবে এই রোগের কারণ যখন সে-ই, তখন সে আমার কাছে এসে তোমার মত পরাজয় স্বীকার কর্‌লে হয়তো আবার আমি সুস্থ হতে পারি।"

—"তাহলে আমি প্রতিজ্ঞা কর্‌ছি যে তাকে যেমন করে পারি তোমার পায়ের কাছে এনে ফেলে দেব! কিন্তু তোমাকেও একটা প্রতিজ্ঞা কর্‌তে হবে যে অন্ধ বলে তাকে নিয়ে তুমি খেলা কর্‌তে পাবে না।"

—"খেলা! যে আমায় এমন করে খেলাচ্ছে তার সঙ্গে আমি

কোন্ সাহসে খেলা কর্ব! তার পক্ষে যা খেলা আমার পক্ষে যে তা মৃত্যুর লীলা!"

—"কথার মার-পেঁচ ছেড়ে সোজা কথায় বল যে তাকে যদি তোমার কাছে আনি, তুমি তাকে বিয়ে কর্বে?"

—"বিয়ে? কি সর্ব্বনাশ! যা একেবারে না-পাওয়ার ধন, তাকে একেবারে ধূলোমাটির মধ্যে টেনে আন্ব? তা পার্ব না। বিশেষ শৈলকে আমি অত কষ্ট দেব কি করে? সে যে তাহলে মরে যাবে। না সর্ব্ব-দা, শৈলই আমার পথের আলো, শৈলই আমার পাওয়ার ধন, আমি তাকে এক মুহূর্ত্তের জন্যও যদি সে কষ্ট দি, তাহলে আমায় মর্তে হবে। একেই ত আমায় নিয়ে সে আজীবন কষ্ট পাচ্ছে, তার উপর ও কষ্ট তাকে দিতে পার্ব না।"

—"এটুকু বুদ্ধি ত বেশ আছে! তাহলে তুমি তার স্বামী হয়ে সারা-জীবন অন্যের উপর মন ফেলে রেখে বসে আছ কেমন করে? এতে বুঝি তার খুব সুখ হচ্চে?"

—"তুমি জান না, সর্ব্ব-দা, তুমি আমায় কখনও বোঝনি, আজও বুঝ্তে পার্বে না। আমি কেন সেই অন্ধকে এমন করে প্রাণপণে চাই, জান? সে পাবার বস্তু নয় বলে;—যা পাবার বস্তু, তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ যা' তা' আমার ভাগ্যে লাভ হয়েছে, আমি শৈলকে পেয়েছি। কিন্তু চিরদিনই আমার অন্তরাত্মা যাকে না-পাওয়া যায়, যার অন্ধকারের মধ্যে সমস্তই দিশেহারা পথহারা হয়ে যায়, তাকেই চাচ্চে, তার দিকেই আমার অন্তরের মানুষটির ছুটে যাবার প্রচণ্ড চেষ্টা। এই চেষ্টার সঙ্গে শৈলর প্রতি স্নেহ বা কর্ত্তব্যের কখনও বিরোধ ঘট্তে পারে না। সংসারে থেকেও যেমন মহাপুরুষেরা সেই চির অপ্রাপ্য অনন্তশায়ী নারায়ণের দিকে তাঁদের আত্মাকে ফিরিয়ে রাখেন, আমারও যেন কতকটা সেই

রকম হয়েছে। তবে তাঁরা যাঁকে চান, তাতে কেউ দোষ ধরতে পারে না, তাতে কোন দোষ ঘটেও না, তাই সংসার তাঁদের নিয়ে খুসী থাকে, সুখে থাকে। কিন্তু আমার প্রার্থিত বস্তু সংসারের বাইরে, সমাজের বাইরে, ধর্ম্মের বাইরে, এমন কি মানুষেরও বাইরে, তাই সকলের সঙ্গেই আমার বিরোধ চলেছে।"

কার্ত্তিক চলিতে চলিতে হঠাৎ থামিয়া বলিল, "সব্ব-দা, দেবু কৈ? তার আওয়াজ যে অনেকক্ষণ থেকে পাচ্ছিনে!" সর্ব্বানন্দ এতক্ষণ অবাক হইয়া কার্ত্তিকের কথা শুনিতেছিল, হঠাৎ কার্ত্তিকের কথায় তাহার চৈতন্য হওয়ায় সে চাহিয়া দেখে, দেবু উদ্যানস্থ পুষ্করিণীতে নামিয়া গিয়া একেবারে এমন একটা জায়গায় দাঁড়াইয়াছে, যেখান হইতে নড়িলেই সে একেবারে গভীর জলে পড়িয়া যাইবে। তখন সে তাড়াতাড়ি কার্ত্তিকের হাত ছাড়িয়া সোপান-শ্রেণী অবতরণ করিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু সে পৌঁছিবার পূর্ব্বেই তাহার পদশব্দে চমকিত হইয়া দেবু যেমন ফিরিয়া চাহিবে, অমনি সশব্দে জলে পড়িয়া ডুবিয়া গেল। কার্ত্তিক সে শব্দে চীৎকার করিয়া যেমন নামিতে যাইবে অমনি সেও পতিত হইয়া গুরুতর আঘাত পাইল। কিন্তু সর্ব্বানন্দর সে দিকে চাহিবার অবসর ছিল না; সে তাড়াতাড়ি লাফাইয়া পড়িয়া বালককে জল হইতে তুলিল। বালক জল হইতে উঠিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিল। কার্ত্তিকের শরীরে নানাস্থান কাটিয়া রক্ত পড়িতেছিল; কিন্তু সেদিকে ভ্রূক্ষেপমাত্র না করিয়া সে হাত বাড়াইয়া বলিল, "আমার কোলে দাও, সর্ব্ব-দা, আমার কোলে দাও।"

সর্ব্বানন্দ তাহার কোলে বালককে দিয়া তাহার গাত্র-বস্ত্র সমস্তই খুলিয়া দিল। দু-এক ঢোক জল তাহার উদরস্থ হইয়াছিল বটে কিন্তু সে কোথাও কোনরূপ আঘাত প্রাপ্ত হয় নাই। সর্ব্বানন্দ কার্ত্তিকের

ক্রোড় হইতে বালককে পুনর্ব্বার গ্রহণ করিয়া বলিল, "তুমি আস্তে আস্তে এস, আমি একে ওর মার কাছে পাঠিয়ে দিয়ে ডাক্তারকে খবর পাঠাই।"

কার্ত্তিক বলিল, "আমার কোলে রাখ ওকে, আমায় নিয়ে যেতে দাও।"

সর্ব্বানন্দ সে কথা শুনিল না, সে বালককে লইয়া দ্রুতগতি অন্তঃপুরে চলিয়া গেল। কার্ত্তিকও একজন মালির হাত ধরিয়া আপনার কোটরে গিয়া প্রবেশ করিল।

এদিকে সন্ধ্যার পর ম্যানেজার সাহেব ফিরিয়া আসিয়া সংবাদ দিল যে, ম্যাজিষ্ট্রেট আসিয়াছিল এবং সমস্ত বন্দোবস্তই এমন চমৎকার হইয়াছিল যে সাহেব আর টুঁ শব্দটী না করিয়া তাঁবুতে ফিরিয়া গিয়াছে।

কিন্তু ম্যানেজারের অন্ধকার কার্য্যাবলীর সঠিক সংবাদ সর্ব্বানন্দ কোন গূঢ় উপায়ে অবগত হইয়া কার্ত্তিকের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, "কার্ত্তিক, এই বেলা সাবধান হও। তোমার এই ম্যানেজার কোন্ দিন তোমায় বিষম বিপদে ফেল্‌বে! আমার ভয় হচ্চে, কোন্ দিন তুমি কোন্ খুনী মকদ্দমার আসামী হয়ে না চালান যাও!"

কার্ত্তিক হাসিয়া বলিল, "ব্যাপার কি? মণির উপর চট্‌লে কেন?"

সর্ব্বানন্দ কহিল, "মণি আজ কি ক'রেছে জান?"

—"না। সে আজ শ্রান্ত, তাই রাতে আর আস্‌বে না। কালই সমস্ত জান্‌তে পারব।"

—"অতক্ষণ অপেক্ষা করার দরকার নেই, তুমি লোক পাঠিয়ে ওর কাছ থেকে সঠিক সংবাদ আনাও। আমি যা খবর পেয়েছি, তাতে ভয়ে আমার হাত-পা পেটের মধ্যে ঢোক্‌বার মত হয়েছে।"

—"তোমার চাল-কলা-খেকো সাহস, একটুতেই তাই ভয় লাগে।" জমিদারী রাখ্‌তে গেলে অনেক রকম দুঃসাহসের কাজ করতে হয়। জানই ত, None but the brave deserves the fair !"

—"অথবা তার চাইতে বল, None but the fool-hardy deserves the gaol ।"

—"কি হয়েছে, বল না ?"

—"কমবকৎপুরের প্রজাদের গোলমাল মিটুতে আজ ম্যাজিষ্ট্রেট স্বয়ং এসেছিল। তোমার ম্যানেজার নিজের লোকদের দিয়ে তাঁর পাল্কির ওপর ডাকাতি করায়, তারপর স্বয়ং অন্য লোকজন নিয়ে সেই কৃত্রিম ডাকাতদের তাড়িয়ে ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে এসে বলে যে প্রজারা ঐ পাল্কিতে ম্যানেজার আছে মনে করে তাকে খুন করতে আসে। ম্যাজিষ্ট্রেট্ ঘাগি লোক, সে বোধ হয় সব চালাকি বুঝে গিয়েছে! এখন দেখ, তোমার ম্যানেজারের অদৃষ্টে কি হয়!

সন্ধ্যায় কার্ত্তিকের সম্পূর্ণ অন্যরকম ভাব ;—সে উচ্চ হাস্য করিয়া বলিল, "ও একটি রত্ন। কালই ওর মাইনে বাড়িয়ে দেব ।"

সর্ব্বানন্দ কহিল, "কিন্তু কাল যদি ও জেলে যায় ?"

কার্ত্তিক কহিল, "ম্যানেজার হবার লোক জগতে আরও আছে ।"

সর্ব্বানন্দ কহিল, "অর্থাৎ ?"

কার্ত্তিক কহিল, "অর্থাৎ ও গেলে লোকের অভাব হবে না। ওর জন্য কান্নাকাটী করব, এত বড় গাধা আমি নই ।"

৮

সর্ব্বানন্দ শশিভূষণের পত্রে ব্যস্ত হইয়া কলিকাতায় উপস্থিত হইলে শশিভূষণ বলিল, "তুমি যদি কার্ত্তিককে নিয়ে এত ব্যস্ত হয়ে পড়, তা হলে তোমার এ সব কাজ চালাবে কে?"

সর্ব্বানন্দ হাসিয়া বলিল, "তোমার কর্ম্ম তুমি কর লোকে বলে করি আমি! তুমি যা করাচ্ছ, তাই আমি কর্‌ছি; এখন যদি বল যে কার্ত্তিককে ছেড়ে দাও ত আমায় তাই কর্‌তে হবে।"

শশী কহিল, "এ-সব না হয় আমার কাজ, কিন্তু সুকুকে শেখাবার ভারটী যে নিয়েছ, সেটা ত' আর আমার কাজ নয়!"

সর্ব্বানন্দ কহিল, "সেটা তোমার কাজেরই off-shoot।"

শশী কহিল, "এই এত-বড় একটা কর্ত্তব্যের সমস্ত দায়িত্ব আমারই ঘাড়ে! এর জন্য কি আর-কেউ দায়ী নয়? আমি যদি না থাকি, তা হলে কি আর-কেউ এ কাজের ভার নেবে না? এই হতভাগা-কেই চিরদিন এই কর্ত্তব্যের চাকার তলে পড়ে পেষণ-যন্ত্রণা সহ্য কর্‌তে হবে!"

শশী অসহিষ্ণু হইয়া উঠিয়া পাদচারণ করিতে লাগিল। সর্ব্বানন্দ কিছুক্ষণ নীরবে চিন্তা করিয়া শেষে দুঃখিতভাবে বলিল, "তা হলে কি কর্‌ব, বল! কার্ত্তিককে এখন ত্যাগ কর্‌লে সে যে কি করে বস্‌বে, তা কে বল্‌তে পারে?"

শশী কহিল, "সে কি কর্‌বে না কর্‌বে তাই কেবল ভাব্‌ছ, আমার বিষয় ত কৈ একটি বারও ভেবে দেখ্‌ছ না?"

সর্ব্বানন্দ কহিল, "তোমার বিষয় কি আবার ভাব্‌ব, ঠাকুরদা? তুমি যে সব চিন্তার বাইরে। তুমি নিজেকে যে চিরদিন পরের করে

রেখেছ। তোমার নিজের জন্য যদি নিজেকে এতটুকুও রাখ্‌তে, তা হলে তোমার জন্য জগৎশুদ্ধ লোক চিন্তা কর্‌ত। তোমার অস্তিত্বই পরের জন্যে! এই কার্ত্তিকের জন্যই তোমার কত চিন্তা, কত উৎকণ্ঠা দেখেছি। যারা তোমার কেউ নয়, তারাই তোমার সব; তাইত তোমার দেখাদেখি কত লোক পরার্থপর হয়ে উঠ্‌ছে। আজ যদি তুমি হঠাৎ নিজের জন্য চিন্তা সুরু কর, তা হলে যে সবই গোলমাল হয়ে যাবে!"

শশিভূষণ পদচারণ করিতে করিতে সহসা থামিয়া বলিল, "কি জানি সর্ব্ব, তোর সেই চিঠিটা পেয়ে পর্য্যন্ত আমার যেন সব ওলট পালট হয়ে যেতে সুরু করেছে। কার্ত্তিকের অবস্থা শুনে পর্য্যন্ত আমার মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে। এত বড় আত্মপরায়ণতা! আত্মহত্যা করে আপনাকে জাহির করা! এই দৃষ্টান্তের ফল যতই unhealthy হোক এর একটা বিকট সৌন্দর্য্য আছে, এতে মদের তীব্র নেশা আছে, এর অভিভূত করবার ক্ষমতা আছে। নইলে আমার মত লোকই বা কেন আজ ক'দিন নিজের চিন্তায় ব্যস্ত হবে? আমারই বা কেন বারবার মনে হবে যে, কি করলুম আমি! কি পেলুম আমি! নিজেকে ভুলে পরের কথা ভেবে ভেবে কি আমার লাভ হল! আজ ক'দিন কেবলি মনে হচ্চে যে, আমার অন্তরে বসে আমার ক্ষুধিত অন্তরাত্মাটা কেবলি কাঁদ্‌ছে। কি যে সে পায় নি, তা বুঝ্‌তে পার্‌ছি না, তবু এটা স্পষ্ট অনুভব হচ্চে যে সেই হতভাগা মনটা আমায় আবার ব্যস্ত কর্‌তে আরম্ভ করেছে। এখন কি দিয়ে তাকে থামাই? সে যাকে চায় বলে মনে হচ্ছে, তাকে ত আর মাথামুড় খুঁড়ে মর্‌লেও ফিরিয়ে আন্‌তে পার্‌ব না। এ কথাটা সে জানে, তবুও সে কাঁদ্‌বে! এখন এই অবুঝ প্রাণটাকে নিয়ে কি করি! যা অপ্রাপ্য, তারই জন্য এত কান্নাকাটী কেন? যা পেয়েছিস্‌, তাই নিয়ে খুসি থাক্‌ না বাপু!"

সর্ব্বানন্দ কহিল, "ঠাকুরদা, ঐ দেখ, তুমিও কার্ত্তিকের মত সুরু কর্‌লে। কার্ত্তিকও যে ঐ কথা বলে।"

শশী কহিল, "পাব না জেনেই মানুষ কাঁদে। পাব জান্‌লে হয় ত কাঁদ্‌ত না।"

সর্ব্বানন্দ কহিল, "মিথ্যে কথা! আকাশকুসুমও কেউ চায়? সোনার পাথরের বাটীর জন্য কান্নাকাটী কখনও কারও শুনেছ? মনে মনে মানুষ ঠিক জানে যে যা চাচ্ছি, তা পাওয়া গেলেও যেতে পারে, যা চাচ্ছি তা অপ্রাপ্য নয়, তাই মানুষ প্রার্থিত বস্তুর জন্য আদুরে ছেলের মত আছড়ে পড়ে কাঁদ্‌তে থাকে, যেন ভগবানের আর কোন কাজ নেই, সেই হতভাগাটার আব্দার রাখাই একমাত্র কাজ! ছি শশি-দা, তোমার মুখে আজ এই অনার্য্য দুষ্ট কথা শুনে আমার ভারি রাগ হচ্ছে। আমার মনে হয়, যে মানুষের চঞ্চল প্রকৃতি, যে অস্থির চিত্তের লোক, সে সুখেও অসুখী, দুঃখেও অসুখী। সে যদি ভাল অবস্থায় থাকে, তখন মন্দ অবস্থা পাবার জন্য সে মিছিমিছি কাঁদ্‌তে সুরু করে; সুখ যেন তার সইছে না, এইভাবে কাঁদ্‌তে সুরু করে। আর যে বাস্তবিক দুঃখী, তার ত কান্না-কাটির আর সীমা থাকে না। আসল কথা হচ্চে, মনের সাম্যাবস্থা, শান্তভাবটী হারালে মানুষের সব-চাইতে দুরবস্থা হয়। তোমায় আর কি বল্‌ব, ঠাকুর্দা, গীতার ভাষায় বলি, "ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্বল্যং তত্তোঽত্থিষ্ঠ।"

শশী তাহার দীর্ঘ দাড়ির মধ্যে হাত বুলাইতে বুলাইতে হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, "আমিও অর্জ্জুন নই, তুমিও শ্রীভগবান নও; অতএব এই মশা মারতে গীতা-গদাঘাতের প্রয়োজন নেই। আমার মত ক্ষুদ্র প্রাণীর সুখ-দুঃখে যখন কোন মহাকবির টিকি আন্দোলিত হয়ে ওঠবার সম্ভাবনা নেই এবং যখন কোন অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র আমার এই দাড়ির শরাঘাতের ভয়ে তাঁর রাষ্ট্রের জন্য ভীত হয়ে উঠ্‌বেন না, তখন তোমার বাক্যবাণ সংহার

কর। মন আমার যতই চঞ্চল হোক, তাতে এই দাড়ির একগাছি চুলও যখন নড়্‌তে দেব না, তখন ভয় কি ভাই? তবে মনের মধ্যে মাঝে মাঝে যদি বাষ্প জমে, তখন তাকে বের করে দেওয়া উচিত, তাই তোমার কাছে দু'কথা বল্‌লুম। ওতে রাগ কর্‌তে নেই।"

সর্ব্বানন্দ হা হা করিয়া হাসিয়া বলিল, "তোমার দাড়ির শত বর্ষ পরমায়ু হোক; ওর এক এক গাছিতে যেটুকু সদ্বুদ্ধি আছে, তাই যদি অপরে পায়, তা হলেও সে সারা জীবনের জন্য ধন্য হয়ে যায়।"

শশী কহিল, "তোদের আদরেই ত' এটা অযথা বেড়ে যাচ্ছে। যাক্! সুকু যে এদিকে তোর জন্য প্রায় ক্ষেপে যাবার মত হয়েছে। কি যে তার মাথায় ঢুকিয়ে দিয়েছিস্, সে ত বাড়িশুদ্ধ লোককে পাগল করে তুলেছে; এমন কি সে দিন দেখি, মা শুদ্ধ চোখ বুজে ওর কাছ থেকে তোর সেই সব ছুঁচের ডগায় হাত বুলোন শিখ্‌ছেন; মাঝে মাঝে খোঁচাখুঁচিও খাচ্ছেন, তবু তাঁর উৎসাহ বেড়েই চলেছে, ভয় হচ্ছে, আমিই বা কোন্ দিন চোখ বুজে ওঁদের সঙ্গে লেগে পড়ি।"

সর্ব্বানন্দ কহিল, "তবেই বোঝো ঠাকুর্দা, সৎকার্য্যের কি শক্তি! একবার পরের মঙ্গল করব এই সংকল্প কর্‌লেই অমনি কোথা থেকে এত আনন্দ এসে সেই সঙ্গে যোগ দেয় যে তখন আর কিছুতেই নিজেকে সামলানো যায় না। তখন মানুষ যতক্ষণ না নিজেকে নিঃশেষে তাতে সঁপে দিতে পারে, ততক্ষণ আর কিছুতেই থাম্‌তে পারে না। এই সুকুমারীর কথাটাই ভেবে দেখ। তোমার বা তোমার শাশুড়ীঠাকরুণের কথা ছেড়েই দাও, কারণ তোমরা ত চিরদিনই পরের জন্য আপনাদের সঁপে রেখেছ; কিন্তু এই অন্ধ বালিকা কোথা থেকে এতখানি উৎসাহ এতখানি সদিচ্ছা লাভ কর্‌লে?"

শশী কহিল, "কোথা থেকে যে সম্পূর্ণভাবে পেয়েছে তা বল্‌তে

পারিনে, তবে কতকটা যে তার বর্ত্তমান গুরুর কাছ থেকে পেয়েছে এটা নিঃসন্দেহ। সেজন্য আশা করি সুকুর গুরুটী তাঁর প্রিয়শিষ্যাকে অকালে ত্যাগ করবেন না। তার এই প্রাণপণ চেষ্টার ফলে যেন সে গুরুর হাত থেকে তার সাধনার চরম সার্থকতা লাভ করে।"

সর্ব্বানন্দ লজ্জিতভাবে বলিল, "সাধনায় সিদ্ধি!"

শশিভূষণ তার দাড়িতে একটা প্রচণ্ড টান দিয়া বলিল, "তবে রে চোরেরা! একটিকে কেড়ে নিলে সেই হতভাগা কার্ত্তিক এসে, আর একটিকে নেবে তুমি? আমি আজই দাড়ি মুড়িয়ে শিব সেজে গিয়ে ওদের বলছি, "বর নে রে পূর্ণ-মনস্কাম তোর"—অর্থাৎ আমায় নেরে! আহা, আমার গান গাইতে ইচ্ছে করছে। বাজা, ঐ টেবিলটাই বাজা।"

সর্ব্বানন্দ কহিল, "আহা হা, অমন কাজ করো না। দাড়িওয়ালাদের মুখ থেকে বেদ-উপনিষদ বাইবেল কোরাণ ছাড়া অন্য কিছু বেরুলে আবার এখুনি কোন্ এক দাড়িওয়ালা জীবের সরস মাংসের কথা মনে উদয় হয়ে খিদে জেগে উঠ্‌বে।"

শশিভূষণ আসন ছাড়িয়া লাফাইয়া উঠিয়া বলিল, "Three cheers for the happy suggestion. ক্রমাগত Carbo-hydrates খেয়ে খেয়ে আমার মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে; আয়, নিউ মার্কেট থেকে এক সের মটন্ আনা যাক্।"

সর্ব্বানন্দ কহিল, "তোমার অন্ত পাওয়া ভার! এই কান্নাকাটি হচ্ছিল, আবার দশ মিনিট না যেতেই স্ফূর্ত্তির ধূম লেগে গেল।"

শশী কহিল, "spirit damp করিস্ নে, আজ ভাল করে রাঁধ্‌তে হবে। পেটে কিছু ভাল মন্দ জিনিষ না পড়াতে এতদিন মরে ছিলুম। এখন বেশ বুঝ্‌তে পার্‌ছি যে কেন এত দিন কোন কাজে মন দিতে পারি নি! ওরে বেটা রোঘো, যা, হগ সাহেবের বাজার থেকে এখুনি

ছু সের মটন নিয়ে আয়। এই নে দুটো টাকা, আর যা-যা দরকার, সব গুছিয়ে আন্‌বি।"

সর্ব্বানন্দ কহিল, "আরে থাম থাম! একেবারে দমকা খরচ করে ফেলো না। দু'-দু'টো টাকা! কর্‌লে কি.? ওতে যে তোমার আট দিনের মাছ আর ষোল দিনের আলোর খরচ বন্ধ হয়ে যাবে।"

শশী কহিল, "তোকে আমার গিন্নিপনা থেকে বরখাস্ত কর্‌তে হবে। না খেতে দিয়ে তুই আমার ইহকাল-পরকাল সব খেলি। এবার থেকে তহবিল আমি রাখ্‌ব।"

সর্ব্বানন্দ কহিল, "তারপর দু'দিন যেতে না যেতেই ত' আমার কাছ থেকে ধার করা সুরু হবে! সে হবে না, দাও তোমার এই ক'দিনের হিসাব, আর তহবিল।"

সর্ব্বানন্দ শশিভূষণের হাত বাক্স খুলিবার জন্য চাবিগুলি যেখানে সাধারণতঃ থাকিত সেই স্থানে হাত দিল; কিন্তু পাইল না! বিরক্ত হইয়া বলিল, "চাবি গুলো কি কর্‌লে?" শশিভূষণ মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বলিল, "বাগবাজারে ফেলে এসেছি।" সর্ব্বানন্দ রাগিয়া বলিল, "তা হলে কি করে খুল্‌ব?" শশিভূষণ অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া বলিল, "খোলাই আছে বোধ হয়।"

সর্ব্বানন্দ বিস্মিত হইয়া দেখিল, হাত বাক্‌সের তালা ভাঙ্গা। সে তখন ক্রুদ্ধ হইয়া অনুসন্ধান করিয়া দেখিল, আর একটা আলমারির কলেরও ঐ দশা ঘটিয়াছে, তাছাড়া অনেকগুলি নূতন দৈনিক প্রয়োজনীয় দ্রব্য ক্রয় করিয়া আনা হইয়াছে। সে শশিভূষণকে বিশেষরূপেই চিনিত। এই সমস্ত দ্রব্য যে বাক্‌সে বা আলমারিতে আছে, তাহার তালা ভাঙ্গিবার ভয়ে যে এগুলি কেনা হইয়াছে, তাহা সে তৎক্ষণাৎ বুঝিয়া লইয়া বলিল, "চাবিগুলো কি কাউকে পাঠিয়ে আনিয়ে নেওয়া যায় না?"

শশিভূষণ ঘর হইতে পলাইয়া গেল। কারণ চাবিগুলা বাগবাজারের বাড়ীতেও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না; তবে শশিভূষণের খুব বিশ্বাস যে চাবি সেইখানেই আছে।

সর্ব্বানন্দ বিরক্ত হইয়া রঘুনাথকে ডাকিল; কিন্তু রঘুনাথ শশিভূষণের উপযুক্ত ভৃত্য। সে ঐ বাটির নিম্নতলে বাহিরের দিকে যে চাউলাদির দোকান ছিল, তাহাতে সরু চাউল ঘৃত ইত্যাদির বরাত দিয়া একটা লৌহ তারের টোকা হস্তে লইয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছিল। সর্ব্বানন্দ বিরক্ত হইয়া স্বয়ং সমস্ত দ্রব্য যথাস্থানে স্থাপন করিয়া ঘরটিকে পুনরায় মনুষ্যবাসযোগ্য করিয়া তুলিল।

৯

মণিশঙ্করের অত্যাচারের ফল এতদিনে ফলিতে চলিল। ম্যাজিষ্ট্রেট স্বয়ং সমস্ত তদন্ত করিয়া তাহাকে এবং তাহার সাঙ্গোপাঙ্গ সকলকে পিনাল কোডের অনেকগুলি ধারার চার্জ্জে অভিযুক্ত করিয়া চালান দেওয়াইলেন, এবং জমিদার কার্ত্তিকচন্দ্রের নাম ব্লাক বুকে তুলিয়া দিয়া তাহাকেও শাসাইলেন, ভবিষ্যতে যদি সে সাবধান না হয়, তাহা হইলে তাহার হাত হইতে এষ্টেটের ভার কাড়িয়া লওয়া হইবে। সর্ব্বানন্দ এ সংবাদ পাইয়া কার্ত্তিককে লিখিয়া পাঠাইল যে মণিশঙ্করকে বাঁচাইবার জন্য যেন চেষ্টার ত্রুটি না হয়; কারণ কার্ত্তিকের দোষেই সে এই বিপদে পড়িয়াছে। কার্ত্তিক সে পত্রের উত্তরে লিখিল যে একজন ম্যানেজার গেলে অন্য ম্যানেজার পাওয়া এই চাকুরী-লোলুপ বঙ্গদেশে খুবই সহজ, অতএব মণিশঙ্করের জন্য চিন্তা করিবার কোনই প্রয়োজন নাই; বিশেষতঃ উহারই জন্য যখন কার্ত্তিকের এত দুর্নাম, তখন যাহাতে মণির জেল হয় তাহাই করা কর্ত্তব্য; উপরন্তু ইহাতে ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট লুপ্ত প্রতিষ্ঠার পুনরুদ্ধারেরও বিশেষ সম্ভাবনা।

শৈলজা কার্ত্তিকের এই অভিমত শুনিয়া বলিল, "না, তা হবে না। তোমার জন্যই মণিদা যখন এই বিপদে পড়েছে, তখন তাঁকে বাঁচাবার চেষ্টা করতেই হবে। তুমি যদি না কর, বাবা বলেছেন; আমার তরফ থেকে তিনি তদ্বির করে তাকে বাঁচাবেন।"

কার্ত্তিক কহিল, "স্বামীকে ছেড়েও যে স্ত্রীর একটা অস্তিত্ব আছে, তুমি যে আমার ছায়ামাত্র নও, এটা তুমি বুঝতে পারছ দেখে আমার ভারী আনন্দ হচ্চে। আমি যদি অন্যায় করি, তুমি সাধ্যমত সে অন্যায়ের প্রতিবিধান করবে, এই হচ্চে কাজ। তাহলেই বুঝ্‌ব যে তুমি মানুষ, তুমি খেলার পুতুল নও।"

শৈলজা ব্যস্ত হইয়া বলিল, "অমন কথা বলো না। আমি তোমাকে লঙ্ঘন করে কোন কাজ করতে চাইনে, এত বড় দুর্ম্মতি যেন আমার না হয়। আমি যা করতে চাই, সে তোমার ভালর জন্যই। স্বামীকে ছাড়িয়ে কোন কাজ করলে স্ত্রীর পাপ হয়।"

কার্ত্তিক কহিল, "ভুল, মস্ত ভুল! স্বামীকে ভালবাসা ভক্তি করা ছাড়াও একটা বড় জিনিষ আছে, সেটা হচ্চে নিজের ধর্ম্ম, নিজের মনুষ্যত্ব। সেটা যেখানে নষ্ট হবার ভয় থাকে, সেখানে সমস্ত ত্যাগ করেও মানুষের তাকে রক্ষা করবার চেষ্টা করা উচিত। নইলে যিনি স্বামীর স্বামী, তাঁর কাছে গিয়ে কি জবাব দেবে?"

শৈলজা কহিল, "তুমি যদি এত বোঝো, তবে কেন নিজে এমন হয়ে যাচ্ছ?"

কার্ত্তিক কহিল, "আমি যে আর মানুষ নেই! নইলে দেখ্‌তে পাচ্ছ না যে, যারা আমাকে কত ভয় করত, তারাও এখন আমায় তৃণ জ্ঞান করে। আমি নিজের ইচ্ছেটাকে যতদিন আমার অধীনে রেখেছিলুম, ততদিন কেউ আমার সুমুখে মুখ তুলে কথা বলতে সাহস করত না।

এখন আমি সেই ইচ্ছার অধীন হয়ে সেই ইচ্ছার বিচিত্র মায়াজালে বদ্ধ হয়ে গুটিপোকার মত আবদ্ধ হয়ে পড়্‌ছি। ইচ্ছাটা এখন আর আমার নয়, আমিই আমার ইচ্ছার—আমার মায়ার—আমার মোহের। না হলে আমার এমন দুটো চোখ থাক্‌তে আমি অন্ধ হয়ে যাই? অন্ধ আমি নই, তা বেশ জানি, তবু দিনের আলো আমার সহ্য হয় না। ইচ্ছে ছিল, যে আর কিছু দেখ্‌ব না, অন্ধ হয়ে তোমাদের উপর প্রতিশোধ নেব। তোমরা জান্‌তে পার্‌তে না, কিন্তু প্রথম প্রথম আমি atropin দিয়ে চোখের দৃষ্টি কমাতে চেষ্টা কর্‌তুম আরও কত ওষুধ ব্যবহার কর্‌তুম্ তার ঠিক নেই; কিন্তু তখনও আমার আমিত্ব সম্পূর্ণ বজায় ছিল, তাই কিছুতেই এই চোখ দুটো এদের শক্তিকে ছাড়্‌তে চাইত না। কিন্তু আজ আর কোন ওষুধ ব্যবহার করিনে, এদের শক্তিও বোধ হয় যথেষ্টই আছে, তবু যেই বাইরের আলো লাগে, অমনি কে যেন এদের বন্ধ করে দেয়, শতচেষ্টাতেও আর খুল্‌তে পারি না। আমার একটা আত্মার পাশে কোথা থেকে আর একটা অন্ধকারের প্রেতাত্মা এসে যেন অচল অটল হয়ে বসে আছে। রাত হলেই সেটা যেন বাইরের অন্ধকারের সঙ্গে মিশে যায়। তখন আবার নিজের শক্তি ফিরে পাই বটে; কিন্তু সারাদিন একটা বিশ্রী রকম শক্তির অধীন থাকার দরুণই বোধ হয় রাত্রেও আমি ঠিক মানুষের মত হতে পারি না।"

কার্ত্তিকের কথা শুনিয়া শৈল অবাক হইয়া গেল। সে কিছুতেই ভাবিয়া পাইল না যে, এই মানুষটী কোন্ শক্তির দ্বারা আবিষ্ট হইয়া সমস্ত বুঝিয়া-সুঝিয়াও এমন হইয়া আছে। যে এমন পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আপনার চরিত্রের অন্তঃস্থল পর্য্যন্ত দেখিতে পাইতেছে, সে কেমন করিয়া ভূতাবিষ্টের ন্যায় কাজ করিতেছে, তাহা শৈল কেমন

করিয়া বুঝিবে? শৈল কাঁদিয়া-কাটিয়া দেখিয়াছে, মান অভিমান করিয়া দেখিয়াছে অনাহারে অনিদ্রায় কত দিন কত রাত্রি কাটাইয়া দেখিয়াছে, কিছুতেই কার্ত্তিকের দৈনিক জীবন-যাত্রার গতি এক চুলও পরিবর্ত্তিত করিতে পারে নাই। কতদিন প্রভাত হইতে সন্ধ্যা, সন্ধ্যা হইতে প্রভাত পর্য্যন্ত একাসনে কার্ত্তিকের নিকট বসিয়া কাটাইয়াছে, তবু কি করিলে যে সে আবার সুস্থ হইবে, আবার তাহার পূর্ব্বাবস্থা সে ফিরিয়া পাইবে, তাহা ঠিক করিতে পারে নাই। অথচ ইহা সে স্পষ্টই বুঝিয়াছে যে কার্ত্তিক স্নেহহীন নহে, কার্ত্তিক তাহার পত্নীর সম্পূর্ণ মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী; তাহার উপর পুত্র দেবীপ্রসাদের সামান্য কষ্টও সে সহ্য করিতে পারে না। এমনি-পাছে তাহার নিকটে আসিলে দেবীপ্রসাদের কোনরূপ অমঙ্গল হয়, সে জন্য পুত্রকে তাহার নিকট দিনের বেলায় সে আসিতেই দেয় না।

শৈলজা নিরুপায় হইয়া এই পুত্রের সাহায্যেই সময় সময় স্বামীকে তাহার অন্ধকার কোটর হইতে বাহিরে আনিতে পারে বটে, কিন্তু তাহাতে তাহার নিজের হৃদয়ে যে কতখানি অভিমানের ব্যথা জাগিয়া উঠে, তাহা সহজেই অনুমেয়। তথাপি পাছে অভিমান দেখাইলে স্বামী আরও কি করিয়া বসে, এই ভয়ে সে মান-অভিমান দেখানো ইদানীং একপ্রকার ত্যাগই করিয়াছে। আজ স্বামীর মুখে তাহার অবস্থার এতটা সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ শুনিয়া সে গদ্গদ কণ্ঠে বলিল, "যদি সর্ব্বস্ব ত্যাগ করেও তোমায় ফিরে পাই, তাও আমি করতে পারি। কিন্তু তুমি কি যে চাও, কি হলে যে তোমার ভাল হয়, তাই বুঝতে পারছি না।"

কার্ত্তিক কহিল, "যেদিন তুমি আমা-থেকে সম্পূর্ণ পৃথক হয়ে একটা পূরা মানুষ হয়ে দাঁড়াতে পারবে, সেই দিন বুঝবে।"

শৈল কহিল, "তুমি আমায় ত্যাগ কর্‌লে যদি সুস্থ হও, তবে তাই কর না কেন? আজ কতদিন থেকে সে কথা ত' বল্‌ছি।"

কার্ত্তিক কহিল, "কাকেও ত্যাগ কর্‌বার ক্ষমতা যদি আমার থাকৃত, তাহলে ত' আমি মানুষই থাকৃতুম। আমি যে এখন বদ্ধ জীব, শক্তি থাক্‌তে শক্তি-হীন! শৈল, তুমি আমায় বুঝ্‌তে পার্‌বে না, কেন মিছে কষ্ট পাচ্ছ? যাও, বেশীক্ষণ আমার কাছে থাক্‌লে হয়তো তুমিও আমার মত হয়ে যাবে। আমি বলেছি ত' তোমায় ত্যাগ করা আমার পক্ষে অসম্ভব। তবে যেদিন তুমি—উঃ, সে কি দিন! যেদিন সেও হার্‌বে, তুমিও হার্‌বে, আমি জিতব—"

শৈল কহিল, "কোন্ দিন? কোন্ দিনের কথা তুমি ভাব্‌ছ? বল, তোমার পায়ে পড়ি।"

শৈলজা কার্ত্তিকের হাত চাপিয়া ধরিয়া অনুভব করিল, কার্ত্তিকের শরীর সঘন কম্পিত হইতেছে। কার্ত্তিক শৈলর পাশে বসিয়া তাহাকে অতিশয় আবেগে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "ছিঁড়ে ফেল, ছিঁড়ে ফেল, শৈল, এ বন্ধন। তুমি মুক্ত হয়ে দাঁড়াও, আমিও মুক্ত হয়ে দাঁড়াই। পার্‌বে?" শৈলজা কাঁদিয়া ফেলিল। কার্ত্তিক তখন তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া একটী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল। শৈলজা চোখ মুছিতে মুছিতে বলিল, "এ জীবনে তোমার সঙ্গে আমার যে সম্বন্ধ তাতে তোমায় ত্যাগ করা আমার পক্ষে অসম্ভব, শুধু অসম্ভব নয়, সে চিন্তাও পাপ। তুমি আমায় ত্যাগ করে সুখী হতে চাও, হও, কিন্তু আমায় তোমার আশায় চিরদিনই বসে থাক্‌তে হবে।"

কার্ত্তিক কহিল, "দেখদিকি শৈল, কত বড় অন্যায়! কত বড় অত্যাচার! পুরুষ মানুষ যা ইচ্ছে কর্‌তে পার্‌বে, আর মেয়ে মানুষের বেলাতেই যত নিয়ম, যত বন্ধন, যত পাপের বিভীষিকা! কিন্তু তোমাকে

এই আমারই জন্য, এই আমাকে ভালবাস বলেই আমায় ত্যাগ করতে হবে। তোমাকে দিয়েই আমি তোমাদের জাতের উপর পুরুষমানুষের এই অন্যায় অবিচারের প্রতিশোধ নেব। তোমাকেই একদিন পূর্ণ শক্তিতে বলতে হবে যে, তুমি আমায় চাও না!"

শৈল তাড়াতাড়ি কার্ত্তিককে বুকের মধ্যে টানিয়া লইয়া বলিল, "সেদিন বোধ হয় আমি মরব।"

কার্ত্তিক তাহার মুখে চুম্বন করিয়া বলিল, "না, সেই দিনই তুমি তোমার যথার্থ জীবনকে খুঁজে পাবে, শৈল। সেই দিনই সামনাসামনি মুখোমুখি হয়ে দু'জনে দাঁড়াতে পারব।"

শৈলজা স্বামীর বুকে মুখ লুকাইয়া বলিল, "তোমায় এক মুহূর্ত্ত না দেখলে আমি থাকিতে পারিনে। সেই আমি তোমায় বলব, তোমায় চাইনে, তুমি চলে যাও? তুমি আমায় যে দিন গলা টিপে মারতে পারবে, সে দিনও ও কথা বলতে পারব কি না সন্দেহ।"

কার্ত্তিক কহিল, "তুমি স্বেচ্ছায় না পার, আমি তোমাকে দিয়ে তাই করাব। আমাকে ভালবাস বলেই তুমি আমায় বলবে যে, আমায় আর চাও না। আমি সেদিনের আশায় আমার জীবনকে ধরে রেখেছি। ভগবান কি দয়া করে এমন দিন দেবেন না?"

শৈল কহিল, "দয়া? তাকে তুমি দয়া বল? ছি ছি, যদি তিনি আমায় তোমাকে ত্যাগ করতে বাধ্য করান, তাহলে তাঁর দয়াময় নামে কলঙ্ক হবে।"

কার্ত্তিক শৈলজার বাহুপাশ হইতে আপনাকে মুক্ত করিয়া বলিল, "কবে তোমায় বোঝাতে পারব, শৈল? হায়, জানি না, সে কবে!"

শৈলজা আর থাকিতে পারিল না। টলিতে টলিতে বাহিরে চলিয়া গেল। কিন্তু সেদিন তাহার কোন কাজ হইল না। ভূতাবিষ্টের ন্যায়

সমস্ত দিন অনাহারে থাকিয়া, সন্ধ্যার পর গৃহ-দেবতার মন্দিরে প্রবেশ করিয়া একপাশে সে পড়িয়া রহিল। সকলেই তাহার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিল। কিন্তু সে আজ কাহারও কোন কথা শুনিল না; গৃহদেবতার মন্দিরে অনাহারেই শয়ন করিয়া রহিল। দেবু কাঁদিয়া কাঁদিয়া বহুবার মাতার কাছ হইতে ফিরিয়া গেল, দাসদাসীগণ সাধ্যসাধনা করিয়া শ্রান্ত হইয়া পড়িল; তবু শৈলজা যেন চেতনা-হীন!

তাই কি হবে, ঠাকুর? আমি কি ইচ্ছা করে আমার হৃৎপিণ্ড ছিঁড়ে ফেলে দেব? এ আজ আমি কি শুনলুম, ঠাকুর! এ আমায় কেন শোনালে, নারায়ণ! স্বামী যখন এত জোর করে বলছেন, তখন নিশ্চয়ই তা হবে। কিন্তু তা হলে কি হবে? কি নিয়ে আমি থাকব? আমি যে আর ভাবতেও পারিনে।

শৈলজার মনে হইল সমস্ত জগৎ ব্যাপিয়া একটা ভয়ানক হাহাকার উঠিতেছে। সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করিয়া বিশ্ব-সংসার উল্কা-বৃষ্টির মত দিকে দিকে ছুটিয়া ভাঙ্গিয়া যাইতেছে। তাহার কেবলি মনে হইতেছে যে, যদি স্নেহ মিথ্যা, ভালবাসা মিথ্যা, ভক্তি মিথ্যা, ধর্ম্ম মিথ্যা, মায়া মোহের বন্ধনমাত্র, তবে সত্য বস্তু কি? কি? সত্য বস্তু কি কেবল সর্ব্বপ্রকার বন্ধন হইতে মুক্ত, উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খল উদ্দেশ্যহীন ছুটাছুটি? না, না, কিছুতেই তা নয়।

শৈলজা প্রাণপণ-বলে মনে মনে বলিল, "না, তা নয়। ধর্ম্ম সত্য, বন্ধন সত্য, স্নেহ সত্য, ভক্তি সত্য, ভালবাসা সত্য—সত্য, সত্য, সত্য! এ সত্যের জগৎ, মিথ্যার নয়। মিথ্যা যা, তাই মোহ, তাই মায়া, তাই মানুষকে সত্য হতে চ্যুত করে, পাগল করে, চিরদিনের পথ হইতে দূরে লইয়া গিয়া অন্ধকারের মধ্যে আপনাকে নষ্ট করিয়া ফেলে। শৈলজা ভক্তিভরে গৃহ-দেবতাকে প্রণাম করিয়া পূজা-কক্ষ হইতে বাহির হইয়া

প্রথমে দেবুকে কোলে লইয়া অশ্রুপ্লাবিত বদনে বারবার তাহাকে চুম্বন করিল ; তারপর কিছু আহার করিয়া একজন দাসীকে সঙ্গে লইয়া শ্বশুর ন্যায়রত্ন মহাশয়ের নিকট চলিয়া গেল।

শিবচন্দ্র পুত্রবধূকে বসিতে বলিয়া প্রথমতঃ পৌত্রকে ক্রোড়ে লইয়া আশীর্ব্বাদ ও চুম্বন দান করিলেন। তার পর বলিলেন, "আজ সমস্ত দিন তোমায় দেখিনি কেন মা? দেবু বার বার আমায় খবর দিয়েছে যে তুমি আজ তাকে কোলে নাও নি। কি হয়েছে মা?"

বধূ তখন কন্যা যেমন স্নেহময় পিতার নিকট তাহার সমস্ত মর্ম্ম-কথা ব্যক্ত করে, সেইভাবে অসঙ্কোচে সমস্ত বর্ণনা করিয়া বলিল, "যদি এই হয় ত' কি হবে, বাবা?"

ন্যায়রত্ন সমস্ত শুনিয়া বলিলেন, "ভয় কি মা, তোমারই জয় হবে। কার্ত্তিক যখন সমস্তই বুঝতে পেরেছে, তখন মেঘ কেটে আসছে। আমি তোমায় বলছি, মা, তোমার কোন ভয় নেই। তোমার যদি পরাজয় হয়, তাহলে বুঝব, সংসার মিথ্যা, ধর্ম্ম মিথ্যা, সমস্ত বিশ্ব-রচনাই মিথ্যা।"

শ্বশুরের নিকট অভয় পাইয়া শৈলজা তখনই তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিয়া শ্বশুর-গৃহে তাহার যে দৈনিক কর্ম্ম আজ অসম্পন্ন ছিল, তাহা সম্পন্ন করিয়া শ্বশুরকে আহারাদি করাইয়া স্বগৃহে ফিরিয়া গেল।

১০

আজ মহালয়া। আজ এমন একটা দিন যে-দিন ঘরমুখো বাঙ্গালীর 'ঘর-ছাড়া' প্রাণগুলি গৃহের দিকে ফিরিবার জন্য ছটফট করে। যাহারা ছুটিতে পায় তাহারা ছোটে, যাহারা পায় না তাহারা অতি-কষ্টেই আপনাদের সংযত রাখে। আজ এমন একটা দিন যেদিন হিন্দুর ঘরে ঘরে মেশামেশি, জানাজানি, কানাকানি, আসা-আসির একটা সাড়া

পড়িয়া যায়। আজ যেন বাঙ্গালীর জীবনে মায়ের প্রবল আহ্বান জাগিয়া উঠিয়া পথে ঘাটে, বাসে প্রবাসে, কাজে-অকাজে, যে যেখানে আছে, সকলকে মনে পাড়াইয়া দেয় যে, আজ ফিরিবার দিন, আজ মায়ের কোল ছাড়া, মার কাছ ছাড়া অন্য কোথাও তাহাদের যথার্থ স্থান নাই। মা যেন হঠাৎ এক শারদ প্রভাতের নির্ম্মল আকাশের তলে শ্যামল বসনে শিশির-মুক্তাবলি-হারে সজ্জিত হইয়া তাঁহার নক্ষত্রলোক কৈলাস হইতে নামিয়া আসিয়া দাঁড়ান! অমনি চারিদিকে ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকি পড়িয়া যায়, 'ওরে, মা আসিয়াছেন রে, মা আসিয়াছেন।' আর সকল শক্রতা, সকল দ্বন্দ্ব, সকল হানাহানি টানাটানি থামিয়া গিয়া সমস্ত বঙ্গ সংসার হইতে মায়ের পূজার আয়োজনের জন্য স্নেহ, প্রেম, ভক্তির কোলাহল উত্থিত হয়!

আজ এমন একটা দিন, যেদিন সকলকেই মনে করিতে হইবে যে সে, এই বিশ্ব পরিবারের একান্নভুক্ত, সকলের আপনার জন। যাঁহারা বহুপূর্ব্বে চলিয়া গিয়াছেন, "অতীত কুলকোটীনাং সপ্তদ্বীপনিবাসিনাং সহ" আজ স্মরণ করিতে হইবে যে এই প্রকাণ্ড জগৎ একটি মহা আলয়—প্রকাণ্ড একান্নভুক্ত সংসার! ইহাকে সারা বৎসর ধরিয়া বহু কোটী অংশে বিভক্ত করিয়া রাখিয়াছি এবং এক একটী ক্ষুদ্রতম অংশকে আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ বলিয়া মনে ভাবিয়াছি। কিন্তু আজিকার এই শিশির-স্নাত শেফালির গন্ধ দিকে দিকে ছুটিয়া সমস্ত বঙ্গের হৃদয় একটী মাত্র গন্ধের বন্ধনে বাঁধিয়া ফেলিয়াছে! সমস্ত বঙ্গ দেশের শস্য-ক্ষেত্র আজ একই শোভায় একই গন্ধে সর্ব্বদিক ভরিয়া ফেলিয়া একই জননীর আগমন জানাইয়া দিতেছে। আজ একই জননীর উৎসুক স্তন হইতে ক্ষীরধারা পান করিতে হইবে; তাই আজ এত তাড়াতাড়ি, এত হুড়াহুড়ি! আজ তাই ভাগাভাগির আঁটাআঁটি ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া বিশ্বের প্রাঙ্গণে অনন্ত আকাশের

চন্দ্রাতপতলে সর্ব্বলোক মন্দিরে বিশ্ব-মাতার জন্য মঙ্গল ঘট স্থাপিত করিতে হইবে। মায়ের জন্য বিশ্ব-হৃদয়-সিংহাসন আম্র গঙ্গা জলে বিল্ব-দলে পূজিতে হইবে।

আজ মা স্বয়ং ডাকিতেছেন! কে বসিয়া থাকিবে? কে এমন মাতৃহারা সর্ব্বস্বহারা দিক্‌ভ্রান্ত পথিক আছে যে আজ মাকে ছাড়িয়া অন্য দিকে যাইবে? মাগো, তোমার গভীর উদাত্ত স্বরে ডাক, "কে আছিস্, ওরে মাতৃহারা স্নেহহারা কে আছিস্, ছুটে আয়! আজ আমি এসেছি, ওরে, আর ভয় নাই।" বল মা সেই বেদময়ী সমবেতকারিণী ঐক্য-সাধিনী বাণী, যাহা কোন্ সুদূর অতীতে সরস্বতী দৃষদ্বতী-তীরে প্রথম ধ্বনিত হইয়া উঠিয়া কতযুগের কত যুগান্তের মধ্য দিয়া আজও আমাদের কর্ণে এক হইবার মহামন্ত্র রূপে ধ্বনিত হইতেছে! বল সেই কথা, "সংগচ্ছধ্বং সংবদধ্বং সং বো মনাংসি জানতাং"—মিলিত হও এক কথা বল, তোমাদের চিত্তও এক হউক!' মনে বাক্যে কার্য্যে এক হও, মিলিত হও, এক মায়ের পুত্র বলিয়া আপনাকে স্বীকার কর। যাক্, সেই বাণী দিকে দিকে ছুটিয়া যাক্। সমস্ত জগতের হৃদয়ে সেই বাণী ধ্বনিত হউক—সকলে জাগিয়া উঠিয়া বলুক, "আমরা এক মায়ের ছেলে, আমরা পর নহি, আমরা নিতান্তই আপনার জন,—আমরা এক মায়ের এক মহা-আলয়ে একই স্তন্য-দুগ্ধে লালিত পালিত জীবিত রহিয়াছি। আমরা বহু তবু একের, আমরা বিচিত্র তবু একের, আমরা বিচ্ছিন্ন তবু একের সত্তায় সত্তাবান, একই কোলে আশ্রিত!'

শশিভূষণ তাহার পিতার নিকট চলিয়া গিয়াছে। অন্ধ বিদ্যালয়ের ছাত্রগণও ছুটি পাইয়াছে। সর্ব্বানন্দ আজ সকালে জাগিয়া ভাবিল, সে কোথায় যাইবে? তাহার যাইবার মত স্থান কোথায়? মন তাহার যাই-যাই করিতেছে, অথচ যাইবার মত, আজিকার মত দিনে আশ্রয়

পাইবার মত স্থান তাহার নাই! সর্ব্বানন্দ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া শয্যার উপর পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিল। এমন সময় রঘুনাথ আসিয়া তাহার শয্যার উপর কয়েক খানি পত্র ফেলিয়া দিয়া বলিল, "ছোট বাবু, আজ কি রান্না হবে,—বামুন ঠাকুর জিজ্ঞেস কর্‌ছেন।" সর্ব্বানন্দ উঠিয়া বসিয়া একখানা চিঠি খুলিতে খুলিতে বলিল, "আজ আমি এখানে খাব না, বাগবাজারে যাব, তোমরা যা হয় রেঁধে নাও গে।" রঘুনাথ হাসিয়া বলিল, "আজ আমারও নেমতন্ন আছে, বামুন ঠাকুরও কালীঘাটে যাবেন।"

সর্ব্বানন্দ কোন উত্তর দিল না দেখিয়া রঘুনাথ চলিয়া গেল। কিন্তু সর্ব্বানন্দ পত্র পাঠ করিতে করিতে অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল, কারণ কার্ত্তিক লিখিয়াছে যে আজ তিন দিন হইতে দেবুর সর্দ্দি কাশী হইয়া প্রবল জ্বর দেখা দিয়াছে। ডাক্তার বলিতেছে যে উহার ভয়ানক নিউমোনিয়া হইয়াছে, কি যে হইবে কে জানে!

সর্ব্বানন্দ তৎক্ষণাৎ শয্যা ত্যাগ করিয়া সার্ট গায়ে দিয়া বাহির হইয়া পড়িল; এবং পোষ্ট অফিসে গিয়া জরুরি টেলিগ্রামে দেবুর বিষয় প্রশ্ন করিয়া পাঠাইল; এবং কলিকাতা হইতে ডাক্তার লইয়া যাইবে কি না তাহাও টেলিগ্রামের উত্তরে জানাইতে লিখিল।

পোষ্ট অফিস হইতে গৃহে ফিরিয়া সর্ব্বানন্দ রঘুকে বলিল, "আমি এখনি বাগবাজারে যাচ্ছি, তুমি তোমার নেমতন্ন সার্‌তে বারোটার পর যাবে। আমার নামে কোন টেলিগ্রাম এলে যেমন করে পার তা নিয়ে রাখ্‌বে, আমি বারোটার মধ্যে নিশ্চয়ই ফির্‌ব।"

রাস্তায় চলিতে চলিতে সর্ব্বানন্দ মনে মনে বলিল, আগমনীর বাঁশী বাজিতে না বাজিতে এ কি বাঁশী বাজাইয়া তুলিলি, মা? আমি কোথায় যাইব, কোথায় যাইব, ইহাই ভাবিতেছিলাম বলিয়া কি এইভাবে আমায়

ডাকিতে হয় ? দেবুকে যদি বাঁচাইতে না পারি, তাহা হইলে কাৰ্ত্তিকের সুস্থ হওয়ার যে আর কোন আশাই থাকিবে না !

সৰ্ব্বানন্দ ব্যস্তভাবে রান্না ঘরের দিকে যাইবামাত্র সরোজ জিজ্ঞাসা করিল, "আজ যে এত তাড়া সৰ্ব্ব-দা ? বেলা দশটা না বাজ্‌তেই খাবার তাগিদ কর্‌ছ ! মার আর সুকুর হুকুমে তোমার জন্য আজ যে কত রকম আহাৰ্য্যের ব্যবস্থা হচ্ছে, তার আর ঠিক নেই। তোমার যদি অন্য কোন কাজ থাকে ত আজ আর তা হচ্ছে না, সেটা জেনে রেখো।"

সৰ্ব্বানন্দ কহিল, "তা হবে না, সরোজ, আমি গঙ্গাস্নান কর্‌তে যাচ্ছি। ফিরে এলে যা হয় তাই চাট্টি বেড়ে দিয়ো। আমায় আবার বারোটার আগেই বাসায় পৌঁছুতে হবে।"

সরোজ কহিল, "ব্যাপার কি ? বাসায় আজ কিসের আয়োজন করেছ ?"

সৰ্ব্বানন্দ কহিল, "কোন আয়োজন নেই, আমার একটা বিশেষ কাজ আছে।"

সরোজ কহিল, "তা হবে না, সৰ্ব্ব-দা ; আজ তোমায় ভাল করেনা খাইয়ে আমরা ছাড়্‌তে পার্‌ব না। আমাদের সমস্ত আয়োজন নষ্ট করো না।"

সৰ্ব্বানন্দ কহিল, "সরোজ, আমার বড্ড দরকার ; আজ আমায় মাপ কর, ভাই। আজ কিছুতেই দেরী কর্‌তে পার্‌ব না।"

ইতিমধ্যে সুকুমারী আসিয়া পড়িয়া বলিল, "বাঃ, তা কেমন করে হবে ? কাল আপনি নিজে যেচে নেমতন্ন নিয়ে গেলেন, মস্ত একটা খাবারের ফৰ্দ্দ দিয়ে গেলেন, আর আজ আপনার মত ঘুরে গেল ! এ হতেই পরে না, আমি মাকে বলে দিচ্ছি।"

সৰ্ব্বানন্দ ব্যস্ত হইয়া বলিল, "ও সুকু, শোনো, শোনো।" আর

শোনো! সুকুমারী চিন্ময়ীর নিকট চলিয়া গেল। সরোজ একটু চিন্তিতভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "কি হয়েছে সর্ব্ব-দাদা, আমায় বল্‌বে না?"

সর্ব্বানন্দ বলিল, "তোমাদের মিছিমিছি ব্যস্ত করে কি হবে?"

সরোজ কহিল, "না বল্‌লে আরও বেশী ব্যস্ত হব, তা কি বুঝ্‌তে পার্‌ছ না?"

সর্ব্বানন্দ বলিল, "দেবুর নিউমোনিয়া হয়েছে, হয় তো আজই তিনটের ট্রেনে আমায় ডাক্তার সঙ্গে করে শিবরামপুর যেতে হবে। আজ চিঠি পেয়েই টেলিগ্রাম করেছি, দেখি, সে এখন কি লেখে!"

সরোজ কহিল "টেলিগ্রামের কি উত্তর আস্‌বে, আমরা তা কি করে জান্‌তে পার্‌ব?"

সর্ব্বানন্দ কহিল, "ঐ দেখ, ঐ ভয়ে আমি তোমাকে কিছু বল্‌তে চাচ্ছিলুম না।"

সরোজ কহিল, "এই খবর আমার কাছে লুকিয়ে রাখ্‌তে?"

সর্ব্বানন্দ কহিল, "তোমাকেই আমার বিশেষ ভয়। যাক্‌, ব্যস্ত হয়ো না, ব্যস্ত হয়ে ত কোন লাভ নেই।"

আজ প্রভাতে উঠিয়া সরোজ মনের মধ্যে যতখানি উৎসাহ অনুভব করিয়াছিল, এক নিমেষে সে সমস্তই চলিয়া গেল। দেবু যে কার্ত্তিকের পক্ষে কতখানি, তাহা সে বহুবার সর্ব্বানন্দের মুখে শুনিয়াছে, সেই দেবীপ্রসাদের এমন অসুখ! না জানি, কার্ত্তিক তাহার অন্ধকার ঘরের মধ্যে কি করিতেছে! যে দেবীপ্রসাদের জন্য সরোজও এই দূর হইতে তীব্র আকর্ষণ অনুভব করে, না জানি, সেই পুত্রের জন্য কার্ত্তিকের অন্ধকার কারাগারের প্রাচীর আরও কত-না কঠিনতর, দুর্ভেদ্যতর হইয়া উঠিয়াছে! সরোজের মুখ উৎকণ্ঠায়, আশঙ্কায় বারবার বর্ণ পরিবর্ত্তন করিতে লাগিল। সর্ব্বানন্দ তাহার মানসিক অবস্থা অনুভব

করিয়া বলিল, "সরোজ, ব্যস্ত হয়ো না ভাই, ভগবানের ইচ্ছার উপর কারও হাত নেই। তিনি যা চাইবেন, তা হবেই। তাড়াতাড়ি আমায় যা হয় একটা ভাতে-ভাত দিয়ে বিদেয় করে দিয়ো। আমি স্নান করে আসি।"

সর্ব্বানন্দ স্নান করিতে চলিয়া গেল। আর সরোজ সেই রান্নাঘরের চৌকাঠের উপর বসিয়া পড়িয়াই ভাবিতে লাগিল। সুকুমারী ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "কি হয়েছে, সরো-দি? তুমি অমন করে বসে পড়লে কেন?" সরোজ কোন উত্তর দিল না। ভিতর হইতে রাঁধুনী ঠাকুরাণী বলিলেন, "সরোজ দি, তাহলে ভাতে-ভাত চড়িয়ে দি?"

সুকুমারী ব্যস্ত হইয়া বলিল, "কেন? কেন? কি হয়েছে?"

রাঁধুনী বলিলেন, "সর্ব্ববাবু বলে গেলেন যে ওঁকে এখুনি যেতে হবে, দেবু না কে, তার ভারী অসুখ করেছে। তাই শুনে সরোজ দি ভয়ে অমনি কাঁটা হয়ে বসে পড়েছে।"

সুকুমারী বুঝিতে না পারিয়া বলিল, "কি হয়েছে? কার অসুখ করেছে?"

সরোজ এইবার উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "বামুন দি, তুমি ভাতে-ভাত চড়িয়ে দাও। এস সুকু, আমরা উপরে যাই। দেবুর নিউমোনিয়া হয়েছে, এখান থেকে ডাক্তার নিয়ে সর্ব্বদাদাকে আজই যেতে হবে।"

সুকুমারী এবার সমস্তই বুঝিল। তাহারও মনে আজ অনেকখানি আনন্দ সঞ্চিত হইয়াছিল। সেও রাত্রি থাকিতে উঠিয়া সর্ব্বানন্দের জন্য বহু আয়োজন করিতেছিল। কিন্তু হায়! সমস্তই বৃথা হইল। সর্ব্বানন্দকে আজ সে কিছুতেই ধরিয়া রাখিতে পারিবে না।

সর্ব্বানন্দ আহারাদি সারিয়া গমনোদ্যত হইলে, সরোজ সঙ্কুচিতভাবে বলিল, "সর্ব্ব-দা, আমি কি কোন দরকারে লাগ্‌তে পারি না?"

সর্ব্বানন্দ বলিল, "তুমি আর এ বিষয়ে কি করতে পার?"

সরোজ কহিল, "দয়া করে ভেবে দেখ সর্ব্ব-দা হয়তো আমার দ্বারাও কোন কাজ হতে পারে।"

সর্ব্বানন্দ তাহার কাতরতা দেখিয়া মনে মনে কি একটা কথা চিন্তা করিয়া বলিল, "হয়তো এ বিষয়ে তুমি অনেকখানি সাহায্যই করতে পারতে, কিন্তু আমি তা নিতে পারছি না।"

সরোজ কহিল, "কেন?"

সর্ব্বানন্দ কহিল, "কেন—তা কি তুমি বুঝতে পারছ না?"

সরোজ কহিল, "আমি বুঝতে চাইনে, আর বুঝবও না, সর্ব্ব-দা—"

সর্ব্বানন্দ বাধা দিয়া বলিল, "ছি সরোজ, ছেলেমানুষী করো না। মা কি মনে করবেন? শশী ঠাকুরদা কি মনে করবে? দশজনে কি ভাববে? তোমার সেখানে যাওয়া হতেই পারে না। তবে—"

সরোজ কহিল, "কি তবে? বল, কি বলছিলে?"

সর্ব্বানন্দ কহিল, "জানিনে হয় তো যদি তোমাকে ছাড়া আর কোন উপায় না পাই, তখন ভগবান হয়তো আমাকে তোমার কাছেও সাহায্য নিতে বাধ্য করতে পারেন। তখন তোমার কাছে আসব, আজ তোমাকে আমার কোন প্রয়োজন নেই।"

সরোজ কহিল, "তোমার না থাকতে পারে কিন্তু আমার আছে, আমি আর থাকতে পারছি না। পলে পলে দণ্ডে দণ্ডে আমি এ মরণের দিকেই এগিয়ে চলেছি। তুমি কি একটুও দয়া করবে না? এক দিনের জন্য, এক মুহূর্ত্তের জন্য কর্ত্তব্যের দিক্ থেকে সাধারণের মতামতের দিক্ থেকে ফিরে মানুষের অন্তরের দিকে করুণ দৃষ্টিতে চাও,—সহানুভূতি নিয়ে কাতর প্রাণীদের প্রাণের মধ্যে গিয়ে দাঁড়াও, সর্ব্ব-দা, তা হলেই তোমার মনে দয়া হবে।"

সুকুমারী নিকটেই দাঁড়াইয়াছিল। সে সরোজের হাত ধরিয়া কাতর-ভাবে বলিল, "সরো-দি, তুমি ত এমন অবুঝ ছিলে না! ছি, এ-সব কথা কেন বলছ? যাও, আপনার কাজে যাও! আর দাঁড়িয়ো না।"

সরোজ কহিল, "না, না, দাঁড়াও। একটা কথা শোনো, যাবার আগে, কি টেলিগ্রাম আসে, সেটা বলে যেও।"

সর্ব্বানন্দ কহিল, "আমি নিজে আসতে পারব না, সরোজ, কেন না বড্ড দেরী পড়ে যাবে, তাহলে। তবে বলে যাচ্ছি, রোজ চিঠি দেব, মাকে দিয়ে পড়িয়ে নিও। আর আজ টেলিগ্রামে কি খবর আসে, রঘু এসে বলে যাবে।"

সর্ব্বানন্দ চলিয়া গেলে সুকুমারী সরোজকে বলিল, "ছি সরো-দি, তুমি এমন হয়ে যাচ্ছ কেন?"

সরোজ কহিল, "তুই কি জানবি, সুকু, ঐ দেবু যে তাঁর কতখানি, তা যে তুই কিছুই জানিস্ নে। দেবু যদি না বাঁচে, তা হলে কি যে হবে, তা মনে করতে আমার সমস্ত দেহ-মন অসাড় হয়ে যাচ্ছে! আজ মহালয়ার দিনে এ কি কথা শুন্লুম, সুকু। আজকের আগমনীর বাঁশীতে আমি যেন বিজয়ার বিদায়ের কাতর কান্না শুন্তে পাচ্ছি! মা মঙ্গলময়ী, মঙ্গল ক'র মা।"

সরোজ কাঁদিতে কাঁদিতে উদ্দেশে জগৎজননীর পদে প্রণাম করিল।

১১

শিবরামপুরের জমিদার-গৃহে প্রতি বৎসর যেরূপ ধূমধামে পূজা হইয়া থাকে, এবার তদপেক্ষা অধিকতর আয়োজন হইয়াছে। সমস্ত হিতৈষী ব্যক্তির, সমস্ত আমলা-ফয়লার অনুরোধ-উপরোধ উপেক্ষা করিয়া জমিদার বাবু এ বৎসর পূজার উপচার বহুল পরিমাণে বাড়াইয়া তুলিয়াছেন। নৃত্য-

গীতের জন্য দুই দল যাত্রা, চার দল কবি, ছয় দল বাই এমন কি একদল থিয়েটার-পার্টিকে আনাইয়া স্থানে স্থানে আসর করিয়া বোধনের দিন হইতে আমোদ চালাইবার ব্যবস্থা হইয়াছে। কেহ স্বেচ্ছায়, কেহ-বা অনিচ্ছায় এই সমস্ত আয়োজনের তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত হইয়াছে। কার্ত্তিক কাহারও কথা শুনিতেছে না। আজ কয়দিন হইতে তাহার সম্মুখে লোকের তিষ্ঠানো দায় হইয়া উঠিয়াছে। অন্ধকার ঘর হইতে কেবল আজ্ঞাই প্রচারিত হইতেছে, সেখানে উপদেশ বা মন্ত্রণা দিবার জন্য কাহারও যাইবার সাধ্য নাই। সর্ব্বানন্দ এই সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া বকিয়া ঝকিয়া সারা হইয়াছে, তবু কার্ত্তিক অচল, অটল।

দেবু যখন রোগ-যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করিতেছে, তখন বহির্ব্বাটীতে ও অন্তঃপুরে, সর্ব্বত্রই একটা বিরাট কোলাহল। সর্ব্বোপরি চারিটী যে তোরণ রচিত হইয়াছে, তাহার উপর হইতে ক্রমাগত আগমনীর বাঁশী বাজিতেছে। শৈলজাও যেন এ কয়দিনে পাগলের মত হইয়া গিয়াছে। তাহার ইচ্ছা, তাহার পুত্রকে লইয়া এই বীভৎস কোলাহল হইতে সে দূরে পলাইয়া যায়। কিন্তু স্বামীর মূর্ত্তি দেখিয়া সে ইচ্ছা সে প্রকাশ করিয়া বলিতে পারিতেছে না। সর্ব্বানন্দ কাতর হইয়া সপ্তমীর প্রভাতে কার্ত্তিকের ঘরে প্রবেশ করিয়া বলিল, "পুত্র-হত্যা কর্‌বার যদি ইচ্ছা না থাকে, তা হলে এখনই এ-সব থামিয়ে দাও। দেবু কাল সারারাত ঘুমোতে পারে নি।"

কার্ত্তিক কহিল, "দেবু ঘুমোতে পারে নি,—তাতে শিবরামপুরের জমিদারের কি এসে যায়? তার মস্ত নাম-ডাক, ভারী সম্ভ্রম, সে-সব রাখ্‌তে হবে ত! আমার ছেলে মর্‌ছে, সে কথা সে শুন্‌বে কেন?"

সর্ব্বানন্দ কহিল, "তোমার পায়ে পড়ি কার্ত্তিক, তুমি একটু স্থির হও।"

কার্ত্তিক কহিল, "আমার চাইতে স্থির কে? আমার যেটুকু প্রাণ ছিল, তাও মা দুর্গা এসে কেড়ে নিচ্ছেন। তাই ত' ভাল করে তাঁর পূজার বন্দোবস্ত করেছি। মা এসেছেন, লোকে পাঁঠা-মহিষ বলি দিচ্ছে। আমি শিবরামপুরের জমিদার, আমার ত একটা বড় রকম কিছু করার দরকার, আমি আমার ছেলে বলি দেব। পারবে কেউ আমার সঙ্গে?"

সর্ব্বানন্দ অনেক বুঝাইল। কার্ত্তিক একটা বিকট হাস্যে তাহার সমস্ত যুক্তি-তর্ক উড়াইয়া দিয়া বলিল, "চারি দিক থেকে অন্ধকার পাথরের পাঁচিলের মত ঘিরে আস্‌ছে। আসুক, কিন্তু আমিও দেখে নেব। ডুবে মরিত' এমন করে ডুব্‌ব, যাতে তোমরা বুঝ্‌তে পার্‌বে যে কাকে বেঁধে রেখেছিলে, কাকে ডুবিয়ে মার্‌লে। বুনো সিংহকে শেকল দিয়ে বাঁধ্‌লে সমস্ত ঘরখানাকে ভেঙ্গে-চুরে সে সেই ঘর চাপা পড়ে' তবে ত মর্‌বে! এখন এ হয়েছে কি?"

কার্ত্তিক বদ্ধ জন্তুর মত একটা সুগভীর শব্দ করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে হঠাৎ থামিয়া অতি করুণস্বরে ডাকিল, "দেবু, বাবা আমার—" এবং পরক্ষণে সর্ব্বানন্দর নিকটে আসিয়া তর্জ্জন করিয়া বলিল, "বেরোও এ ঘর থেকে, এ ঘরে আমি একা থাক্‌ব—অন্ধকারের মধ্যে আমি একা—একা।" সর্ব্বানন্দ জোর করিয়া কার্ত্তিককে নিকটস্থ বিছানায় শোয়াইয়া দিয়া একটা জানালা খুলিয়া দিল। বাহিরের আলো কার্ত্তিকের মুখের উপর আসিয়া পড়িতেই দুই হাতে সে মুখ ঢাকিয়া পাশ ফিরিয়া বালিসে মুখ লুকাইল। সর্ব্বানন্দ একখানা পাখা লইয়া তাহাকে বাতাস করিতে করিতে বলিল, "কার্ত্তিক, বল, তুমি কি চাও?"

কার্ত্তিক কাতর কণ্ঠে উচ্চারণ করিল, "আলো, আলো—অন্ধকারে ডুবে যাচ্ছি। আলো দাও। আলোকে অবজ্ঞা করেছিলুম অপমান করেছিলুম,

সেই পাপে সে আমার সামনে থেকে আজ তার ক্ষীণ রশ্মিটুকুও সরিয়ে নিচ্চে। দাও, আলো দাও, আলো, সর্ব্ব-দা আলো দিয়ে আমায় বাঁচাও।"

সর্ব্বানন্দ কহিল, "চোখ চেয়ে ফেলো, কার্ত্তিক, চেয়ে দেখ, আকাশ-ভরা আলো এসে তোমার দরজায় দাঁড়িয়েছে। তুমি তাকে ডেকে নাও।"

কার্ত্তিক উদ্‌ভ্রান্তের ন্যায় একবার মাথা তুলিয়া চাহিল। কি ভীষণ উন্মাদের ন্যায় দৃষ্টি! সর্ব্বানন্দ অপর দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিল, "কি দেখ্‌ছ, কার্ত্তিক ?"

কার্ত্তিক পুনরায় বালিসে মুখ লুকাইয়া বলিল, "দেখছিলুম,—তোমার কথা সত্য কি না, অন্ধকার আমার কাছে হেরে আমার পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়েছে কি না! সে না গেলে ত আর আলো আমার কাছে আস্‌তে পার্‌বে না!"

সর্ব্বানন্দ কহিল, "এমন অবস্থাতেও তুমি পাগলামি ছাড়বে না ? আলো-অন্ধকার, ছাইপাঁশ, সেই সব অর্থহীন প্রলাপ বক্‌বে ? যাক ছাই, তোমার যা ইচ্ছে যায়, তুমি তাই কর, কিন্তু ঐ ছোট্ট ছেলেটা ত কোন দোষ করে নি, ওর উপর এ অত্যাচার কেন ? ওকে বাঁচ্‌তে দাও। এই সব গোলমাল থামিয়ে দিয়ে নমো-নমো করে কোনমতে মায়ের পূজা সারো।"

কার্ত্তিক কহিল, "আমার কষ্ট হচ্চে, কি শৈলর কষ্ট হচ্চে, কি দেবুর কষ্ট হচ্চে, এ কথা আর সবাই শুন্‌বে কেন ? আমরা যদি কেউ মরি, তাঁতে ত কারও কিছু আস্‌বে-যাবে না। তবে কেন তাদের প্রাপ্য আমোদে বাধা দেব ? যদি তারা শোনে যে দেবু মরেছে, তাহলে তারা মা দুর্গার সাম্‌নে দাঁড়িয়ে মনে মনে বল্‌বে, 'মা, জমিদারের ছেলেটাকে নিয়েছ, তা বেশ করেছ, তুমি যা ভাল বুঝেছ করেছ, কিন্তু দেখো মা,

আমার ছেলেটিকে নিয়ো না। আমার ছেলেটিকে যে বাঁচিয়ে রেখেছ, এর জন্য এই নাও আমার নৈবিদ্দি, এই নাও আমাদের প্রণাম।' তাদের মধ্যে যদি কারো আমার মত অবস্থা হত ত আমিও যে রকম কথা ভাব্‌তুম, যে রকম কাজ কর্‌তুম, তারাও তাই কর্‌ছে, কেন না, তারাও মানুষ। তুমি মানুষকে এখনও চেন নি, সর্ব্ব-দা।"

সর্ব্বানন্দ কিছুক্ষণ চুপ করিয়া কি-একটা কথা চিন্তা করিল, শেষে বলিল, "তা হলে আমি দেবুকে এখান থেকে সরিয়ে টোলে খুড়ো মহাশয়ের ঘরে নিয়ে গিয়ে রাখ্‌ছি। আর আমি কিছুতেই তোমার কথা শুন্‌ব না।"

কার্ত্তিক কহিল, "কি! তুমি আমার কাছ থেকে দেবুকে কেড়ে নিয়ে যাবে?"

সর্ব্বানন্দ কহিল, "তুমি যদি রাক্ষসের মত তাকে মার্‌বার বন্দোবস্ত কর, তাহ'লে সাধ্য মত তাকে বাঁচাবার চেষ্টা কর্‌তে হবে বৈ কি!" কার্ত্তিক লাফাইয়া উঠিয়া অন্তঃপুরাভিমুখে ছুটিল, কিন্তু দুই-চারি পা যাইতে না যাইতেই ধরাশায়ী হইল। সর্ব্বানন্দ তাহাকে আরও দুই-একজন লোকের সাহায্যে তাহার কোটরে আনিয়া শয়ন করাইল। কার্ত্তিক তখন সংজ্ঞাহীন!

সর্ব্বানন্দ বহু চেষ্টা করিয়াও যখন তাহার মূর্চ্ছা ভাঙ্গাইতে পারিল না, তখন ব্যস্ত হইয়া সে ডাক্তারের নিকট সংবাদ পাঠাইল। ডাক্তার আসিয়া নানাবিধ ঔষধাদি প্রয়োগে প্রায় দুই ঘণ্টার উদ্যোগে কার্ত্তিককে সম্পূর্ণ সুস্থ করিলেন। সর্ব্বানন্দর আদেশে পূজা স্থানের সমস্ত শব্দ বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু কার্ত্তিক জাগিয়াই বলিল, "এ কি, নবৎ বাজ্‌ছে না কেন?" ডাক্তার তৎক্ষণাই কার্ত্তিকের আজ্ঞা পালন করিতে আদেশ দিলেন।

সর্ব্বানন্দ কার্ত্তিককে না জানাইয়া দেবীপ্রসাদকে সন্তর্পণে বুকে তুলিয়া টোলে লইয়া গেল। শৈলজা শিবচন্দ্রের দিকে কাতরভাবে চাহিয়া বলিল, "বাবা, হিতে বিপরীত হবে না ত?"

শিবচন্দ্র ম্লান মুখে বলিলেন, "কোন ভয় নেই মা, আমার কাছে সে কিছুই কর্‌তে পার্‌বে না। তবে আমার ভয় এই, এখানে যদি দেবুর ব্যাধির আরও বৃদ্ধি হয়, তা হলে কি কর্‌ব?"

শৈলজা কহিল, "এই ত ওর আপনার ঘর, এ ঘরে যদিও ভাল না হয়, তা হলে আর কোথাও আশা নেই।"

সন্ধ্যার পর কার্ত্তিক যখন তাহার পুত্রের ঘরে উপস্থিত হইয়া দেখিল, সে ঘর শূন্য, তখন সে সর্ব্বানন্দকে ডাকাইয়া পাঠাইয়া বলিল, "দেবুকে এ ঘর থেকে নিয়ে গেছ? ভাল করনি সর্ব্ব-দা। এর ফল ক্রমেই টের পাবে।"

সর্ব্বানন্দ ক্রুদ্ধভাবে বলিল, "তা পাই পাব, তাই বলে তোমার মত বাপের তত্ত্বাবধানে ছেলেকে রাখ্‌তে পারি নে!"

কার্ত্তিক কহিল, "শৈলকে একবার পাঠিয়ে দেবে?"

সর্ব্বানন্দ "দিচ্ছি" বলিয়া চলিয়া গেল। কার্ত্তিক পুত্রের ত্যক্ত শয্যার উপর পড়িয়া অতি মর্ম্মভেদী কণ্ঠে অথচ মৃদুস্বরে ডাকিল, "দেবু, ফিরে আয় বাবা!" কতক্ষণ যে সে এইভাবে ছিল, তাহা তাহার স্মরণ নাই; কিন্তু যখন তাহার সংজ্ঞা হইল, তখন সে দেখিল, শৈলজা তাহার নিকটে বসিয়া তাহাকে বাতাস করিতেছে। কার্ত্তিক হঠাৎ তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল, "শৈল, সত্যই কি দেবু আমায় ছেড়ে গেল?" শৈলজা এই অপ্রত্যাশিত ভয়ানক প্রশ্নে ভীত হইয়া প্রায় কাঁদ-কাঁদ ভাবে বলিল, "ষাট্‌, ও কি কথা বল্‌ছ তুমি? তুমি চল, তোমায় আমি নিতে এসেছি,—দেবু ডাক্‌ছে।"

কার্ত্তিক একদৃষ্টে শৈলর মুখের দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া মৃদু স্বরে বলিল, "ডাক্‌ছে কিন্তু আমি যাব না! কেমন প্রতিশোধ নিচ্ছি, শৈল? আমি অন্ধ হয়ে যাচ্ছি, দেবুও চলে যাচ্ছে,—কেমন, আমায় বেঁধে রাখ্‌বে? আমার যেটুকু আলো ছিল, তাও আমি নষ্ট কর্‌ছি, যদি চোখে জল আসে ত চোখ উপড়ে ফেল্‌ব, তবু দেবুকে আর দেখ্‌তে যাব না। এইখানেই পড়ে থাক্‌ব, আমায় কেউ তোমরা আর এখান থেকে অন্য কোথাও নিয়ে যেতে পার্‌বে না। হয় এইখানে আমারও শেষ হবে, না হয়, অন্ধকার কারাগার থেকে একেবারে পূর্ণ আলোর মধ্যে আমি মুক্তি পাব!"

একজন দাসী আসিয়া সংবাদ দিল, দেবু মাতার জন্য ক্রন্দন করিতেছে, শৈলজা আর অপেক্ষা করিতে পারিল না, কাতরভাবে বলিল, "আমায় যে শাস্তি হয় দিও, কিন্তু চল, একবার ছেলেটার কাছে চল।"

কার্ত্তিক তর্জ্জন করিয়া বলিল, "যাও তুমি, আমি যাব না।"

শৈলজা উপায়ান্তর না দেখিয়া চলিয়া গেল। কার্ত্তিক সে রাত্রে কিছু আহার করিল না। মায়ের প্রসাদ লইয়া অনেক রাত্রে স্বয়ং শিবচন্দ্র আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কার্ত্তিক তখন তাড়াতাড়ি উঠিয়া পিতৃ-চরণে প্রণাম করিয়া তাঁহার প্রদত্ত আহার্য্য হইতে যৎসামান্য গ্রহণ করিয়া বলিল, "বাবা, আমায় দয়া করুন, এই ঘরে আমায় থাক্‌তে দিন।"

"তোমার সুমতি হোক" বলিয়া শিবচন্দ্র চলিয়া গেলেন।

সপ্তমী গেল, মহা অষ্টমীও চলিয়া গেল, কিন্তু দেবীপ্রসাদের ব্যাধি না কমিয়া বৃদ্ধির দিকেই চলিয়াছে। কলিকাতা হইতে যে ডাক্তার আসিয়াছিলেন, তিনি নবমীর দিন সর্ব্বানন্দকে নিভৃতে ডাকিয়া বলিলেন, "আশা ত মোটেই দেখ্‌ছি না। এক অক্সিজেন inhale করানো ছাড়া

এখন আর ওষুধও কিছু নেই।" সর্ব্বানন্দ কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিল, "তাই বলে আপনি এখন কোথাও যাবেন না।"

ডাক্তারটি ভদ্র; তিনি বলিলেন, "না, না, আমি কোথাও যাচ্ছি না। তবে আপনাদের আগে থেকে জানিয়ে রাখ্‌লুম।"

সর্ব্বানন্দ টেলিগ্রাম করিয়া আর একজন ডাক্তার আনাইবার বন্দোবস্ত করিল বটে কিন্তু প্রকৃতই যাহার সর্ব্বনাশ হইয়া যাইতেছে, সেই কার্ত্তিককে কিছুতেই তাহার পুত্রের নিকট আনিতে পারিল না। শৈলজা বুদ্ধিমতী। সেও তাহার পুত্রের অবস্থা দেখিয়া সমস্তই বুঝিতে পারিতেছিল; তথাপি পাছে কি করিতে কি হয়, এই জন্যই শুধু স্বামীকে ব্যস্ত করে নাই। কিন্তু তাহার স্বামীর অমতে পুত্রকে শ্বশুরালয়ে আনিয়া শেষে যে তাঁহাকে বাঁচাইতে পারিতেছে না, এই দুঃখেই তাহার প্রাণটা ছিঁড়িয়া যাইতেছিল। সপ্তমীর রাত্রে স্বামী যাহা বলিয়া ফেলিয়াছিলেন, শেষে যে তাহাই ঘটিতে চলিল! ইহা দেখিয়া সে অনাহারে অনিদ্রায় দিন রাত্রি যাপন করিতেছিল। তাহার কেবলই মনে হইতেছিল যে হয়তো কার্ত্তিকের কাছে থাকিলে দেবুকে এমনভাবে হারাইতে হইত না। হায়, হায়, এখানে আসিয়া সে এ কি করিল! এই দেবুকে যদি ফিরাইতে না পারে, তাহা হইলে সে কি করিয়া কার্ত্তিকের সম্মুখে গিয়া আবার কোন্ মুখে দাঁড়াইবে?

আজ বিজয়ার সন্ধ্যা। বর্দ্ধিষ্ণু শিবরামপুরের বহু গৃহ হইতে আজ বহু দুর্গাপ্রতিমা বাহির হইয়া গ্রামের রথতলায় সমবেত হইয়াছে। বহু ঢাক-ঢোলের শব্দে সারা গ্রাম মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে। রথতলায় প্রকাণ্ড মেলা বসিয়াছে। জমিদারের আজ্ঞায় কোন অনুষ্ঠানেরই ত্রুটি হয় নাই। আনন্দময়ীর আগমন ও অবস্থান যেরূপ সাড়ম্বরে হইয়াছিল, তাঁহার বিজয়াও তেমনি আলোকে গন্ধে শব্দে বিরাট হইয়া উঠিয়াছে।

দুঃখ করিবার বা পরের দুঃখের বিষয় চিন্তা করিবার অবসর আজ কাহারও নাই।

জমিদার মহাশয় তাঁহার দ্বিতল কক্ষের বাতায়ন হইতে স্বীয় প্রতিমার বিজয়া প্রোসেশনের আলো দেখিতে ছিলেন। পাশে কেবল একজন তাঁহার ভৃত্য। সেই মধ্যে মধ্যে তাঁহার অনুজ্ঞা বহন করিয়া লইয়া গিয়া অনুষ্ঠানের ত্রুটি সংশোধন করিতেছিল। অবশেষে বহু আলোক জনতা ও নানাবিধ বাদ্যের শব্দ সঙ্গে লইয়া মা যখন চলিয়া গেলেন, তখন কার্ত্তিক সহসা দুই হাত ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত করিয়া চীৎকার করিয়া বলিল, "ওঃ, আর পারিনে, ফিরে আয়, একেবারে সব আলো নিয়ে যাস্‌নে! ওরে দেবু, ফিরে আয়।"

ভৃত্য তাহাকে ধরিয়া না ফেলিলে সে পড়িয়া যাইত। কিন্তু সে যখন কার্ত্তিককে ধরিল, তখন কার্ত্তিক প্রায় সংজ্ঞাহীন। ভৃত্য তাহাকে ধীরে ধীরে লইয়া গিয়া শয্যায় শয়ন করাইয়া দিল এবং ডাক্তারকে সংবাদ দিতে গেল।

কিন্তু প্রতিমা-বিসর্জ্জনের বাজনা বাজিয়া উঠার সঙ্গে সঙ্গেই যেন দেবীপ্রসাদেরও জগৎ-সংসার হইতে বিদায়ের সময় আসিয়া উপস্থিত হইল! সর্ব্বানন্দ ছুটিয়া আসিয়া কার্ত্তিককে বলিল, "যদি একবার দেখ্‌তে চাও ত এখনই এস।"

কার্ত্তিক তখন বিকট হাস্য করিয়া বলিল "আমি ত বিসর্জ্জন দিয়েছি, আবার কেন ডাক্‌তে এসেছ?"

সর্ব্বানন্দ কহিল, "ওরে রাক্ষস, তোর নিজের ছেলে যে!"

কার্ত্তিক কহিল, "অন্ধকারের ছেলে কখন আলো হয়? তুমি ভুল কর্‌ছ সর্ব্ব-দা, আমার আবার ছেলে কোথায়? কা তে কান্তা কস্তে পুত্রঃ!"

সর্ব্বানন্দ তাহার সমস্ত বল প্রয়োগ করিয়া কার্ত্তিককে কোনমতে টানিয়া আনিয়া তাহার পুত্রের মৃতুশয্যার পাশে দাঁড় করাইয়া দিল। কার্ত্তিকের সে সময়ের সে মূর্ত্তি বর্ণনার অতীত! শৈলজা কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহার পায়ের নিকটে আসিয়া বলিল, "ওগো তোমারই দেবু, তুমি ফিরিয়ে আনো। তোমারই ছেলে,—ওগো শোনো, একবার শোনো!" কার্ত্তিক কাঁপিতে কাঁপিতে গিয়া শয্যার উপর আছড়াইয়া পড়িয়া বলিল, "নিয়ে গেছিস্, রাক্ষসি! সত্য সত্যই নিয়েছিস্! একটুও আমার জন্য রাখ্‌লিনে? ওঃ, আলো,—আলো, একটু আলো—"

শৈলজা কার্ত্তিকের পায়ের উপর মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেল।

১২

ক্ষণজন্মা পুরুষ মণিশঙ্কর অনেক কষ্টে ফৌজদারী আইনের কবল হইতে মুক্তিলাভ করিলেও শিবরামপুর এষ্টেটের ম্যানেজারি চাকরিটি তাহাকে খোয়াইতে হইল। চাকরি খোয়াইয়া উক্ত গ্রামেই সে মহা-আড়ম্বরে জ্যোতিষিক মতে আয়ুর্ব্বেদীয় ও হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা আরম্ভ করিয়া দিল। 'জ্যোতিষিক মতে'—এই কথা কয়টী সাইন বোর্ডে বড় বড় অক্ষরে লিখিবার তাৎপর্য্য এই যে রোগীর রোগও ভোগের কাল জানাইয়া কতদিন ধরিয়া তাহাকে ঔষধ সেবন করিতে হইবে এবং আন্দাজ কত টাকা তাহাকে ব্যয় করিতে হইবে তাহাও বলিয়া দেওয়া হইত; উপরন্তু রোগী বাঁচিবে কি না, এবং মরিলেও অন্তত পরজন্মে সে রোগমুক্ত হইবে কি না তাহাও সে সঠিক জানিতে পারিত!

অল্প দিনের মধ্যেই তাহার চিকিৎসার খ্যাতি চতুর্দ্দিকে বিস্তার লাভ করার নানা কারণের মধ্যে কেহ কেহ বলিত যে প্রাণী-বিজ্ঞানে ও শারীর বিজ্ঞানে তাহার অপূর্ব্ব অধিকারই অন্যতম। সেই কথার পোষকতায়

কেহ কেহ না কি ইহাও বলিয়াছেন যে মণিশঙ্কর প্রাণীগণের শ্রেণী-বিভাগের মধ্যে নানা প্রকার পরিবর্ত্তন আনয়ন করিয়াছে—যথা, অশ্বকে সে না কি মাংসাশী জীবের মধ্যে, না হয়, অন্তত অণ্ডজ জীবের মধ্যে ফেলিতে চায়, কারণ তাহার ঘোড়াটী অনেকবারই তাহাকে দংশন করিয়াছে এবং অশ্বের ডিম্ব প্রসব সম্বন্ধেও একটা প্রবাদ-বচন প্রচলিত আছে। অর্থাৎ, যাহা রটে তাহার কিছু ত বটে—এই শ্রুতি কখনও মিথ্যা হইতে পারে না! অতএব কোন কোন অশ্ব নিশ্চয়ই অণ্ডজ জীব।

শারীর বিজ্ঞান সম্বন্ধেও তাহার জ্ঞান এতই সূক্ষ্ম যে তাহা আছে কি না বুঝা যায় না! সে প্রমাণ করিয়াছে যে জীবে উপরকার চোয়াল নাড়িয়া আহার করে; দেহে যত নাড়ী আছে সমস্তই উদরের বত্রিশ হস্ত পরিমিত নাড়ী হইতে উদ্ভূত এবং প্লীহা ও যকৃৎ উভয়ই মূর্ত্তিমান রোগযন্ত্র, অঙ্গ ব্যবচ্ছেদ করিয়া উভয় যন্ত্রকে বাহির করিয়া ফেলিয়া দিতে পারিলে সর্ব্ব প্রকার রোগ হইতে মানব মুক্তিলাভ করিতে পারে।

সে তাহার প্রচণ্ড গবেষণার বলে বিশেষভাবেই ইহা প্রমাণিত করিয়াছে যে ইংরাজেরা আমাদের দেশের জন-সাধারণকে চিরকাল দুর্ব্বল করিয়া রাখিবার জন্যই দেশে কুইনাইন নামক বিষের আমদানি ও প্রচার করিতেছেন। ম্যালেরিয়া জ্বর আর কিছুই নহে, সে ঐ বিষেরই কার্য্য। এই মতের পোষকতায় সে আরও বলে যে আমাদের দেশে অতীত যুগে বহুপ্রকারের জ্বর ছিল বটে কিন্তু ম্যালেরিয়া জ্বরের উল্লেখ নিদান চরক সুশ্রুত পাঁচন-সংগ্রহ প্রভৃতি কোন গ্রন্থে নাই; অতএব ইহা যে কুইনাইনেরই আমদানি হইতে উদ্ভূত সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

চিকিৎসা ব্যবসায় ব্যতীত আরও একটি অপূর্ব্ব ব্যবসায় সে তাহার জ্যোতির্ব্বিদ্যা বা অন্য কোন গুণের দরুণ প্রবল-ভাবে চালাইতেছিল। সে আর কিছুই নয়, পুলিশের গোয়েন্দাগিরি। আজ কাল সন্ধ্যার পর হয়

সে দারোগার আটচালায় না হয় তাহার ডিস্‌পেনসারিতে রাত্রি সাড়ে নয়টার পর কয়েকজন গুপ্তচরের সহিত বসিয়া জল্পনা-কল্পনায় ব্যাপৃত থাকিত। সে চিকিৎসা-ব্যপদেশে বহু গৃহের গুহ্য কথা জ্ঞাত হইয়া তাহা হইতে বেশ দুই পয়সা উপার্জ্জনও করিতেছিল।

মণিশঙ্করের মাতা মনোরমা দেবীও ইতিমধ্যে তাঁহার সংসারটী বেশ গুছাইয়া লইয়াছেন। পুত্রের বিবাহ দিয়া পৌত্রের মুখ দেখিয়াছেন এবং তাঁহার হাতেও বেশ দুই পয়সা জমাইয়া স্বামীর নিকট গমন করিয়া শেষ বয়সে ৺কাশীবাস করিবার কল্পনাও তাঁহার মনে এখন মধ্যে মধ্যে উদয় হইতেছে। পুত্রকে পূর্ণরূপে সংসারী করিয়া তিনি একদিন তাঁহার কাশী-গমনের ইচ্ছা প্রকাশ করিলে মাতৃভক্ত পুত্র বলিল, "সে কি হয় মা, এর মধ্যেই কাশী যেতে দেব কেন? আমি মনে মনে যে ফন্দী আঁটছি তাতে যে তুমি না হলে চলবেই না।"

মাতা কহিলেন, "কি ফন্দী?"

পুত্র কহিল, "তুমি ত জান যে কালিকা বাবুর দৌহিত্রকে বিষ দিয়ে মেরে ফেলে কার্ত্তিক এখন পাগলের ভাণ করে পড়ে আছে।"

মাতা কহিলেন, "কি ভয়ানক! সে কি কথা বলিস্ রে?"

পুত্র কহিল, "এই কথা এবং তাই প্রমাণ কর্‌তে হবে।"

মাতা কহিলেন, "অমন কাজ করো না, বাবা। ওদের অন্নে আমাদের দেহ, ওদের অপকার কর্‌বার চেষ্টা কর্‌লে—"

পুত্র কহিল, "দোষীকে শাস্তি না দিলে সমাজ বল, ধর্ম্ম বল, কিছুই টেঁক্‌বে না। বিশেষতঃ আমি কালিকাবাবুর বংশের ত কারও কিছু কর্‌তে চাচ্ছি না। কার্ত্তিকের সঙ্গে আমার আজন্মের বিবাদ, তাকে জব্দ কর্‌তেই হবে। ফৌজদারীতে যখন আমি ওরই জন্য পড়ি তখন ওই আমায় জেলে দেবার চেষ্টা করেছিল।"

মাতা কহিলেন, "কিন্তু ওর স্ত্রী, ওর বাপ, ওর বন্ধু তোমায় বাঁচিয়েছেন। না মণি, আর ও সব নয়। এখন যা করছ, তাই কর। আর ওদের দিকে নজর দিয়ো না, তাহলে যা আছে তাও যাবে।—আমি এ বিষয়ে তোমায় কোন সাহায্য করব না, এমন কি যদি জান্‌তে পারি তুমি ঐ চেষ্টা করছ, তাহলে সব কথা প্রকাশ করে দেব, না হয় এখান থেকে চলে যাব।"

মণিশঙ্কর তাহার মাকে চিনিত। তিনি যদি কোন বিষয়ে অমত করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে স্বমতে আনয়ন করা মণির সাধ্যাতীত। মণি অগত্যা নিরুপায় হইয়া বাহিরে চলিয়া গেল।

১৩

আঘাতের প্রতিঘাতই প্রকৃতির নিয়ম। যত জোরে আঘাত দিবে, ঠিক তত জোরেই সে আঘাত ফিরিয়া আসিয়া আঘাতকারীকে প্রতিঘাত করিবে। কার্ত্তিকের অস্বাভাবিক বলপ্রয়োগ, সংসারের উপর স্বজনের উপর সর্ব্বোপরি নিজের উপর বলপ্রয়োগ, সমস্তই ফিরিয়া আসিয়া একসঙ্গে তাহাকেই আঘাত করিল। সে মনে করিয়াছিল যে, বল-প্রয়োগে সে প্রমাণ করিয়া দিবে, স্নেহ কিছুই নয়, ধর্ম্ম কিছুই নয়, সমাজ-বন্ধন কিছুই নয়, বন্ধন-হীন স্বেচ্ছাচারিতাই একমাত্র সত্য। তাহাকে যে তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে সুখী করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে, ইহাও অধীনতা, ইহাতেও তাহার আত্মার অপমান করা হইয়াছে। সে জোর করিয়া প্রমাণ করিতে চাহিয়াছিল যে জগতের সমস্তই নিয়মের অধীন বটে কিন্তু মানুষের আত্মাই একমাত্র স্বাধীন বস্তু। আত্মার একমাত্র সুখ আপনার স্বাধীনতাকে অনুভব করা। সমস্ত উৎসর্গ করিয়া সে প্রমাণ করিতে চায় যে পূর্ণ স্বাধীনতাই মানবাত্মার স্বসত্তানুভব, তাহাই তাহার একমাত্র

সত্য অভিব্যক্তি। সে কিছুতেই বুঝিবে না যে মানুষের জীবনও জগৎ-ব্যাপী মহা নিয়ম-চক্রের উপর অধিষ্ঠিত। সে বলপ্রয়োগে প্রমাণ করিতে চাহিয়াছিল যে মানুষের জন্যই নিয়ম, নিয়মের জন্য মানুষ নয়। কিন্তু এই জগৎ-ছাড়া, স্বভাব-ছাড়া উচ্ছৃঙ্খলতা তাহাকেই যেমন আঘাত করিল এমন আর কাহাকেও নয়। জোর করিয়া অন্ধ হইতে গিয়া সে কাহার কি ক্ষতি করিল? নিজের অসীম স্নেহের বিরুদ্ধে বলপ্রয়োগ করিয়া প্রাণাধিক পুত্রকে বিসর্জ্জন দিয়া সে কাহার কি ক্ষতি করিল? এই পরম-স্নেহময়ী শৈলজার উন্মুখ ভাল বাসাকে সবলে পদ-দলিত করিয়া সে কাহার অনিষ্ট করিল? সমস্ত সংসারকে সে একটা কাল্পনিক স্বেচ্ছাচারী স্বাধীনতার জন্য নষ্ট করিতে গিয়া কাহাকে বেশী আঘাত দিল? সংসার ত সেই আপন নিয়মেই চলিতেছে, সেই ত প্রভাত তেমনি প্রতিদিন আসিতেছে, সেই ত প্রতি সন্ধ্যায় কর্ম্মক্লান্ত মানব আপন-নীড়ে স্নেহ-ভালবাসার বন্ধনের মধ্যে ফিরিয়া আসিতেছে, সেই ত সমস্ত জগৎ একই নিয়মে সুখে-দুঃখে হাসিতেছে, কাঁদিতেছে। লোকসান ত আর কাহারও হইল না! কৈ, কেহ ত বুঝিতে চাহিল না যে এই অনন্ত বন্ধনের মধ্যে এই সমাজ, সংসার, স্নেহ, কর্ত্তব্য, ধর্ম্ম প্রভৃতির মধ্যে সুখ নাই—সুখ আছে, কেবল স্বেচ্ছার স্বাধীনতায়, সুখ আছে কেবল বন্ধন-হীন ইচ্ছা-শক্তির পরিচালনায়, সুখ আছে কেবল পাখীর মত অনন্ত আকাশে আপন ইচ্ছা-অনিচ্ছার দুই পক্ষ মেলিয়া উড়িয়া বেড়ানোয়?

দেবুর মৃত্যুর পর সাত-আট দিন কার্ত্তিকের কোন প্রকার সংজ্ঞা ছিল না। সে যেন কিছুদিনের জন্য একেবারে অতল অন্ধকারে তাহার অস্তিত্বকে সম্পূর্ণরূপে হারাইয়া ফেলিয়াছিল। তারপর অনেক সেবা-শুশ্রূষায় যখন সে ক্রমশ সুস্থ হইতে লাগিল, তখন তাহার মনে ধীরে ধীরে সমস্ত পূর্ব্ব স্মৃতিই সজাগ হইয়া উঠিতে লাগিল। তাহার অবসন্ন

মন যখন ক্রমশ তাহার লুপ্ত শক্তিটুকু আবার ফিরিয়া পাইতেছিল, দেহ যখন তাহার হারানো স্বাস্থ্য পুনর্লাভ করিতেছিল, তখন একদিন শৈলজা তাহার পুত্রশোক, তাহার দিবারাত্রি পরিশ্রমের উত্তেজনা, তাহার বহু রাত্রি-জাগরণের ক্লান্তি, সর্ব্বোপরি তাহার নারী-হৃদয়ের সর্ব্বংসহা শক্তিকে দুই চোখের দৃষ্টির মধ্যে পুঞ্জীভূত করিয়া কার্ত্তিকের মুখের উপর ঝুকিয়া পড়িয়া বলিল, "বল, তুমি কি হলে সুস্থ হবে?" কার্ত্তিক তখন অতি ক্লান্তভাবে অথচ স্নেহ-সকাতর দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া চাহিয়া বলিল, "আর কেন, শৈল? আর ও কথা নয়।"

শৈল কহিল, "না, তা হবে না। আমি বল্‌ছি যে আজ আমি সব পার্‌ব। আমি এত দিন যা সহ্য করেছি, তাতে যদি কিছু শিক্ষা লাভ করে থাকি, কিছু শক্তি পেয়ে থাকি ত, সেই জোরে বল্‌ছি যে আজ আমি সমস্তই পার্‌ব।"

কার্ত্তিক উত্তেজিতভাবে উঠিয়া বসিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না; আজ কত বর্ষব্যাপী প্রচণ্ড চেষ্টার শ্রান্তি তাহার সমস্ত দেহ-মনের উপর চাপিয়া বসিয়াছে। এতদিন ধরিয়া নিজের উপর যে অত্যাচার সে করিয়াছে, তাহার প্রতিক্রিয়া প্রবলভাবে আক্রমণ করিয়া তাহার দেহ-মন সমস্তই অবসন্ন করিয়া দিয়াছে। তাই শৈলজা যখন তাহার চোখের উপর উজ্জ্বল চক্ষু রাখিয়া বলিল যে সে সমস্তই পারিবে, তখন কার্ত্তিক নিমীলিত নেত্রে বলিল, "আমি যে আর পারব না, শৈল। আমার সমস্ত শক্তি চলে গিয়েছে। আমি যা চাইতুম, তাকে চাইবার মত শক্তি আর আমার কৈ?"

শৈল কহিল, "তুমি কি চাইতে?"

কার্ত্তিক কহিল, "আমি চাইতুম, মুক্তি—"

শৈল কহিল, "তোমায় আমি তাই দিলুম। আমিই তোমার একমাত্র

বন্ধন—অন্য যে বন্ধন ছিল ভগবান তা কেটে দিয়েছেন। এখন আমি সর্ব্বান্তঃকরণে বল্‌ছি, তুমি মুক্ত।"

কার্ত্তিক একদৃষ্টে শৈলজার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। এই কি সেই শৈল? যে একদিন এই ব্যাপারের উল্লেখমাত্রেই কাঁদিয়া কাঁদিয়া সমস্ত দিন অনাহারে অনিদ্রায় দেবমন্দিরে পড়িয়াছিল! কত বড় আঘাতে যে এই স্নেহময়ী নারী আজ এই কথা বলিতে সক্ষম হইয়াছে, তাহা অনুভব করিয়া কার্ত্তিক শিহরিয়া উঠিল। ভীতভাবে শৈলজার হাত ধরিয়া সে বলিল, "শৈল, তুমি আমায় ত্যাগ কর্‌বে?"

শৈল কহিল, "ত্যাগ করবার সম্বন্ধ তোমায় আমায় নয়, কিন্তু তুমি মুক্ত—তোমায় আমি আর চাই না।"

কার্ত্তিক কহিল, "কিন্তু আমি যে এখন তোমায় চাই।"

শৈল কহিল, "ভয় নেই! এই অসুস্থ অবস্থায় তোমায় ফেলে আমি কোথাও যাব না— আমি কোন দিনই কোথাও যাব না। কিন্তু যে মুক্তি তুমি চেয়েছ, আজ তোমায় তা আমি দিচ্ছি। সুস্থ হয়ে তুমি যা চাও, যাকে চাও, তার কাছে অনায়াসে তুমি যেতে পার। আমিও বুঝেছি, ভালবাসা বল, আর যাই বল, সবই বন্ধন। যখন বন্ধনে সুখ নাই, সুখ আছে কেবল স্বেচ্ছাচারিতায়—তখন তোমার সুখের পথে দাঁড়িয়ে কেবল যে তোমাকেই আমি হত্যা কর্‌ছি, তা নয়, নিজেরও হয়ত মস্ত অপকার কর্‌ছি। তোমাকে আমার ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ করেছিলুম, কিন্তু দেখ্‌লুম, ছায়াকে বেঁধে রাখা যা, তোমাকে বাঁধ্‌বার চেষ্টা করাও তাই। তাই বল্‌ছি—"

কার্ত্তিক উপাধানে ভর দিয়া উঠিয়া বসিয়া বলিল, "শৈল, আমার শক্তি, বল, তেজ—সব গিয়েছে, হয় ত আমায় চোখও গিয়েছে, কিন্তু এখন সেই স্বাধীনতা নিয়ে আমি কি কর্‌ব?"

শৈল কহিল, "তা ভাব্‌বার অধিকার আর আমার কৈ? দস্যুবৃত্তি করেঁ তুমি আমার সে অধিকার কেড়ে নিয়েছ।"

কার্ত্তিক কহিল, "যদি আবার দিই?"

শৈল কহিল, "আমি নেব না।"

কার্ত্তিক কহিল, "কেন?"

শৈল কহিল, "যা দিতে পারা যায়, তা কেড়েও নেওয়া যায়। আজ তুমি যা দিচ্ছ, কাল তা কেড়ে নিতে পার। অগ্নি সাক্ষী করে ধর্ম্ম সাক্ষী করে যে বন্ধন তুমি স্বীকার করেছিলে, তাই যখন নাগপাশ বলে চির দিন মনে করে এসেছ, তখন এই দুর্ব্বলতার সময় যা দেবে, তার জোর কত টুকু? আমি বেশ বুঝেছি, আর তোমায় বেঁধে রাখ্‌লে তুমিও নষ্ট হবে, আমিও চিরদিন দুঃখ পাব। তার চেয়ে ভগবান যেটুকু-যা আমারই জন্য মেপে রেখেছেন, সেইটুকু পাবার জন্যই আজ থেকে আমায় তৈরি হতে হবে। তুমি মনে কর্‌ছ, আমি অভিমান করে এ-সব কথা বল্‌ছি? অভিমান আর কার উপর কর্‌ব? তুমি মান-অভিমানের বাইরে গিয়েছ। এখন তোমায় বেঁধে রাখ্‌লে নিশ্চয়ই অন্যায় করা হবে, কারণ বাঁধন যদি এক পক্ষে হয়, তা হলে সেটা দাসত্ব। তুমি যখন আমায় বাঁধ নি, তখন আমিই বা আমার বন্ধন রাখ্‌ব কেন? আমার দিক থেকে তোমাকেও আজ আমি মুক্তি দিলাম।"

কার্ত্তিক নিশ্বাস ফেলিয়া শুইয়া পড়িল; ক্ষণপরে বলিল, "ঠিক হয়েছে। এই আমার উপযুক্ত। শৈল, তুমি যদি আমার মত জীবকে ভালবাস্‌তে, তাহলে নিজেরই অপমান কর্‌তে। আজ যে সে অপমানের বোঝা আমার মাথায় ফিরিয়ে দিতে পেরেছ, এর জন্য আমি সুখী। না, এত সুখের যোগ্য আমি নই। আমার জন্য যে তুমি আহার নিদ্রা ত্যাগ করে বসে থাকবে, সংসারের এ ভয়ানক অত্যাচার। ঠিক হয়েছে

—শৈল, এতদিনে তোমার আসল মানুষটার জয় হয়েছে। সে আমার মত মানুষের পায়ে চিরদিন ফুল বেল পাতা ঢেলে পূজো কর্‌বার মত এত হীন নয়! সে—"

শৈল কহিল, "সে যে কিসের উপযুক্ত, সে যে কি, তা আর কেন ভাব্‌ছ? সে যা, তাই। এখন তোমার নিজের কথা চিন্তা করে দেখবার সময় এসেছে।"

কার্ত্তিক মুদিত নেত্রে বলিল, "আর এখন তা ভাব্‌তে পার্‌ছি না। এই এত বড় একটা ভয়ানক সৌভাগ্য, এই এতদিনকার প্রার্থিত বস্তু পেয়ে প্রাণটা যে কি কর্‌বে, তা এখনও ভেবে দেখ্‌তে পারেনি। ভেবে দেখ্‌বার ক্ষমতাই নেই—বোধ হচ্ছে যেন মনের পক্ষাঘাত হয়েছে, নইলে এমন ভয়ঙ্কর সুখের আঘাতে সে সাড়া দিচ্ছে না কেন? যাও তুমি, আর মিছে বসে থেকো না।"

শৈলজা ধীর পদে চলিয়া গেল। কার্ত্তিক ক্ষণকাল জড়ের মত পড়িয়া থাকিয়া শেষে উঠিয়া বসিল।

এই স্বাধীনতা? এই মুক্তি? ইহাকেই পাইবার জন্য সে না করিয়াছে কি! মাতৃহত্যা, পিতৃহত্যা, এমন কি যাহার জন্য সমস্তই, সেই আপনাকে পর্য্যন্ত সে হত্যা করিতে উদ্যত হইয়াছিল। কিন্তু কোথায় আনন্দ? কোথায় মুক্ত পথে অবাধ সঞ্চালনের বিরাট সুখ? যাহার জন্য করতলগত স্বর্গকে সে ত্যাগ করিল, সেই মহাবস্তু কৈ? বুকের মধ্যে কৈ তাহার অনুভূতি? মুক্তি, মুক্তি—মুক্তিই ত বটে!

কার্ত্তিক ধীরে ধীরে শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। তারপর কি মনে করিয়া গবাক্ষের নিকটে গিয়া একহাতে চোখ ঢাকিয়া অপর হস্তে জানালাটা খুলিয়া দিল। অমনি বহুদিনের বিরহের পর আলোকের সহিত মিলনের হাসিতে সেই কক্ষের সমস্ত বস্তু হাসিয়া উঠিল।

কার্ত্তিক সাহসে ভর করিয়া ধীরে ধীরে চোখের উপর হইতে হাত সরাইয়া লইল—কিন্তু অনেক দিনের অনভ্যস্ত চোখে আলো সহ্য হইল না। কার্ত্তিক পুনরায় চক্ষু মুদিয়া মনে মনে বলিল, "না, তা হবে না—এ মুক্তি সইতেই হবে। আলো যখন ফিরে পেয়েছি, তখন সইতেই হবে।"

কিন্তু আলো কিছুতেই সহিল না। অন্ধকার নির্ম্মমভাবে তাহার অন্তরে বাহিরে আঁটিয়া বসিয়াছে! ইহার হাত হইতে বুঝি মুক্তি নাই! কার্ত্তিক চক্ষু মুদিয়া শয্যায় আসিয়া শয়ন করিল।

হায় আলো! হায় সর্ব্বলোকচক্ষু! তুমি ত্যাগ করিলে! অন্ধকারের দৈত্যের হাতে আমায় ত্যাগ করিয়া গেলে! তাই হোক, আমিও অন্ধকারের হাতেই আপনাকে সঁপিয়া দিব।

কার্ত্তিক হঠাৎ কাতর কণ্ঠে ডাকিল, "শৈল—"

শৈলজা পাশের ঘর হইতে আসিয়া বলিল, "কি ?"

কার্ত্তিক কহিল, "সমস্ত দরজাগুলো খুলে দিতে পার ?"

শৈলজা দ্বারগুলা খুলিয়া দিলে কার্ত্তিক আবার বলিল, "আমার গায়ে আলো লাগ্‌ছে ?"

শৈল কহিল, "লাগ্‌ছে।"

কার্ত্তিক কহিল, "খুব লাগ্‌ছে ?"

শৈল কহিল, "জানালা দিয়ে যতটা আস্‌ছে, ততটা লাগ্‌ছে।"

কার্ত্তিক কহিল, "কিন্তু আমি আরো আলো চাই।"

শৈল কহিল, "তুমি যে এতদিন অন্ধকার, অন্ধকার করে কাঁদ্‌তে,—আজ এত আলো চাইছ কেন ?"

কার্ত্তিক কহিল, "চিরকালের জন্য বিদায় নিতে হবে যে—তাই শেষ দেখা-শোনা করে নিচ্ছি।"

শৈল কহিল, "সে কি! তুমি—"

কার্ত্তিক কহিল, "ভয় নেই, আমি মরতে যাচ্ছি নে। মরবার জন্যই কি এত বড় একটা লঙ্কাকাণ্ড কেউ করে? মর্‌ব কেন? মরণের উপরে যা, তাই যে আমি পেয়েছি, আমি অমর হয়ে গিয়েছি। ভয় নেই, শৈল, আমার মরণ নেই। আমি মলে এই এত বড় ভয়ঙ্কর সুখটা—মুক্তির সুখটা—হজম কর্‌বে কে? তুমি যাও—নিজের কাজ করগে যাও, —আমি এখন একা—একা থাক্‌ব।"

শৈল আবার চলিয়া গেল।

* * * * *

প্রভাতে উঠিয়া শৈলজা কার্ত্তিকের ঘরে গিয়া দেখিল, সমস্ত জানালা দরজা খোলা, কার্ত্তিক ঘরে নাই। বিস্মিত হইয়া শয্যার দিকে সে চাহিয়া দেখিল, একখানা কাগজ পড়িয়া আছে। তাড়াতাড়ি সে খানা সে খুলিয়া দেখিল, কার্ত্তিকের চিঠি।

কার্ত্তিক লিখিয়াছে,—

"শৈল,

আমি চলিলাম। যখন মুক্তি পাইয়াছি, তখন তাহার পূর্ণ স্বাদ আমায় পাইতেই হইবে। দিনে বাহির হইতে পারি নাই, কারণ আলোতেই আমার ভয়। রাত্রির অন্ধকারই আমার আলো—তাই রাত্রে বাহির হইতেছি।

সিন্দুক দেরাজ ইত্যাদির চাবি আমার মাথার শিয়রেই রহিল। সমস্ত ঠিক করিয়া গুছাইয়া রাখিয়া যাইতেছি। যখন আমি মুক্ত, তখন তোমার কোন জিনিসই লওয়া উচিত নয় মনে করিয়া আমার কাছে যাহা কিছু ছিল, সে সমস্তই যথাস্থনে রাখিয়া দিয়াছি। রাত্রে বাবার নিকট হইতে চুরি করিয়া একখানা কাপড় ও গায়ের কাপড় আনিয়াছিলাম।

তাহাই গায়ে দিয়া বাহির হইতেছি। যদিও জানি যে এ সমস্ত লইয়া গেলে তুমি কিছুই বলিতে না, তথাপি তোমার কিছুই লইব না, প্রতিজ্ঞা করিয়া এই কাজ করিলাম। তুমি কখনও আমার নিকট হইতে কিছুই পাও নাই, আমিই বরং তোমার নিকট হইতে অযাচিতভাবে অজস্র পাইয়াছি। তোমার এ বিষয়ে সুবিধা আছে, কিন্তু আমার সে সুবিধা ছিল না। সেই সুবিধার জন্য বাবার জিনিস চুরি করিলাম—আমার ন্যায়-অন্যায়ের ধর্ম্মশাস্ত্রে এটা তত দোষের বলিয়া বোধ হইল না।

তুমি যাহা বলিয়াছ, তাহা যদি সত্য হয় তাহা হইলে নিশ্চয় আমার জন্য তুমি দুঃখ করিবে না। আমি দুঃখ-কষ্টের উপযুক্ত নই, এ কথাটা মনে ভাবিয়া নিশ্চিন্ত হইও।

কোথায় যাইব জানিতে চাহিয়ো না—কারণ আমিই তাহা ঠিক জানি না—এই আলোক-ভীত চোখ দুইটা আমায় কোথায় লইয়া যাইবে, তাহার ঠিক কি !

আশীর্ব্বাদ করি, সর্ব্বান্তঃকরণে আশীর্ব্বাদ করি, তুমি সুখী হও—ভগবান্ যেন তোমায় শান্তি দেন। আমি যাহাই হই, এই কথাটুকু বিশ্বাস করিও যে আমি তোমার চির-মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী। আমি তোমার জীবনের শনিগ্রহ ছিলাম—গ্রহ কাটিয়া গেল, এখন তুমি নির্ভয়ে নিজের জীবন নিজে গড়িয়া তুলিও। ইতি

নিত্যশুভাকাঙ্ক্ষী কার্ত্তিক।”

চিঠি পড়িয়া শৈলজা কাঠের মত হইয়া গেল। প্রভাতের মৃদু আলো তাহার চোখে অত্যন্ত তীব্র ঠেকিল—সে মুখ ঢাকিয়া শয্যার উপর শুইয়া পড়িল।

শশিভূষণের ভৃত্য রঘুলাল প্রভাতে উঠিয়া বাহিরের দরজা খুলিয়াই দেখে, বাড়ীর রোয়াকের উপর কে-একজন শুইয়া আছে। দরজা খুলিতেই সেই ব্যক্তি ফিরিয়া বলিল, "কে? ঠাকুর-দা?"

রঘুলাল তাহার মুখের দিকে চাহিল, মুখখানা যেন চেনা-চেনা বোধ হইল। সে প্রশ্ন করিল,

"আপনি কে? কাকে খুঁজছেন?"

"শশিবাবুকে। তিনি বাড়ীতে আছেন?"

"আছেন, এখনো উঠেন নি।"

"সর্ব্ববাবু?"

"তিনিও আছেন। আপনি চোখ বুজে রয়েছেন কেন?"

"আমার চোখে আলো সয় না, তাকাতে পারি না। আমায় ওপরে নিয়ে যেতে পার?"

রঘুলাল আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, "আসুন।"

"আস্‌ব কি করে? আমার হাত ধর।"

"এলেন কি করে?"

"রাত্তিরে এসে এখানে শুয়ে আছি। রাতে আমার কষ্ট হয় না। তুমি আমায় ওপরে নিয়ে চল।"

রঘুলাল কার্ত্তিকের মূর্ত্তি দেখিয়া অবাক্ হইয়া গেল। যেন কবর হইতে উঠিয়া-আসা মানুষ! রঘুলাল একবার ভাবিল, নিশ্চয় পাগল; আবার ভাবিল বাবুদের নাম করিতেছে যখন তখন নিশ্চয়ই তাঁহাদের চেনা মানুষ। সাত-পাঁচ ভাবিয়া সে কার্ত্তিকের হাত ধরিয়া উপরে লইয়া গেল। সর্ব্বানন্দ সেইমাত্র দরজা খুলিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। হঠাৎ চাহিয়া দেখে—কার্ত্তিক!

এই দুদিন পূর্ব্বে সে পত্র পাইয়াছে যে কার্ত্তিক তখনও সম্পূর্ণ সুস্থ হয়

নাই। ইহারই মধ্যে সে এমনভাবে এখানে আসিয়া উপস্থিত! সর্ব্বানন্দ তাড়াতাড়ি রঘুলালের হস্ত হইতে কার্ত্তিকের হস্তটা টানিয়া লইয়া বলিল, "কার্ত্তিক!"

কার্ত্তিক। হাঁ আমিই বটে—

সর্ব্ব। কিন্তু চেহারা দেখে যে তা বোধ হচ্চে না। মনে হচ্চে যেন পরলোক হতে তোমার Spiritটা ফিরে এসেছে।

কার্ত্তিক। পরলোক হতেই বটে, এখন ইহলোকে কি হয় তাই দেখ্‌তে এসেছি। আমি আর দাঁড়াতে পার্‌ছি না, আমায় তোমার বিছানায় নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দাও।

সর্ব্বানন্দ তাড়াতাড়ি তাহাকে নিজ কক্ষে লইয়া গিয়া শুয়াইয়া দিয়া বলিল, "আর কে এসেছে?"

কার্ত্তিক বলিল, "আর কেউ নয়—আমি একলা এসেছি।"

সর্ব্ব। একলা? এই অবস্থায়?

কার্ত্তিক। হ'লেই বা এই অবস্থা, তবু আমি মুক্ত তাই আস্‌তে পেরেছি, বদ্ধ থাক্‌লে নড়্‌তে-চড়্‌তে পার্‌তাম কি? শৈল আমায় মুক্তি দিয়েছে।

সর্ব্বানন্দ ভীত হইয়া বলিল, "সে কি? শৈল? সে কেমন আছে?"

কার্ত্তিক। সে ভালই আছে বোধ হয়—তাকে সুস্থই দেখে এসেছি।

সর্ব্ব। তবে?

কার্ত্তিক। তবে আর কি? সারা জীবনের সাধনা ফলেছে, সে আমায় ছেড়ে দিয়েছে।

সর্ব্ব। বুঝ্‌তে পার্‌লাম না।

কার্ত্তিক বলিল, "ভাই, আর কথা কইতে পার্‌ছি না। কাল থেকে একপ্রকার অনাহারে আছি। একজন আমায় অন্ধ দেখে দয়া ক

কিছু খেতে দিয়েছিলেন তাই বেঁচে আছি। তিনি কলকাতা আস্‌ছিলেন, আমাকে একখানা গাড়ী ভাড়া করে তুলে দিয়েছিলেন তাই তোমার এখানে আস্‌তে পেরেছি। ভাড়াও তিনি দিয়েছেন, আবার পাঠিয়ে দিতে হবে। এখন আমি একটু ঘুমুব, তারপর সব কথা বল্‌ব। জানালাগুলো বন্ধ করে দাও।"

সর্ব্বানন্দ তাহাই করিল। তারপর বাহিরে গিয়া শশিভূষণকে ডাকিল। শশিভূষণ বাহিরে আসিয়া বলিল, "ডাকাডাকি কেন?" সর্ব্বানন্দ তাহাকে সমস্ত কথা বলিল। শশিভূষণ ব্যস্ত হইয়া বলিল, "তাইত, এখন উপায়?"

"উপায় আর কি, নিশ্চয়ই ও পালিয়ে এসেছে। এখনি টেলিগ্রাম কর্‌তে হবে—তুমি ডাক্তার ডেকে আনো, আমি টেলিগ্রাম করে আসি।"

ডাক্তার আসিয়া দেখিয়া শুনিয়া বলিল, শরীরের ওপর দিয়ে ভয়ানক অত্যাচার গিয়েছে। এখন বাঁচা না বাঁচা ভগবানের হাত, তবে—"

শশিভূষণ বলিল, "তবে আর কিছু নেই। সবই ভগবানের হাত। আপনি যদি দরকার বোঝেন আর যাকে হয় সঙ্গে করে আন্‌তে পারেন। মোদ্দা প্রাণপণ চেষ্টা কর্‌তে হবে।"

দশ বার দিন যমে-মানুষে টানাটানির পর কার্ত্তিক প্রথম যখন সংজ্ঞালাভ করিয়া চক্ষু মেলিল, তখন নিশীথ রাত্রি। মৃদু আলোকে কক্ষটি আলোকিত, তাকের উপর একটা ঘড়ি টক্‌টক্‌ করিতেছে। দূরে কে একজন একখানা আরাম-চেয়ারে শুইয়া ঘুমাইতেছে। কার্ত্তিক মাথা তুলিয়া বিস্মিতভাবে চারিদিকে চাহিতে চাহিতে হঠাৎ দেখিল, শিয়রে কে একজন বসিয়া মৃদু মৃদু বাতাস করিতেছে। এ কি! এ কে? কার্ত্তিক বিস্মিতভাবে চাহিয়া চাহিয়া মাথা নামাইয়া বলিল, "কে আপনি?"

উপবিষ্ট ব্যক্তি চমকিত হইয়া বলিল, "আমি সরোজ।"

কার্ত্তিক। "সরোজ? কে সরোজ? শৈল কৈ?"

সরোজ লজ্জিতভাবে বলিল, "আপনি যে কলকাতায় এসেছেন, আপনাকে আমরা—"

কার্ত্তিক। কলকাতায়? কলকাতায় আমি কি করে এলাম? কে আন্‌লে?

সরোজ। সে কথা পরে শুন্‌লেই হবে। আপনি চুপ করে এখন একটু ঘুমুবার চেষ্টা করুন।

কার্ত্তিক। না না, তা হবে না, কলকাতায় আমি কি করে এলাম? শৈল এনেছে বুঝি? আমার কি খুব অসুখ বেড়েছিল? কৈ কিছু মনে পড়্‌ছে না ত? শৈল ঘুমুচ্ছে?

সরোজ। তিনি এখানে নেই।

কার্ত্তিক। সে কি! কোথায় সে?

সরোজ। বোধ হয় বাড়ীতেই আছেন।

কার্ত্তিক। তবে আমায় কে আন্‌লে? কি করে এখানে এলাম? এ কার বাড়ী? ও কে শুয়ে রয়েছে?

সরোজ। উনি সর্ব্ববাবু।

কার্ত্তিক। সর্ব্ব-দাদা? কি আশ্চর্য্য! আমার কিছুই মনে পড়্‌ছে না যে! কবে আমি এখানে এসেছি?

সরোজ। আজ বার দিন হ'ল।

কার্ত্তিক। আপনি কি করে আমার খবর পেলেন? সর্ব্ব দাদা ডেকে এনেছে বুঝি? সর্ব্ব-দাকে ডাকুন।

সরোজ। উনি এই ক'রাত্রি জেগে আজ একটু ঘুমিয়েছেন। আপনার কিছু দরকার আছে কি?

কার্ত্তিক। কিছু না—আপনি বসুন। বার দিন হ'ল এসেছি!

কার্ত্তিক কিছুক্ষণ নীরবে চিন্তা করিল। কিন্তু কিছুই স্মরণ করিতে পারিল না। শিবরামপুর হইতে বাহির হওয়ার পর হইতে কলিকাতা আসা পর্য্যন্ত সমস্ত ব্যাপারই ভীষণ যন্ত্রণার আক্রমণে সংজ্ঞালোপের সঙ্গে-সঙ্গেই, স্মৃতি হইতেও লোপ পাইয়াছিল। ক্ষণকাল বিফল চেষ্টার পর হঠাৎ সে প্রশ্ন করিল, "কিন্তু শৈল এল না কেন?"

সরোজ নীরবে রহিল। কার্ত্তিক পুনরায় ঐ প্রশ্ন করায় বলিল, "তা ত' আমি জানি নে—তাঁকে আন্তে সর্ব্ব-বাবু গিয়েছিলেন, কিন্তু তারপর কি হয়েছে সর্ব্ব-বাবু আমায় বলেন-নি।"

কার্ত্তিক পুনরায় নীরবে চিন্তা করিতে লাগিল। ক্ষণপরে মৃদুস্বরে বলিল, "আমি কলকাতায়—শৈল নেই! আচ্ছা, বাবা কৈ?"

সরোজ। তিনিও আসেন-নি।

কার্ত্তিক হতাশভাবে নিশ্বাস ফেলিয়া পাশ ফিরিল। তারপর কিছুক্ষণের মধ্যেই আবার ঘুমাইয়া পড়িল।

প্রভাতে সর্ব্বানন্দ জাগিয়া উঠিয়া সরোজকে বলিল, "একি, আমায় তিনটের সময় জাগাওনি কেন? কেমন আছে কার্ত্তিক? রাত্রে আর কিছু করে-নি? যা তা বকে-নি?"

"না" বলিয়া সরোজ উঠিয়া বাহির হইয়া গেল। সর্ব্বানন্দ কার্ত্তিকের নিকটে আসিয়া জ্বরের উত্তাপ পরীক্ষায় জন্য গায়ে হাত দিবামাত্র সে চক্ষু মেলিল। সর্ব্বানন্দ বলিল, "এখন কেমন বোধ হচ্চে, কার্ত্তিক?"

কার্ত্তিক। ভালই বোধ হচ্চে সর্ব্ব-দা, আমার কি খুব অসুখ করেছিল?

সর্ব্ব। তা তোমার মনে পড়ছে না?

কার্ত্তিক। না, এ তোমরা কোথায় আমায় এনেছ বলত?

শিবরামপুরের একটা ঘরে শুয়ে ছিলাম—রাতে জেগে দেখি এক অচেনা যায়গায় এসেছি—মাথার শিয়রেও এক অচেনা মানুষ।

সর্ব্ব। অচেনা মানুষ! সরোজকে চিন্‌তে পার-নি?

কার্ত্তিক। প্রথমে পারিনি। কিন্তু কি করে যে এখানে এলাম তা আমার কিছুই মনে পড়্‌ছে না।

সর্ব্ব। তোমার অসুখ সারুক, তারপর বল্‌ব। যে ব্যাপার লাগিয়েছিলে তাতে আমাদেরই সব ভুল হয়ে গিয়েছিল তা তোমার! যাক, মুখে দুটো কুলি করে এই ওষুধটা দাও।

যথানির্দ্দিষ্ট কার্য্য সারিয়া সর্ব্বানন্দ বলিল, "আমি এখন চল্লাম।"

কার্ত্তিক ব্যস্ত হইয়া বলিল, "কোথায় যাচ্ছ?"

সর্ব্ব। ভয় নেই, তুমি ভাল জায়গাতেই আছ। বাগবাজারে ঠাকুরদার শ্বশুরবাড়ীতে আছ। এঁরা তোমার যা করেছেন তা কোন আত্মীয়তেও করে না।

কার্ত্তিক। তা ত' বুঝ্‌তেই পার্‌ছি; কিন্তু এখানে কেন আন্‌লে?

সর্ব্ব। সব কথা পরে জেনো ভাই, আর হয়তো আপনিই মনে পড়্‌বে। দু'দিন মাথাটা হতে বিকারের ঘোর কাটুক। তুমি ব্যস্ত হয়োনা, এঁরা তোমার আপনার লোক। আর সরোজ—

কার্ত্তিক। কৈ তিনি?

সর্ব্ব। তাকে ডেকে দিয়ে যাচ্ছি—বেচারী সারারাত জেগেছে।

কার্ত্তিক। না না ডেকো না—সর্ব্ব-দাদা, তুমি জেনেশুনে কেন আমায় এখানে নিয়ে এলে?

সর্ব্ব। আমি জেনেশুনেই এনেছি—ভালোর জন্যই এনেছি। সব কথা পরে বল্‌ব।

সর্ব্বানন্দ আর দাঁড়াইল না। কার্ত্তিক চুপ করিয়া শুইয়াছিল।

হঠাৎ মুক্ত গবাক্ষ-পথে বাহিরের দিকে চাহিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেল। বাহিরটা এত সুন্দর এত উজ্জ্বল হইল কি করিয়া! কোথা হইতে এই অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য আসিয়া ঐ রক্তাভ প্রভাত আকাশে, গৃহের ঐসব ছবিগুলির উপর ছড়াইয়া পড়িয়াছে! কার্ত্তিক অবাক হইয়া তাহার নূতন ফিরিয়া-পাওয়া নয়ন দুইটী দিয়া আলোক-সুধা পান করিতে লাগিল। তাহার অন্তরও আলোকে ভরিয়া উঠিল। বহুক্ষণ একদৃষ্টে আকাশের দিকে তন্ময়ভাবে চাহিয়া সে চুপ করিয়া রহিল। হঠাৎ কাহার পদশব্দে ফিরিয়া দেখে, সরোজ এবং আর একজন অপরিচিতা রমণী। কার্ত্তিকের সমস্ত দেহ কম্পিত হইয়া উঠিল। সে যেন একটা ভয়ানক ধাক্কা খাইয়া একেবারে শয্যার আর এক প্রান্তে সরিয়া গেল। তাহার খাটের শব্দ শুনিয়া সরোজ তাড়াতাড়ি নিকটে আসিয়া বলিল, "আপনি জেগেছেন?"

কার্ত্তিক উত্তর দিল না। আর কোন শব্দ না পাইয়া দ্বিতীয় রমণী বলিল, "উনি বোধ হয় আবার ঘুমিয়ে পড়েছেন।"

সরোজ। তবে যে সর্ব্ববাবু আমায় আস্‌তে বল্লেন! ডেকে দেখ্‌ব, সুকু?

সুকুমারী। না, ঘুম ভাঙ্গিয়ে কাজ কি! তুমি না হয় ব'স, আমি কাজ সারি না।

সুকুমারী চলিয়া গেল। সরোজ দু-একবার ইতস্ততঃ করিয়া একখানা চেয়ারে বসিয়া পড়িল। কার্ত্তিক ভয়ে ভয়ে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। এই সেই সরোজ! চির-ব্যবধানময় চিররহস্যময় সেই অন্ধ রমণী! ঐ সেই অন্ধনয়ন দুটী, যাহার অতল অন্ধকারের গোপন শক্তি তাহার উপর কত না অত্যাচার করিয়াছে। আজ যেন সেই শক্তিময়ী মূর্ত্তি ঝড়বৃষ্টির পর রৌদ্রোদ্ভাসিত অপসরণশীল মেঘের মত দূর দিগন্তে চলিয়া পড়িয়াছে।

সরোজকে নীরবে দেখিতে দেখিতে ধীরে ধীরে কার্ত্তিকের সমস্ত স্মৃতিই ফিরিয়া আসিতে লাগিল। এই ছয় সাত বৎসরের ভয়ানক দুর্য্যোগ তাহার মনের চতুর্দ্দিকে ছবির ন্যায় নৃত্য করিতে করিতে ঘিরিয়া ধরিল। কার্ত্তিকচন্দ্র ব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিল, "সরোজ, আর কেন, আমায় ছেড়ে দাও! একজন বাইরের মুক্তি দিয়েছে, তুমি ভিতরকার মুক্তিটাও দাও।"

সরোজ চমকিত হইয়া চেয়ারের হাতলটা চাপিয়া ধরিল। তাহার মুখ দিয়া একটী কথাও বাহির হইল না। কার্ত্তিক আবার বলিল, "এই এতবড় অত্যাচার আমি তোমার জন্য সহ্য কর্‌লাম—"

সরোজ। আমার জন্য!

কার্ত্তিক। হ্যাঁ, তোমারই জন্য—তোমারই জন্য আমার দৃষ্টি যেতে বসেছিল, তোমারই জন্য সব শক্তি হারাতে বসেছিলাম, এমন-কি তোমারই অন্তরের অন্ধকার মানুষটা আমাকে চির-অন্ধকারে ডুবিয়ে দিচ্ছিল, অন্তরে বাইরে আমি মরতে বসেছিলাম। কিন্তু ভগবান দয়া করে মেরে ধরে আমায় সব ভুলুচ্ছেন; আমি আবার আমার নিজেকে ফিরে পাচ্ছি। তুমি দয়া করে আমায় মুক্তি দাও।

সরোজের অন্ধনয়ন জ্বলিয়া উঠিল, কিন্তু পরক্ষণেই সে আলোক নিবিয়া গেল। সে দুইহস্তে মুখ ঢাকিয়া বলিল, "আমি—আমি, আমারই দোষ! তুমি নিজে এই অঘটন ঘটিয়ে আমার সব নষ্ট করে দেবার উদ্যোগ করে, আত্মীয়-স্বজন সকলের ওপর অত্যাচার করে এখন অন্ধ নারীর ওপর সব দোষ চাপাচ্ছ? আমি কি করেছি, কি কর্‌তে পারি আমি? কোথায় এককোণে পড়ে থাকৃতাম, কেউ আমার কথা জান্‌তেই পার্‌ত না। তুমিই আমার গোপনতা নষ্ট করে এখন সমস্ত দোষের বোঝা আমার কাঁধে চাপিয়ে দিচ্ছ! মানুষ এত অবিচারক এতবড়

নিষ্ঠুর হতে পারে তা জান্‌তাম না। আমি চক্ষু হারিয়েছিলাম কিন্তু নিজেকে হারাই নি; কিন্তু তুমি দস্যুর মত আমার তাও কেড়ে নিচ্ছিলে —ভগবান বাঁচিয়েছেন, নইলে—”

কার্ত্তিক আর থাকিতে পারিল না, কাঁদিতে কাঁদিতে উঠিয়া বসিয়া বলিল, “থাম—থাম, তুমি রাক্ষসটাকে আর জাগিও না। এ যে সর্ব্বগ্রাসী ক্ষুধা,—এতো দেবতার সুধার পিপাসা নয়! আমার মধ্যে এ লুকিয়ে ছিল, কিন্তু তুমিই ত’ একে জাগিয়ে ছিলে?”

সরোজ। না, আমি জাগাই নি—আমি ওকে চিনি না, জানি না। আমি অন্ধ, আমি সামান্য নারী—আমার কি ক্ষমতা যে রাক্ষস নিয়ে খেলা করি? তুমি নিজে তাকে জাগিয়েছিলে, ভগবান তাকে মার্‌ছেন। যে যা চায় ভগবান তাকে তাই দেন, তুমি দেবতাকে চাওনি, দৈত্যকে চেয়েছিলে তাই পেয়েছিলে; আমি কি চেয়েছিলাম তা অন্তর্য্যামী জান্‌তেন তাই সেই জিনিষ আমি পেয়েছি।

সরোজ নীরবে অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিল। কার্ত্তিক চাহিয়া চাহিয়া বলিল, “সরোজ, এই আমার নবপ্রভাতটাকে চোখের জল দিয়ে ম্লান করে দিও না। আলো যে এত সুন্দর তা ত’ জান্‌তাম না। অন্ধকার থেকে বেরিয়ে আমি বেঁচেছি। তুমি আমায় ভুলে যাও—রাত্রের দুঃস্বপ্নের মত আমাকে মন থেকে একেবারে দূর করে দাও। রাক্ষস বলে ভেবো মানুষ বলে নয়, দুঃখী বলে নয়, ব্যথিত বলে নয়—স্বেচ্ছাচারী অহঙ্কারী হত্যাকারী বলে মনে করো, তা-হ’লে আমায় ভুল্‌তে পারবে। ঘৃণা ক’র্‌তে চেষ্টা করো তাহ’লেই সব সহজ হয়ে আস্‌বে। আমি তোমায় ভয় কর্‌ছি, তুমি আমায় ঘৃণা ক’রো। বল, পার্‌বে?”

সরোজ চুপ করিয়া রহিল। কার্ত্তিক পুনরায় বলিল, “কেন পার্‌বে না? আমি কি মানুষ? আমি কি মানুষের মান্য জানি! ভক্তি

ভালবাসা আমার যে কিছুই নেই। নইলে এমনটা কি কেউ কর্‌তে পার্‌ত? আমি তোমার দোষ দিচ্ছি বটে, কিন্তু সেটা কেবল মনকে চোখ ঠারা হচ্ছে। তবু আমায় তাই কর্‌তে হবে, তোমায় ভয়ই কর্‌তে হবে, নইলে যে উপায় নেই, নইলে মুক্ত হবে কি করে?"

সরোজ উঠিয়া দাঁড়াইল, তারপর ধীরে ধীরে কার্ত্তিকের পায়ের কাছে বসিয়া পড়িয়া বলিল, "তুমি মুক্ত হও, সুস্থ হও, আমি যে চিরদিন ভগবানের কাছে এইটেই প্রার্থনা করে আস্‌ছি। তুমি যা আমায় দিয়েছিলে তাতে যে আমার কোন অধিকার নেই, এই কথাটাই যে চিরদিন আমি আপনাকে বুঝিয়েছি। আমি ত কখনো কিছু চাইনি, তুমিই ঝড়ের মত ঝাঁপিয়ে পড়ে আপনাকে দিয়ে সব উল্টে-পাল্টে দিয়েছ। কিন্তু আজ যখন শান্ত হয়েছ তখন তোমার পা ছুঁয়ে বল্‌ছি, আমি তোমার কাছ থেকে কিছু চাই না। তুমি যা দিয়েছিলে তা যে মৃত্যুর মত ভয়ঙ্কর কে তা সহ্য কর্‌বে? তুমি আমায় বিশ্বাস কর—আমি কিছু চাই না। তুমি ভুল বুঝ না, আমি কখনো কারও কাছে কিছু চাই-নি, চাইব না। ভগবান যখন আমায় অন্ধকারে ডুবিয়ে রেখেছেন, তখন তাই আমার স্বর্গ। কিন্তু তোমাকেও আমার এক অনুরোধ, তুমি যাকে ছেড়ে এসেছ তাকেই তোমার অন্তরের মানুষটি চাইছেন। এই ব্যারামের বিকারের অবস্থাতেও সেই তোমার অন্তর্য্যামীর কোলে বসেছিল, আমি দেখ্‌তে পেয়েছি। স্নেহ-ভালবাসা কি মানুষকে এমন করে পোড়ায়? তোমার ব্যাধির দুষ্ট ক্ষিদে সেরে গিয়েছে, এইবার সুস্থ হও। আমি যা পেয়েছি তাই আমার পরম লাভ,—তুমি আমার জন্য ভেবো না। আমি তোমার পা ছুঁয়ে বল্‌ছি আমার কোন দুঃখ নেই—আমাকে ভয় করার কিছু দরকার নেই।"

সরোজ কার্ত্তিকের পদস্পর্শ করিয়া প্রণাম করিল। কার্ত্তিক চুপ,

করিয়া রহিল। তাহার উত্তেজনা ধীরে ধীরে অপসৃত হইতেছিল, সরোজের অন্ধ নয়নের দিকে কিছুক্ষণ এক দৃষ্টে চাহিয়া শেষে নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "বাঁচ্‌লাম, সরোজ, তুমি আমায় বাঁচালে। তুমি যে হার মেনেছ, আগে হলে এইটেকেই বড় করে দেখ্‌তাম, কিন্তু তোমার পরাজয়কেই এখন আমার সব চাইতে ভয় হয়েছিল।"

সরোজ। আমায় ভয় কর্‌বার কিছু নাই—বরঞ্চ তোমাকেই তোমার ভয়ঙ্কর আত্মঘাতী শক্তিটাকেই আমার ভয় ছিল; কিন্তু তোমার মাথার শিয়রে দিনের পর দিন রাতের পর রাত কাটিয়ে আমার সব ভয় চলে গিয়েছে—আমি যে তোমার অন্তর্য্যামীর অন্তরের কথা টের পেয়েছি। সে যে কি চায়, কাকে চায়, তুমি এতদিন তা মনোযোগ দিয়ে শোন নি, তাই মরীচিকার পিছনে ছুটেছিলে। কিন্তু আর তাঁর কথা না-শুনবার যো নেই—তিনি জেগেছেন, ভগ্নী শৈল চিরায়ুষ্মতী হোক—সে জিতেছে। আমারও ভয় ভেঙ্গে গিয়েছে। এখন তোমার কোন ভয় নেই। ভয় যতদিন ছিল কেবলই পুরাণের হিরণ্যকশিপুর মত—কংশের মত—রাবণের মত তোমাকে ভয়ঙ্কর ভেবেছি, কেবলি তোমার প্রচণ্ড আকর্ষণে চারিদিকে তোমাকেই দেখেছি। ভগবান সে ভয় আমার কাটিয়ে দিয়েছেন—তাঁকে প্রণাম করি।

সরোজ উঠিয়া গবাক্ষের নিকটে গিয়া তাহার অন্ধনয়ন মুদিত করিয়া জোড়হস্তে প্রণাম করিল। তাহার দেহ মৃদু মৃদু কম্পিত হইতেছিল—যেন সে নয়ন না থাকাতে তাহার সমস্ত দেহ দিয়া দেব-আশীর্ব্বাদের আলোককে অন্তরের মধ্যে গ্রহণ করিল।

তারপর অতি আনন্দে তাহার ও কার্ত্তিকের দিনগুলি কাটিয়া গেল। শেষে একদিন সে সরোজকে বলিল, "সরোজ, বাড়ী যাব।"

সরোজ। শশি-দাকে বল।

কার্ত্তিক। বলেছি, সে বলে আরও দুদিন যাক।

সরোজ। তুমি ত এখন উঠ্‌তে পার না, এত তাড়াতাড়ি কেন?

কার্ত্তিক। সরোজ, আমি ক'দিন থেকে ভাব্‌ছি তুমি আমার সঙ্গে শৈলের কাছে চল, আমার হয়ে একটু ওকালতি কর্‌তে হবে।

সরোজ। ওগো অন্ধ মানুষ, তার কিছু দরকার হবে না।

কার্ত্তিক। না, সরোজ, হবে—আমি তার অন্তরটাকে যে একেবারে শুকিয়ে দিয়ে এসেছি। নৈলে সে একবারও আমার খোঁজ নিলে না।

সরোজ। যদি শুধু খোঁজ নিত তাহলেই ভয়ের কথা ছিল, যখন নেয়-নি তখন কোন ভয় নেই। তোমার বাবাও ত খোঁজ নেন নি, কিন্তু তিনি কি তোমায় ভুল্‌তে পারেন? তুমি যে একেবারে তাঁর বুকের মানুষটার অংশ। আমরা প্রতিদিন তাঁদের পত্র দিয়েছি। আর সর্ব্ব-দাদা যা দেখে এসেছেন তা যেদিন শুন্‌বে সেদিন তুমি এক মিনিটও এখানে থাক্‌তে পার্‌বে না।

কার্ত্তিক। আমি তাই শুন্‌ব সরোজ, তাই তুমি আমায় বল। বাবা আমার জন্য কি করেছেন? মা গিয়েছেন, বাবা আছেন, তবু আমি এমন পিতৃমাতৃহারার মত হয়ে রয়েছি কেন? তিনি কেন এলেন না? আর শৈল—আমার সর্ব্বংসহা শৈলজা—না সরোজ, আমি আজই যাব, তুমি নিয়ে চল।

সরোজ হাসিয়া বলিল, "অন্ধ মানুষের উপর নির্ভর কর্‌ছে—"

কার্ত্তিক। খোঁড়ামানুষে। তুমি সর্ব্বদাদাকে ডাকিয়ে পাঠাও—রাস্‌কেলটা সারাদিন আমার ওপর পাহারা বসিয়ে আমাকে সত্যি-সত্যি খোঁড়া করে দেবে দেখ্‌ছি। না, আর তা হচ্চে না—আমি শুয়ে থাক্‌ব না—এই আমি উঠ্‌লাম—আর শোবো না।

কার্ত্তিক সত্যসত্যই উঠিয়া দাঁড়াইল; সরোজ তাড়াতাড়ি নিকটে

আসিয়া হাত ধরিয়া বলিল, "চল, ছাতে গিয়ে বসবে, বেলা পড়ে এসেছে।"

কার্ত্তিককে একখানা আরাম-কেদারায় শোওয়াইয়া সরোজ বলিল, "তুমি চুপ করে শুয়ে থাক, আমি আবার এসে নিয়ে যাব।"

সরোজ চলিয়া গেলে কার্ত্তিক সন্ধ্যাকাশের দিকে চাহিয়া একটা গভীর নিশ্বাস ফেলিল।

বেল-যুঁই-চামেলী সেই কৃত্রিম উদ্যানে আবার তেমনি শোভায় তেমনি গন্ধে ফুটিয়া উঠিয়াছে। সমস্ত স্থানটির মধ্যে একটা অপূর্ব্ব নিপুণতার একটা আন্তরিক স্নেহের—একটা গভীর অচঞ্চল আনন্দের অস্তিত্ব যেন সমস্ত লতায়-পাতায়-পুষ্পে-গন্ধের মধ্যে জাগিয়া রহিয়াছে। এই উদ্যানখানি যেন স্বয়ং সরোজ। কার্ত্তিক হাত বাড়াইয়া একঝাড় জুঁই-পুষ্পের স্তবক স্পর্শ করিতে করিতে মনে মনে সরোজকে অজস্র আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিল।

তারপর শুভদিনে কার্ত্তিক, সরোজ ও সর্ব্বানন্দকে লইয়া শিবরামপুর যাত্রা করিল। গ্রামে পৌঁছিয়াই সরোজ ও সর্ব্বানন্দকে শৈলজার নিকট পাঠাইয়া দিয়া স্বয়ং পিতার নিকট চলিয়া গেল।

সর্ব্বানন্দ ও তৎপশ্চাতে একজন অপরিচিত রমণীকে দেখিয়া শৈলজা বিস্মিত হইয়া বলিল, "একি সর্ব্ব-দাদা! ইনি কে?"

সর্ব্বানন্দ। ইনি সন্ধির দূত। ইনিই তোমার সরোজ-দিদি, এঁকে প্রণাম কর।

শৈলজা প্রণাম করিতেই সরোজ হাত বাড়াইয়া বলিল, "আমি যে অন্ধ ভাই, তোমার হাতখানা আমায় দাও।"

শৈলজা তাহার হাত ধরিতেই সর্ব্বানন্দ বলিল, "আমি এখন খুড়োমশাইয়ের কাছে চল্লাম, সরোজ!"

সরোজ হাসিয়া বলিল, "যাও—কোন ভয় নেই, আমি সব ঠিক করে নেব।"

সর্ব্বানন্দ চলিয়া গেলে সরোজ বলিল, "কোথায় বস্‌ব ?"

শৈলজা তাহাকে একখানা পালঙ্কে বসাইয়া বলিল, "আমি আপনার বিষয় অনেক শুনেছি কিন্তু আপনাকে কখনো দেখিনি।"

সরোজ। এখন দেখতেও পেলে, কিন্তু আমি কখনই তোমায় দেখ্‌তে পাব না। তোমার মুখখানায় আমায় একবার হাত দিতে দেবে ?

শৈলজা তাহার হাতখানা লইয়া তাহার মুখের উপর রাখিতেই সরোজ তাহাকে বুকের মধ্যে টানিয়া লইয়া বলিল, "তোমার ত' জয় হবেই ভাই—তোমার পলাতক মানুষটিকে এনে পৌছে দিয়েছি; আমাদের শেষ চিঠি পেয়েছিলে ?"

শৈলজা। পেয়েছিলাম। আপনাকে প্রথমে কত কি ভেবেছি, কিন্তু আপনাকে দেখে কিছুতেই বুঝ্‌তে পার্‌ছি না যে আপনি কি করে ওঁকে এমন করেছিলেন। আপনার মধ্যে এতবড় আগুন কোথায় ছিল যাতে ঐ মানুষটা এমন হয়ে পুড়ে ছাই হতে বসেছিল ?

সরোজ। ভুল, ভাই, ভুল—আমি জ্ঞানতঃ কোন অপরাধে অপরাধী নই ত'! তবে বোধ হয় যার জীবন ঠিক খড়ের গাদার মত, পুড়বার শক্তি তারই থাকে,—একটা স্ফুলিঙ্গ বা দিয়াশলাইএর কাঠির কতটুকু শক্তি যে, সে অগ্নিকাণ্ড করে ?

তারপর শৈলজা ও সরোজ বসিয়া বসিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া অনেক কথাবার্ত্তা কহিল। শেষে সরোজ বলিল, "ভাই, মান অভিমান কিছুই নয়, সেইজন্য বল্‌ছি ও-সব কথা জীবনে কখনো তুলো না। ওতে তুমিও সুখী হবে না, সেও নয়। কি হবে ছুটো অন্যায়কে মনে রেখে ? দুঃখ-টাকেই চিরদিন মনে রাখ্‌তে হবে, সুখকে নয় ? তুমি যা হারিয়েছিলে

বলে মনে করে রেখেছ, তাই ভগবানের খাতায় জমার ঘরে পড়েছিল সে খোঁজ ত' তুমি পাওনি! উনি তোমার কাছ থেকে চলে গিয়ে তোমার সেই জমার ভাণ্ডারটা নিজে ঘাড়ে করে এনেছেন। এখন স্বেচ্ছাবন্দীকে বন্দী কর। আশীর্ব্বাদ করি, এবারকার বন্ধন যেন মঙ্গলের হয়।"

শৈল। কিন্তু তুমি? তোমার কি হল?

সরোজ। আমি? আমার জন্য ভেবো না, আমি লাভই করেছি। যে লোকসান হতে বসেছিল তা হতেই ভগবান এমন বস্তু লাভ করিয়ে দিয়েছেন, যাতে আমার এই ভিতরকার চির-অন্ধকার একেবারে উজ্জ্বল হয়ে গিয়েছে।

শৈল। কি তা?

সরোজ। তা না-হয় নাই শুন্‌লে।

শৈল। তা হবে না দিদি, আমায় শুন্‌তেই হবে।

সরোজ। আমি যদি না বলি?

শৈল। তাহলে আমার যেমন হচ্ছে সেই রকম একটা-কিছু অনুমান করে নেব। না সরোজ-দিদি, আমায় বল্‌তেই হবে!

সরোজ কিছুক্ষণ ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, "হয়তো তাতে তোমার দুঃখ হবে।"

শৈল। তা হোক, তবু আমি শুন্‌ব।

শৈলজা ও সরোজ মুখোমুখী হইয়া বসিয়াছিল। সরোজ খুব জোরে শৈলজার হাতখানা চাপিয়া ধরিল। শৈলজা একদৃষ্টে সরোজের অন্ধ চক্ষুর দিকে চাহিয়া চাহিয়া বলিল, "বল।"

সরোজ সজলনয়নে বলিল, "জানি না, তুমি আমার কথা বুঝবে কি না—তবু তোমায় বল্‌তেই হবে; কারণ তোমার সঙ্গে একটা বুঝা-পড়া হওয়ার দরকার। আমি যা পেয়েছি তার নাম ভালবাসতে পারা।

সংসারে যারা স্নেহ করতে,—স্নেহ দিতে পায় না তারাই সব-চাইতে হত-ভাগ্য। আমি যে তাঁকে ভালবাসতে পেরেছি তাই আমার পরম ভাগ্য। আমার মত অন্ধ হতভাগার অন্ধকার মনের মধ্যে কেউ কি ঢুকতে যেতো?—কেউ না। উনিই সেই অন্ধকারকে ভেদ করে ঢুকেছিলেন। সেইটেই আমার পরম লাভ। আমি আর-কিছু চাই না—চাইব না; কারণ আর কিছু পাওয়া আমার উচিত নয়—আমায় সইবে না।"

শৈল। কে বল্লে সইবে না—আমি বলছি নিশ্চয় সইবে! আমি তোমায় যেতে দেবনা!

সরোজ। ভুল বুঝ না বোন্—আমার এর-চাইতে বেশী পাওয়া হবে না, আমি যা চাই তা কি কারুর হাতে করে এনে দেবার সাধ্য আছে? কতটুকু দিয়ে তুমি আমায় সন্তুষ্ট করবে? তুমি ত' ভাই মেয়েমানুষ—তুমি ত জান, কত-বড় আমাদের ক্ষিদে! সেই ক্ষিদে তুমি কতটুকু দিয়ে পুরুবে? তার চাইতে এই যা পেয়েছি এইটুকু যাতে না হারাই তাই আমায় ক'রতে হবে। ভালবাসা এসেছে, তাকে পূর্ণভাবে কাজে লাগাতে হবে। যে না ভালবাসতে জানে সে কি দুঃখের সংসারে কোন কাজে লাগে? সেই শুকনো প্রাণ যে কেবল শুকিয়ে দেবার জন্যই সংসারে ঘুরে মরে। তুমি বেশ করে বুঝে দেখ, তুমি যা দিতে চাচ্ছ তাতে আমার অন্তর ভরবে না—অতএব মিছে চেষ্টা ক'র না। উনিও তাতে কষ্ট পাবেন, আমিও পাব।

শৈলজা চাহিয়া চাহিয়া হঠাৎ সরোজের গলা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল। অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে হঠাৎ বলিল, "এইবার বুঝেছি, তুমি কি! তুমি এমন নইলে ঐ অতবড় প্রচণ্ড শক্তিকে এমনভাবে জাগাতে পার! দিদি, তুমি এ-দেশের এই রাতদিনের মানুষ নও—যে দেশ আলো-আঁধারের

একেবারে ওপারে, তুমি সেই দেশ থেকে এসেছ। তোমার পায়ের ধূলো নিয়ে—"

"থাম, থাম—আমিও মানুষ ভাই—"

শৈলজা থামিল না ; সরোজের কোলের মধ্যে মুখ লুকাইয়া আনন্দে কাঁদিতে লাগিল। আর সেই অশ্রুবন্ধনে এই দুই রমণীর চিত্ত চির-কালের মত আবদ্ধ হইয়া গেল।

উপসংহার

[আবার আলোকে]

জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লা-ষষ্ঠী তিথি। আজ হিন্দুকুললক্ষ্মীদের আরণ্যক ষষ্ঠী-ব্রত। বাঙ্গলাদেশের ঘরে ঘরে আজ মহা আনন্দ-কোলাহল। জামাতৃ-অর্চ্চন এই ব্রতের প্রধান অঙ্গ হইলেও সন্তানবতীগণের পক্ষে আজ পুত্র-কন্যাগণের মঙ্গলের জন্য কেবলমাত্র কৃচ্ছ্র-ব্রত আচরণ করিলে চলে না, আজ তাহাদিগকেই বিশেষভাবে আহারাদির দ্বারা সন্তুষ্ট করিতে হয়।

শিবরামপুরের ষষ্ঠীতলায় আজ মহাধূম। ভারে ভারে দধি দুগ্ধ, ছানা চিনি ইত্যাদির নৈবেদ্য, কদলি, আম্র, পনস্যাদি বহু প্রকারের ফল, এমন-কি ছাগাদি পশুবলি পর্য্যন্ত ষষ্ঠীবৃক্ষের তলে উপহৃত হইতেছে। সন্তানবতীগণ কলার 'পেটো'য় করিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দধিভাণ্ড, আম্রাদি ফল ক্ষীর-ছানা প্রভৃতি মিষ্টান্ন এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তীরধনুক সাজাইয়া ভারে ভারে ষষ্ঠীদেবীর নিকট উপস্থিত করিতেছেন। স্থানে স্থানে বর্ষীয়সী স্ত্রীলোক-গণ বসিয়া ষষ্ঠীর 'কথা' বলিতেছেন, এবং এক একগাছি হলুদরঞ্জিত সূত্র ধরিয়া পুত্রবতী কুললক্ষ্মীগণ, সেই কথা শুনিতেছেন। কেহ কেহ বাঁশের শীষ দূর্ব্বা কদলী ইত্যাদি মাঙ্গলিক ফল-সমন্বিত তালবৃন্তের দ্বারা পুত্রকন্যা-গণকে 'অমুক মাসে অমুক ষষ্ঠী যাট্ বাট্ ষাট্', ইত্যাদি মন্ত্রের সহিত ব্যজন করিয়া শেষে আপনার উদরের উপর বাতাস দিতেছেন। পরে হলুদরঞ্জিত সূত্রখণ্ডের দ্বারা তাহাদের বাঁধিতেছেন। বিবিধ বাদ্যোদ্যমের

সহিত জমিদার-গৃহ হইতে ষষ্ঠীর পূজোপহার আসিয়া উপস্থিত হইল। প্রতি বৎসরই পুরোহিত আসিয়া পূজা দিয়া যাইতেন, এবং জমিদার-গৃহ হইতে একজন বর্ষীয়সী আত্মীয়া আসিয়া আশীর্ব্বাদাদি লইয়া যাইতেন; কিন্তু অদ্য শৈলজা কয়েকজন আত্মীয়ার সহিত স্বয়ং আসিয়াছে। যদিও সে পুত্রহারা, তথাপি ষষ্ঠীব্রত একবার লইলে আর ফেলিতে নাই, ফেলিলে পরজন্মে রাক্ষসী হয়—এই শাসন-বাক্যের জন্য সে ষষ্ঠীব্রত ত্যাগ করিতে পারে নাই। কিন্তু তাহার স্বয়ং আসিবার কারণ কেহই অনুমান করিতে না পারিয়া সেই পবিত্র বটবৃক্ষের তলস্থ সমবেত সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া গেল। যাহাদের সহিত শৈলজার বিশেষ পরিচয় ছিল, তাহারা তাহাকে ঐ বিষয়ে প্রশ্ন করিলে সে ম্লানহাস্যে তাহাদের আপ্যায়িত করিয়া বলিল, "কেন? তোমরা যদি আস্‌তে পার, আমিই কি এমন রাজরাজেশ্বরী যে হেঁটে মার চরণে পূজা দিয়ে যেতে পারব না। দেবতার কাছে আবার বড়লোক গরীবলোক আছে নাকি ভাই?"

সকলেই সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে ঘিরিয়া বসিল। শৈলজার অমায়িক ব্যবহারে চিরদিনই তাহারা তাহাকে ভালবাসিত। বিশেষতঃ সে যেদিন হইতে একমাত্র পুত্রটিকে হারাইয়াছে সেইদিন হইতে সমস্ত পুত্রহারা এবং পুত্রবতীগণের সমবেদনার পাত্রী হইয়াছে। আর পুত্রের মৃত্যুর পরও আজ তাহাকে এত ভক্তিভরে "মা ষষ্ঠী"র পূজা দিতে দেখিয়া অনেক পুত্রহারাই গোপনে অশ্রুমোচন করিল!

পুরোহিত পূজা শেষ করিলে, শৈলজার কোন প্রৌঢ়া আত্মীয়া শৈলকে আশীর্ব্বাদাদি প্রদান পূর্ব্বক মাঙ্গলিক তালবৃন্তখানি হস্তে লইয়া পুনরায় তাহা রাখিয়া দিলেন। শৈলজা অগ্রসর হইয়া বলিল, "তা হবে না তিনুপিসী, আমার পেটে বাতাস দাও! আমার দেবু যায় নি, সে

আছে, লুকিয়ে আছে।" তিনুপিসী কাঁদিয়া পুনরায় তালবৃন্ত তুলিয়া লইলেন এবং শৈলজা তাহার পার্শ্বদেশ উন্মুক্ত করিলে তাহার উপর ব্যজন করিলেন। আর একজন বর্ষীয়সী আর্দ্রকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "এক গিয়েছে সাত হবে মা, দাও তিনু ওর কোঁকে হাওয়া।"

পূজা সারিয়া, গৃহস্থদের বধূর চুরি করিয়া খাওয়া ও নিরীহ কৃষ্ণবর্ণ মার্জ্জারের উপর দোষারোপঘটিত 'ষষ্ঠীর কথা' ভক্তিভরে শ্রবণ করিয়া 'জয় দেবি জগন্মাতা' ইত্যাদি মন্ত্রে প্রণামান্তে শৈলজা আত্মীয়াগণের সহিত প্রস্থান করিল।

কার্ত্তিকচন্দ্র আত্মীয়াগণের নিকট হইতে আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া অপেক্ষা করিতেছিল। শৈলজা ও তাহার সঙ্গিনীগণ গৃহে পৌঁছিলে কার্ত্তিক একে একে সকলের নিকট হইতে আশীর্ব্বাদ, মিষ্টান্ন ও বস্ত্রাদি গ্রহণ করিয়া শৈলজার নিকটে উপস্থিত হইল। সালঙ্কৃতা পট্টবস্ত্রপরিহিতা শৈলজা তাহাকে প্রণাম করিয়া উঠিয়া বলিল, "চল, একবার বাবার কাছে যাই।" কার্ত্তিক দুঃখিত ভাবে বলিল, "মা নেই, বাবার কাছে আজকের দিনে গিয়ে কি হবে?"

শৈল। তিনিই একাধারে মা বাবা দুই।

কার্ত্তিক। আমি সকালে উঠেই তাঁকে প্রণাম করে এসেছি।

শৈল। তা হোক, তবু আর একবার চল, একসঙ্গে গিয়ে প্রণাম করে আসি।

কার্ত্তিক। চল, কিন্তু তিনি হয়তো কেঁদে ফেল্‌বেন, আমি তা সইতে পার্‌ব না।

শৈল। তিনি তোমার মত কিনা, তাই একটুতেই কেঁদে ফেল্‌বেন। চল, ছেলেমানুষী ক'র না।

কার্ত্তিক আর তর্ক না করিয়া শৈলজার সহিত পিতার নিকট

উপস্থিত হইল। পুত্র ও পুত্রবধূকে একসঙ্গে প্রণাম করিতে দেখিয়া শিবচন্দ্র ন্যায়রত্ন তাঁহার ন্যায়শাস্ত্রের যুক্তিতর্ক প্রমাণ বস্তুবিচার সমস্ত বিস্মৃত হইয়া আনন্দে অশ্রুগদ্‌গদ কণ্ঠে তাহাদের আশীর্ব্বাদ করিয়া পুত্রবধূকে বলিলেন, "মা তোমার যদি জয় না হবে তাহলে যে সমস্ত বিশ্বরচনাই ভ্রমসংকুল হয়ে যাবে। বাবা কার্ত্তিক, তুমি যে আমার মাকে এতদিন পরে সুখী করতে পেরেছ এতেই আমার সংসারের সমস্ত অভীষ্ট সিদ্ধ হয়েছে। আজ তোমাদের একত্রে দেখে তোমার গর্ভধারিণীর জন্যে আমার খুবই দুঃখ হচ্ছে। কিন্তু সে স্বর্গে গিয়েছে, তার জন্য বৃথা শোক করার দরকার নেই। তোমরা যে সুখী হয়েছ এতে সে পরলোকেও নিশ্চয় সুখানুভব করছে। কিন্তু আজ আমার এখানেই তোমাদের খেতে হবে; এই দেখ, তোমাদের জন্যে আমি নিজেই সব জোগাড় করে রেখেছি।" বধূ শ্বশুরের কথা শুনিয়া অশ্রু মুছিয়া তৎক্ষণাৎ গৃহকার্য্যে মনোনিবেশ করিল, এবং শ্বশুর ও স্বামীকে আহার করাইয়া স্বয়ং তাঁহাদের প্রসাদ গ্রহণ করিল।

বৈকালে কার্ত্তিক একখানা পত্র হস্তে শৈলজার নিকটে গিয়া বলিল, "শৈল, এই মাসের ২৭শে সর্ব্বদার বিয়ে; আমি বরের পক্ষ থেকে তোমায় নিমন্ত্রণ করছি, আর এই দেখ হচ্ছে কনের পক্ষ থেকে সরোজবাসিনী দেবী তোমায় নিমন্ত্রণ করছে। দেখ দেখি চিঠিখানা খুলে।"

শৈলজা পত্র পাঠ করিয়া বলিল, হ্যাঁ, তাই বটে।"

কার্ত্তিক। তা হলে তুমি কোন্ পক্ষে যাচ্ছ? আমার ত' সদলবলে বরের বাড়ী যেতে হচ্ছে, কারণ বর ত' তিন কুলে কেউ ... বিশেষতঃ তার জ্ঞাতি-কুটুম্ব কেউ তেমন আস্‌ছেও না। তার ... বলতে আমি, আত্মীয়া বলতে তুমি এ তোমার আমার খু... মাসীপিসীরা। এখন কি করবে?

শৈল। সর্ব্বদাদার যেমন কাণ্ড, খবরাখবর নেই—ব্যাস্, বিয়ে কর্‌তে চল্লেন। আমার দু'পক্ষই রাখ্‌তে হবে, চল। কবে যেতে হবে?

কার্ত্তিক। তোমার যেদিন অভিরুচি—আমার ত' কালই যেতে হচ্চে।

শৈল। তুমি ত' গিয়ে সবই কর্‌বে মেয়েমানুষ না গেলে তোমাদের যজ্ঞিকাজের যা দশা হবে তাত' জানি। যাক্ তা'হলে, এত আগে থাক্‌তে সবাইকে নিয়ে গিয়ে কাজ নেই, তিনুপিসী, সুবুমাসী আর রতন কুমুদী দুই ঝি নিয়ে যাওয়া যাক; তারপর সময় কালে আর যাদের দরকার বুঝ্‌ব, ডেকে পাঠাব।

কার্ত্তিক। তাহ'লে তুমি ত যাচ্ছ?

শৈল। তা না হলে তুমি কি নিজে বরণডালা মাথায় কর্‌বে নাকি?

কার্ত্তিক। এতবড় আস্পর্দ্ধা তোমার! আমাদের জন্যই ত বরণ-ডালা, আমাদেরই ত বরণ আগে। তোমরা আবার কাদের বরণ কর্‌ব, আমাদেরই তোমরা চিরদিন বরণ করে থাক।

শৈল। ঐ অহংকারেই ত' তোদের এতটা বাড় বেড়েছে।

কার্ত্তিক। তোমরা যদি আমায় চিরদিন পূজাই কর্‌তে পার তাহ'লে আমরা কি দয়া করে সেই পূজা নেবার পরিশ্রমটুকু কর্‌তে পার্‌ব না?

শৈল। অনুগ্রহ করে পূজা নিতে পার বটে কিন্তু সব সময় যে পূজার উপযুক্ত থাক্‌তে পার না, এটেই দুঃখ।

এই কথায় হঠাৎ কার্ত্তিকের হাস্যোজ্জ্বল মুখের সমস্ত উজ্জ্বলতা যেন লুপ্ত হইয়া গেল। শৈলজাও তাহা লক্ষ্য করিয়া তৎক্ষণাৎ করজোড়ে কহিল, "ক্ষমা কর, আর আমি এমন কথা বল্‌ব না।"

কার্ত্তিক। ক্ষমা! ক্ষমা কেন শৈল? আমি তোমায় এই কথার

উপসংহার

[আবার আলোকে]

জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লা-ষষ্ঠী তিথি। আজ হিন্দুকুললক্ষ্মীদের আরণ্যক ষষ্ঠী-ব্রত। বাঙ্গলাদেশের ঘরে ঘরে আজ মহা আনন্দ-কোলাহল। জামাতৃ-অর্চ্চন এই ব্রতের প্রধান অঙ্গ হইলেও সন্তানবতীগণের পক্ষে আজ পুত্র-কন্যাগণের মঙ্গলের জন্য কেবলমাত্র কৃচ্ছ্র-ব্রত আচরণ করিলে চলে না, আজ তাহাদিগকেই বিশেষভাবে আহারাদির দ্বারা সন্তুষ্ট করিতে হয়।

শিবরামপুরের ষষ্ঠীতলায় আজ মহাধূম। ভারে ভারে দধি দুগ্ধ, ছানা চিনি ইত্যাদির নৈবেদ্য, কদলি, আম্র, পনসাদি বহু প্রকারের ফল, এমন-কি ছাগাদি পশুবলি পর্য্যন্ত ষষ্ঠীবৃক্ষের তলে উপহৃত হইতেছে। সন্তানবতীগণ কলার 'পেটো'য় করিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দধিভাণ্ড, আম্রাদি ফল ক্ষীর-ছানা প্রভৃতি মিষ্টান্ন এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তীরধনুক সাজাইয়া ভারে ভারে ষষ্ঠীদেবীর নিকট উপস্থিত করিতেছেন। স্থানে স্থানে বর্ষীয়সী স্ত্রীলোক-গণ বসিয়া ষষ্ঠীর 'কথা' বলিতেছেন, এবং এক একগাছি হলুদরঞ্জিত সূত্র ধরিয়া পুত্রবতী কুললক্ষ্মীগণ, সেই কথা শুনিতেছেন। কেহ কেহ বাঁশের শীষ দূর্ব্বা কদলী ইত্যাদি মাঙ্গলিক ফল-সমন্বিত তালবৃন্তের দ্বারা পুত্রকন্যা-গণকে 'অমুক মাসে অমুক ষষ্ঠী যাট্ ষাট্ ষাট্', ইত্যাদি মন্ত্রের সহিত ব্যজন করিয়া শেষে আপনার উদরের উপর বাতাস দিতেছেন। পরে হলুদরঞ্জিত সূত্রখণ্ডের দ্বারা তাহাদের বাঁধিতেছেন। বিবিধ বাদ্যোদ্যমের

সহিত জমিদার-গৃহ হইতে ষষ্ঠীর পূজোপহার আসিয়া উপস্থিত হইল। প্রতি বৎসরই পুরোহিত আসিয়া পূজা দিয়া যাইতেন, এবং জমিদার-গৃহ হইতে একজন বর্ষীয়সী আত্মীয়া আসিয়া আশীর্ব্বাদাদি লইয়া যাইতেন; কিন্তু অদ্য শৈলজা কয়েকজন আত্মীয়ার সহিত স্বয়ং আসিয়াছে। যদিও সে পুত্রহারা, তথাপি ষষ্ঠীব্রত একবার লইলে আর ফেলিতে নাই, ফেলিলে পরজন্মে রাক্ষসী হয়—এই শাসন-বাক্যের জন্য সে ষষ্ঠীব্রত ত্যাগ করিতে পারে নাই। কিন্তু তাহার স্বয়ং আসিবার কারণ কেহই অনুমান করিতে না পারিয়া সেই পবিত্র বটবৃক্ষের তলস্থ সমবেত সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া গেল। যাহাদের সহিত শৈলজার বিশেষ পরিচয় ছিল, তাহারা তাহাকে ঐ বিষয়ে প্রশ্ন করিলে সে ম্লানহাস্যে তাহাদের আপ্যায়িত করিয়া বলিল, "কেন? তোমরা যদি আস্তে পার, আমিই কি এমন রাজরাজেশ্বরী যে হেঁটে মার চরণে পূজা দিয়ে যেতে পারব না। দেবতার কাছে আবার বড়লোক গরীবলোক আছে নাকি ভাই?"

সকলেই সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে ঘিরিয়া বসিল। শৈলজার অমায়িক ব্যবহারে চিরদিনই তাহারা তাহাকে ভালবাসিত। বিশেষতঃ সে যেদিন হইতে একমাত্র পুত্রটিকে হারাইয়াছে সেইদিন হইতে সমস্ত পুত্রহারা এবং পুত্রবতীগণের সমবেদনার পাত্রী হইয়াছে। আর পুত্রের মৃত্যুর পরও আজ তাহাকে এত ভক্তিভরে "মা ষষ্ঠী"র পূজা দিতে দেখিয়া অনেক পুত্রহারাই গোপনে অশ্রুমোচন করিল!

পুরোহিত পূজা শেষ করিলে, শৈলজার কোন প্রৌঢ়া আত্মীয়া শৈলকে আশীর্ব্বাদাদি প্রদান পূর্ব্বক মাঙ্গলিক তালবৃন্তখানি হস্তে লইয়া পুনরায় তাহা রাখিয়া দিলেন। শৈলজা অগ্রসর হইয়া বলিল, "তা হবে না তিনুপিসী, আমার পেটে বাতাস দাও! আমার দেবু যায় নি, সে

আছে, লুকিয়ে আছে।” তিনুপিসী কাঁদিয়া পুনরায় তালবৃন্ত তুলিয়া লইলেন এবং শৈলজা তাহার পার্শ্বদেশ উন্মুক্ত করিলে তাহার উপর ব্যজন করিলেন। আর একজন বর্ষীয়সী আর্দ্রকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, “এক গিয়েছে সাত হবে মা, দাও তিনু ওর কোঁকে হাওয়া।”

পূজা সারিয়া, গৃহস্থদের বধূর চুরি করিয়া খাওয়া ও নিরীহ কৃষ্ণবর্ণ মার্জ্জারের উপর দোষারোপঘটিত ‘ষষ্ঠীর কথা’ ভক্তিভরে শ্রবণ করিয়া ‘জয় দেবি জগন্মাতা’ ইত্যাদি মন্ত্রে প্রণামান্তে শৈলজা আত্মীয়াগণের সহিত প্রস্থান করিল।

কার্ত্তিকচন্দ্র আত্মীয়াগণের নিকট হইতে আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া অপেক্ষা করিতেছিল। শৈলজা ও তাহার সঙ্গিনীগণ গৃহে পৌঁছিলে কার্ত্তিক একে একে সকলের নিকট হইতে আশীর্ব্বাদ, মিষ্টান্ন ও বস্ত্রাদি গ্রহণ করিয়া শৈলজার নিকটে উপস্থিত হইল। সালঙ্কৃতা পট্টবস্ত্রপরিহিতা শৈলজা তাহাকে প্রণাম করিয়া উঠিয়া বলিল, “চল, একবার বাবার কাছে যাই।” কার্ত্তিক দুঃখিত ভাবে বলিল, “মা নেই, বাবার কাছে আজকের দিনে গিয়ে কি হবে?”

শৈল। তিনিই একাধারে মা বাবা দুই।

কার্ত্তিক। আমি সকালে উঠেই তাঁকে প্রণাম করে এসেছি।

শৈল। তা হোক, তবু আর একবার চল; একসঙ্গে গিয়ে প্রণাম করে আসি।

কার্ত্তিক। চল, কিন্তু তিনি হয়তো কেঁদে ফেল্‌বেন, আমি তা সইতে পার্‌ব না।

শৈল। তিনি তোমার মত কিনা, তাই একটুতেই কেঁদে ফেল্‌বেন। চল, ছেলেমানুষী ক’র না।

কার্ত্তিক আর তর্ক না করিয়া শৈলজার সহিত পিতার নিকট

উপস্থিত হইল। পুত্র ও পুত্রবধূকে একসঙ্গে প্রণাম করিতে দেখিয়া শিবচন্দ্র ন্যায়রত্ন তাঁহার ন্যায়শাস্ত্রের যুক্তিতর্ক প্রমাণ বস্তুবিচার সমস্ত বিস্মৃত হইয়া আনন্দে অশ্রুগদ্‌গদ কণ্ঠে তাহাদের আশীর্ব্বাদ করিয়া পুত্রবধূকে বলিলেন, "মা, তোমার যদি জয় না হবে তাহলে যে সমস্ত বিশ্বরচনাই ভ্রমসংকুল হয়ে যাবে। বাবা কার্ত্তিক, তুমি যে আমার মাকে এতদিন পরে সুখী করতে পেরেছ এতেই আমার সংসারের সমস্ত অভীষ্ট সিদ্ধ হয়েছে। আজ তোমাদের একত্রে দেখে তোমার গর্ভধারিণীর জন্যে আমার খুবই দুঃখ হচ্ছে। কিন্তু সে স্বর্গে গিয়েছে, তার জন্য বৃথা শোক করার দরকার নেই। তোমরা যে সুখী হয়েছ এতে সে পরলোকেও নিশ্চয় সুখানুভব করছে। কিন্তু আজ আমার এখানেই তোমাদের খেতে হবে; এই দেখ, তোমাদের জন্যে আমি নিজেই সব জোগাড় করে রেখেছি।" বধূ শ্বশুরের কথা শুনিয়া অশ্রু মুছিয়া তৎক্ষণাৎ গৃহকার্য্যে মনোনিবেশ করিল, এবং শ্বশুর ও স্বামীকে আহার করাইয়া স্বয়ং তাঁহাদের প্রসাদ গ্রহণ করিল।

বৈকালে কার্ত্তিক একখানা পত্র হস্তে শৈলজার নিকটে গিয়া বলিল, "শৈল, এই মাসের ২৭শে সর্ব্বদার বিয়ে; আমি বরের পক্ষ থেকে তোমায় নিমন্ত্রণ করছি, আর এই দেখ হচ্ছে কনের পক্ষ থেকে সরোজ-বাসিনী দেবী তোমায় নিমন্ত্রণ করছেন। দেখ দেখি চিঠিখানা খুলে।"

শৈলজা পত্র পাঠ করিয়া বলিল, "হ্যাঁ, তাই বটে।"

কার্ত্তিক। তা হলে তুমি কোন্ পক্ষে যাচ্ছ? আমার ত' সদলবলে বরের বাড়ী যেতে হচ্ছে, কারণ বর ত' তিন কুলে কেউ নেই, বিশেষতঃ তার জ্ঞাতি-কুটুম্ব কেউ তেমন আসছেও না। তার আত্মীয় বল্‌তে আমি, আত্মীয়া বল্‌তে তুমি এ তোমার আমার খুড়ী মাসীপিসীরা। এখন কি করবে?

শৈল। সর্ব্বদাদার যেমন কাণ্ড, খবরাখবর নেই—ব্যাস্, বিয়ে করতে চল্লেন। আমার দু'পক্ষই রাখ্‌তে হবে, চল। কবে যেতে হবে?

কার্ত্তিক। তোমার যেদিন অভিরুচি—আমার ত' কালই যেতে হচ্চে।

শৈল। তুমি ত' গিয়ে সবই করবে মেয়েমানুষ না গেলে তোমাদের যজ্ঞিকাজের যা দশা হবে তাত' জানি। যাক্ তা'হলে, এত আগে থাক্‌তে সবাইকে নিয়ে গিয়ে কাজ নেই, তিনুপিসী, সুবুমাসী আর রতন কুমুদী দুই ঝি নিয়ে যাওয়া যাক; তারপর সমসম কালে আর যাদের দরকার বুঝ্‌ব, ডেকে পাঠাব।

কার্ত্তিক। তা'হলে তুমি ত যাচ্ছ?

শৈল। তা না হলে তুমি কি নিজে বরণডালা মাথায় করবে নাকি?

কার্ত্তিক। এতবড় আস্পর্দ্ধা তোমার! আমাদের জন্যই ত বরণ-ডালা, আমাদেরই ত বরণ আগে। আমরা আবার কাদের বরণ করব, আমাদেরই তোমরা চিরদিন বরণ করে থাক।

শৈল। ঐ অহংকারেই ত' তোদের এতটা বাড় বেড়েছে।

কার্ত্তিক। তোমরা যদি আমার চিরদিন পূজাই করতে পার তাহ'লে আমরা কি দয়া করে সেই পূজা নেবার পরিশ্রমটুকু করতে পারব না?

শৈল। অনুগ্রহ করে পূজা নিতে পার বটে কিন্তু সব সময় যে পূজার উপযুক্ত থাক্‌তে পার না, এটেই দুঃখ।

এই কথায় হঠাৎ কার্ত্তিকের হাস্যোজ্জ্বল মুখের সমস্ত উজ্জ্বলতা ম্লান হইয়া গেল। শৈলজাও তাহা লক্ষ্য করিয়া তৎক্ষণাৎ করজোড়ে বলিল, "ক্ষমা কর, আর আমি এমন কথা বলব না।"

কার্ত্তিক। ক্ষমা! ক্ষমা কেন শৈল? আমি তোমায় এই কথার